বিষ্ণু দে

প্রবন্ধসংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৩, এপ্রিল, ১৯৫৬

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং : পেজমেকার্স
২৩বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০২৬

মুদ্রক স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশকের নিবেদন

বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশ করতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। এই সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলেন অধ্যাপক স্বপন মজুমদার। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বেশ কিছুটা অংশ মুদ্রিত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও নানা অনিবার্য কারণে প্রকাশিত হতে বিলম্ব হলো বলে আমরা মার্জনাপ্রার্থী। বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য কবিপত্নী প্রণতি দে ও কবিপুত্র শ্রীজিষ্ণু দে-র কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। শ্রীধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধসংগ্রহের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপ্রকাশের অভিজ্ঞতা অর্জন দুর্লভ সৌভাগ্য। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদদের জন্য এটা সম্ভব হয়েছে। বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ প্রকাশে যাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, নানা পরামর্শে বাধিত করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রবেশক

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিষ্ণু দে [১৯০৯—৮২] যেমন এক গুরুত্বপূর্ণ কবি-ব্যক্তিত্ব, তেমনি বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে বিষয়-ভাবনার ও রীতির ইতিহাসে তাঁর স্বাতন্ত্র্যও ভাস্বর। তাঁর কবিমানস নির্মিতিতে যেমন তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিরাজিত, তেমনি সমকালীন জীবনপ্রবাহ, সাংস্কৃতিক-দার্শনিক-সাহিত্যিক-রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতাও তাঁর কবিতা নির্মাণের জগতে বহুধাব্যাপ্ত। তাঁর গদ্যরচনার মননে ও রীতিতে উক্ত সূত্রাবলীও অনুপস্থিত নয়। বিষ্ণু দে-র প্রাবন্ধিক মানসিকতা গঠনে তাঁর অনুশীলিত রসজ্ঞান, পরিশ্রমী গঠন, পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, দেশজ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র, আধুনিক সময়-সংকট, বৈশ্বিক কালচেতনা, মার্কসীয় দর্শন ইত্যাদি অত্যন্ত স্মরণীয় ভূমিকায় সমাসীন। তাঁর চিন্তাজগতের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো স্বকাল চেতনা। তিনি এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন —"নিজের চেতনার অন্তস্তলে বাস্তবের ঐ যন্ত্রণাময় উপলব্ধি থেকে যাত্রা শুরু। তাই তো চলতে হয় ক্লান্তিহীনভাবে উদ্‌ভ্রান্তি ও শক্তিমত্তা সাধ্যানুসারে অর্জন করতে করতে নিজেরই সত্তার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে, যে সত্তা ব্যক্তি মানুষেরই অহম্ এবং সমাজে তার জীবনযাত্রার মিলিত ফল।···এই সত্তাকে বিকশিত বা অর্জন করা সম্ভব একমাত্র নিজেদের মিলিয়ে দিতে পারায় আমাদের আজন্ম মানবিক দৃশ্যের সঙ্গে, আমাদের ইতিহাস এবং আমাদের নিজেদের কৃতকর্তব্যে যে সামাজিক দৃশ্যে আমাদের অবস্থান তার সঙ্গে যেটা আমাদের বিশ্বদৃশ্যের সৌন্দর্যের, অজস্রতার আর মহিমার একটা বিলক্ষণ সক্রিয় প্রাণশক্তি।" বিষ্ণু দে তাঁর নিজস্ব চিন্তায় জীবন-সচেতন, আশাবাদী এবং মানবজীবনের কালগত পরিক্রমার বিকাশে অন্বিষ্ট। তাঁর অন্বেষণ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিপুষ্ট। বিষ্ণু দে-র মানসিকতা উন্মোচনে যেমন তৎকালীন বাস্তবতার প্রেক্ষাপট বিচার করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তাঁর পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, তাঁর প্রত্যেক রচনাতেই আত্মসচেতন মনের 'স্বয়ংনির্দিষ্ট' প্রকাশ সংলক্ষ্য। তাছাড়া তিনি স্বয়ং

এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতা এই মনেরই সজ্ঞানতার স্বয়ং নির্দিষ্ট সক্রিয় বিন্যাস,...আর এই অভিজ্ঞতাটা কমবেশি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংলগ্ন বা আত্মজীবনীমূলক হতেও পারে বা মোটেই তা নাও হতে পারে।" বিষ্ণু দে তাঁর সুদীর্ঘকালের সাহিত্য সাধনায় এমন একটি পরিশুদ্ধ বোধ, সংবেদনশীলতা, ঋদ্ধমননচিন্তা, পারিপার্শ্বিক জীবনচিন্তার অচ্ছেদ্যবোধ, সচেতন দায়বদ্ধতা সাহিত্যের জগতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যা আধুনিকতার বিচারে অনন্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হবে।

যে কোনো মহৎ প্রতিভাসম্পন্ন সৃজনশীল শিল্পীর ন্যায় বিষ্ণু দে-র শিল্পকর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে কালগত তাৎপর্য, শিল্পগত আধুনিকতা, সচেতন মানবিক হৃদয়বত্তা ও যুগগত মননধর্মিতা। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে বাদ দিয়ে কোনো শিল্পীর মানসিক অভিপ্রায় প্রকাশিত হতে পারে না। কেননা, 'পরিণতির আত্মপ্রকাশ সম্ভব, সভ্যতার বা বৈদগ্ধ্যের গভীরতায় এবং নিষ্ঠার ঐকান্তিকতায়'। ১৯০৯-৮২ বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ জীবনপরিধিতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তাঁর স্বদেশে এবং স্ববিশ্বে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদের উত্থান ও পরাজয়, দ্বিখণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা অর্জন, চীন বিপ্লবের সফল পরিণতি, ভারত-রুশ মৈত্রী, চীন-ভারত মৈত্রী, ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ, ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভ, স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের অভ্যুত্থান, নকশালবাড়ি আন্দোলন ইত্যাদি। ১৯০৯-৪৬ পর্যন্ত পরাধীন উপনিবেশ ভারতবর্ষে তাঁর জীবন অতিবাহিত; তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়েছে রেনেসাঁসী অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী পারিবারিক ঐতিহ্যের মধ্যে। ইংরেজের উপনিবেশ কলকাতা শহরে তাঁর জন্ম [১৮ জুলাই, ১৯০৯] তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হাওড়া [তৎকালীন হুগলী] জেলার পাঁতিহাল গ্রামের অধিবাসী। তাঁর পিতামহ বিমলাচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামাচরণ প্রথম কলকাতার অধিবাসী হন এবং তিনি মধুসূদন দত্ত, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তির সহপাঠী ছিলেন। বিষ্ণু দে-র জীবনে প্রথম প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন পিতা অবিনাশচন্দ্র দে। মাতা মনোহারিণী দেবীর কাছে তিনি বাল্যে বাংলা ভাষায় পাঠ নিয়েছিলেন। বাল্যে ও কৈশোরে বিষ্ণু দে সাহচর্যে এসেছিলেন পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী প্রমুখ ছাত্রবৎসল গুণী শিক্ষকবৃন্দের। ১৯৩০—৩২-এ সেণ্ট পলস কলেজে বি. এ. পড়ার সময় তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন কলেজের অধ্যাপক

রেভারেণ্ড সি.সি. মিলফোর্ড, অধ্যাপক এইচ্ ক্রাবট্রি এবং ক্রিস্টোফার একরয়েডের দ্বারা। অধ্যাপক একরয়েডই তাঁকে মার্কসবাদের জগত ও ইউরোপীয় ক্লাসিকাল সঙ্গীত সম্পর্কে অবহিত করান। পরবর্তীকালে তিনি প্রায়ই বীটোভেন, মোৎসার্ট, বাখ, শেপা, মউসর্স্কি, হ্বাগনার, চাইকোভস্কি, এলিজাবেথ গুম্যান প্রমুখ সঙ্গীতবিদদের উল্লেখ করতেন। সাহিত্যবোধ ও সমালোচনার রুচিবোধ গঠনে তাঁর জীবনে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের ভূমিকা স্মরণীয়। তিনি পাউণ্ড, এলিয়ট ও স্যাঁজন পের্স-এর গুণমুগ্ধ ছিলেন। ১৯৩৫ সালে রিপন কলেজে [অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ] অধ্যাপনা করতে এলে সঙ্গলাভ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, প্রমথনাথ বিশী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বজ্জনদের। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে তাঁর ছিল সহৃদয় অন্তরঙ্গতা।

বিষ্ণু দে-র সমকালে অনেকে আধুনিকতার অন্বেষণ করছিলেন পরিবর্তিত মানবস্বভাবের তাৎপর্যবাচকতায়, সময় ও চারিত্র্যের ভিন্নতার জন্য ভিন্ন প্রতীকতায়, শব্দানুষঙ্গে, ছন্দে, সর্বোপরি চিন্তাচেতনায়, উপলব্ধি ও ভাবনায়। বিষ্ণু দে-র কাছে আধুনিকতা হলো 'কালের মাত্রায় সত্তার সন্ধান' এবং সৃজনশীল শিল্পীর ও ব্যক্তিসত্তার সংকট জটিল জিজ্ঞাসায় এক দায়বোধ। বিষ্ণু দে ভেবেছেন —"কিভাবে লেখক হিসাবে আমাদের এই সত্য বা তথ্য বিষয়ে অবহিত হতে হয়—যদি আমরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই আমাদের আত্মপরিচয়ের সত্তাকে, যদি আমরা মনে করি যে আমরা আধুনিক শিল্পকর্মে অনুপ্রাণিত বা আমরা যুগান্তর আনতে চাই শিল্পসাহিত্যে, অর্থাৎ পরিণত হয়ে উঠতে চাই অরিজিন্যাল বা মৌলিক অর্থাৎ প্রকৃত শিল্পী, স্বভাবে, জীবন্ত, স্বকীয় সংবেদ্যতায় আর মনন-প্রক্রিয়ায়। একমাত্র তাতেই হয় প্রাণময় শক্তিতে গতিশীল তার টেকনিক বা আঙ্গিকের ও তার বাহন অর্থাৎ বিষয় শরীরের কর্তৃত্ব তখনই সম্ভব হয় পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অগ্রগামী কর্মিষ্ঠতা। আমাদের চৈতন্যে বাধ্যতই এসে পড়েছিল সংকটবোধ···বৃহত্তম অর্থে ব্যক্তিগত এবং সেই হেতু সামাজিকও বটে, এবং বাধ্যতই এল সদা চলমান সংকট উত্তরণের বা সমাধানের দ্বৈতাদ্বৈত দ্বান্দ্বিকন্যায়তত্ত্ব"। বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথকে 'আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাগরিক' রূপে উল্লেখ করে বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাগরিক এবং কয়েকটি মৌল পুরুষার্থে তাঁর আস্তিক্য নিশ্চিত, যদিও প্রান্তিক থেকে শেষ লেখায় কঠোর নগ্ন প্রশ্ন তাঁর মন তুলেছে এবং শেষ অবধি শান্তি পারাবারে তাঁকে সংকুচিত হতে হয়নি

আত্মপ্রকাশের প্রেরণায়। সে প্রকাশ যেমন বিরাট, বিচিত্র, তেমনি সুস্থ ও মহৎ।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩১-এ এবং বিষ্ণু দে প্রথমাবধি তার সঙ্গে যুক্ত। 'পরিচয়'-এর আত্মপ্রকাশ এবং বিষ্ণু দে-র মননবিশ্ব বিকাশের ধারা প্রায় একই তাৎপর্যসূত্রে জড়িত। 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে দেশীয় ও বৈশ্বিক সাহিত্যের পঠন-পাঠনের যে পরিধি গড়ে ওঠে তা স্বাভাবিকভাবে বিষ্ণু দে-র প্রতিভাবিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। শিল্পকর্মের সঙ্গে সামাজিক মননের সংযোগ ঘটানোর তাগিদ 'পরিচয়'-এর সাহিত্য-সাধনায় ফুটে উঠেছিল বলে বিষ্ণু দে তার সঙ্গে মানসনৈকট্য অনুভব করেছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় বিষ্ণু দে-র প্রচুর সমালোচনা জাতীয় রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলি তাঁর মানসিক ব্যাপ্তির, বিপুল পঠনের ও সমালোচনার উচ্চমানের পরিচয় দেয়। "সেদিন বিষ্ণু দে-ই তো ছিলেন অন্যতম কনিষ্ঠতম, 'পরিচয়' যখন বেরুতে শুরু করে, কবিতায়, প্রবন্ধে, সমালোচনায়, গল্প-অনুবাদে স্বনামে-বেনামে এই কনিষ্ঠ সদস্যের অংশ সংখ্যার দিক থেকে ছিল অতিশয় মুখ্য"—এই অর্থে 'পরিচয়' ও বিষ্ণু দে 'চৈতন্যের সহোদর' তা অনেকাংশে সত্য হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথকে বিষ্ণু দে কল্লোলীয় বা তাঁর সমকালীন অন্যান্য অনেকের ন্যায় সম্পূর্ণত বর্জন বা গ্রহণ করতে চান নি; রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ-বর্জনের দোলাচল-চিত্ততায় বিষ্ণু দে আক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ-বর্জনের দোলাচল চিত্ততায় তিনি কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ না করলেও প্রবন্ধের আলোচনায় তিনি রবীন্দ্র-সমর্থক। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত এবং 'প্রগতি' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটিকে যে বিষ্ণু দে মেনে নিতে পারেন নি, তার 'ধূপছায়া' [আশ্বিন ১৩৩৫] পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'নব সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে। 'চিত্রাঙ্গদার' বিরূপ সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বিষ্ণু দে লেখেন—"সুনিপুণ রসবোধে একটি অতি সুকুমার জিনিষ লইয়া কি অপূর্ব সাফল্যে উৎকৃষ্ট কাব্য লেখা যায়, চিত্রাঙ্গদা তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ"। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে-র কাছে 'বিশাল ও মনোরম, হ্রদ', 'সংহতসত্তা হিমালয়'। 'ব্যক্তির স্বকীয় কথা' যে রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, একথা বিষ্ণু দে স্বীকার করেন, 'রুচি ও প্রগতি' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে। কবিজীবনের সূচনায় বিষ্ণু দে তাঁর 'উর্বশীও আর্টেমিস' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বিমূর্ত সৌন্দর্যতত্ত্বকে স্বীকার না করলেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে উচ্চারণ করেছিলেন—"বাংলার ছোট ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। … তাঁর প্রভাবে বাংলা সংস্কৃতির

স্থরে এল অনেক বিন্যাস, তাঁর প্রতিটি বই টেকনিকের প্রগতিতে পদক্ষেপ ও বিষয়বস্তুর বাহুবিস্তার। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেখালেন শালীনতা।··· প্রাদেশিকতাদুষ্ট বাংলায় তিনি আনলেন বিশ্বের মানদণ্ড। রোমান্টিকের পরিবর্তন অভীপ্সা, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, পেলবতা তাঁর দান। ···সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন যে নিছক সৌন্দর্যের চেতনা, সেও আমরা রবীন্দ্রনাথে দেখেছি। ভিক্টোরীয় চরিত্রের বলিষ্ঠ সততা, কর্মের দায়িত্ববোধও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা।" বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথের ছবির 'স্বকীয়তায় ও বৈচিত্র্যে' অভিভূত হয়ে তাঁকেই প্রথম 'আধুনিক শিল্পীর মানস' অধিকারী বলেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের ছবিতে লক্ষ্য করেছেন—"এক আশ্চর্য নির্ভীক বিশ্ব, এক প্রবল ব্যক্তিস্বরূপের নিবিড় ঐশ্বর্যে বিস্ময়কর ও বিস্মিত জগৎ। ···মনের এ চিত্রলোকে নানা মেজাজ, গতির ও স্তব্ধতার আনন্দের ভাব, তীব্র অভীপ্সা, কঠিন উপহাস, তীক্ষ্ণ ঠাট্টা, স্নিগ্ধ মমতা।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে 'আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাগরিক'। বিষ্ণু দে তাঁর সম্পাদিত 'একালের কবিতা'র মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে 'আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাগরিক'রূপে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে 'তুলনারহিত' ব্যক্তিত্ব—"বস্তুত রবীন্দ্রনাথই আমাদের দেশে শিল্পসাহিত্যে তো বটেই, দেশের সমস্ত সংস্কৃতি, মানবজীবন ও কর্মের আধুনিকতার আদি ও মৌলিক দৃষ্টান্ত। তাঁর মতো আত্মপরিচয় লাভের আকৃতি অথবা সত্তাসংকটের তীব্রতা ও ব্যাপ্তিবৈচিত্র্য বোধহয় বিশ্বে তুলনারহিত,—শিল্পপ্রতিভার মাত্রা, ঐতিহাসিক কার্যকারণ, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের বিরাট সামগ্রিকতা ও তার তাত্ত্বিক সার্থকতা সবকটি কারণে।" বিষ্ণু দে তাঁর কবিস্বভাবের নিজস্বতা প্রতিপাদনের জন্য রবীন্দ্রভাবাবহ অস্বীকার করে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন কবিতার জগতে। রবীন্দ্রনাথকে জীবনের প্রথম পর্বে পরিহার করাটা নঙর্থক দিক নয়; বরং বিষ্ণু দে-র মত আত্মসচেতন, ঐতিহ্য-পরম্পরা সচেতন, দৈশিক ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ, মার্কসীয় চিন্তার শিল্পিত রূপান্বয় প্রয়াসী কবির পক্ষে স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ বর্জনের দোলাচলচিত্ততার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে অশোক সেন যথার্থই বলেছেন—"বিষ্ণু দে-র তরুণ কবিমনে অবক্ষয়ের বোধ ছিল প্রখর। কিন্তু প্রথমে স্থানকাল ইতিহাসের সম্পূর্ণ ধারণা, তাদের কার্যকারণে অবহিত সমগ্র চৈতন্যের অঙ্গীকার সম্ভব হয়নি। তখন মুখ্য ছিল যন্ত্রণায় আপ্লুত সেই নবীনবোধ—চারপাশের জীবন এক দুঃসহ গৌণতায় আকীর্ণ, তার বিরুদ্ধে শুধু আবেগময় অভিপ্রায় ও সৌন্দর্য-প্রিয়তার জোরে এমন কোনো কাব্যবস্তু তৈরি হয় না যা সার্থক প্রতিবাদের

তাৎপর্য অর্জন করবে। গৌণতার অভিজ্ঞতা এবং তার যন্ত্রণা এমনভাবে, এমনরূপে প্রকাশ করা প্রয়োজন যাতে কবির উপলব্ধি একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্য হয়ে দাঁড়ায়। যে বহিরাশ্রয়ে কবির বোধ কবিতায় রূপ পেল তার তন্ময়তায় পাঠকের কাছেও সেই বোধ বাস্তব হবে। এই প্রচেষ্টা ও তার কীর্তিতে বিষ্ণু দে-র কবিতা বিশিষ্ট। শুরু থেকেই তাই। ফলে তার আরম্ভের বর্ণমালা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক হওয়া অনিবার্য ছিল।"

১৯৭১ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার গ্রহণকালে বিষ্ণু দে বলেছিলেন—"আবার আমি স্মরণ করি এখানে টি. এস. এলিয়টকে। তাঁর 'ঐতিহ্য' ও 'ব্যক্তিক গুণীপনা' আমাকে আমার বিকাশে সাহায্য করেছিল প্রচুর।" বিষ্ণু দে-র এলিয়ট-চর্চা সম্ভবত কলেজ জীবনের সূচনাতে। ঐ সময়ে কবির হাতে আসে এলিয়টের 'দি সেক্রেড উড' এবং 'পোয়েমস্ ১৯২৫'। "তারপর এল আকস্মিকভাবে আমাদের পটলডাঙ্গা পাড়ার পুরোনো বইয়ের কারবারী ইউসুফের দাক্ষিণ্যে এলিয়টের 'দি সেকরেড উড' আর' 'পোয়েমস ১৯১৫'। ···এলিয়ট সাহেবের নামটা আগেই জানতুম, কবিতা পড়েছিও গোটাকয় মার্কিন কবিতার সংকলনে—··· তখনও তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'দি ক্রাইটেরিয়ন' চোখে দেখিনি। অচিরে সামাজিক সম্পর্কের সুযোগে জানতে পারলুম যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীন্দ্রনাথ এই কবির ও সমালোচকের মুগ্ধ পাঠক।···এলিয়টের সেকরেড উডের অন্তত দু'টি প্রবন্ধের বক্তব্য পাশ্চাত্যের অনেকের মতো আমাদের কাউকে কাউকে বেশ অনুপ্রাণিত করে এবং এইরকম আলোকিত ধাক্কা ফলপ্রসূ হয়—···কারণ তখন মনে হয়েছিল এইরকমই তো আমরাও ভাবতে চেষ্টা করেছিলুম। এবং তাঁর 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' নামক তাঁর তখনকার দীর্ঘতম কবিতাটি বিচলিত করে এত গভীরভাবে যে লাইনগুলো ঘরে-বাইরে ট্রামে বাসে মনে গুঞ্জরিত হত এমনই তার জাদুর ভয়ঙ্কর কিন্তু লিরিকল শক্তি, একটা ঘোরের মধ্যে বহুকাল কাটে তীব্র নান্দনিক আততিতে।" বিষ্ণু দে-র এলিয়ট বিষয়ক প্রথম রচনা মুদ্রিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৩২-এ। ১৩৩৯-এর 'পরিচয়' কার্তিক সংখ্যায় এলিয়টের The Triumphal March গ্রন্থের সমালোচনা এবং ১৯৩৫ সালের 'পরিচয়'-এর কার্তিক সংখ্যায় The Rock এবং Murder in the Cathedral গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়। এলিয়ট সম্পর্কিত বিষ্ণু দে-র স্মরণীয় প্রবন্ধ ত্রয়ী হলো 'টমাস স্ট্যার্নস এলিঅট', 'এলিয়টের মহাপ্রস্থান' ও 'এলিয়ট প্রসঙ্গ'। রবীন্দ্রনাথকে

এলিয়ট সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলার জন্য বিষ্ণু দে এলিয়টের কবিতা বঙ্গানুবাদ করে রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। ১৯৩২ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় বিষ্ণু দে এলিয়ট সম্পর্কে চিন্তা করেছেন এবং বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছেন ; এলিয়টের কবিতার অনুবাদ করেছেন এবং এলিয়টের 'ট্রাডিশন অ্যাণ্ড ইনডিভিডুয়াল ট্যালেণ্ট' যে বিষ্ণু দে-র মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এতো প্রায় সকলেরই জানা। বিষ্ণু দে-র ইংরেজি ভাষায় রচিত এলিয়ট সম্পর্কিত স্মরণীয় প্রবন্ধ হলো 'টি. এস. এলিয়ট' এবং 'মিস্টার এলিয়ট অ্যামং দি অর্জ্জুনজ'। ১৯৩২-৩৩ সাল থেকেই বিষ্ণু দে এলিয়টের কবিতার অনুবাদ করতে থাকেন এবং অনূদিত কবিতাগুলি ১৯৫৩-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিষ্ণু দে-র মননে এলিয়টের প্রভাব কত গভীর ব্যাপ্ত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত রচনায়—"রাবীন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের মননের জলহাওয়ায় বিদেশী এই কবি ও সমালোচকের প্রভাব কম উদ্বোধক ও গভীর নয়। ...এলিয়টের মৃত্যু সংবাদ এল অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়, অত্যন্ত সভ্য স্নেহশীল কোনো আপন মানুষের বিদায়ের মতো যাঁর সাহায্যে আমাদের অনেকেরই প্রথম বয়ঃপ্রাপ্তির সংবেদন জিজ্ঞাসা, সাহিত্যচিন্তা পেয়েছিল এবং আশাকরি পেতে থাকবে পরিণতির দিশা। তাই সাক্ষাৎ পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা বিনাই দূরস্থ এলিয়ট দিয়েছেন অনেককেই বেশ গভীর এক অন্তরঙ্গতা। এলিয়টের সঙ্গে বিষ্ণু দে তাঁর নান্দনিক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন সম্ভবত আন্তর্জাতিক সভ্যতার সাংস্কৃতিক-শৈল্পিক-সাহিত্যিক উপাদানকে এলিয়টীয় প্রকল্পে ধারণের পদ্ধতিতে। ইংলণ্ডীয় সাহিত্যে এলিয়ট বিশ্ববীক্ষার অনুপস্থিতি বোধজনিত আক্ষেপে বিশ্বসাহিত্যের ঐতিহ্যে অস্তিত্বের নির্ভরতা অনুসন্ধান করেছিলেন। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এই যে বোধজনিত অভিজ্ঞতার উপলব্ধি তাই এলিয়ট ও বিষ্ণু দে-কে উভয়ের সমীপবর্তী করিয়েছে। বিষ্ণু দে-ও এলিয়টের মতো বহুধাবিচ্ছিন্ন সত্তাকে, চৈতন্যসূত্রের এককতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ঐতিহ্যসম্পর্কিত এলিয়টীয় মতবাদও বিষ্ণু দে-র পক্ষে গ্রহণীয় হয়েছে। 'সাহিত্যিক রূপান্তর' যে 'সঠিক রূপান্তরের চৈতন্য' এ তত্ত্ব বিষ্ণু দে অর্জন করেছিলেন এলিঅটীয় চৈতন্যের আলোকে—"অ্যাংলো ক্যাথলিক রাজন্যবাদী এলিঅটের ঐ ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধের অসম্পূর্ণ নির্ণয়ই নিয়ে যায় সাহিত্যের পাদপীঠে, সমাজজীবনে, রাজনীতির ইতিহাসে, অতীতে ও ভবিষ্যতের চিন্তায় অর্থাৎ বর্তমানেই। এবং সাহিত্যিক রূপান্তর হয়ে ওঠে সঠিক রূপান্তরের চৈতন্য।" এ সমস্ত আলোচনার অর্থ কিন্তু এই নয় যে বিষ্ণু দে আজীবন এলিয়টে নিমজ্জিত। কেননা, তিনি

এলিঅটের ন্যায় ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন না ; এলিঅট জনগণ সম্পৃক্ততায় ছিলেন না বিশ্বাসী। তাছাড়া বিষ্ণু দে মার্কসীয় দর্শনের যে সর্বতোভদ্র বিশ্ববীক্ষায় প্রাণিত এলিঅটে তা অনুপস্থিত। ফলত, বিষ্ণু দের কবি জীবনের সূচনাপর্বে এলিঅটীয় প্রভাব স্মরণ্য হলেও, বিশ্লেষণে দেখা যাবে, সেখানেও ছিল গ্রহণ অগ্রহণের দ্বিমেরুচারিতা।

বিষ্ণু দে-র শিল্পসংবেদনগত ও কাব্যিক মানস পরিণতিতে লোকসংস্কৃতি লোকশিল্প লোকসংগীত লোকসাহিত্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। তিনি ১৯৪৪ সালে যামিনী রায়ের চিত্রসংকলনের সম্পাদনা ও ভূমিকা রচনাসূত্রে জন আরউইনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। লোকসাহিত্যের প্রত্নরূপ, আদিবাসীর জীবনচর্চা ও সংগ্রহকারী আরউইনের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিষ্ণু দে-র নান্দনিকতায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাছাড়া ভেরিএর এলউইনের সঙ্গেও বিষ্ণু দে নিবিড়-ভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি এলউইনের *Folksongs of Chattishgrah* গ্রন্থের সমালোচনা করে এবং 'ছত্তিশগড়ী গান' নামে অনুবাদ কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর 'লোকসংগীত' প্রবন্ধে মানুষের জীবনাচরণে প্রত্যক্ষ সুখ-দুঃখের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। লোকসাহিত্য, সংস্কৃতি ও সংগীত চর্চার ফলে বিষ্ণু দে-র কবিতার প্যাটার্নে লোকসংগীতের দেশজ শব্দ ও ভাবের স্তর ক্রমশ অঙ্গীভূত হয়েছে। লোকসংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যের বিচিত্র পর্যায়িক এই যে আত্মীকরণ সেখানেই তিনি যামিনী রায় সম্পর্কে বিশেষ প্রাণিত ও ভাবিত। বিষ্ণু দে-র সঙ্গে যামিনী রায়ের পরিচয় যে দীর্ঘদিনের এ সম্পর্কে সংশয় নেই। "শিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গে যে পরিচয়ের সূত্রপাত বহু আগে থেকেই ঘটেছিল, যা পরিণত হয়েছিল অসমবয়সী বন্ধুত্বে ও যামিনী রায়ের চিত্র সাধনার প্রতি বিষ্ণু-দে-র শ্রদ্ধান্বিত মনোযোগে, তা ক্রমশই গভীর হয়ে উঠেছে। অসংখ্য প্রবন্ধে ও কবিতায় তার স্বীকৃতি আছে। বস্তুত সারা জীবনই বিষ্ণু দে যে দুজন সম্পর্কে বারবার আলোচনা করেছেন, সে দুজন হচ্ছেন টি. এস. এলিয়ট এবং যামিনী রায়। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দুই ব্যক্তিত্ব, স্বীকৃতির মাত্রাও সমান নয় — তবু দুজনেই বিষ্ণু দে-র পক্ষে নিশ্চয়ই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ছিলেন।"

বিষ্ণু দে-র রচনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বিষ্ণু দে ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই যামিনী রায় সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁর উক্ত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। ঐ প্রবন্ধগুলিতে যামিনী রায় সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। বিষ্ণু দে-র 'পূর্বলেখ' (১৯৪১)

কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতা আছে। কবিতাটির নাম 'যামিনী রায়ের একটি ছবি'। কবিতাটি প্রথমে 'একটি ছবি' নামে 'পরিচয়' (আশ্বিন, ১৩৪৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালে 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হওয়ার কালে কবিতাটির নামকরণ করা হয় 'যামিনী রায়ের একটি ছবি'।

১৯৪২ সালে বিষ্ণু দে-র '২২শে জুন' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে যামিনী রায়কে—'উৎসর্গ: শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের করকমলে'।

১৯৪৪ সালে 'Jamini Roy' নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থ ও চিত্রসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। বিষ্ণু দে-র সঙ্গে সহ-লেখক ছিলেন John Irwin. ১৯৪৮ সালে বিষ্ণু দে যামিনী রায়েও শিল্পকর্ম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন Jamini Roy: The Great Artist' নামে। প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে-র 'In the-Sun-and the Rain' নামক ইংরেজি প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৯ সালে বিষ্ণু দে লেখেন 'Art of Jamini Roy', প্রবন্ধটি ১৯৪৯-এর মে সংখ্যা 'The people' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে যামিনী রায় সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধ রচনার কালে তিনি 'Jamini Roy: 'The great Artist' এবং 'Art of Jamini Roy' প্রবন্ধটির সাহায্য নিয়েছেন। বলতে গেলে, 'Art of Jamini Roy প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়ায় 'যামিনী রায়ের শিল্পসংগ্রাম' এবং এই নামে 'সাহিত্যপত্রে' (শ্রাবণ ১৩৫৮) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির শীর্ষনাম পরিবর্তিত হয় 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কালে; তখন বিষ্ণু দে প্রবন্ধটির নামকরণ করেন 'যামিনী রায়"। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিষ্ণু দে-র যামিনী রায় সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বলা যেতে পারে। প্রবন্ধটি নাতিদীর্ঘ, মোট কুড়িটি অনুচ্ছেদ আছে প্রবন্ধটিতে। উক্ত গ্রন্থের 'অবনীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে বিষ্ণু দে বলেছেন—'এইদিক থেকেই যামিনী রায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন'। 'অবনীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে যামিনী রায় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন 'যামিনী রায়' প্রবন্ধটিকে তারই বিস্তৃত পরিপূরক বলা চলে। 'যামিনী রায়' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে যামিনী রায়ের মূল শিল্প স্বভাবকে আবিষ্কারে প্রয়াসী হয়েছেন। সমকালীন দেশজ চিত্রকলার সংবাদ বিষ্ণু দে যেমন রাখতেন, তেমনি ইউরোপীয় চিত্রকলা সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি মাতিস ও পিকাসোর সঙ্গে যামিনী রায়ের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন—"যামিনী রায়ের চিত্রাবলী এতই চিত্রগুণে শুদ্ধ যে তাঁর বিষয়ে ভাষায় লেখা সক্ষম হলেও খানিকটা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

সচরাচর এই চিত্রগুণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আক্রমণে কাবু দেখা যায়। তাই আমরা গল্প না পেলে চিত্রকে দুর্বোধ্য তো বানাই, তার সামাজিক সত্তাও দেখতে পাই না। মাতিসের মতো যামিনী রায়ের দীর্ঘ চিত্র সাধনার বিষয়ে একথা বিশেষভাবে সত্য। ফলে আমরা হয়তো তাঁর বিশেষ দু'একটি ধরনের ছবি পছন্দ করতে পারি, কিন্তু তাঁর কীর্তির সামগ্রিক উৎকর্ষ উপলব্ধি আমাদের বোধের বাইরে থেকে যায়।

কারণ মাতিসের সঙ্গেই তাঁর শিল্প স্বভাবের কিছুটা তুলনা সম্ভব হলেও, এক হিসাবে তাঁর বিকাশের বহুবিধ ঐশ্বর্যের তুলনা মেলে খানিকটা পিকাসোরই সঙ্গে, যদিচ পিকাসোর বুদ্ধিঘর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীর অস্থির কৌতূহল বা পিকাসোর মায়ামমতাহীন গড়ে ভাঙা ও ভেঙে গড়া এক স্বতন্ত্র শিল্প স্বভাবের ইতিহাস।" আলোচ্য প্রবন্ধে বিষ্ণু দে যামিনী রায়ের জীবনে বেলেতোড় গ্রামের ভূমিকা নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন, "লোকসংস্কৃতির অবশেষে ও অপেক্ষাকৃত আঞ্চলিক সচ্ছলতার মধ্যে বেলেতোড় গ্রামে তাঁর শৈশব তাঁর জীবনের বিকাশ নিরর্থক নয়।" কেননা, "শিল্পের প্রাণ সন্ধান এবং সামাজিক জীবনের আত্মসম্পূর্ণতার স্বপ্ন তাঁর এই গ্রামীণ পটভূমিতেই আরম্ভ।" বিষ্ণু দে তাঁর মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে উপলব্ধি করেছেন যে, বেলেতোড় গ্রামের স্মৃতি যামিনী রায়কে কলকাতার নকল বুর্জোয়া জগতের পশ্চিমা প্রাকৃতবাদী শিল্প মার্গের অসহায়তা উপলব্ধিতে সাহায্য করেছিল। আলোচ্য প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুকে সূত্রাকারে সাজালে দেখা যাবে যে, প্রাবন্ধিক বিষ্ণু দে যামিনী রায়ের মানসিক যন্ত্রণার কারণ নির্ণয়ে প্রয়াসী হওয়ার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পধারায় তাঁর ভূমিকা নির্ণয়ের সচেষ্ট হয়েছেন। সমকালীন ভারতীয় চিত্রকলা কিভাবে যামিনী রায়ের শিল্প সাধনায় সার্থকতা লাভ করেছে, তার প্রতিও তিনি ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। ১৯৫১-এর অক্টোবরে 'India Today' পত্রিকায় বিষ্ণু দে যামিনী রায় সম্পর্কে ইংরাজিতে 'Jamini Roy' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

'পরিচয়' পত্রিকায় (১৩৬২ / পৌষ) বিষ্ণু দে-র একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটির নাম 'যামিনী রায় ও শিল্পবিচার'। আসলে এটি একটি প্রতিবাদী সমালোচনা। ১৩৬২-এর ভাদ্র মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় অশোক মিত্র 'যামিনী রায়' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বিষ্ণু দে লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারেননি এবং তিনি পূর্বোক্ত প্রতিবাদী সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি লেখেন। প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য', 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও

অন্যান্য জিজ্ঞাসা এবং 'যামিনী রায়' নামক প্রবন্ধগ্রন্থে সংকলিত হয়। তিনটি গ্রন্থে প্রবন্ধটি যথাযথ মুদ্রিত হয়েছে! কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। ১৩৬২-এর মাঘ মাসের 'পরিচয়' পত্রিকায় বিষ্ণু দে লিখিত প্রবন্ধের উত্তরে অশোক মিত্রের বক্তব্য পত্রাকারে প্রকাশিত হয় এবং বিষ্ণু দে ঐ সংখ্যাতেই 'যামিনী রায় ও শিল্পবিচার' প্রসঙ্গে একটি পত্র লেখেন।

সম্ভবতঃ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে নিউ দিল্লী থেকে যামিনী রায়ের চিত্রসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। বিষ্ণু দে উক্ত চিত্রসংগ্রহের একটি ভূমিকা লেখেন 'Jamini Roy' নামে। বিষ্ণু দে-র 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে যামিনী রায় সম্পর্কিত যে তিনটি প্রবন্ধ আছে তার মধ্যে অন্যতম হল 'বিদেশীর চোখে যামিনী রায় ও তাঁর ছবি'। প্রবন্ধটির মূলে ছিল 'যামিনী রায়ের ছবি' এবং এটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' ষষ্ঠবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে (৩১ শে চৈত্র, ১৩৬৭)। আলোচ্য প্রবন্ধের শেষাংশে বিষ্ণু দে বিদেশী সমালোচকের একটি সংক্ষিপ্ত লেখার অনুবাদ পরিবেশন করেছেন। বিষ্ণু দে জানিয়েছেন—"যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সাহায্য করেছে সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে, উপসংহারে প্রবাসী পাঠকদের জন্য লেখকের উপহার হোক বরঞ্চ একজন বিদেশী সমালোচকের একটি সংক্ষিপ্ত লেখার অনুবাদ। সচিত্র লেখাটি 'মহান শিল্পী যামিনী রায়' নামে কয়েক বছর আগে 'লার্' নামক ফরাসী শিল্প-সাপ্তাহিকে বেরিয়েছিল।" 'Main Stream' (6th May 1972) পত্রিকায় বিষ্ণু দে যামিনী রায় সম্পর্কে ইংরাজীতে যে প্রবন্ধটি লেখেন সেটির বাংলা অনুবাদ 'যামিনী রায়' নামে ১৩৭৯-এর 'সাহিত্যপত্রে' (শ্রাবণ-ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫-এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারি মাসে যামিনী রায়ের চিত্রাবলীর প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় তাঁরই বাড়ীতে। উক্ত প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাশিত ক্যাটালগে বিষ্ণু দে 'Jamini Roy' নামে ইংরাজীতে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখেন। অবশ্য এটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ অপেক্ষা মুখবন্ধ বলাই শ্রেয়।

যামিনী রায় সম্পর্কিত বিষ্ণু দে-র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'যামিনী রায়' (১৩৮৪)। গ্রন্থটিতে যামিনী রায় বিষয়ক বিষ্ণু দে-র সমস্ত প্রবন্ধ, যামিনী রায় লিখিত প্রবন্ধ, চিঠি ইত্যাদির সংকলন করা হয়েছে। 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে প্রকাশিত 'যামিনী রায়' প্রবন্ধটি এই গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ হয়েছে আংশিক পরিবর্তনসহ। 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধের তিনটি প্রবন্ধই 'যামিনী রায়ও শিল্পবিচার', 'শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের রবীন্দ্রকথা' এবং 'বিদেশীর চোখে যামিনী রায় তাঁর ছবি'

'যামিনী রায়' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'যামিনী রায়' এবং 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে 'যামিনী রায় ও শিল্পবিচার নামে যে প্রবন্ধটি আছে তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বিষ্ণু দে-র 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প সাহিত্য' গ্রন্থে।

তাহলে দেখা গেল যে, বিষ্ণু দে যামিনী রায় সম্পর্কে মোট চারখানি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মধ্যে একটি প্রতিবাদী সমালোচনামূলক প্রবন্ধ; অবশ্য তাঁর নিজস্ব লিখনপদ্ধতির ফলে প্রবন্ধটি প্রতিবাদী সমালোচনামূলক হওয়া সত্বেও মৌলিক প্রবন্ধে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি প্রবন্ধেই তিনি যামিনী রায়ের প্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

যামিনী রায় (১৮৮৭) বিষ্ণু দে-কে (১৯০৯) অসংখ্য পত্র লিখেছেন। তার মধ্যে 'যামিনী রায়' গ্রন্থে মাত্র ৭১টি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই ৭১টি পত্রে যামিনী রায় ও বিষ্ণু দে-র অন্তরঙ্গ মানসিকতা অকৃপণভাবে ব্যক্ত হয়েছে। যামিনী রায় সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র রচনার উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব সম্পর্কে মূল্যায়নে সাহায্য করে। বিষ্ণু দে-র বিশ্লেষণী অথচ কবিত্বময় দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যামিনী রায়ের শিল্পকৃতির মৌলিক তাৎপর্যটি—

১. "তিনি খুঁজেছিলেন মৌলিক আকারের ও সমবর্তী রঙের উচ্ছল রূপায়ণ এবং তা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন বাংলার পুতুলের চৈত্যরূপের নিশ্চিন্ত ঋজুতায় তাঁর ঘরের ও সর্বদেশের শিশুদের শুদ্ধ ভাব গঠনের দৃষ্টিতে, আদিম বর্ণপংক্তির রঙিন শক্তিতে।"

২. "একথা সত্য যে যামিনী রায় নিজে তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপগুলির সমধিক গুরুত্ব দেন না, কিন্তু সেখানেও তাঁর চোখের দেখা-চেনা, স্মৃতিজাত, চিত্রমূল্য কাল্পনিক বা বিদেশী কাজের পরীক্ষামুলক নানান ল্যাণ্ডস্কেপের বৈচিত্র্যে ও অসামান্য দক্ষতায় অবাক হতে হয়।"

যামিনী রায়ের শিল্পকৃতি সম্বন্ধে বিষ্ণু দে-র বক্তব্য কি বিষ্ণু দে-র কবিতাতে প্রকাশিত হয় নি? 'পূর্বলেখ' কাব্য থেকে বিষ্ণু দে-র স্বদেশকে অন্বেষণের নতুন পালার সূচনা—আর তার প্রতীক হলেন যামিনী রায় ও তাঁর চিত্রকলা। ভাবনার এই একই সূত্র থেকে বিষ্ণু দে 'ক্যালকাটা গ্রুপে'র শিল্পীসংঘের স্বাধীন আত্ম-প্রকাশকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই গ্রুপকে যামিনী রায়ের উত্তরসূরী বলা চলে এবং ১৯৪৩-এ এর আত্মপ্রকাশ। শুভো ঠাকুর, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, প্রদোষ দাশগুপ্ত, কমলা দাশগুপ্ত, প্রাণকৃষ্ণ পাল, পরিতোষ সেন প্রমুখের চেতনাদৃপ্ত সমবেত আন্দোলন বিষ্ণু দে-কে প্রাণিত করেছিল। 'ক্যালকাটা

গ্রুপে'র শিল্পীদের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন "কলকাতা গোষ্ঠীর শিল্পোৎকর্ষ বিষয়ে নতুন করে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, যামিনী রায়ের কীর্তির পরে এঁরা এবং এঁদের সহকর্মীরা ভারতশিল্পের আশা। এই ক'জন শিল্পী যে আমাদের গলিত ভদ্র সমাজের এবং তার জীর্ণ শিল্পধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অভিযান চালিয়েছেন, সে স্বীকৃতি আমাদের প্রগতিবাদীরা নিশ্চয়ই তাঁদের দেবেন, কারণ প্রতিরোধের দ্বন্দ্বাত্মক আন্দোলনেই এ শিল্পবুদ্ধির উৎস ও বিকাশ।' প্রথাগত চিত্ররীতির বিরুদ্ধে ক্যালকাটা গ্রুপের বিদ্রোহ ও অঙ্কনপদ্ধতিকে তিনি দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের পদ্ধতিতে অভিনন্দন জানান। ক্যালকাটা গ্রুপকে বিষ্ণু দে-ই ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলনের সংস্পর্শে এনে যুদ্ধবিরোধী মনোভাবে দীক্ষিত করেন এবং সামাজিক বাস্তবতার প্রকাশকে মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার বিভায় দীপ্ত করেন।

১৯৩৩-এ হিটলার ও নাৎসীরা ক্ষমতা দখল করলে মানবসভ্যতার ইতিহাসে মারণযজ্ঞ শুরু হয়। সংবাদপত্র-সাহিত্যের কণ্ঠরোধ করা হয়। কমিউনিস্ট ও ইহুদী নিধন মানবসভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করে। বিজ্ঞানী এবং চিন্তাবিদরা হয় স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হন; অথবা নিজবাসভূমে পরবাসী হন। চিন্তার রাজ্যে বহু প্রগতিশীল মতাবলম্বী গ্রন্থ ভস্মীভূত ও বাজেয়াপ্ত হয়। সমগ্র পাশ্চাত্যজগৎ ফ্যাসিস্ত বর্বরোচিত কার্যকলাপে ভীত-সন্ত্রস্ত জীবনযাপনে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় রঁমা রোঁলা, ম্যাক্সিম গার্কী, আরি বারবুস প্রমুখের আহ্বানে সমগ্র বিশ্বের চেতনাসম্পন্ন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীর দল ১৯৩৫-এর ২১ জুন প্যারিসে প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্যাসীবাদ বিরোধী সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকদের কণ্ঠ থেকে বজ্রগর্ভ ধিক্কারবাণী উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসীবাদের মোকাবিলা করার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং International Association of Writers for the Defence of Culture গঠিত হয়। ওই সম্মেলনে আঁদ্রে জিদ, ই. এম. ফরস্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডাস হাক্সলি, জন স্ট্রাচির মত অনেক অকমিউনিস্টও যোগদান করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বজুড়ে এই সংকটচেতনা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহমণ্ডলে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল। ১৯৩৬-এর এপ্রিলে লক্ষ্ণৌ শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশন থেকে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ভূমিকা স্পষ্ট হয়েছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশাপাশি বিশিষ্ট উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচন্দের নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' গঠিত হয় ১৯৩৬-এর ১০ এপ্রিল। 'নিখিল ভারত

প্রগতি লেখক সংঘ' সংগঠনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; কেননা, এই সংগঠনটি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে ফ্যাসিস্ত বিরোধী ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল। অবশ্য একথা ঠিক যে 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল বিদেশে। "প্রগতি লেখক সংঘকে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম প্রয়াস হয়ে ছিল এদেশে নয়, বিদেশে, লণ্ডনে এক ঘরে বসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকজন যে আলোচনা ১৯৩২-৩৩-৩৪ সালে করেছিল, তারই পরিণতি ঘটে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠায়। মুলকরাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, ভবানী ভট্টাচার্য, ইকবাল সিং, রাজা রাও, মুহম্মদ আশরফ্ এবং আরও কয়েকজন মিলে যে আলোচনা চলে, তারই জের এ-দেশে টেনে ১৯৩৫ সালে প্রস্তাবিত প্রগতি লেখক সংঘের ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়।" ঐ ইস্তাহারে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিল—"যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তি-হীনতার দিকে টানে তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু ও সমাজের রূপান্তরক্ষম করে তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করি।" 'প্রগতি লেখক সংঘে'র যে সম্ভাবনা লণ্ডনে উপ্ত হয়েছিল, তাই ১৯৩৬ এর এপ্রিলে লক্ষ্ণৌতে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' নামে রূপ পরিগ্রহ করল। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার সফলতার পটভূমিকায় ছিল ইউরোপ প্রত্যাগত কয়েকজন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর সক্রিয় সহযোগিতা—প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার পিছনে ছিল মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় উদ্যোগ। এই আয়োজন সেদিন সফল হয়েছিল সদ্য ইয়োরোপে প্রত্যাগত সজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের সচেতন প্রচেষ্টায়। এঁদের উদার মানবিক দৃষ্টিই সেদিন এই সংগঠনের মধ্যে টেনে এনেছিল বহু অমার্কসবাদী অথচ গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ খ্যাতিমান লেখক শিল্পীকে।" 'প্রগতি লেখক সংঘে'র ইস্তেহারে জীবনের মৌলিক সমস্যার ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অযৌক্তিক, প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্মকে প্রত্যাখ্যান করে সৃষ্টিশীল, প্রগতিশীল ধ্যানধারণাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশিত করার কথা বলা হয়—"We believe that the new literature of India must deal with the basic problems of our existence to day—the problems of hunger and poverty, social backwardness and political subjection. All that drags us down to passivity, inaction and

unreason we reject as reactionary. All that arouses in us the critical spirit. which examines institutions and customs in the light ourselves, to transform, we accept as progressive.”

প্রগতি লেখক সংঘ যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রোঁমা রোঁলা, আরি বারবুস এদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল ; তেমনি জাতীয় ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রেমচন্দ, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু প্রমুখ মনস্বী ব্যক্তিবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রেখেছিল। সর্বভারতীয় সম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের কিছুদিন পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রগতি লেখক সংঘের শাখা গঠিত হতে শুরু করে এবং ১৩৩৬-এর এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর নেতৃত্বে ‘নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘে’র একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৬ এর ২৫ জুন কলকাতার অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত ম্যাক্সিম গোর্কীর স্মরণ অনুষ্ঠানে ‘নিখিল বঙ্গ প্রগতি লেখক সংঘ’ জন্ম লাভ করে। সংঘের প্রথম সভাপতি হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং সম্পাদক হন সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। প্রগতি লেখক সংঘ সম্পর্কিত নানা খবরাখবর হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর মারফৎ ‘পরিচয়’ পত্রিকার সভায় আনীত হতো। ‘পরিচয়’ পত্রিকা তখন আন্দোলনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ-ভাবেই যুক্ত এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় ‘বাংলায় তখন পরিচয়ই ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে প্রগতি আন্দোলনের মুখপত্র’। অবশ্য এ তথ্যও সঠিক যে, প্রগতি লেখকদের মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে পরিচয়গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধতা ছিল। ১৯৩৭-এ সংঘের পক্ষে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সম্পাদনায় ‘প্রগতি’ নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। উক্ত সংকলনে ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অরুণ মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি কবিতাও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শিল্পীর সংগ্রামে বিষ্ণু দে-র ভূমিকা প্রথম দিকে সদর্থক হলেও পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে-র ভূমিকা মার্কসবাদী শিবিরে বিশেষ পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। ১৯৪২-এর ২৮ মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক সম্মেলনে সংগঠিত ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন বিষ্ণু দে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই পর্বে বিষ্ণু দে-র অধিকাংশ লেখা প্রকাশিত হয়

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'অরণি' পত্রিকায়। ১৯৪১ সালে বিষ্ণু দে-র কবিতা পুস্তিকা '২২শে জুন' প্রকাশিত হয় এবং উক্ত কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, কলিকাতা। উক্ত গ্রন্থের লভ্যাংশ প্রাপ্য ছিল লেখক ও শিল্পী সংঘের। 'সমুদ্রের মৌন' থেকে শুরু করে তিনি ফ্যাসিস্ত বিরোধী নানা গল্প কবিতার অনুবাদও করেন। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সামাজিক দায়িত্ব ও সক্রিয়তা বিষয়ক চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ রচনা, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের জন্য চাঁদা সংগ্রহার্থে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ইত্যাদিতেও বিষ্ণু দে-র ভূমিকা অত্যন্ত সক্রিয়। ১৯৭৫ সালে আশুতোষ কলেজে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের উদ্যোগে সুধীন্দ্রনাথ কৃত ইয়েটসের 'রেজারেক্‌সন্' কাব্যনাট্যটির অনুবাদ 'পুনরুজ্জীবন'-এর মহড়া ও পরিচালনা করেন বিষ্ণু দে। ভারতীয় গণনাট্যের সর্বভারতীয় সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি বোম্বাই গমন করেন। আন্তর্জাতিক বিশ্বে, ফ্যাসিজমের আগ্রাসী ভূমিকায় যে মৈত্রীর সূচনা হয় ও প্রগতির যে উদ্দীপনা জাগে তাতে বিষ্ণু দে উদ্দীপিত হন এবং টি এস এলিয়ট-এর চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদী কবি পল এলুয়ার ও লুই আরাগঁ সম্বন্ধে আগ্রহী ও সচেতন হন। বিষ্ণু দে এই সময় নিজের মানসিকতাকে সমাজকর্মের সক্রিয়তার সঙ্গে এবং সহানুভূতির পরোক্ষতার সঙ্গে মেলাতে চাইছিলেন। বিষ্ণু দে-র এই সময়ের মানসিকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেবেশ রায় তাঁর 'চৈতন্যের সহোদর' (পরিচয় ৪৮ বর্ষ ১০-১২ সংখ্যা) প্রবন্ধে লিখেছেন—"হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বদলে যায় জনযুদ্ধে। দেশকে জানার আত্মদীর্ণ প্রক্রিয়া গিয়ে মেশে ইতিহাসের সমসাময়িকের প্রচণ্ড জীবনে। 'পূর্বলেখ'তে যে জানা ছিল ইতিহাসে সেই জানা বদলে যায় '২২শে জুন', 'সাত ভাই চম্পাতে' দুনিয়ার বদলটা চোখের সামনে যেখানে ঘটেছে। কলোনির দেড়-দুশ বৎসরের গ্লানির ভার অবান্তর হয়ে যায় বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর অভূতপূর্ব ভূমিকায়।... 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর উপমায় বিষ্ণু দে তাঁর দেশকে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই দেশ আবিষ্কার আর কবিত্বের আত্মআবিষ্কার একই উদ্বোধনে ঘটেছিল। সেই উদ্বোধন তাঁর জীবনব্যাপী কবিতাকর্মে কখনোই আর ভোলা গেল না।" ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পরবর্তীকালের সারাভারত-ব্যাপী নৌ-বিদ্রোহ, ডাক-তার ধর্মঘট, তেলেঙ্গানা কৃষকসংগ্রাম, বাংলাদেশের তেভাগা আন্দোলন ইত্যাদি সমস্ত মনুষ্যত্বের যে অবমাননা ও প্রতিবাদ একই সঙ্গে ঘটায়, তা কবির অভিজ্ঞতায় এক বিস্তারধর্মী অথচ কেন্দ্রাম্বিত আবেগ সৃষ্টি

করে—যার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি সন্দীপের চর (রচনাকাল ১৯৪৪-৪৭) কাব্যগ্রন্থে। দুর্ভিক্ষে অকাল মৃত্যু আর শোষণ, লোভ আর অনাচার ইত্যাদিতে পীড়িত বিষ্ণু দে-র কবি আত্মা ইতিহাসের প্রগতির অটুট আস্থার সঞ্জীবনী সন্ধানে মানবতার ঐতিহ্যের প্রতি নিবদ্ধ হতে থাকেন। ১৯৪২-৪৫ সালের সক্রিয়তার মধ্যে মার্কসীয় চিন্তাদর্শে যে বলয় গড়ে উঠতে থাকে, সমাজ মানসে তার প্রবল প্রভাব অনুভূত হয়। ১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বাই শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় (তৃতীয়) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিষ্ণু দে এতে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত 'ফ্যাসিস্ত বিরোধী লেখক ও শিল্পীসংঘের' ছয়দিনব্যাপী সম্মেলনে বিষ্ণু দে অংশ গ্রহণ করেন। গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩), সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (১৯৪৩) ইত্যাদি সংগঠনেও বিষ্ণু দে-র আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

"সম্ভবত সমকালীন সকল সাহিত্য স্রষ্টার মধ্যে সমাজবোধ ও শিল্পায়নের অদ্বৈত সার্থকতায় তিনি শ্রেষ্ঠ"।—বিষ্ণু দে সম্পর্কে একথা বলেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'তরী হতে তীর' গ্রন্থে। সভাসমিতির ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উদাসীন বিষ্ণু দে সাহিত্যিক মজলিসে নিয়মিত অংশগ্রহণে উৎসাহী এবং সৃষ্টিশীল রচনার সঙ্গে নানা গ্রন্থের সমালোচনা লেখাতে তৎপর। 'পূর্বলেখ' কাব্যরচনার পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণু দে যেন নিঃসঙ্গ—কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতির জগত থেকে দূরে তাঁর অবস্থান; পরিচয়-তেও যেন সম্পূর্ণ নন। অথচ মানসিক প্রস্তুতিপর্ব গড়ে ওঠে শ্রেণী ব্যক্তি ও বাস্তব চেতনতার মধ্য দিয়ে ১৯৩৬ থেকেই বিষ্ণু দে-র নিজস্ব কবিকণ্ঠ শোনা যেতে থাকে মার্কসীয় চেতনাকে কবিকর্মে অঙ্গীভূত করার প্রয়াসে। এই পর্বে তাঁর আত্মিক জগতের অন্যতম সহকর্মী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—যাঁর ব্যক্তিত্বে ও বন্ধুত্বে বিষ্ণু'দে মার্কসীয় ধ্যানধারণার সাংগঠনিক ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন; আর এ প্রসঙ্গে আর একজন হলেন পূরণচাঁদ যোশী—এ দুই বন্ধুর উদ্দেশে বিষ্ণু দে 'In the Sun and the Rain' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন —'I dedicate this book to two of my very good friends for three decades and a half—P. C. Joshi and Hirendranath Mukherjee" মার্কসবাদে বিষ্ণু দের আস্থা অর্জনে এ পটভূমিকাটুকু স্মরণ্য।

ঔপনিবেশিক ছত্রছায়ায় উদ্ভূত যে মধ্যশ্রেণীর পরিবেশ-প্রতিবেশে বিষ্ণু দে-র জন্ম সেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটা সমাজ-অর্থ-সাংস্কৃতিক শ্রেণীসত্তা আছে এবং এই শ্রেণী মধ্যবিত্ত সুলভ দৃষ্টি অসম্পূর্ণতা, বস্তু ও ভাবের বৈপরীত্য, অস্তিত্বের যন্ত্রণা,

অহংবোধের অচরিতার্থতা ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত। বিষ্ণু দে মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিবেশের সীমাবদ্ধতা থেকে বার হতে চাইছেন বলেই মার্কসবাদে স্থিত হতে প্রয়াসী—অবশ্য সেখানে গ্রহণ বর্জনের দোলাচলচিত্ততা এবং দোলাচলচিত্ততাজাত সংকটও অনুপস্থিত নয়। তবে বিষ্ণু দে-র মার্কসবাদে স্থিত হওয়ার কারণ তাঁর চৈতন্যের সংকট সমাধানের প্রচেষ্টা। বিষ্ণু দে আপন চেতনায় বুর্জোয়া শ্রেণীর অবক্ষয় ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশের যে নানন্দিক বিচ্ছিন্নতাবোধ তার দ্বারাও আক্রান্ত হচ্ছিলেন। বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, মার্কস-এর রচনার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মার্কস পূর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতির পঠন-পাঠনেও তিনি অভ্যস্ত ও প্রাণিত হন। বিষ্ণু দে-র আকাঙ্ক্ষিত ছিল 'দীর্ঘদৃষ্টি' বা 'প্রাক প্রবুদ্ধি' আয়ত্ত করা—"মার্কস ও এঙ্গেলস আমাদের পক্ষে সম্ভব করেন এই প্রাকবুদ্ধির অন্বেষা এবং তার চর্চা এবং তা নান্দনিক ক্রিয়া কর্মের ক্ষেত্রেও। এই প্রাক প্রবুদ্ধি অবশ্যই শুধুমাত্র মনে সদা প্রস্তুত থাকার একটা সক্রিয় অবস্থা।" 'প্রাক প্রবুদ্ধি সদা প্রস্তুত থাকার সক্রিয় অবস্থা' বলে কবিকে বর্তমান ও অতীতকে সুস্পষ্ট করে দেখতে হয় চলমান গতিশীলতার মধ্যে। এক অর্থে একেই সৃজনক্রিয়া বলা চলে। মার্কসবাদে এই দ্বান্দ্বিক ন্যায় ও মানুষের সক্রিয় সৃজনক্রিয়ার তত্ত্ব স্বীকৃত। বিষ্ণু দে কাব্যসাধনার মৌলিক প্রক্রিয়া হলো মানবিক দর্শনের প্রত্যয়ের ভিত্তিভূমিতে আত্মবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ। বিষ্ণু দে শিল্পকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন বিশ্বকে দেখার ও উপলব্ধি করার উপযোগিতায়। রবীন্দ্রনাথের বিপরীত জগতে অভিযানের বিরুদ্ধে বা কল্লোলীয় রোমান্টিক পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও বিষ্ণু দে-র সমস্যা ছিল স্বতন্ত্র্যবাদী বিকাশকে নিরালম্বতা থেকে রক্ষা করা। মার্কস কবিকে ধীরে ধীরে সংহত বিশ্ব উপহার দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন—"কার্ল মার্কসের বিশ্বদর্শনের তত্ত্ব ও কর্মযোগও আমাদের চৈতন্যে অঙ্গীভূত হতে লাগল ধীরে ধীরে এবং স্তরে স্তরে পর্বে পর্বে, আমাদের ভিন্নকাজের কাঠামোর ঘরানার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বোধ হয় এই সামগ্রিক, সর্বাশ্লিষ্ট, যদিচ চিন্তার এক চলমান পরীক্ষামূলক পদ্ধতি যাতে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মানুষ এবং নন্দনকর্মী হাতে হাত মিলিয়ে চলে দ্বন্দ্বোত্তরণশীল ন্যায়ের এক সংগঠন, যার বনিয়াদ বস্তুবাদে পাকা ও প্রকৃত জীবনের মাটিতে গভীর। অবশ্যই এই প্রক্রিয়া ধীরগতি হতে বাধ্য, কারণ মানুষের সমগ্র অন্তহীন পারস্পরিকভাবে সংলগ্ন বিশ্বই ছিল এর জগত।" সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেছেন যে, আপন সত্তার সংহতি

আবিষ্কারের জন্যই বিষ্ণু দে-কে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী হতে হয়েছে। মার্কসীয় দর্শন ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রে এমন প্রেক্ষাপট আনয়ন করে যেখানে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি-মানুষও প্রকৃতি পরিবেশ ও সমাজ পরিবেশে ইতিহাসের গতিময়তার সদর্থক ভূমিকা পালনে প্রয়াসী হয়। বিষ্ণু দে-ও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। "সক্রিয় দ্বন্দ্বময়তার সামাজিক ও মানবিক দৃশ্যের সংলগ্নতায়, বাস্তবের যন্ত্রণাবোধ থেকে সত্তা আবিষ্কারে বিষ্ণু দে গঠন করেন তাঁর তত্ত্বজগৎ, যেখানে থেকে তাঁর কবিতাই জল হাওয়া পায়। বিষ্ণু দে তাঁর মার্কসবাদ পঠনের দ্বারা মননে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রম-বিভাগের শৃঙ্খলজনিত যে অনন্বয় তা থেকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র মার্কসবাদ এবং মার্কসীয় দর্শনই মানুষকে তার অপরিমেয় সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করায়। বিষ্ণু দে-র স্বীকৃতিতে এ উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষ্যগোচর—"মার্কসের বিশ্বকৌষিক মনের বিরাট কর্তৃত্বের জুড়ি বোধ হয় পৃথিবীতে আর হয়নি, মুষ্টিমেয় বিশ্বমানবদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় বিজ্ঞান বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ মননশীল এবং সব চেয়ে নৈর্ব্যক্তিক-ভাবে মানবিক, অধিকন্তু তাঁর ছিল স্বীয় চিন্তার প্রক্রিয়ারই প্রবল যন্ত্র যার আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল দূরের অস্পষ্ট অনেক কিছু, ...তাঁর চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মের কল্যাণে পরবর্তীকালে আমরা সবাই পেয়েছি সর্বমানবের ইতিহাস বিষয়ে কাজ করবার বৈজ্ঞানিক রীতিটি আর পুরোধা তথ্য ও তত্ত্বসন্ধানের উত্তরাধিকার।" বিষ্ণু দে-র কবিজীবনে এলিঅট অন্যতম সত্য, আর মার্কসীয় দর্শন অন্তিম সত্য। তিনি এলিঅটীয় কবিস্বভাবে চিন্তার কারুণ্য, বিজ্ঞানে অবিশ্বাস এবং খণ্ডিত মানবচৈতন্যের বোধ উপলব্ধি করে মার্কসীয় দর্শনের জগতে প্রস্থানী পথিক। বিষ্ণু দে উপলব্ধি করেছিলেন স্বাধিকারের প্রশ্নে, সীমাহীন মানবতাবাদের প্রশ্নে, ইতিহাসবোধ ও শিল্পীসত্তার বিকাশের প্রশ্নে মার্কসীয় দর্শনই একমাত্র সত্য। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শিল্পীর সংগ্রামে তাঁর এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল।

বিষ্ণু দে-র নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় কার্লমার্কস ব্যতীত আর কয়েকজন মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিকের সঙ্গে তাঁর চিন্তাগত সাদৃশ্য সংলক্ষ্য। মার্কসবাদী চিন্তাবিদ্ লুকাচের (১৮৮৫-১৯৭১) চিন্তা, নন্দনতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার সঙ্গে বিষ্ণু দে-র চিন্তাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। লুকাচ মনে করতেন যে, বিজ্ঞান, দর্শন অপেক্ষা সাহিত্যে কালের মূল সত্য ধরা পড়ে এবং কবির কালের মূল সত্যের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অন্তর্নিহিত সংযোগ রক্ষা করে চলেন। তার মতে, সাহিত্যকর্ম শিল্পীর অভ্যন্তরীণ সৃজনক্রিয়া, তবে তা সামাজিক ও ঐতিহাসিক বন্ধনে অনিবার্যভাবে

যুক্ত। বিষ্ণু দে-ও লুকাচের মতো অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতার চরিত্র রচনায় রত। লুকাচের মতো বিষ্ণু দে-ও ভাষাকে চিত্র ও সঙ্গীতের মতো অনুষঙ্গে দেখেছেন এবং চিত্রকলার প্রতি সীমাহীন আকর্ষণ অনুভব করেছেন। আদর্শনিষ্ঠ ও মার্কসীয় মানবতাবাদে প্রত্যয়ী লুকাচের মতো বিষ্ণু দে-ও আত্ম-বিশ্বাসী ও সারস্বত জীবনযাপনে নিষ্ঠাবান। বিষ্ণু দে ও লুকাচের মতো সাহিত্যের আপেক্ষিক সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছিলেন; যদিও উভয়েই মনে করতেন যে সাহিত্য নির্দিষ্ট সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক বাতাবরণ জাত।

ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নেতা আন্তোনিও গ্রামসির মতাদর্শের দ্বারা বিষ্ণু দে যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে তাঁর প্রবন্ধে ও চিঠিতে। 'সাহিত্যের সেকাল থেকে মার্কসীয় কাল' প্রবন্ধে গ্রামসির উল্লেখ আছে। গ্রামসির মতো তিনিও বিপ্লবের জন্য সাংস্কৃতিক মতাদর্শগত প্রস্তুতি ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অপরিহার্য অস্তিত্বের কথা বলেছেন। গ্রামসি চেতনায় যে দীর্ঘ দৃষ্টি এবং 'প্রাক প্রবুদ্ধি'র কথা বলেছেন বিষ্ণু দে তার উল্লেখ করে বলেছেন—"এই স্মৃতিচারণের প্রবন্ধ প্রয়াস বোধ হয় এবারে ক্ষান্ত করা যায় মার্কসীয় চিন্তার এক প্রাজ্ঞ ও মহানুভব ভাষ্যকার গ্রামসির কথা তুলে। গ্রামসি লিখেছিলেন: 'দীর্ঘ দৃষ্টি' বা প্রাক প্রবুদ্ধি আর কিছু নয়, শুধুমাত্র বর্তমান ও অতীতকে চলমান বলে গতিরূপে স্পষ্টত দেখা; অর্থাৎ প্রক্রিয়াটির মূল এবং স্থায়ী দিকগুলি ঠিকভাবে শনাক্ত করা কিন্তু এই দীর্ঘ দৃষ্টিকে নিছক বাহ্য বা বিষয়সর্বস্ব ভাবাটা আজগুবি হবে। বাস্তবে প্রাক প্রবুদ্ধ বা দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির মানসে থাকে একটা বিশেষ লক্ষ্য, একটা বিশেষ অভীষ্ট কর্মসূচী, একটা কার্যক্রম এবং প্রাক্ প্রবুদ্ধি সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার সহায়।"

সূচনাপর্ব থেকে প্রগতিসাহিত্য আন্দোলন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেও এবং শিল্পীর দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রগতিশীল প্রবন্ধ লিখলেও চল্লিশের দশকে বিষ্ণু দে-কে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বুদ্ধির অতিরিক্ত চর্চা, আঙ্গিকসচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ ইত্যাদির জন্য বিষ্ণু দে-কে সমালোচিত হতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধে 'শুদ্ধাচারী শিল্পদৃষ্টি ও নাগরিক বৈদগ্ধ্যের জটিল মানসিকতার' এবং 'গণআন্দোলনমুখী সাহিত্যচেতনার' সামঞ্জস্যহীনতার অভিযোগ ওঠে। ভবানী সেন বিষ্ণু দে-কে আক্রমণ করে বলেছিলেন—"বিষ্ণুবাবু একজন দক্ষ কলাকৌশলবিদ কিন্তু মার্কসিস্ট নন। তাঁর কলাকৌশল মার্কসবাদকেই হত্যা করে। কিন্তু একথা মনে করলে ভুল হবে যে,

বিষ্ণুবাবুর গলদ শুধু কলাকৌশলেই। কলাকৌশল তাঁর ভাবধারাকে বিকৃত করে দিয়েছে, অথবা তাঁর ভাবধারারই প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হল তাঁর কলাকৌশল। পাতঞ্জলির সাংখ্য দর্শনের মত 'বস্তুকে' তিনি 'প্রকৃতি'তে পরিণত করতে চেয়েছেন। ভাববাদের এক মহাসংকটের সময় শঙ্করাচার্য যেমন অদ্বৈত বেদান্তে বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েই তাকে মায়ায় পরিণত করেছিলেন, বিষ্ণুবাবু তেমনি বস্তুজগতের প্রকৃত সংগ্রাম ও সমস্যাকে মায়াময় করে তুলেছেন।" উক্ত 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' প্রবন্ধে ভবানী সেন বীরেন পাল ছদ্মনামে বিষ্ণু দে-র প্রগতিধর্মী কবিসত্তাকে নস্যাৎ করার জন্য আরো কয়েকটি পৃষ্ঠা ব্যয় করেছেন। মার্কসবাদী সাহিত্যসমালোচক বিনয় ঘোষ নয় স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, অনিল কাঞ্জিলাল প্রমুখ সকলেই বিষ্ণু দের-র তীব্র সমালোচনা করেন। ক্রমশ সমালোচনা ও তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণে বিষ্ণু দে-র মানসজগতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং তিনি একটি স্বকীয় শিল্পবোধের জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে পি সি যোশীর উত্থান-পতনের প্রেক্ষাপটের জটিলতায় বিষ্ণু দে-র তত্ত্বগত সংকট জটিলতার রূপ ধারণ করে। রাজনীতি ও শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চরমপন্থী মতবাদ তীব্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৪৭-এর প্রায় শেষাশেষি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ব্যাপারে বিরোধ দেখা যায়। অবশ্য এই মতবিরোধ মূলত দেখা দেয় রাশিয়ায় ও ফ্রান্সে। ১৯১৭ সালের সফল বিপ্লবের পর লেনিনীয় কালে শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে যে স্বায়ত্তশাসন ছিল, ১৯৩২-এর পর থেকে, মূলত স্তালিনের কালে তা সংকটাপন্ন হয়। লেনিন বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেননি; বরঞ্চ তিনি তাঁর টলস্টয় বিষয়ক আলোচনায় সৃষ্টিশীল সাহিত্যরচনার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়েছেন। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন শিল্পসাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট, সুসংবদ্ধ কোনো গ্রন্থ রচনা না করলেও বিভিন্ন সময়ে নানা রচনায় শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে যে মতবাদ প্রকাশ করেছেন সেখানে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ধারণা সুপরিস্ফুট ছিল। কিন্তু সেই সমস্ত অর্থময় ও পর্যাপ্ত রচনার আলোচনায় মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের বিকাশমানতার প্রশ্নে নানা মতদ্বৈধ দেখা যাচ্ছিল। আঁদ্রে ঝদানভ 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' নামে এক মতবাদের প্রচার করেন এবং স্তালিনের মৃত্যু পর্যন্ত এই 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতবাদ'ই শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একমাত্র নিয়ন্ত্রীশক্তিরূপে দেখা দেয়। অন্যদিকে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য রজার গারোদি শিল্প-সাহিত্যের সৃজনশীলতার

ক্ষেত্রে পার্টি লাইন অস্বীকার করেন। ঝদানভ ও গারোদি-আরাগঁ-এর মার্কসীয় নন্দনতত্ব সম্পর্কিত বিতর্ক-মতান্তর বাংলাদেশের শিল্পসাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মী তথা পার্টিকর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ের 'অরণি' পত্রিকার ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ 'সমসাময়িক সাহিত্য' সংখ্যায় গারোদি ও লুই আরাগঁ-র শিল্প সাহিত্য সমস্যা সম্পর্কিত বক্তব্য প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার ১৯৪৭-এর ২৮ ফেব্রুআরি সংখ্যায় বিষ্ণু দে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা, লেখক ও শিল্পসমালোচক রজার গারোদির 'আর্টিস্ট উইদাউট ট্রাউজারস' প্রবন্ধের বাংলায় অনুবাদ করেন 'উর্দিহীন শিল্পী' নামে। অনুবাদ প্রবন্ধটি 'সাহিত্যপত্রে' পুনর্মুদ্রিত হয় বৈশাখ ১৩৬৪-তে। অনুবাদ প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। রজার গারোদি এবং এরতে নামক আর একজন কমিউনিষ্ট নেতা 'শিল্প সাহিত্যের ব্যাপারে রাজনৈতিক ফতোয়া বা নির্দেশ কিংবা শিল্পের সৌধের সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির সহজ ও সরল অভ্যাসে'র বিরুদ্ধে বলেছিলেন। তিনি 'শিল্প সাহিত্যের আপেক্ষিক স্বাধিকারের কথা' উচ্চারণ করেন এবং বলতে চেয়েছেন 'কমিউনিস্ট শিল্পতত্ব বলে কিছু নেই—শিল্পবিচারে কোনো পার্টি লাইন বা মার্কসীয় নিয়ম-কানুন প্রযোজ্য নয়।' বিপক্ষ মতবাদরূপে লুই আরাগঁর 'সাহিত্যশিল্পকলা হবে পার্টি লাইন নিয়ন্ত্রিত' বক্তব্যটি তুলে ধরা হয়। 'উর্দিহীন শিল্পী'র বক্তব্য তথা গারোদির মত সমর্থন করেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশও। আরাগঁর মত সমর্থন করেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, রাধারমণ মিত্র, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বিষ্ণু দে গারোদির মতবাদের সমর্থক ও উত্থাপক বলে পার্টি তাত্ত্বিকদের বিরাগভাজন হন। বিষ্ণু দে ১৩৫৪ এর 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কথাসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে 'গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত পত্রিকার ১৩৫৪-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় নীহার দাশগুপ্ত 'শারদীয় সাহিত্যে ছোটগল্প' প্রবন্ধে বিষ্ণু দে-কে তীব্র আক্রমণ করেন। উক্ত তর্ক-বিতর্ক প্রসঙ্গে নীহার দাশগুপ্ত বিষ্ণু দে-কে ব্যক্তিগত আক্রমণ জানাতে পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত হন না—"বুদ্ধিবিলাসীর আত্মাভিমানে যখন আঘাত লাগে, তখন তার তথাকথিত ভদ্রতার মুখোস খুলে পড়ে, প্রতিপক্ষের গায়ে কাদা ছিটানো ছাড়া 'তাঁর আর কোনো গত্যন্তর থাকে না।" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'পরিচয়' (পাঠকগোষ্ঠী, ফাল্গুন ১৩৫৪) পত্রিকায় বিষ্ণু দে-কে আক্রমণ করে লেখেন—'পৌষের পরিচয়ে প্রকাশিত বিষ্ণু দে

মহাশয়ের পত্রখানির অকারণ তিক্ততা ও অসংযম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। মার্কসীয় সাহিত্যবিচার সম্পর্কে তার ভুল ধারণার মতো এই তির্যক অবিনয়ও প্রতিবাদযোগ্য। …বিষ্ণুবাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতদুর অপরিচ্ছন্ন তার আরেক প্রমাণ লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যেই পাই। …প্রকৃতপক্ষে, বিষ্ণুবাবু এখানে আর্টের জন্যই আর্ট-এর পক্ষেই একটু ঘুরিয়ে ওকালতি করেছেন। মার্কসবাদের মূলকথা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, লেখকের শ্রেণীগত চেতনার হিসাব না ধরেও লেখকের বিচার চলে।" এজাতীয় আলোচনা-সমালোচনা বিষ্ণু দে-র মানসজগতে বিপর্যয় ঘটায়। এমনকি তাঁকে লোককবি গুরুদাস পালের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং গুরুদাস পালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হয়। 'পরিচয়' পত্রিকায় এই সমস্ত বাদানুবাদ প্রকাশিত হচ্ছিল বলে "এইসব ঘটনা ও মতামতের প্রতিক্রিয়ায় বিষ্ণু দে 'অবজ্ঞামূলক মনোভাব ও উগ্র মতবাদের উদ্ধত যান্ত্রিকতায় সাহিত্যে প্রগতির এবং প্রগতি সাহিত্যেরও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা'র কথা বলে পরিচালকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগের ইচ্ছায় চিঠি দেন।" ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় পরিচালকমণ্ডলীতে বিষ্ণু দে-র নাম ছিল না। এর কিছুদিন পরে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে বিষ্ণু দে এবং চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশ করেন। অবশ্য এর আগে 'পরিচয়-এর পাশাপাশি অন্য দৃষ্টিভঙ্গির পত্রিকা প্রকাশ করা অপরিহার্য মনে করে বিষ্ণু দে-ও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'লোকায়ত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। কিন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হওয়ায় উক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি। 'সাহিত্য পত্র' প্রকাশের মাধ্যমে বিষ্ণু দে তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মতাদর্শ প্রকাশের ক্ষেত্র গড়ে তুলতে শুরু করেন এবং মার্কসবাদী হয়েও মার্কসবাদী দর্শন ও নন্দনতত্ত্বের মধ্যবর্তী সীমারেখা সম্বন্ধে সচেতনতা অবলম্বন করে স্বীয় অবস্থানকে প্রত্যয়ের ভূমিতে দাঁড় করাতে চান। তবে বিষ্ণু দে-ও 'পরিচয়ে'র এই সম্পর্ক যে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়—"বিষ্ণু দে রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন অন্যতম প্রধান কবি, প্রগতি-সাহিত্য আন্দোলন ও 'পরিচয়' পরিচালকমণ্ডলীরও তিনি দীর্ঘদিনের সুখ-দুঃখের সাথী। যে পত্রিকার তিনি অন্যতম পরিচালক সেই পত্রিকাতেই তাঁর এতদিনের ললিত সাহিত্য বিষয়ক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-লেখকেরাই নন, হিরণকুমার সান্যালের মতো উদারহৃদয় প্রবীণ সমালোচকও

যেভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন তাতে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া কত ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, কালের ব্যবধানে দাঁড়িয়েও তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।" 'সাহিত্যপত্রে'র প্রথম সংখ্যায় পুস্তক সমালোচনা রূপে প্রকাশিত বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধটিকে উক্ত পত্রিকার ইস্তাহার রূপে গণ্য করা চলে। প্রবন্ধটি পরে 'রাজায় রাজায়' নামে 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উক্ত প্রবন্ধে বিষ্ণু দে শিল্পসাহিত্যের জগতে অতিবামপন্থী ও অতিদক্ষিণপন্থী উভয় বিচ্যুতিরই সমালোচনা করে শুদ্ধ সাহিত্যের প্রবক্তা বুদ্ধদেব বসু এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রগতিলেখক শিল্পী সংঘের মতবাদের উগ্রতার বিরোধিতা করেন। ফলে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী মহলে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং বিষ্ণু দে পূর্বাপেক্ষা আরো বেশি সমালোচিত হতে থাকেন। ভবানী সেন ও প্রদ্যোৎ গুহ যথাক্রমে 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' এবং 'সাহিত্য বিচারে মার্কসীয় পদ্ধতি' শীর্ষক প্রবন্ধে সমালোচনার ধারা তীব্রতর করে বিষ্ণু দে-র মার্কসবাদী ধারণাকে ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেন ও তাঁকে 'তৃতীয় শিবিরের' অন্তর্ভুক্ত করেন।

১. "সাহিত্যের কলাকৌশল সাহিত্যের মূল নীতি ও মূল উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সত্যবস্তুকে উপলক্ষ করেও ভাবনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ কলাকৌশল সূক্ষ্মভাবে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব রক্ষা করে থাকে। তার প্রমাণ শ্রীবিষ্ণু দে-র কবিতা। তাঁর কলাকৌশল হল কাব্যকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবার বা জনগণকে কাব্য থেকে বঞ্চিত রাখবার কলাকৌশল।...তাঁর কলাকৌশল বক্তব্য-বিষয়কে সহজ ও সরল করে না, যতদূর সম্ভব দুর্বোধ্য ও জটিল করে তোলে।...তাঁর কলাকৌশল মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করে না বরং বাইরের বস্তু ও ভাবগুলিকে একটা অতীন্দ্রিয় রূপ দিয়ে ভেতরে টেনে নেয়,...তাঁর কলাকৌশল ভাবের ঐক্য এবং শৃঙ্খলাকে ভেঙে মনোরাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করে।...এই কলাকৌশল হল—বস্তুনিষ্ঠ নহে ব্যক্তিনিষ্ঠ, গণতান্ত্রিক নহে আত্ম-কেন্দ্রিক, গঠনমূলক নহে অরাজক! এ কলাকৌশল হল বুর্জোয়া ভাবধারার দৈন্য ও অরাজকতা থেকে উৎপন্ন। এর সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। বিষ্ণুবাবু একজন দক্ষ কলাকৌশলবিদ কিন্তু মার্কসিস্ট নন। তাঁর কলাকৌশল মার্কসবাদকেই হত্যা করে।"

২. "আজকের সামাজিক সত্য হল এই যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অন্তিমকাল উপস্থিত। বিপ্লবের শক্তি সংহত। আর আগামীকালের প্রাণস্পন্দন হল বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ।...বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের পক্ষে এই সত্যকে রূপ দেওয়ার অর্থ

নিজেদের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করা। সেইজন্যই তাঁরা আজকের সামাজিক সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করেন। তাঁদের কর্ম তাই সত্য গোপনের কর্ম। এই কর্মের চটকদার নামাবলী পরে তাঁরা নিজেদের দেউলিয়াপনাকে ঢাকবার চেষ্টা করেন। একথা বিষ্ণুবাবুর কবিতা সম্পর্কেও সত্য।" অবশ্য বেশ কিছুকাল পরে এই মতান্ধতার অবসান হয়। এবং তখন বিষ্ণু দে-কে বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়—"অনেক পরে কমিউনিস্ট পার্টি যখন তাঁর ভ্রান্তি মোচন করল, রণদিভের পতন ঘটল, তখন অবশ্য ভবানী সেন, আমার উপস্থিতিতে, বিষ্ণুদার কাছে এসে মার্জনা চান। এবং ধন্যবাদ জানিয়ে স্বীকার করেন যে, সাহিত্যপত্র ত্রৈমাসিক, বিষ্ণুদার প্রায় একক মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের সূত্রগুলির জন্যে আপ্রাণ লড়াই করে রবীন্দ্রনাথ থেকে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র প্রভৃতি সবার রচনার যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার এই চেষ্টা, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে হতাশ ও ক্রুদ্ধ করলেও একেবারে মার্কসবাদ বিরোধী করে তোলেনি। ভবানীবাবু অনুরোধ করেছিলেন বিষ্ণু দে যেন অতঃপর বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনের হাল ধরেন। বিষ্ণুদার কাব্যিক মন, নিজস্ব মনন ও রচনার চাপ, সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারেনি।" বিষ্ণু দে-র বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সম্পর্কে বিষ্ণু দে কী মতামত পোষণ করতেন এবং বিরোধীপক্ষের মতামতের কোন জাতীয় মূল্যায়নে পক্ষপাতী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'আরাগঁ', 'রাজায় রাজায়' প্রভৃতি প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রমাণের প্রয়াস এবং ঐতিহ্য সন্ধানের সূত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অতি মূল্যায়নের প্রয়াসও বিষ্ণু দে-কে বিচলিত ও ভাবিত করেছিল। তবুও বিষ্ণু দে প্রতিকূল পথ অতিক্রমণের জন্য যে 'অক্লান্ত মেধাবী' সাধনা করে গেছেন তা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়। বিষ্ণু দে চৈতন্যসন্ধানের সাধনা নানা দুরূহসমস্যাকণ্টকিত পথ অতিক্রমণের সাধনা।—"এই সাধনায় যথার্থই বিষ্ণু দে অবিচল। উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা এবং পরবর্তী সকল সংকটের মধ্যে আশাবাদের প্রবল শিখা জালিয়ে চলেছেন তিনি—লোরকার সেই কমরেডের মত, কিম্বা নিজেরই 'শেষ রোমান্টিকের' অপূর্ব প্রত্যাশার অভিযাত্রায়"। বিষ্ণু দে-কে সমালোচনা করে অযৌক্তিক ও হীন রচনার দ্বারা তাঁকে আক্রমণ করলেও তিনি মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের প্রতিপালনের পথ থেকে দূরে সরে যান নি। পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে যে ভ্রান্তি ও উগ্রতার প্রকাশ ঘটেছিল তা পরবর্তীকালে স্বীকৃত হয়েছে—"এ দুটি প্রবন্ধে ভ্রান্তি ও উগ্রতার প্রকাশ ঘটেছিল

…এই মানসিকতা পরিস্ফুট হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন রণনীতি ও রণকৌশলের লিখিত-অলিখিত নির্দেশক্রমেই।…পুরনো ভুলের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতিকে বিন্দুমাত্র লঘু না করে আমরা সকলেই বোধ হয় বিনীতভাবে স্বীকার করতে পারি : টিটোবাদী-ট্রটস্কিবাদী বুলি ছিল আমাদের অপরিণত রাজনৈতিক চেতনার সাময়িক আশ্রয়ভূমি মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত ঝোঁক এবং গ্রহণ ক্ষমতার তারতম্য থাকা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কেউই সেদিন অভ্রান্ত ছিলেন না, সকলের দৃষ্টি ছিল কমবেশি অস্বচ্ছ এবং কুয়াশাচ্ছন্ন।" বিষ্ণু দে দীর্ঘ পাঁচ দশকের কাব্য-সাহিত্য সাধনায় স্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে নানা টেকনিকের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, মানুষ, সংস্কৃতি ও কাব্যাদর্শে যে নন্দনতত্ত্বের জগত গড়ে তোলেন তা তাঁর একান্ত নিজস্ব। তাঁর সেই নন্দনতত্ত্ব আর সাহিত্য তত্ত্বের জগতকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি তাঁর প্রবন্ধে।

অবশ্য, যামিনী রায়ের শিল্পকর্ম ভারতের মনেই জন্ম হয়-নি : ~~[illegible]~~ মধ্যবয়েসে এসে তিনি পশ্চিমের প্রচুর প্রেরণা খুঁজেছিলেন। তাই খৃষ্টের এমন সব অপরূপ মনোলোভা [illegible] যায়, যার মধ্যে বাইজান্টীয় শিল্পের সাদৃশ্য বিস্ময়কর। এই সাদৃশ্য অধিকন্তু প্রমাণ করে এই ভারতীয় শিল্পীর স্বকীয়তাই। বস্তুত, বাইজান্টিয়ামের ভৌগোলিক পরিস্থিতি, এবং সেকালে যে সব প্রভাব সেখানে শিল্পীরা পেয়েছিলো, এ দুয়েরই উদ্ভব বাইজান্টীয় শিল্পে পূর্ব ও পশ্চিমের [illegible] মিশ্রণ। পূর্বদেশীয় যামিনী রায় যখন পশ্চিমে তাঁর প্রেরণা চান, তখন সাদৃশ্য মিলন ও তার অসদৃশ্য ফলাফলে আশ্চর্য কি?

ভারতবর্ষের বাইরে, যামিনী রায় নিশ্চয়ই একালের মহত্তম শিল্পস্রষ্টাদের [illegible] মান্য হবেন। তাঁকে কোনো দিক থেকে, তাঁর [illegible] নির্লোভ ও নির্বিকার [illegible] (আলিঙ্গন বা [illegible]) [illegible] রমণীয়তায়, তাঁর চিত্র দেখে সহজে সময়ে মাতিসের ছবি মনে আসে। প্রসঙ্গত এটা নিশ্চয় জানেন: মাতিসের কাছে পূর্বদেশ [illegible] পূর্বদেশী [illegible] অপরিচিত নয়; এবং সম্ভবত দুই সভ্যতার পূর্বপশ্চিমের উদ্ভবে [illegible] হয় এই দুই শিল্পীর সাদৃশ্য, যদিও তাঁদের উৎসভূমি এতো ভিন্ন। সে যাই হোক, যামিনী রায় [illegible] প্রকাশ [illegible] ভারতবর্ষের [illegible], প্রমাণ করলেন এক শিল্পী ভারতের জীবন, ঐতিহ্য [illegible] প্রবল এবং [illegible] প্রকাশ [illegible] দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে।

[illegible]

Art, 16 [illegible], 1931
L'Art A L'Etranger [illegible] Un Grand Peintre [illegible]
Roy

বিষ্ণু দে, রিখিয়া ও দে পরিবার সম্পর্কে কিছু তথ্য

জিষ্ণু দে

বাবার প্রবন্ধের বই সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে ধ্রুববাবু আমাদের বিশেষ বন্ধুর কাজ করেছেন। তাঁর দক্ষতায় বইটির প্রকাশ সম্ভব হলো। এছাড়া দে'জ পাবলিশিং-এর সুধাংশু দে মহাশয়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বাবা এবং তার লেখা সম্বন্ধে নানা জায়গায় কিছু কিছু ভ্রান্তিমূলক তথ্য লক্ষ্য করা গেছে। তার কিছু সংশোধনের চেষ্টা করা হলো।

বাবা এবং মায়ের বিষয়ে কিছু সম্ভবত ভ্রান্তিজনক তথ্য আছে অরুণ সেনের লেখা সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত ইংরেজি 'বিষ্ণু দে' বইটিতে। মা কুমিল্লায় স্কুল বা কলেজে কোনদিনই পড়াশোনা করেনি, কলকাতায় লরেটো কনভেন্টের ও পরে লক্ষ্ণৌ লরেটোর ভাল ছাত্রী ছিলো, সেখান থেকে সিনিয়র কেম্ব্রিজে ফার্স্ট হয়ে পাশ করে। তারপর কলকাতা লরেটো থেকে ১৯৩১ সালে B. A. পাশ করে। দিদিমার অসুখের জন্য মা এক বছর পরীক্ষা দেয়নি। পরে বাবা ও মা একসঙ্গে ১৯৩৪ সালে এম.এ. পাশ করে। প্রসঙ্গত মা কনভেন্টে ভালো ফরাসী শিখেছিলো বলে বাবাকে ফরাসী থেকে অনুবাদে অনেক সাহায্য করে। বাবা সেন্ট পল্‌স কলেজে পড়ার সময় মিশনারী অধ্যাপকদের কাছে ফরাসী শেখে।

বাবার ঠাকুর্দা বিমলাচরণের পক্ষে ডিরোজিও-র ছাত্র হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ডিরোজিও যখন প্রয়াত হন তখন বিমলাচরণের বয়স মাত্র এগারো। আমাদের আদি বাড়ী হাওড়ার পাঁতিহাল গ্রামে, ইংরেজিতে লেখা হয় Pantihal, Patihal নয়।

১৯৫৭ সালে, ১৮ বছর চাকরী করার পরে, মা কমলা বালিকা বিদ্যালয় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সময়টা আমাদের পক্ষে খুব অশান্তিকর ছিল। শান্তিনিকেতনের উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয় অনুরোধে, মা কয়েক মাস বিশ্বভারতীতে কাজ করে। এবং পুজোর ছুটিতে মাত্র মাসখানেক বাবা ও আমিও শান্তিনিকেতনে যাই। তারপরই মা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে চলে আসে। বাবা

কখনোই শান্তিনিকেতনে একসঙ্গে কয়েক মাস থাকেনি। প্রসঙ্গত, শান্তিনিকেতনের কিছু বাসিন্দা সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার জন্য বাবা ও আমরা সকলে মর্মাহত হয়েছিলাম।

আমার ঠাকুমা মারা যান ১৯৪৩ এর জানুয়ারীতে, আমি জন্মাই তার একমাস পরে, একবছর পরে নয়।

এইরকম তথ্যগত বিভ্রান্তি ঠিক করে দেওয়া সহজ। বাবার লেখা বিল আর্চরের বইএর সমালোচনা বা কোণারক মন্দির সম্বন্ধে লেখার যে পরিচয় অরুণবাবু দিয়েছেন, তাকে সংশোধন করা অনেক শক্ত কাজ। পাঠকদের এ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে বলা ছাড়া আমার করণীয় আর কিছু নেই। যদি কেউ মন দিয়ে এই লেখাগুলো পড়েন তাহলে দেখবেন বাবা ভারতীয় চিত্রকলা বা কোণারক মন্দিরের প্রতি আক্রমণের প্রতিবাদে সোচ্চার। এই লেখাগুলিকে তিক্ত আক্রমণ হিসেবে না ধরে সুস্থ প্রতি-আক্রমণ বলাই মনে হয় সমীচীন। আর্চরের নৃতত্ত্ববিদ্ হিসাবে চিত্রকলা সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি থাকার কথা নয়, এদেশে বাবার সঙ্গে আলাপের সূত্রে ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয়। পরে ভারততত্ত্ববিদ হিসেবে ভিক্টোরিয়া এণ্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মএ ভারতীয় বিভাগের কিউরেটর হয়ে উনি কেন যে হঠাৎ অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথকে নস্যাৎ করতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন, তা বোঝা দুস্কর। ভারতীয় চিত্রকলার পাশে ইংলণ্ডের চিত্রকলা যে খুবই গৌণ, সেটাই বাবার লেখায় বলা ছিল। আজ স্থবির নিলাম বাজারে তা প্রমাণিত বলা যেতে পারে।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডের শেষে 'বিশিষ্টার্থ বাচক শব্দ ও তথ্যপঞ্জি'-তে নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাঙ্ক অনুযায়ী এই ভুলগুলি আছে :

অর্ঘ্যকে বলতে বাবা সুগায়ক অর্ঘ্য সেনকেই বুঝিয়েছিলো, 'অর্ঘ্যকুসুম দত্তকে ?' (পৃষ্ঠা ৩৩০) নয়। তাই অর্ঘ্যদাকে উদ্দেশ্য করা কবিতা 'এরচেয়ে ডুব দেওয়া ভালো'র শেষ লাইনে 'চলো যাই, সেই অশ্রুনদীর সুদূর পারে চলো'— অর্ঘ্যদার গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গানের উল্লেখ।

আমরুয়া (পৃষ্ঠা ৩৩১) (যেমন বাবুডি) রিখিয়ার একটি গ্রাম। জামরুয়া শুধু আমরুয়ার সঙ্গে মিল দেওয়ার জন্য লেখা। প্রসঙ্গত নীরদ মজুমদার ১৯৪৫ সালে আমাদের রিখিয়া নিয়ে যান। তারপর বহুবার আমরা রিখিয়া গিয়েছি। রিখিয়ার আনন্দ বাবার মজ্জায় মজ্জায় গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে বাবার কাছে রিখিয়াই 'তুমি' সমার্থক দেশের প্রতীক হয়েছিল। ৮০ সালে আমরা বাবাকে

দিল্লী নিয়ে যাই অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এ সি. টি. স্ক্যান করাতে। তখনও বাবা বারেবারে বলছে 'এরপর আমাকে আবার রিখিয়া নিয়ে যাবে তো?' ১৯৮১ সালে বাবা শেষ রিখিয়া গিয়েছিলো।

কোয়ার্টেট (পৃষ্ঠা ৩৩৭) বলতে সাধারণতঃ দুটি বেহালা, ভিয়োলা ও একটি চেলোর ('violin-cello' না, violon-cello পৃষ্ঠা ৩৩৯) জন্য লেখা সংগীত বোঝানো হয়। Joseph Haydn এ জিনিস প্রথম লেখেন। একটি বেহালা বাদ দিয়ে piano বা clarinet যোগ হলে নাম হয় পিয়ানো বা ক্লারিনেট কোয়ার্টেট। বেহালা বাদ না দিলে পাঁচটি যন্ত্রে quintet,

গ্রোসফুগে (পৃষ্ঠা ৩৩৯) 'বেটোফেনের সুরনির্মিতি' ঠিকই, কিন্তু 'সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতে যন্ত্র ও কণ্ঠ সহযোগে নিয়মবদ্ধ গ্রন্থনাকে' ফ্যুগ বলা ঠিক নয়। ফ্যুগ "The most highly developed form of counterpoint which is the art of combining individual melodies in part singing". গ্রোসফুগ একটি কোয়ার্টেটও বটে; বেটোফেনের শেষ কয়েকটি কোয়ার্টেট অনবদ্য। বাবার কবিতায় বারবার এদের উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে একটি opus. 130, গ্রোসফুগ তারই অংশ ছিলো। পরে কোয়ার্টেটটি খুব বড় হয়ে গেছে বলে সমালোচনা হওয়ায় বেটোফেন এটি opus. 133 নাম দিয়ে আলাদা করে দেন। Opus. 130র জন্য একটি হাল্‌কা final movement লিখে দেন।

'তেম রুসে' 'রুশ সুরস্রষ্টা' নন (পৃষ্ঠা ৩৪২)। এটি বেটোফোনের মধ্য পর্যায়ের একটি কোয়ার্টেটের একটি movement এর রাশিয়ান সুর। বেটোফেন কাউণ্ট Rasoumovsky কে এই কোয়ার্টেটটি উৎসর্গ করেন বলে এটি Rasoumovsky কোয়ার্টেট্ নামে পরিচিত।

দিগরিয়া বা দিঘারিয়া (পৃষ্ঠা ৩৪৩) ত্রিকূটের পাশের অঞ্চল নয়, রিখিয়ার পশ্চিমের পাহাড়, ত্রিকূট পুবে। তাই ত্রিকূটের ভোরের আগুন—দিগিরিয়া বেয়ে সন্ধ্যা। আগাইয়া রিখিয়ার একটি প্রান্ত যেখান থেকে ত্রিকূট পরিষ্কার দেখা যায়। হিরণার টিলা রিখিয়ার অন্য প্রান্ত যেখান থেকে দেখা যায় দিঘারিয়া। 'বৃষ্টির পরে বর্ষার ত্রিকূট' কবিতায় বাবা বলতে চেয়েছিলো পল্ সেজানের Saint Vtctoire পাহাড়ের মতোই, নীরদ মজুমদার ও আরো অনেকে, ঘুরে ফিরে ত্রিকূট এঁকেছেন। বাবার কবিতাতেও সেই রকমই ত্রিকূট—দিগরিয়া বারে বারে এসেছে।

বাখ (পৃষ্ঠা ৩৪৮) 'সাধারণভাবে গির্জার প্রার্থনাসঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে খ্যাতনামা বলাটা ঠিক নয়, suites for unaccompanied cello, suites and partitas for unaccompanied violin, Brandenburg concerti, well tempered clavier, orchestral suites, art of fugue ও অন্যান্য রচনার জন্যও বিখ্যাত।

মাকাড়া—মুগনী (পৃষ্ঠা ৩৫২) সাঁওতালী বাদ্যযন্ত্র নয়। মাকাড়া red sand stone, মুগনী green chlorite stone, কোণারক্ মন্দিরে ব্যবহার করা হয়েছে।

মান্তোভানি (পৃষ্ঠা ৩৫৩) স্টালিনের অন্য নাম নয়, কবি দান্তে ইটালির মাঞ্চুয়ায় জন্মেছিলেন বলে মান্তোভানি নামে সুপ্রসিদ্ধ।

শোঁপ্যা (পৃষ্ঠা ৩৫৬) 'ফরাসী সুরস্রষ্টা' নয়, পোলিশ।

সোনাটা (পৃষ্ঠা ৩৫৮) একটি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের রীতি, যাতে দ্রুত ও ধীর পর্বের পরম্পরা চলে। একটি, দুটি, তিনটি বা বেশি যন্ত্রেরও সোনাটা হয়। পুরো অর্কেস্ট্রা সঙ্গে থাকলে কন্‌চের্তো। শুধু অর্কেস্ট্রা থাকলে সিম্ফনি।

প্রসঙ্গত বাবা পাশ্চাত্ত্য সংগীত খুব মন দিয়ে শোনার ফলে বহু সিম্ফনি, কোয়ার্টেট, সোনাটা ও অপেরা কয়েক সেকেণ্ড বাজলেই ধরে ফেলতে পারতো। কিন্তু ভারতীয় রাগ রাগিনী ধরতে পারতো না, হয়তো অনেক শক্ত বলেই। ভারতীয় রাগরাগিনী শুনতে অবশ্য ভালোবাসতো।

বাবার কবিতায় পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতকারদের উল্লেখ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিছু নমুনা :

বেটোফেন (9th symphony 'জন্মাষ্টমী' ও অনেক পরে 'তোমাকে দেখে স্পষ্ট হয়', 'যাকে বলি ধুলোমাটি' কবিতায়, Grosse Fugue 'পাঁচপ্রহর' ও অনেক পরে 'গ্রাৎসিয়া', A minor quartet এর heiliger dankgesange 'কেবা যাত্রী কে পাটনী' ও 'দিনকে রাত্রির নীলে', Hammerklavier piano sonata 'অসম্পূর্ণ কবিতা—বাংলায় বাংলায়')।

মৎসার্ট (Mozart's clarinet quintet 'মৎসার্টের একটি রচনা শুনে')

Moussorgsky (Pictures at an exhibition. movement: troubador before the castle, 'যেন চর্যাপদ')

Schubert 'ফ্রানৎস্ শুবের্ট—কোয়ার্টেট ১৪'

ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো লেখার ইচ্ছা রইলো। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের উল্লেখের জন্য বাবাকে বেশ সমালোচনা করেছেন অনেকে। তার মধ্যে লিখিত আকারে স্মিতা চক্রবর্তীর একটি লেখা খুব মজার। তিনি 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'র

হ্বাখনারকে বাখনার পড়েছেন। লিখেছেন "বাখনার সম্ভবত তিনি Wanger-কেই বলেছেন। বিষ্ণু দে-র লিখিত উচ্চারণ অনেক সময়েই আমাদের পরিচিত উচ্চারণের সঙ্গে মেলে না। আবার, আরেক সুরকার বাখ্—এ নামের ধ্বনিটিই হয়তো ইচ্ছে করেই Wagner-এর নামের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।" আশ্চর্য যে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'র কোন সংস্করণ খুঁজে পাইনি যেখানে মুদ্রণভ্রমে হ্বাখনারকে বাখনার লেখা হয়েছে। কিন্তু আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত কাব্য-সংগ্রহর তৃতীয় খণ্ডের শেষে 'বিশিষ্টার্থ বাচক শব্দ ও তথ্যপঞ্জি'-তে ৩৫০ পাতার শেষে সম্ভবত ছাপার ভুলে হ্বাখনারকে ইরাগনার লেখা রয়েছে।

* * *

রিখিয়ার বিষয়ে শ্রদ্ধেয় রামরেণু চট্টরাজ মহাশয় বাবার অনুরোধে একটি বিবরণী লিখে দেন। তিনি মারা গেছেন, এটি তাই খুব মূল্যবান। এটি এখানে তুলে দিলাম।

"দেওঘর সাবডিভিশন্ ও মোহনপুর থানার অন্তর্গত দেওঘর হতে পাঁচ মাইল উত্তরে তালুক বাহিঙ্গা অবস্থিত। উক্ত তালুকের মধ্যে ৮৪টি মৌজা আছে। উক্ত তালুকের জমিদার ছিলেন গিধোড়ের মহারাজা। তিনি তাঁহার মালিকানা স্বত্ব, অর্থাৎ জমিদারী স্বত্ব (যাহা মোকবরী স্বত্ব নামে অভিহিত) বাবা বৈদ্যনাথজীকে দেবোত্তর হিসাবে দানপত্র করেন। সেই সময় উক্ত তালুকের মোকাবরী খাজনা ২১৪ টাকা হিসাবে ধার্য ছিল যাহা উক্ত মালিক পেতেন। ঐ তালুক কয়েকজন মোকবরীদারকে ২১৪ টাকা খাজনার বন্দোবস্ত করা ছিল। কাজই এ ৮৪টি মৌজাই তাদের খাস দখলে ছিল।

১৮৮০-৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত মনীষীগণ যাঁহাদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন ও আরও সাতজন মনীষী, যথা অনারেব্‌ল্ সি. বি. এল. গুপ্ত, লেফটেনাণ্ট কর্নেল কে. পি. গুপ্ত, মির্জা সুজা আলি বেগ খাঁ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, রায়সাহেব গোপালচন্দ্র চ্যাটার্জী, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন,—তালুক বাহিঙ্গার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে একটি স্বাস্থ্য নিকেতন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কতকগুলি মৌজা নির্বাচিত করেন: রিখিয়া, সিরিয়া, হিরণা, পুনরবাথান, পাহারিডি, নবাডি, বাখাকুড়া, আমরোয়া. পানিয়াপগাড়, আগৈয়া, বাবুডি, বিরোজি ও কুস্‌মা।

সাঁওতাল পরগণা জেলা ননরেগুলেটেড জেলা হিসাবে এখানকার কোন জায়গা খরিদ বিক্রী হয় না, অথচ জায়গা না পেলে উপরোক্ত মনীষীগণের

উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়া সম্ভব ছিল না। এখানকার জায়গা পেতে হলে land acquisition act অনুযায়ী জায়গা অধিগ্রহণ করতে হয়, কিন্তু তাহা একমাত্র মৌজার খাসদখলী জমিদার ভিন্ন অপর কেহ করতে পারে না। সেইজন্য উক্ত তালুক বাহিঙ্গার যে সমস্ত মোকররীদারগণ খাসদখলে দখলিকার ছিলেন, তাদের নিকট থেকে কতক জমিদারী স্বত্ব ও কতক পত্তনী স্বত্ব ক্রয় করে উক্ত সমগ্র তালুক বাহিঙ্গা তাঁহাদের খাস দখলে নিয়েছিলেন। উক্ত ট্রাষ্টিগণ ম্যাক্‌ফার্সন্‌ সেটেলমেণ্টের পূর্বেই উক্ত জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন। এবং ক্রমশঃ উপরোক্ত মৌজাগুলিতে বহু জমি অধিগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছিলেন The Deoghar Agricultural Settlement Company. Nonregulated সাঁওতাল পরগণা জেলার এই স্বাস্থ্যকর স্থানে যাতে সহজেই যে কোন ব্যক্তি কিছু জমি বন্দোবস্ত পেয়ে সেই জমিতে horticulture, kitchen garden, poultry, dairy ইত্যাদি করে একটি পরিবারের নিত্য নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় শাকশব্জী ফলমূলাদি উৎপাদন করে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন, প্রত্যেককে সেইরূপ কিছু কিছু জমি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ কোম্পানী আইন অনুযায়ী অঞ্চলে জমি অধিগ্রহণ করতে থাকেন। এবং ঐ কোম্পানী প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারকে স্ট্যাণ্ডার্ড পাঁচ বিঘা জমি, ১৫০ টাকা একটি শেয়ারের মূল্য, ২৫ টাকা পাট্টা সেলামী ও এক টাকা খাজনার বিনিময়ে বন্দোবস্ত করতে থাকলেন। উপরোক্ত নয়জন মনীষী এই কোম্পানীর প্রথম ট্রাষ্টী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর founder president ছিলেন।

১৯১৮ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পত্নী বাসন্তী দেবী তালুক বাহিঙ্গার lease নিয়েছিলেন এবং পাঁচ বছর পরে lease surrender করেন। এই সময়ের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই অঞ্চলের উন্নতি সাধনের জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করেন। দেওঘর—রিখিয়া রাস্তা, হরলাজুড়ি—বাবুডি রাস্তা ও অনেক-গুলি ব্রিজ তাঁর দানেই তৈয়ারী হয়েছিলো। বিরোজী মৌজায় দুটি টিলা রবীন্দ্র টিলা ও চিত্তরঞ্জন টিলা নামে অভিহিত।"

বাবার বিষয়ে অত্যন্ত মূল্যবান বই লিখেছেন বাংলাদেশের বেগম আখতার কামাল। সেখানে তিনি লিখেছেন "পারিবারিক গর্ববোধ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে বিষ্ণু দে ছোটবেলা থেকেই পরিচিত ছিলেন।" বাবা সত্যিই পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা বলতো এবং কিছুটা গর্ববোধও করতো—সেইসঙ্গে একটু মুচকি হাসতো। সুবল মিত্রের দুষ্প্রাপ্য অভিধানে দে-পরিবারের একটি মজার ছবি পাওয়া যাবে :

শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস) রায়বাহাদুর

"১৮২০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত পাঁতিহাল গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শ্যামাচরণের পিতা গঙ্গাধরের কাপ্তেনের মুচ্ছুদ্দির অফিস ছিল, তখন এ কার্যে অর্থ ও সম্মান উভয়ই ছিল। কলিকাতাস্থ পটলডাঙ্গানিবাসী রাধানাথ মল্লিক এই অফিসের কর্মচারী ছিলেন। শ্যামাচরণের অল্প বয়সেই পিতৃ-বিয়োগ হয় এবং তাহার অল্পকালের মধ্যেই মাতাঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। শ্যামাচরণ ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিমলাচরণ মাতামহীর নিকট প্রতিপালিত হয়। ডেভিড হেয়ার উভয় ভ্রাতারই উচ্চশিক্ষার উপায় করিয়া দেন। শ্যামাচরণ হেয়ার স্কুলে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শে ইহার চরিত্র গঠিত হয়। হেয়ার স্কুল হইতে ইনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। হেয়ার সাহেব শ্যামাচরণকে পুরাতন ট্রেজারির একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকুরীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। শ্যামাচরণ বুদ্ধি, বিদ্যা ও দক্ষতায় শীঘ্রই এসিষ্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলার পদে নিযুক্ত হন এবং বহুকাল ধরিয়া ইণ্ডিয়া ট্রেজারীর কার্যনির্বাহ করেন। এলাহাবাদে একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের আফিস যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে সেই সময় গভর্ণমেণ্টের শ্যামাচরণকে এলাহাবাদে প্রেরণ করেন। তিনি অচিরে ঐ আফিস ও এলাহাবাদের হিসাব পত্রাদি সংক্রান্ত সমস্ত কার্যের সুব্যবস্থা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। শ্যামাচরণ কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অডিটার ছিলেন। তিনি অনারেবল স্যর এইচ ড্রামণ্ডের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। অনারেবল স্যর এইচ ড্রামণ্ড উত্তর-পশ্চিম (এক্ষণে আগ্রা ও অযোধ্যা) প্রদেশের লেফটেনেণ্ট গভর্ণর হইবার পূর্বে কলিকাতার ট্রেজারির আফিসে ছিলেন এবং সেই স্থানে শ্যামাচরণের সহিত সাহেবের পরিচয় হয়। শ্যামাচরণ ও মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়কে গেজেটেড কর্মচারী করিবার বিপক্ষে স্যর উইলিয়ম গ্রে বিশেষ চেষ্টা করেন। অনারেবল স্যর এইচ ড্রামণ্ড এই দুইজন বাঙালীর পক্ষ সমর্থন করেন এবং তাহাদের নাম গেজেটভুক্ত করিয়া দেন। এই সময় তাহারা যে পদ পান তাহা এখন এনরোল্ড অফিসার বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। অনারেব্‌ল্ স্যর এইচ ড্রামণ্ড যখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট হইয়া যান, তখন তাঁহার অধীনস্থ সকল কর্মচারীকেই প্রশংসা-পত্র দেন, কিন্তু শ্যামাচরণকে দেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, শ্যামাচরণকে যদি তিনি প্রশংসাপত্র দেন তাহাতে শ্যামাচরণের অপমান করা হইবে। তাঁহার দক্ষতা ও চরিত্রের মহত্ত্ব প্রশংসাপত্রে ব্যাখ্যাত হইবার অনেক উচ্চে। তাঁহাকে তিনি

চিরজীবন স্মরণ রাখিবেন। গভর্ণর জেনারেল ও তাঁহার অর্থসচিবের নিকটও তিনি এই কথাই বলিয়াছিলেন। যখন ভারতের আয় ব্যয় পার্লামেণ্ট মহাসভায় উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ভারতসচিব শ্যামাচরণকে নিমন্ত্রণ করেন। ডাক্তার ম্যাকনামারা বলিয়াছিলেন যে, শ্যামাচরণের বিলাতে যাওয়া উচিত, অন্য কারণে না হউক ইংরাজ ভারতবাসীকে কিরূপ শিক্ষা দিয়াছে শুধু এইটুকু দেখাইবার জন্যও যাওয়া কর্তব্য। আর কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত আরও এমন বাঙ্গালী আছেন, যে কেশবচন্দ্রের ন্যায় ইংরাজী বলিতে পারেন। কিন্তু শ্যামাচরণের বিলাত যাওয়া হয় নাই। তিনি পরম হিন্দু ছিলেন, জাহাজের আচার ব্যবহার তাঁহার মনঃপুত হয় নাই।

শ্যামাচরণের অবসর গ্রহণের পর গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। সরকারী কার্যে অবসর লইবার পরই ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যানের পদে মনোনীত হন। স্যর জেম্‌স্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড তাহাতে প্রতিবন্ধক হন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কমিশনরগণ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন তখন তিনি পিছাইয়া পড়িলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান স্যর হেনরী হ্যারিসনের সহিত তাঁহার মিল হয় নাই। ভাইস চেয়ারম্যানের পদলাভ করিবার কিছুদিন পরে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট, ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ বলিয়া একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহাতে সমস্ত কমিশনার একবাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন করেন যে তাঁহার বার্ধক্য এই কার্যের কোনরূপ প্রতিবন্ধক নহে, বরং উহারই প্রয়োজন, কারণ যৌবনের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্যের উপযোগী বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আর শ্যামাচরণের মত কর্তব্যপ্রিয়, অভিজ্ঞ, কার্যকুশলী ব্যক্তির, প্রাচীন হইলে, প্রবীণতারই বৃদ্ধি হয়। শ্যামাচরণ কিন্তু বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের এই মন্তব্যে কর্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত হন। সার হেনরি তাঁহার বাটিতে আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে এ মন্তব্যে সাহেবের কোন হাত ছিল না। স্টুয়ার সাহেব যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তখন শ্যামচরণ দুইবার রিজাইন দেন। কিন্তু কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি শ্যামাচরণের মতো নির্ভীক, নিষ্কলঙ্কচরিত্র স্বাধীনচেতা, বিচক্ষণ কর্মচারীকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ভাইস চেয়ারম্যান থাকিতে থাকিতেই ১৮৮৪ খৃঃ ১১ই জুলাই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা

বিবাহ" প্রবন্ধ ইনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন, স্যর সিসিল বিডন সে প্রবন্ধের প্রুফ সংশোধন করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ইংরাজী পত্রাদি শ্যামাচরণকে দেখাইয়া লইতেন। ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ ইঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। রামগোপাল ঘোষ ইঁহাকে তাঁহার সম্পত্তির একজন একজিকিউটর নিযুক্ত করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিমলাচরণের উপর সাতিশয় স্নেহ ছিল ও দুই ভ্রাতা পরস্পর সম্প্রীতিতে আবদ্ধ ছিলেন। শ্যামাচরণের চাকুরীর প্রথম অবস্থায় বিমলাচরণের অবস্থা উন্নত ছিল এবং কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। পরে বিমলাচরণের অবস্থান্তর সময়ে শ্যামাচরণ কনিষ্ঠকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামে বেচারাম মিত্রের কন্যার সহিত শ্যামাচরণের বিবাহ হয়। শ্যামাচরণের তিন পুত্র ও চারি কন্যা। জ্যেষ্ঠ যোগেশচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের বিচক্ষণ ও প্রতিপত্তিশালী উকিল, এবং তাঁহার সততার জন্য সকলেই তাঁহাকে সম্মান করেন। দ্বিতীয় সুরেশচন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ও কনিষ্ঠ নরেশচন্দ্র গভর্ণমেণ্ট অফিসার।

আজিও শ্যামাচরণের গৃহে আদর্শ একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত এযুগের শিক্ষাস্থল। এবং সেখানে আজিও বিদ্যাবত্তা, মনীষা ও সর্ববিধ প্রতিভার সমাগম হইয়া থাকে তাহা অন্যত্র দুর্লভ।

বিমলাচরণ বিশ্বাস (দে)

হুগলী জেলার অন্তর্গত পাঁতিহাল গ্রামে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা গঙ্গাধর বিশ্বাস কাপ্তেনি বেনিয়ানের কার্য করিতেন। গঙ্গাধরের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও কনিষ্ঠ বিমলাচরণ। বিমলাচরণ মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের ছাত্ররূপে হেয়ার স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। একাদশ বর্ষ বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে এবং ইহার অল্পকাল পরেই মাতারও মৃত্যু হইলে ইঁহারা উভয় ভ্রাতা মাতামহীর নিকট প্রতিপালিত হন। আবৃত্তিতে বিমলাচরণের বিশেষ দক্ষতা ও কৌশল ছিল, এজন্য কাপ্তেন রিচার্ডস ইঁহাকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। ইনি ম্যালকাম, কিপ্ প্রভৃতি কয়েকটি ইংরাজ সওদাগরী আপিসের মুচ্ছুদ্দী হইয়া বণিক সমাজে বিশেষ প্রতিপন্ন হন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সওদাগর রামগোপাল ঘোষের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া এবং ব্যবসার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া ইনি বিলক্ষণ

উন্নতিসাধন করেন। কিন্তু দৈব দুর্বিপাকে কতকগুলি সওদাগর আপিস দেউলিয়া হইয়া যাওয়ায় ইনি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন ; জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ইঁহার বিপুল ঋণভার নিজ স্কন্ধে লইয়া অসীম ভ্রাতৃস্নেহের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী, প্যারীচরণ সরকার, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ বিমলাচরণের সহিত সাহিত্যচর্চায় আনন্দ লাভ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 'ভ্রান্তিবিলাস' ও 'উপযুক্তস্য ভাইপোস্য' গ্রন্থ লিখিয়া সর্বাগ্রে বিমলাচরণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই যেমন সত্যনিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা, উদারচরিত্র এবং সামাজিক, তেমনই ভ্রাতৃস্নেহের আদর্শ ছিলেন। এরূপ অকৃত্রিম ভ্রাতৃবাৎসল্য ও স্বার্থত্যাগ অধুনা প্রায় দেখাই যায় না। ইঁহাদের আদর্শে ইঁহাদের পুত্রপৌত্রগণ এ পর্যন্ত একান্নবর্তী হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

বিমলাচরণ কলুটোলা নিবাসী বীরচন্দ্র বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি রামগোপাল ঘোষের ভাগিনেয়ী ছিলেন। চারি পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া বিমলাচরণ ১৮৭৯ খৃঃ নভেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচকড়ি ছোটনাগপুরে রাঁচীতে সরকারী উকিলের কার্য করিতেন। ১৯১১ খৃঃ ইঁহার মৃত্যু হয়। মধ্যম সৌম্যমূর্তি শশিভূষণ মেডিকেল কলেজে এম বি পাশ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতার চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিবারবর্গকে রাঁচি হইতে লইয়া আসিবার পথে পুরুলিয়ায় সাহেববাদ দীঘিতে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইনি নিঃসন্তান। তৃতীয় অক্ষয়কুমার আলিপুর জর্জকোর্টের উকিল ও সরকারী উকিলের সহকারী। ইনি খ্যাতনামা স্বর্গীয় নন্দকৃষ্ণ বসু (ষ্ট্যাচুটারি সিভিলিয়ান) মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ অবিনাশচন্দ্র হাইকোর্টের এটর্ণী। ১০/১২ বৎসর পূর্বে ইনি নিজ আপিস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পটলডাঙ্গার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বসুর কন্যার ইঁহার বিবাহ হইয়াছে। বিমলাচরণের কন্যার সহিত পুরুলিয়ার সরকারী উকিল নন্দলাল ঘোষের বিবাহ হয়েছিল। ইনি তিন পুত্র রাখিয়া স্বর্গগত হইয়াছেন। জেষ্ঠ্যপুত্র ললিতমোহন হাইকোর্টের উকিল এবং মধ্যম শচীন্দ্রমোহন পুরুলিয়ায় ওকালতি করিতেছেন। শীলতা, শালীনতা, বিদ্যাবত্তা ও সৌজন্যে ও পরোপকারে এই পরিবার চিরপ্রসিদ্ধ"।

সূচি

রুচি ও প্রগতি (প্রকাশ ১৯৪৬) ১৩

বাংলা সাহিত্যে প্রগতি ১৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ২১

টি এস্ এলিঅটের মহাপ্রস্থান ২৭

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ৪১

পরিবর্তমান এই বিশ্বে ৪৭

সোভিয়েট শিল্পসাহিত্য ৬০

জনসাধারণের রুচি ৭২

হাল্‌কা-কবিতা ৮৩

গদ্যকবিতা ৮৭

প্রগতিবাদী কবি ৯৩

বুদ্ধিবাদীর উপন্যাস ৯৬

রিচার্ডসনের কল্পনা ১০১

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (প্রকাশ ১৯৫২) ১০৯

অবনীন্দ্রনাথ ১১১

যামিনী রায় ১১৭

বাংলা সাহিত্যের ধারা ১২৪

বীরবল থেকে পরশুরাম ১৩৩

রাজায়-রাজায় ১৪১

আরাগঁ ১৫৮

পিকাসো ১৭১

ক্যালকাটা গ্রুপ ১৭৬

সোভিয়েট শিল্পপ্রদর্শনী ১৭৯

লোকসঙ্গীত ১৮৪

নব সাহিত্যতত্ত্ব (প্রকাশ ১৩৩৫) ১৯১
এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য (প্রকাশ ১৯৫৮) ২০৯
চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ২১১
লোকশিল্প ও বাবুসমাজ ২২২
যামিনী রায় ও শিল্পবিচার ২২৮
মস্‌কভা-পিকাসো সংবাদ ২৪১
টমাস্‌ স্ট্যর্নস এলিয়ট ২৫১
প্রমথ চৌধুরী ও আমরা ২৫৮
আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড ২৬২
সুরুচি ও পণ্ডিতম্মন্যতা ২৬৮
ভারত-পথিক ইংরেজি কবি ২৭৯
ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড ২৯৩
ডেভিড হর্বার্ট লরেন্স ৩০২
সাহিত্যের দেশবিদেশ ৩০৯
মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স ৩১১
আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক ৩২৬
সাম্প্রতিক মার্কিন সাহিত্য ৩৫২
আধুনিক কাব্য ৩৬৩
পরিশিষ্ট ৩৭৭
ক. বিষ্ণু দে-র জীবনপঞ্জি : প্রভাতকুমার দাস ৩৭৯
খ. গ্রন্থ পরিচয় : নবনীতা মুখোপাধ্যায় ৩৯৯
গ. প্রবন্ধ পরিচয় : নবনীতা মুখোপাধ্যায় ৪০৩

রুচি ও প্রগতি

বাংলা সাহিত্যে প্রগতি

একটা কারণ অবশ্যই মনের আবহাওয়ায় কয়েক বছর যে প্রত্যক্ষের দিকে বৈজ্ঞানিকমন্য ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার। তাছাড়া লেখকেরা যে-পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, তার থেকেও লেখার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা যেতে পারে যে আমাদের সাহিত্যের শৈশব অতিক্রান্ত এবং সাহিত্যিকরা আজ বিষয় ও কলাকৌশল, ভাব ও রূপের অভিন্নতায় সন্দেহহীন। কলাকৌশল বা টেক্‌নিকের প্রগতি নির্ভর করে মানসের ব্যাপ্তি বা রূপান্তরে। আর এই মনের মানচিত্রে সৃষ্টির আবেগ থাকবে কী ক'রে যদি সে জীবনের দিকে না-তাকায়? সাধারণের জীবনেই ত এ-মানসসরোবরের উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত। এই উৎসের সন্ধান কেউ হয়ত জীবনযাত্রার কর্মধারায় পান, কেউ জনগণমন-অধিনায়কদের খুঁজে পান ইতিহাসের দ্বন্দ্বময় প্রগতিতে।

সমস্যা ওঠে জ্ঞান ও সৃষ্টিক্রিয়ার হ্রস্বদীর্ঘে। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে প্রত্যক্ষ জীবন থেকে মন স'রে যায় জ্ঞাত পরোক্ষের স্বকীয় ধর্মে। শিল্পসাহিত্যে কিঞ্চিৎ স্থায়ী বন্দোবস্তের কারণ মানবচৈতন্যেরই vested interests বা সম্পত্তির স্থাবরতার দিকে ঝোঁক। ভাষার একটা স্বাভাবিক স্থিতিপ্রবণতার জন্য রচনার গতিতে আসে দ্বিধা। গতিতে গা ভাসালে অবশ্য খুঁটিতে বাঁধা মনের দ্বিধাও নিষ্প্রয়োজন। সজীব রচনাতে তাই শিল্পী ও শিল্পবস্তু, বিষয় ও টেক্‌নিকে টান পড়ে জ্যাবদ্ধ ধনুকের টঙ্কারে ধনু ও ছিলার টানের মতো। লক্ষ্যভেদের লক্ষ্য হয়ত অনেকসময়ে সরাসরি চেনা যায় না, ধনুর্ভঙ্গও হ'তে পারে। তবু প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হ'ল এই চৈতন্য-জ্যাবদ্ধ টান। অভ্যাসিক শিল্প উপাদেয় পণ্যশিল্প হ'তে পারে, চমৎকার কুটিরশিল্প হ'তে পারে, প্রগতির প্রশ্নক্ষেপ সে-অভ্যাসের যন্ত্রে অবান্তর।

নেতিতে আরম্ভ হ'তে পারে এই মানসের প্রগতি। তারপরে মিনারবাসীর ভূতলে অবতরণ। মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ঐ-চৈতন্য, ঐ-বোধ। ঐ-বোধের পেশীবহুল ছাপ আসে স্বভাবজড় পাথরে, রং-রেখায়, শব্দে, ভাষার বনেদী রীতিতে, বাক্যের গোঁড়ামিতে। জীবনের প্রত্যক্ষে আর সর্ব-সংস্কৃতিগত পরোক্ষের দ্বন্দ্ব থেকে-থেকে

মাটিতে এসে মেশে প্রচণ্ড পালোয়ানিতে। তাই প্রয়োজন শিল্পীর অপক্ষপাত, পিকাসোর মতো নৈর্ব্যক্তিকতার সিদ্ধান্তে যাতে দ্বন্দ্বটা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে। ব্যক্তিগত বিষয়ীমাহাত্ম্যের ভঙ্গিটা অভ্যাসে সহজ, কিন্তু সেখানে ধনুকের বন্ধন না-থাকলেও, তীরের মুক্তিও নেই। অবশ্য একাকিত্বের শানে মাথাকুটেও মর্মান্তিক রোমাঞ্চকর গান রচনা করা যায়, বহির্জগতের পরিবর্তনকে মানসে না-মেনে। অরণ্যে রোদনেরও সাময়িক সার্থকতা স্বীকার্য। আর নেতি-নেতি ধ্বনিতে প্রত্যক্ষের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়, হিরণ্যকশিপুর ঈশ্বরপ্রমাণের মতো।

টেক্‌নিকের সাধনাই শিল্পীকে জিজ্ঞাসার সীমান্তে টেক্‌নিকের উৎসে নিয়ে যেতে পারে। রচনার পদ্ধতি চৈতন্যমার্গ বা বিশ্বাসের বিরোধী, এ-কথা শুধু অতিবামপন্থীদের অপ্রাকৃত মনেই ওঠে। কারণ বিজ্ঞানপদ্ধতির সত্যের মতো শিল্পপদ্ধতির উপার্জনও শ্রেণীহীন। মায়াকভস্কির প্রতীকচর্চার পরিণতিতে তাই গন্তব্য ছিল বিপ্লব। একমাত্র ন্যায়সঙ্গত পরিণতি ছিল সেইখানে, না-হ'লে থাকে র‍্যাঁবোর মরুভূমিতে মৃত্যু। লুই আরাগঁর অবচেতনবাদের খেলা থেকে ইউ আর্ আর্ এস্-এর গানের পরিণতিতেও তাই দেখি। অতএব লেখককে লেখা ছাড়তে কেউ বলছে না, বলছে শুধু লেখকধর্মী প্রস্তুতির কথা। আপন সমস্যাকে শুধু নিজের মনের গহ্বরনিষ্ক্রান্ত স্বয়ম্ভু জীব না-ভেবে, সে যে ইতিহাসব্যাপী সমস্যারও অংশ, এই উপলব্ধির নিয়ত চর্চা লেখকের প্রস্তুতির সহায়। এ-চর্চায় বিষয়বস্তুর ও আধারের বিস্তার ঘটে, অধিকন্তু জীবনের ধারা বহুমিশ্রিত সমগ্রতা পায়। আর সমগ্রের বিকাশের অসীম সম্ভাবনায় শিল্পীর শিল্পী হিসাবে পরিণতি স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে। বিষয়বস্তুর সন্ধানে বা ব্যক্তিগত বিশেষত্বের মৃগতৃষ্ণিকায় ঘোরায় লাভ আখেরে কমই। কারণ নিছক শিল্পগত বিবেচনাতেও এই সমাজভঙ্গের দিনে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সুস্থ পরিণতি ও ভারসাম্য আনা কঠিন। কারণ সমাজের সঙ্গে তাল কাটলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বোধও কেটে যায়। আর ঐ স্বাধীনতার বোধ ছাড়া মনের বিকাশ সম্ভব নয়। স্বাধীনতা তাই শুধু সীমা ও পারস্পরিক সম্বন্ধ স্বীকারে। নিঃসঙ্গতার abstraction-এ—পরোক্ষ নিদানে স্বাধীনতা কোথায়?

কাব্যের উৎস যতই রহস্যময় হোক্, কাব্য কিছু গোপন তন্ত্রমন্ত্র নয়। কাব্য সম্বোধন, সম্বোধনে শ্রোতার সম্বন্ধ গ্রাহ্য। সোঽহমে সম্ভাষণ সম্বোধনের সুযোগ বেশি নয়। আমাদের লেখকেরা জানেন যে দৃষ্ট ও জ্ঞেয় দ্রষ্টার জ্ঞানে জারিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তনে তাঁদের পরিণতির ক্রান্তি। Interpretation তাই change-এ সম্পূর্ণ। সেইজন্যই তাঁরা যন্ত্রবৎ নূতন অভ্যাসের কলে পা দেন না,

কোন দর্শন থেকে টুক্‌রো কুড়িয়ে জোড়া লাগাতেও চান না। বিশেষ মার্ক্সিয় দর্শনে এই চিরকালের জন্য একবার অর্জিত অভ্যাসের যান্ত্রিকতা অচল। সে-দর্শনের ভিত্তিই হচ্ছে চিরদ্বৈতাদ্বৈতের গতিশীল জীবন্ত পরিণতিতে, প্রথাসিদ্ধ দার্শনিকতার জড় অবসর মার্ক্সিজমে নেই। সে পরগাছা চালাকির চেয়ে জিজ্ঞাসুমাত্র বিষয়ানুরাগ সার্থক।

বিষয়ের বা বস্তুসত্তার অনুরাগে অন্তত সেই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি আসে, যাতে জীবনের বহুব্যাপ্ত সমগ্রতার আভাস পায়, যাতে শিল্পরূপ ও শিল্পবস্তু একটি সক্রিয়তার দুটি দিক ব'লে বুঝি। ইংরেজি সাহিত্যে এলিঅট প্রায় পেয়েছিলেন এই বিষয়-সমাধি। কিন্তু তার আশ্চর্য পরিণতি তির্যক হ'য়ে রইল বর্তমান অবাস্তব এক ধর্মসমাজঘটিত দর্শনের হস্তক্ষেপে। তবু বলতে হবে যে এলিঅটের এই বিষয়শ্রদ্ধাই তাঁকে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ কবি করেছে এবং ঐ নৈর্ব্যক্তিক প্রয়াসের জন্যই তাঁর প্রভাব হয়েছে মুক্তিবহ। কিন্তু রাজনৈতিক মতবাদের কুম্ভীরকবৃত্তিতে যে মুক্তি নেই, সেটা আবার স্মরণ করি। দার্শনিক চয়নিকা প্রয়োগে বামপন্থীর মনোবিকার যে ঘটে, তার প্রমাণ অডেন্-স্পেণ্ডর-লুইসের দল। তাছাড়া, একটা মতবাদের জ্ঞানের দিক যখন গভীর হয়—এবং আমরা কড্‌ওএলের *Illusion and Reality* বা জ্যাক্ লিণ্ডসের *Short History of Culture* ও *The Anatomy of the Spirit*-এর কাছে একান্ত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—তখনও শিল্প-সাহিত্যের উৎসে চৈতন্যের গভীরে সে-মত চারিয়ে যেতে সময় লাগে। কড্‌ওএলের বা লিণ্ডসের কবিতায় প্রাক্-মার্ক্সিয় মামুলিত্ব কথাটার প্রমাণ। তবু ত কড্‌ওএল জীবন দিয়েছিলেন এই মতে নিজেকে মেলাবার জন্য। আর যাঁরা এই জীবনে বুদ্ধিতে এক সাধনা ধরেননি, যাঁরা এক দাগ ওষুধের মতো বা পাঁজির বর্ষফলের মতো মার্ক্সিজমের চটক ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের নিজেদের মনগড়া ছক থেকে দূরে যাবার প্রতিবিপ্লবী ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। এলিঅটের নৈর্ব্যক্তিকতার তীব্র চেষ্টা এর চেয়ে প্রগতিবান্। তাঁর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ব্যক্তিগত বিশৃঙ্খলা বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষে দানা বাঁধতে পারে। সে-কৈলাস-ভাবনা থেকে তবু ঐতিহাসিক দৃষ্টির বিস্তার আনা সম্ভব, দৃশ্যটা অন্তত আয়ত্তে আসতে পারে। চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না, এই কথার জের টেনেই বলা যায় যে খণ্ডিত মনের হঠকারিতায় প্রতিক্রিয়ার চোরাবালিই পরিণাম, ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি নয়। ভালেরির আত্মভুক্ সর্পে নয়, আমাদের লেখকেরা জানেন যে বিশ্বরূপদর্শনেই ব্যক্তির ঐশ্বর্য।

ব্যাপারটা, বলাই বাহুল্য, মোটেই সরল নয়। তার উপরে আছে বাংলা সাহিত্যের অপরিসর কিন্তু বিশিষ্ট ঐতিহ্যের চাপ। এবং সংস্কৃতিগত রচনায় প্রত্যক্ষ ইমারতকে অস্বীকার ক'রে অর্থনীতিগত কাঠামোতে কাজ করা যায় না। আমাদের লেখকেরা চেষ্টা অবশ্য করছেন (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ স্থানমাহাত্ম্য—local colour-এ কথাটার প্রমাণ) প্রত্যক্ষ জীবনযাত্রা ও মানসকে সেতুবন্ধে মেলাতে, কিন্তু চৈতন্যের স্রোত গভীর ও প্রবল। সেই গভীরেই শিল্পসাহিত্যের কারবার। হয়ত যদি কিছু প্রচণ্ড আলোড়নে সারা দেশের জনমানস পাশ ফেরে, তাহ'লে এই দ্বিধা দ্রুত সমাধান পেতে পারে। ইতিহাসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে আর তাতে জনসাধারণের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিতে কল্পনারাজ্যেও লাগছে হাওয়া। তাই জনসাধারণের জীবনে ও আন্দোলনে লেখকদের দৃষ্টি যেমন বেশি যাচ্ছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে ও টেক্‌নিকের প্রশ্নেও লেখকরা মন দিচ্ছেন।

২

এই সাহিত্যিক ঐতিহ্য মোটামুটিভাবে স্যাক্‌সনোত্তর ইংরেজি সাহিত্যের সমবয়সী হ'লেও এর ক্ষীণধারা শুধু থেকে-থেকে কয়েকবার ঝল্‌সিয়ে উঠেছে। সংস্কৃত ঐতিহ্যের অতি নিকট হ'লেও বাংলার প্রাকৃত ঐতিহ্যের স্বভাব ভিন্ন। এমনকি 'কৃষ্ণকীর্তনে'র মতো প্রাচীন ও কাঁচা রচনাতেও আমরা সংস্কৃতের রাজসভাশোভন প্রথাসিদ্ধ মানস ও দেশজ লৌকিক মানসের অস্পষ্ট কিন্তু সুস্থ প্রাকৃতধর্মের বিরোধ দেখতে পাই। লোকমানসের এই স্বাতন্ত্র্য শুধু গ্রাম্যতা বা স্থূলতা ভাবলে ভুল হবে। এ-মানস জীবনধর্মী, জীবনভোগী, প্রত্যক্ষবোদ্ধা মন, যা জনসভ্যতারই প্রাণময় লক্ষণ। এ জীবনকে পরিগ্রহণের ভঙ্গি, প্রাত্যহিককে স্বীকারের দর্শন, তাই এতে পাই হাসিকান্নার মধ্যে একটা বাস্তববিলাসের কর্মঠতা, সময়ে-সময়ে অপরাজেয় জীবনীশক্তির হাস্যোজ্জ্বল আভাস। এতে বিরুদ্ধ মেলে মানিয়ে নেবার স্বাস্থ্যে, দেবদেবী হ'য়ে ওঠে ঘরোয়া মানুষ, মানুষ হ'য়ে ওঠে বিস্ময়কর। এ-মানসে অশ্লীলতার সন্ধান অন্ধ রুচির খেয়াল, কারণ এর মূল্যজ্ঞান এসেছিল সমাজের একটা বিশেষ সাময়িক অখণ্ডতায়, শ্রেণীগত ধর্মব্যবস্থার মধ্যেই এক জীবনব্যাপী ছকে। সে-ছকের পৌরাণিক মহলে-মহলে ছিল লোকের যাতায়াত, উপরে-নিচে ছিল সম্বন্ধ, নিচের লোক গোপন প্রতিশোধে টেনে আনত উপরের জবরদস্তদের। অনার্য শিব ত এইভাবেই গ্রীক পুরাণে ডায়োনিসসের মতোই আর্যজগতে প্রবেশ করেন। আবার সেই নব্য-আর্য শিব যখন ব্রহ্মণ্যবিলাসী হ'য়ে উঠলেন, তখন সে

রুদ্র মহাদেবকে টেনে আনতে হ'ল নেশাখোর বেকার স্বামীর প্রাপ্য গঞ্জনার মধ্যে। ব্রহ্মণ্যের অন্নদাতা সদাগরকে তাই মানতে হ'ল মনসার লৌকিক শক্তি। অবশ্যই সংস্কৃতের বৈদগ্ধ্য অনেকখানি আমরা নিলুম, যেমন নিলুম অলঙ্কার আর রীতির নির্বিশেষ অভ্যাসের সামান্যতা। উপনিষদ্ ও মহাভারতোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যের ছদ্ম-ধ্রুপদী ভাব যে তবু বাংলা সাহিত্যের গতিরুদ্ধ করতে পারেনি, সে শুধু দেশী কবিরা মৃত্তিকার সন্তান ছিলেন ব'লেই। জনমনের বিশ্বাস ও দৃষ্টি এবং তাদের জীবনের রূপের প্রভাবেই কন্ভেন্শন্সের ঈষৎ ভিন্ন চেহারা আমাদের প্রতিবাদী প্রাকৃত সাহিত্যে।

বলার দরকার নেই যে সেকালে আমাদের স্বাধীনতার মাত্রা ইচ্ছাধীন ছিল না, না-ছিল আত্মসচেতনতার সুযোগ বা প্রয়োজন। দুটি মোটা পথ ছিল—এক দেবদেবী ভাঙাগড়া, আরেক নরনারীর সম্বন্ধের বিদগ্ধচর্চা। সে-চর্চার sophistication আজও আমরা গ্রাম্যসাধারণেরও প্রেমালাপে শুনতে পাই।

মধ্যযুগের পরিধিতেই এই একটা মানবিকতার পথে লোকে নিষ্পত্তি ও ক্ষতিপূরণ আদায় ক'রে এসেছে। চণ্ডীকাব্যে, নানা মঙ্গলকাব্যে, শিবদুর্গায়, পাঁচালী ও যাত্রা প্রভৃতি জননাট্যে এ-ক্ষতিপূরণটা বেশ বোঝা-যায়। চিত্র-শিল্পেও এই মন কাজ করেছিল; পটে, পাটায়, মেলার পুতুলে, আল্পনায়, ব্রতকথায়, ছড়ায়, গ্রাম্যগানে এ-মন রূপ পেয়েছিল। (অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত' এদিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে।) পূর্ববঙ্গগাথায় এই জীবনেরই প্রত্যক্ষতা। লোকমনের দিগ্বিজয় প্রাদেশিক বাংলা দেশে মহাকাব্যদুটিতেও পৌঁছেছিল, বৈষ্ণব তত্ত্বকথাতেও তাই প্রেমের সরস আবেদন। মানি 'পদকল্পতরু'র কন্ভেন্শন্স প্রাণহীন,—কেননা বৈষ্ণব কবিদের মন ছিল জনবোধ্য বিষয়ের আবেদনে, সংস্কৃত রীতিবাদীদের মতো কন্ভেন্শন্সের চর্চায় নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষণে-ক্ষণে সূক্ষ্ম বাস্তবিকতার তীব্রতায় আমাদের মধ্যবিত্ত অভ্যাসের মধ্যে চমক লাগে। হঠাৎ এমন লাইন আসে যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাব্যেই মেলে, যা আমাদের ডুবিয়ে দেয় মানুষের অভিজ্ঞতার গভীর সমুদ্রে। অন্তর্দৃষ্টি ও আবেগের পরিধি বেড়ে যায়। প্রেমের বেদনা যে দুই চলিষ্ণু ব্যক্তির চলিষ্ণু সম্বন্ধের দোটানার যন্ত্রণা ও আনন্দ, বৈষ্ণবকবি এটা আমাদের বিস্ময়করভাবে জানিয়ে দেন। খানিকটা অস্পষ্ট অবশ্য এই মানস। তবু এই মানসের ছাপ আমাদের য়ুরোপীয় যুগ অবধি মোটামুটি একভাবে দেখা যায়।

তারপরে এল তাতে পরিবর্তনের ঝড়। ঈশ্বর গুপ্তকে বলা যায় শেষ জনকবি,

তিনি লিখেছিলেন ইতিহাসের ঘোর বিশৃঙ্খলার যুগে, অনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে অতীতের ব্যবস্থার দিকে বারেবারে কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে। এক হিসাবে বিদ্যাসাগর আমাদের সবচেয়ে শুদ্ধ ও মহৎ য়ুরোপীয়, তাই তাঁর দরদী মানবিকতায় দেশী সংস্কৃতি দানা বেঁধেছিল। বিদ্যাসাগর নিজের সমগ্রতার জগৎ থেকে খুঁজলেন সাধারণ ভারসাম্য, এক নূতন ও রীতিমতো সংস্কৃতঘেঁষা ভাষায়। তার কারণ বোধহয় প্রথমত সংস্কৃতের দীর্ঘ ইতিহাস এবং দ্বিতীয়ত তখনকার উচ্ছৃঙ্খল নিকট প্রাদেশিকতা থেকে সংস্কৃত ঐতিহ্যের দূরত্বের আকর্ষণ। মধুসূদনের বিলম্বিত এবং বিষয়হীন রোমান্টিক ভাবাবেগই তাঁকে আবার বাংলায় ফিরিয়ে আনল। তাঁর প্রচণ্ড প্রতিভায় দীপ্ত ভাষা অবশ্য বাংলার লৌকিক ঐতিহ্যে তাঁর য়ুরোপার্জিত দান। কিন্তু মধুসূদনের বিদ্রোহী রাগে দেবদেবীরা সাবেক বাংলার নরকল্পতাই পেয়েছেন, তাঁদের পোষাকী জাঁকজমক সত্ত্বেও। য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ মধুসূদনের মানসে বাংলার জনজীবনের দৃষ্টির আভাস আশ্চর্য ব্যাপার। নূতন সভ্যতাকে সে-দৃষ্টি নিজের ভাষ্য দেয়, সমালোচনার বাস্তবে মিলিয়ে নেয়। তাই মধুসূদনের নাটকদুটিতে ভাষার যে সরস স্বাস্থ্য, যে দেশজ পেশীর স্বচ্ছলতা পুলকিত করে, তা আমরা বঙ্কিমের হিন্দুত্বের সঙ্গে ইংরেজ শাসনের মিশ্রণকৃতিত্বে পাই না।

বরং পাই কয়েকজন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকে, কালীসিংহে, টেকচাঁদে, এমনকি হেমচন্দ্রের কিছু-কিছু সাময়িক পদ্যরচনায়। এঁদের দেখে কল্পনা করা যায়, সে-সময়কার দুই জগতের মধ্যে একটা সাময়িক ভারসাম্য। তাই দীনবন্ধু মিত্রকে প্রথম শ্রেণীর লেখক ব'লেই সম্ভাষণ করতে হয়, বিশেষ ক'রে 'সধবার একাদশী'র সুস্থ বাস্তবিকতা ও ব্যঙ্গের জন্য। তাঁর পলায়নবিমুখ দুর্মর সাধারণ্য কারণ ও কার্য, উৎস ও গতিকে এক করতে গিয়ে দিশাহারা হ'য়ে অতীতে ছোটেনি। তাঁর মানবিকতার করুণা ও হাস্যজাগ্রত শুভবুদ্ধিতে তিনি আমাদের নাট্যসাহিত্যের শীর্ষে।

তবে স্থিতিটা যে অসম্পূর্ণ ও নেহাৎ সাময়িক ছিল, তাতে সন্দেহ নেই! না-হ'লে আমাদের উপন্যাসের পুরোধা বঙ্কিম কেন তাঁর গম্ভীর আত্মমর্যাদা সত্ত্বেও উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন? অবশ্যই য়ুরোপীয় সভ্যতা, ব্রহ্মণ্য ও মধ্যবিত্ত স্থূলতার প্রেস-ক্রুপশন্ কেবল তাঁর স্বকীয় দায়িত্ব ছিল না। বঙ্কিম তাঁর প্রতিভার দ্বারা দ্বন্দ্ব নিরাকরণের চেষ্টাই করেছিলেন, আজকে সাহিত্যে ও রাজনীতিতে প্রতিক্রিয়াবাদীরা যদি তাঁকে নিয়ে টানাটানি করে, সে দেশের দুর্ভাগ্য।

৩

বাংলার ছোটো ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এ প্রচণ্ড আবিষ্কারে আমরা যদি গালিলিওর মতো উত্তেজিত হই ত সে মার্জনীয়। আমার এই সংক্ষিপ্ত প্রস্তাবে তাঁর মতো প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য। অথচ তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায় না। একদিকে ইংরেজিতে চসর, অন্যদিকে জর্মানে গয়টে মিলিয়ে হয়ত খানিকটা ঐতিহাসিক তুল্যাভাস দিতে পারেন। তাঁর প্রভাবে বাংলা সংস্কৃতির স্তরে এল অনেক বিন্যাস, তাঁর প্রতিটি বই টেক্‌নিকের প্রগতিতে পদক্ষেপ ও বিষয়বস্তুর বাহুবিস্তার। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেখালেন শালীনতা। মার্জিতরুচির এ-উত্তরাধিকার অস্বীকার করা কোন গোঁড়ামিতেই আর সম্ভব নয়। প্রাদেশিকতাদুষ্ট বাংলায় তিনি আনলেন বিশ্বের মানদণ্ড। রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য, পেলবতা তাঁর দান। বড়ো কথা, সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন যে নিছক সৌন্দর্যের চেতনা, সে-ও আমরা রবীন্দ্রনাথেই দেখেছি। ভিক্টোরীয় চরিত্রের বলিষ্ঠ সততা, কর্মের দায়িত্ববোধও বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা।

ব্যক্তির যে-স্বকীয়তাবোধ, sense of privacy তা-ও রবীন্দ্রোত্তর সমাজেই বাংলার মানসে কিছু দেখা যায়। তাছাড়া শুধু শ্রেষ্ঠ নন, তিনিই আমাদের সাহিত্যিক পেশার দায়িত্বের প্রথম ও চরম উদাহরণ। তাঁর দান আমাদের নানামুখ আত্মসচেতনতায় মানুষ ক'রে তুলবে, যদিও তাঁর সম্পূর্ণতা তাঁর একান্ত স্বকীয় ব্যক্তিস্বরূপেই সম্ভব। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র ছিল, তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়, সংহতসত্তা হিমালয় নামে নগাধিরাজ যেন। যান্ত্রিক বামপন্থী ব্যাখ্যায় এই মহত্ত্বের মর্যাদা হয় না। বনেদী পরিবার, সামন্ততন্ত্রসমাজের অবশেষ ও বুর্জোয়া সভ্যতার উত্থানশক্তির সন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব, এ-সব কথায় তাঁর দুর্নিবার প্রতিভার নিঃসঙ্গ সৃষ্টির আবেগের আংশিক ব্যাখ্যামাত্র। মহর্ষির প্রভাব, ব্রাহ্মসমাজের মানসও নিশ্চয়ই তাঁর প্রবল বিশ্বাসের মূলে ছিল, যার বলে সুন্দর ও মঙ্গল তাঁর কাছে পরোক্ষ তত্ত্বমাত্র ছিল না, ছিল জীবনের সত্য। তবু তাঁর প্রাণময় রহস্য শেষ হয়ে যায় না।

তবু শূন্য শূন্য নয়
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।

একা একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

আশ্চর্য এই তৃপ্তিহীন প্রাণময়তার আশীবছরব্যাপী সমগ্রতা। এতেই টেক্‌নিকের নব-নব বিকাশে বিষয়ের প্রসার, এতেই শেষটা তিনি তাঁর পটভূমি প্রায় পিছনে ফেলে আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হ'য়ে উঠেছিলেন। তবু মোটামুটি বলতে হবে যে তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার রসালো মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় বিরাজমান থেকেও বহু উর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখানে মধুসূদন বা দীনবন্ধু বরং আমাদের চেনা অগ্রজ।

৪

সুখের কথা যে, আমাদের লেখকেরা যে ইতিহাসের এক বড়ো মোড়ে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের স্বরূপ উপলব্ধিতে চিন্তিত। সে-স্বরূপসন্ধানে ইয়েট্‌সের সেই Great Mother-এর প্রভাব আজ স্পষ্ট—সেই বিশ্বজননী; মৃত্তিকার মানুষের মনের দীর্ঘ স্মৃতি; ফ্রয়েডের অবচেতন; যিনি বিরহী দ্বন্দ্বে ক্ষেপিয়ে বেড়ান, জনসমষ্টির মিলনে যদি একবার তাল কাটে। তাই ত আজ মানবচৈতন্যের বিকাশের বর্তমান অবস্থায় আমরা বুঝেছি যে টেক্‌নিক ও জীবনোৎসারিত বিষয়বস্তু একটি ক্রিয়ার দুটি দিক, আর লেখক শুধুমাত্র কারুশিল্পী নয়, শুধু অনুপ্রেরণায় মত্তও নয়, সমগ্র মানুষ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয়ভাবেই। অধিকন্তু শিল্পেতিহাসে প্রাথমিক গোষ্ঠিজীবনের কাল থেকে আমরা দেখেছি যে বস্তুরূপ ও বস্তুসত্তা অঙ্গাঙ্গী ধারায় চলে। রূপজ্ঞানের চর্চায় বহু শতাব্দীর সঞ্চয়ের পরে আজ তাই দেখি নিছক রূপায়ণে আসে প্রতীকের দ্রুতবোধ্যতা—যদি অবশ্য সমাজে থাকে সম। সুতরাং সজীব সমাজে উচ্‌কপালে রূপচর্চা ও কনৃভেন্‌শন্সের সাক্ষাৎ আবেদন, সেকালের সাহিত্যিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুচর্চার বুর্জোয়া ঐশ্বর্যের অনুকরণে নয়। সাম্যবাদের প্রাকৃতধর্মে নিশ্চয়ই পণ্যবিপ্লবের প্রথম যুগে ফিরে চলার আহ্বান নেই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

গত শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত বাঙালি আমরা পরম উৎসাহে নতুন শিক্ষায় মেতেছিলুম, তখন সে-উৎসাহ ছিল স্বাভাবিক, একমাত্র সুস্থ পথ। সমাজ-ব্যবস্থায় মোড় ফেরার সময় তখন, নতুন শিক্ষায় ছিল জীবিকার ভরসা এবং নতুন জীবনযাত্রার আশা। সে-আশাভরসার চেহারা আজকে স্পষ্ট হয়েছে অনেক নৈরাশ্যের সংঘর্ষে। তার কারণ অবশ্য পূর্বজদের চেয়ে আমাদের বুদ্ধির আধিক্য নয়। সাহিত্যশিল্পের জগতে বিশেষ ক'রে আমাদের ঐতিহাসিক বিনয় প্রয়োজন। কারণ সে-জগতে কী গ্রাহ্য আর কী ত্যাজ্য, সে-বিষয়ে সেকালের কবিরা আমাদের দৃষ্টান্ত হ'য়ে অনেক পণ্ডশ্রম থেকে বাঁচাতে পারেন।

আজকে আমাদের উত্তরাধিকার আবিষ্কার করতে হ'লে যাঁদের রচনাবলি বিচার করতে হবে, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ মর্যাদা। সে-আবিষ্কারে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সহায়। বঙ্কিম গুপ্ত-কবির প্রতিভা প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বঙ্কিমের মধ্যেও সেই দেশজ মনোবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়, যে-মনোবৃত্তি শিক্ষিত বাঙালি আর বাংলার জনসমাজের বিলীয়মান ভেদের সমাধানে আমাদের অবশ্য আলোচ্য। বঙ্কিমের ভাষায় "মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালির কবি, ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালি কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই, জন্মিয়া কাজ নাই।" কথাটি ঐতিহাসিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, কিন্তু ইতিমধ্যে শিক্ষিত বাঙালি আর খাঁটি বাঙালি দুই স্রোত অনেক দূর ব'য়ে গিয়েছে, দুর্লঙ্ঘ্য ভেদের ব্যবধানে দুই স্রোতই সমুদ্রে গিয়ে আজ একাকার। আজ আমরা শিক্ষিত শ্রেণীর বিড়ম্বিত কাব্যসাধনার চূড়ান্তে এসেছি। আমাদের সংস্কৃতির ক্ষুর-ধার চূড়ায় সামাজিক সমর্থনের আশ্রয় নেই, অথচ সমাজজীবনের মরীয়া তাগিদ আমাদের ব্যক্তিত্ববাদের দোরগোড়ায় হানা দিচ্ছে। আজকে তাই কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতু-বন্ধনের কথা। অবশ্যই এ-একতা পারস্পরিক। এবং যেহেতু ব্যাপারটা যান্ত্রিক নয়, সেইহেতু এই সংগঠন সাহিত্যিক বক্তৃতায় বা বই প'ড়ে বা লিখেই হবে না। কিন্তু এলোমেলো সামাজিক সত্তার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সাহিত্যেরও গৌণ দান আছে এবং দেশজ ঐতিহ্যের সন্ধান আজকে তার প্রথম পর্ব।

এই ঐতিহ্য আমরা আজও লোকশিল্পে ও সাহিত্যে খুঁজে পাই। বঙ্কিম একে বলেছিলেন রিয়ালিজম্। পাহাড়পুরের শিল্পনিদর্শন থেকে গ্রামশিল্পের যে-সব লুপ্তপ্রায় নমুনা মেলায় আজও দেখা যায়, সে-সবেই এই বহির্জগতের বস্তু সম্বন্ধে সুস্থ মনোযোগের প্রমাণ। চণ্ডীকাব্যে, মঙ্গলকাব্যে এমনকি বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই স্বাস্থ্য আমাদের আশ্চর্য করে। এই মনোবৃত্তি দেবদেবীর প্রতি মানুষের মহিমা আরোপ করে, সদাগরদের নাকাল করে, প্রেমের মধ্যে নিঃসঙ্কোচ সম্পূর্ণতা পায়। ইংরেজিতে একে মানবিকতা বলে। এই মানবিকতার বস্তুনির্ভরতা, বুদ্ধির উপরে আস্থা, ভাববিলাস এড়িয়ে অভীপ্সা ও প্রত্যক্ষের সমন্বয়—হয়ত-বা একটু রসিকতার আমেজেই সমন্বয়—আজও বাংলা জনসমাজের অন্তরঙ্গ জীবনে দেখা যায়। শিক্ষিত বাঙালির সান্নিধ্যে আমরা ভুলে যাই যে বাঙালির বিখ্যাত ভাবালুতা সাম্প্রতিক এবং শিক্ষিত বাঙালির বিশেষত্ব মাত্র। দেশের যে-ঐতিহ্য ব্রিটিশ-পূর্ব শিল্পসাহিত্যের উৎস, সেই লোকমানসে বাচালতা থাকলেও অশ্রুজলের চর্চা নেই।

গত শতাব্দীর কণ্টকিত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই ঐতিহ্য রক্ষায় এক দিক্‌পাল। সেখানে তাঁর কাজ শুধু উপভোগ্য লেখা নয়, তাঁর সাহিত্যজীবন রূপকও বটে। পুরাতন ঐতিহ্যে বাঁধা তাঁর লেখনী নতুন সমাজের পটে যে-আঁচড় কেটেছিল, সেটাই বিস্ময়কর ঘটনা। হয়ত সে-আঁচড়ে মহাকাব্যের রূপ নেই, কিন্তু কবির লড়াইয়ের কবি, প্রথাসিদ্ধ খাদ্যবর্ণনার কবি, প্রণয় বা পরমার্থের লেখক যে 'সংবাদপ্রভাকরে'র চক্ষুষ্মান সম্পাদক ছিলেন, এ-তথ্য আমাদের কাছে মূল্যবান।

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
আকাশের অকস্মাৎ আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট সুখদ স্বভাব॥

ইত্যাদির প্রথাসিদ্ধ লেখকই দুর্ভিক্ষ, নীলকর, শিখযুদ্ধ, বর্মাযুদ্ধ বিষয়ে অল্পবিস্তর জোরালো পদ্য লিখেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের "ইংরেজি নববর্ষ" নামক কবিতা থেকেই তাঁর এই দ্বৈতধর্মী বস্তুবাদের মজাদার উদাহরণ আরম্ভ করি।

খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর॥

সে-উৎসবে :

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফোটে॥

পরে দেখি :

বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে।
শাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্।
সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি॥
নসী, যশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, গুল্কি।

এদিকে কিন্তু এ-বহিরাশ্রয়ীর চোখে ছদ্ম মিশনরীও কবিতার বিষয়, পৌষ পার্বণেও কবির প্রবল আগ্রহ। তপসী মাছ বা পাঁঠা কিছুতেই এ-বস্তুবাদীর আপত্তি নেই :

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্।
তুমি সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান॥

কিংবা :

কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ী তপস্বীর প্রায়॥
হায় রে তপস্বী তোর তপস্যার কি জোর॥

আনারসকে তাই মনে হয় :

বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥

শেষে :

অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস কোরো মরণের কালে॥

এই প্রাকৃত মনের বাস্তবিকতাতেই কবির সহানুভূতি রূপ পায় :

কিছুদিন মা! দয়া করি রপ্তানিটি বন্ধ রাখো,
ধনে প্রাণে হল কাঙালী
ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙালী,

চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে চালের জাহাজ চেলো নাকো ॥

কিংবা :

হয় দুনিয়া ওলটপালট আর কিসে ভাই রক্ষে হবে।
পোড়া আকালেতে নাকাল করে, ডামাডোল পড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া শিক্ষে ধ'রে ভিক্ষে ক'রে বেড়াই সবে।

সেকেলে কবির তাই ভরসা দূর সিংহাসনে :

ওগো মা বিক্টোরিয়া
কর গো মানা ; যত তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা
চোখ রাঙে না চোখ রাঙে না ॥

কিন্তু এ হিন্দুসভামন্ত্র কাতর প্রার্থনাতেও অতিকথনের চটক, চাপা হাসির আভাস :

ও-মা ! গো-হত্যাটি উঠিয়ে দে মা ! অভয়পদে এই বাসনা।
মাগো সকল গরু ফুরিয়ে গেলে দুগ্ধ খেতে আর পাব না ॥

ওদিকে :

এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেব না মা, সে ভাবনা।
সে "তাঁতিয়া তোপির" মাথা কেটে আমরা ধরে দেব "নানা" ॥

অবশ্য এ-কথা মানতে হবে যে, সমস্যাই শুধু ঈশ্বর গুপ্তকে উত্তেজিত করে, সেইটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। তিনি মুখ ফিরিয়ে কাব্যসাধনা করেননি এইটাই বড়ো কথা। সমাধান যে-কালে ইতিহাসেই প্রায় দৃশ্য ছিল না, সে-কালে একজন কবির মধ্যে সে-দিব্যদৃষ্টি আশা করাই অন্যায়। তাই গুপ্ত-কবি তিক্ত দ্বিধায় সীমাবদ্ধ। ভিক্টোরিয়ার ভক্ত তাই মার্শম্যানকে বিদায় দেন :

শুনিতেছি বাবাজান এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাতে গমন ॥
জোড় করে পশুপতি করি নিবেদন।
সেখানে কোরো না গিয়ে প্রজার পীড়ন।
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে ল'য়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও ?
বাজাই বিজয়ী বাদ্য টম্ টম্ টম্
কিসে তুমি কম ?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে বম্ বম্ বম্।

বিধবাবিবাহ ঈশ্বর গুপ্তের পছন্দ হয় না, অথচ বিলাত থেকে সে-আইন প্রত্যাহারের

সম্ভাবনাও তাঁকে বিচলিত করে। এদিকে তিনি লেখেন :

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব।
একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আরদিকে টেবিলে ডেবিল খায় খানা।
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র দেয় কেটে।
বাপ পুজে ভগবতী, বেটা দেয় পেটে।
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব, জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ, ছেলে বলে যিশু॥

ওদিকে ভাবী সমাজের চিত্রও তাঁকে সান্ত্বনা দেয় না :

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া!
ঠাটঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া!
আর কি এরা এমন ক'রে
সাজ সেঁজুতির ব্রত নেবে?
আর কি এরা আদর ক'রে
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে?
পর্দা তুলে' ঘোমটা খুলে'
সেজেগুজে সভায় যাবে!
আপন হাতে হাঁকিয়ে' বগী
গড়ের মাঠের হাওয়া খাবে।

আমরা কবিত্ব বলতে যা বুঝি, রোমান্টিক কাব্যের সে-সংজ্ঞা গুপ্ত-কাব্যে প্রযোজ্য না-হ'লেও তার নিজস্ব মর্যাদা আছে। অনেকেরই ধারণা যে এ-মেজাজ বা মনন-রীতিতে মহৎ কাব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিক পরিবেশে এ প্রাকৃত মনো-বৃত্তিও যে রোমান্টিক আবেগে দানা বাঁধতে পারে, তার প্রমাণ ইংরেজি কাব্যে চসর এবং আরো মহৎ প্রমাণ দান্তে। রোমান্টিক কাব্যধারায় যেটা মস্ত লাভের বিষয়, সেটা হচ্ছে কাব্যরূপ বা ফর্ম সম্বন্ধে সচেতনতা। ঈশ্বর গুপ্ত সে-জ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিতে পারেননি, তার জন্যে অনেকটা দায়ী হয়ত তাঁর শৈশবের প্রতিকূল আবহাওয়া, শিক্ষার অভাব।

তা ছাড়া, মনে রাখা দরকার যে তিনি যে-যুগসন্ধির, সামাজিক দোটানার, শিক্ষার ও ঐতিহ্যের আপাতবিরোধের কবি, সে-বিরোধে তিনি ঐতিহ্যের চেনা পক্ষই নিয়েছিলেন। দেশজ রীতি বা কন্‌ভেন্‌শনেই তাঁর কবিত্বের শক্তি এবং সে-কন্‌ভেন্‌শনের কাঠামোতে তখন ভাঙন ধরেছে আর সে-রীতির লৌকিক স্বভাব এবং রোমান্টিক জ্ঞানগরিমার সমন্বয় তাঁর আয়ত্তে ছিল না। তার কারণ যে শুধু তাঁর কবিপ্রতিভার সামান্যতা নয়, তার প্রমাণ পাই মাইকেল, হেমচন্দ্র একাধিক নামকরা কবিকীর্তিতে।

হেমচন্দ্র অবশ্য প্রায় ঈশ্বর গুপ্তের সমগোত্র ছিলেন কবিত্বের তুলাদণ্ডে। হেমচন্দ্র এদিকে রোমান্টিক স্বপ্নের অভীপ্সার আস্বাদে মাইকেলের অনুকারক, ওদিকে আবার গুপ্ত-কবির রীতিতে সাময়িক ঘটনা নিয়েও পদ্য লেখেন। কিন্তু দুটি ধারা তাঁর কবিস্বভাবে এক হয় না। ফলে দুটি ধারাই তির্যগ্‌গামী, ক্ষীণ। মাইকেলের প্রচণ্ড প্রতিভা এ-সমন্বয় প্রায় সম্ভব ক'রে তুলেছিল। 'মেঘনাদবধে'র উদ্দাম কল্পনা চতুর্দশ পদাবলীতে, 'ব্রজাঙ্গনা'য় অনেকটা সমাজবেদ্য, অনেকটা প্রাকৃত সমর্থনে সার্থক। তবু তাঁর কাব্যভাষার বাধা মাইকেল বাঁধতে পারেননি। তাই 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় যে প্রাকৃত শুভবুদ্ধির সামাজিক দৃষ্টি, যে বস্তুনির্ভর দেশজ রীতির সুস্থ মনোবিন্যাস পাই, তা তাঁর মিল্টন-ঘেঁষা বায়রন্‌-ঘেঁষা কাব্যে মূর্তি পায়নি। কবিতার চেয়ে নাট্যরূপ কেন এ-কাজে সহায় সে-কথা এ-প্রসঙ্গে বিচার্য। এই শুভবুদ্ধি, এই রীতি টেকচাঁদকে, কালীপ্রসন্নকে লুব্ধ করেছিল, দীনবন্ধু মিত্র এই মননের উৎসেই পান তাঁর অসামান্য সেক্সপীঅরীয় মানবিকতা। ঐতিহাসিক কারণে ও ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্যে ঈশ্বর গুপ্ত এই রীতির সার্থকতা ও সীমাবদ্ধতা একাধারে দুয়েরই দৃষ্টান্ত। কিন্তু বাক্যবিন্যাসের দেশজ রীতি আজও আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে খুঁজতে পারি, যেমন পারি বস্তুনির্ভর সাধারণ সুস্থ বুদ্ধির সরসতা। অবশ্য কোন-কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর দেশী সাধনায় এই সন্ধানের মধ্যে একটা স্থূলতা দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরেও রুচির এই বিপরীত রূপ আমাদের মধ্যবিত্ত বিড়ম্বনাতেই সম্ভব। তার জন্যে চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বাংলা ঐতিহ্যের কবিরা দায়ী নন, দায়ী আমাদেরই ঐতিহাসিক বোধের অভাব এবং মধ্যবিত্ত কুরুচি।

টি এস্ এলিঅটের মহাপ্রস্থান

I sometimes wonder if that is what Krishna meant—
Among other things—or one way of putting the same thing :
That the future is a faded song, a Royal Rose or a lavender
spray
Of wistful regret for those who are not here to regret,
Pressed between yellow leaves of a book that has never
been opened.
And the way up is the way down, the way forward is the
way back.
You cannot face it steadily, but this thing is sure.
That time is no healer : the patient is no longer here.

("The Dry Salvages")

উনিশ-কুড়ি বছরে যে-কবি লিখতে পারেন শুচিবাইগ্রস্ত "এলফ্রেড প্রুফ্রকের প্রেমগীতি" বা "এক মহিলার ছবি"র মতো পাকা কবিতা এবং যাঁর অদম্য পরিণতি শেষে "বর্ন্ট নর্টন" থেকে "লিটল্ গিডিং" অবধি বিশ শতকের সবচেয়ে সার্থক ইংরেজি কবিতার চতুরঙ্গে এসে দাঁড়ায়, তাঁর বিষয়ে ভাষান্তরে কিছু লেখা কঠিন। বিশেষ ক'রে ভিন্নধর্মী আনকোরা ভাষায় এই কবিতার তীব্র সৌন্দর্য এবং এই কবির রসলোকের ক্ষুরধার যাত্রার আশ্চর্য সঙ্গতি ও সম্পূর্ণতার পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে ব্যর্থ চেষ্টা।

আমি শুধু এলিঅটের বিষয়ে বহু বক্তব্যের একটি বলতে চাই। এলিঅটের কাব্যে যে-বেদনা, যে রোমান্টিক যন্ত্রণা—সেই ভাবাশ্রিত বিশেষত্বেই এলিঅট আমাদের এত নাড়া দেন এবং সেই বেদনার আবেগেই তাঁর চিত্রকল্পগুলি প্রতীক হ'য়ে ওঠে। এলিঅটের প্রতিনিধি-মূল্যও এই কারণে এত বেশি। এ-যন্ত্রণার উৎস শেষ পর্যন্ত স্বভাবের গভীরে এক দ্বন্দ্বে, নানা অভিজ্ঞতার সমষ্টিতে নয়,—খাপছাড়া অনুষঙ্গে। এলিঅটের স্বকীয় প্রতিভার রসায়নে আমাদের সমাজের এই বিচ্ছিন্নতা কাব্যরূপ পেয়েছে। তাই এ-কালের কবিদের তাঁর কাছে ঋণস্বীকার

করতে হয় বারংবার। খণ্ডচৈতন্যের এমন একাগ্র উপলব্ধি ও এমন কাব্যসমৃদ্ধ রূপ এবং তার থেকে বর্ধমান নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কাব্যজগতে এলিঅটের দান। এ-দান ভুললে এলিঅটোত্তর কাব্যের মুক্তির উৎসও ভুলতে হয়।

অখণ্ডচৈতন্যের অভাবের জন্য এলিঅটের দায়িত্ব অনেকখানি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাইরে। আত্মসচেতন মানস স্বকীয় দ্বিধায় খণ্ডিত সমাজে দীর্ণ হ'তে বাধ্য, সততা যদি থাকে। এখানে এ-দ্বিধার ইতিহাস বা কারণ নির্দেশ অবান্তর। এলিঅটের শেষ বয়সের কাব্যে চৈতন্যের সন্ততি বা বিস্তার ও একতার ভাববিলাসী প্রশ্ন উঠে কিভাবে কাব্যকে রাঙিয়েছে, তাই সংক্ষেপে দেখা যাক্।

প্রশ্নটির চঞ্চলতা, সুদূরের পিয়াসী আমাদের এই শেষ রোমান্টিককে প্রেরণা দিয়েছে ক্লাসিসিজমের দিকে; হৃদয়বেদনা তাই খুঁজেছে গির্জার সমর্থন; সমাজ-বোধের অভাব আত্মগোপন করতে গেছে সামন্তবাদী রাজশক্তির কল্পনায়। লক্ষণ-গুলি নগণ্য নয়, কারণ এলিঅট শুধু আত্মসচেতন কবি নন, যদিচ সে-কীর্তিও নির্বোধ আনাড়ী কাব্যতত্ত্বের প্রচলনের জগতে প্রচণ্ড সিদ্ধি। তার চেয়ে বড়ো কথা, এলিঅট হচ্ছেন আত্মসচেতনতারই মহাকবি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে আত্মসচেতন মানস, তার নাট্যরূপ ভিন্ন কবিতায় ভিন্ন হ'লেও। ইংরেজি কাব্যে তার প্রয়াস এই প্রথম,—ভালেরি ও রিল্‌কের কথা দুটো কারণে এখানে ওঠে না। প্রথমত তাঁরা বিদেশী; দ্বিতীয়ত, ভিন্ন-ভিন্নভাবে, ভালেরি বা রিল্‌কের মধ্যে যন্ত্রণা এত তীব্রতায় দানা বাঁধেনি ব'লেই হয়ত তাঁদের আত্মপ্রকাশ কবিত্বে প্রচ্ছন্ন। আত্মসচেতনতার সাহিত্যরূপ অবশ্য গদ্যে দেখা গেছে প্রুস্তে, জয়সে, কাফ্‌কায়, খানিকটা ভর্জিনিয়া উল্‌ফে। ইংরেজি কাব্যে কিন্তু এলিঅট অতুলনীয়; তাঁর এই আপন সত্তার মুখোমুখি কাব্যযাত্রার অমাবস্যাই আমাদের মন বিচলিত করে। শিল্পসাহিত্যের মানসে সামাজিক কারণে বা যে-কারণে হোক্ পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব অর্থহীন, যদি-না এই চৈতন্যের আত্মনির্ভরতা দেখা দেয়। শিল্পসাহিত্যের বিষয়ী মনের পক্ষে দ্বন্দ্বের নিরাকরণে প্রয়োজন ঐ-প্রাগাত্মচৈতন্য, অর্থনীতির মূল্যবান ছক্ নয়।

চৈতন্যের সন্ততি ও একতার প্রশ্নেই জড়িত কর্মজীবন, মানসিক সক্রিয়তার তাগিদ। এলিঅটের আত্মসচেতন ভারসাম্য পাবার বারংবার চেষ্টাই আমার কথার প্রমাণ। ১৯১৭ সালেই এলিঅট বোঝেন আত্মসচেতনতার প্রকৃতি—তাঁর ভাষায়, পার্সনাল্যাটি বা ব্যক্তিস্বরূপ এবং নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ। কারণ ব্যক্তিবাদের যুগে নৈর্ব্যক্তিকতার জানলার পথেই ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি। অতঃপর

অল্প বয়সেই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা"। পশ্চিম য়ুরোপের ঐতিহ্য এলিঅট নিজে সংগ্রহ করছিলেন প্রচুর ও গভীর। দুর্ভাগ্যক্রমে তন্ময় পশ্চিম য়ুরোপে এসে পড়ল গত মহাযুদ্ধ আর গত শান্তিপর্ব। নৈরাশ্যের পোড়ো মাঠে এলিঅট দেখলেন নৈর্ব্যক্তিকতার আরো গভীরে শিকড়ের প্রয়োজন, এবং ভাবলেন তাঁর ঐতিহ্যবোধ তাঁর সহায় হবে ভাব-দুর্গের মধ্যেই মৃত্তিকা সন্ধানে। এ-সন্ধানের পরিণাম যে-ধর্মধ্বজ হবে তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু লক্ষ করবার হচ্ছে যে এই মনোভাব যে-হিসাবে এবং যতখানি তাঁর কবিতার উপজীব্য জুগিয়েছে, সে-হিসাবে তা মোটেই নৈর্ব্যক্তিক নয়, ধ্রুপদীও নয়। নৈর্ব্যক্তিকতা বা ধ্রুপদী শান্তির নির্ভর সমাজব্যাপী পুরাণে, যে-পুরাণ মোটা একটা সমাজ-সংস্কৃতির একতায় ব্যক্তিসাধারণকে আশ্রয় দেয়। পুরাণ যে ঐতিহ্য-জ্ঞানার্জনে তৈরি করা যায় না বা পুরাণ যে কখনো ব্যক্তিগত সৃষ্টি হয় না, এ-ভুল প্রাচীন রোমান্টিক কবিরা পণ্য-বিপ্লবের পরে তাঁদের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের মর্যাদার অন্বেষণে করলেও, এলিঅট নিশ্চয় তা করেননি। অন্তত এলিঅটের পক্ষে তা করা মানায় না, শেলি বা ব্লেকের উপরে অত কঠিন সমালোচনার পরে।

পুরাণের পটভূমির খোঁজে কালোপযোগী সামাজিক পরিবর্তনে ভীরুর গন্তব্য হ'য়ে পড়ে ফ্যাশিজমের স্নায়ুবিকারে জোর ক'রে তৈরি সাময়িক একতার ছক্। পাউণ্ডের মতো এলিঅট তাতে ঝোঁকেননি। তাঁর বিবেচনায় ইংরেজি গির্জার আশ্রয়ে ক্যাথলিক ঐতিহ্যের নিরাপদ দিব্যভাবের আবেদন বেশি। ব্লেক্ সম্বন্ধে এলিঅটের মন্তব্য ছিল: পুরাণাভাবে বাধ্য হ'য়ে এইসব কল্পনায় যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রতি,—সাধারণ বুদ্ধির উপরে, বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিকতার উপরে,—শ্রদ্ধা থাকত, তাহ'লে ব্লেকের উপকারই হ'ত। মন্তব্যটি এলিঅটের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

এলিঅটের যে ঐ ব্যক্তিনিরপেক্ষ শান্ত দৃষ্টির উপরে লোভ আছে, সেটা স্পষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানে তিনি নিরুৎসাহ; বিজ্ঞান মানুষের মূল্য স্বীকারে আজ তৎপর ব'লেই কি? তিনি ফিরে চান ধর্মের মালমশলার ফর্দ; তাঁর যাদুঘর ঐতিহ্যের সামাজিক প্রাণ একদা ছিল ব'লেই সেই বিগত যুগের টুকিটাকিতে তিনি অশ্রুপাত করেন। ব্লেক্ এবং শেলির বেলাতে যেমন, এলিঅটের ক্ষেত্রেও 'চিন্তা, আবেগ ও দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা' শুধু কবির দায়িত্ব নয়, সেটা জড়িত 'কবির পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, যেখানে কবির প্রয়োজন মেটেনি। কবি হিসাবে এলিঅটও হয়ত 'এইসব কারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন'।

আমাদেরই মতো এলিঅট মানুষের ইতিহাসটা দেখতে গিয়ে থমকে গেছেন

ক্যাপিট্যালিজমের ব্যাপারটায়—তাঁর মতে যা অর্থনীতি ও যন্ত্রশিল্পে একটা খট্‌কা মাত্র। সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো এই খট্‌কার ব্যাপারটার ফল হয়েছে জন্ ডিউঈ-র ভাষায়: '…compartmentalisation of occupations and interests which brings about separation of that mode of activity commonly called "practise" from insight, of imagination from executive doing, of significant purpose from work, of emotion from thought and doing.… Those who write the anatomy of experience then suppose that these divisions inhere in the very constitution of human nature.' তাই গীডিয়ন্ বলেছেন ভালো, যে গত শতাব্দীর দায়ভাগে মানুষের বিবিধ কর্মধারাও স্বতন্ত্র, প্রতিযোগী হ'য়ে উঠেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের laissez-faire and laissez-aller মানসিক জীবনের কচঙ্গনে প্রয়োজিত।

মানুষের চৈতন্যের এই খণ্ডতায় এলিঅটের যন্ত্রণা ডিউঈ-ভাষ্যের অনুবর্তী। তিনি একে মানবস্বভাবের চিরাচরিত পাপপুণ্যের জালে ফেলে ঈশ্বরের অখণ্ডতার দুরূহ সন্ধানে ব্যস্ত। অর্থনীতি ও যন্ত্রগুলোর ঐ সামান্য ব্যাপারটা সংশোধনের অনেক বেশি সহজসাধ্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না-ক'রে তাই এলিঅট অসম্বন্ধ মুহূর্তে শান্তি খোঁজেন, ফাঁকি দেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বরূপের মতবাদে। সে ব্যর্থ চেষ্টায় যন্ত্রণা বৃদ্ধিই পায় (যন্ত্রণা বৃদ্ধিতে অবশ্য কাব্যের আবেগ আরো তীব্র হ'য়ে ওঠে)।

সুবিধা হচ্ছে এ-ফাঁকিতে ফাঁপামানুষ ঠাসামানুষের কিছু দায়িত্ব থাকে না, কারণ মানুষের মন ত বহুধা হবেই। বহুকাল আগে তাঁর "ঐতিহ্য" প্রবন্ধে (আমার বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'স্বগত' দ্রষ্টব্য) এলিঅট লেখেন: 'The point of view which I am struggling to attack is perhaps related to the metaphysical theory of the substantial unity of the soul; for my meaning is, that the poet has, not a personality to express, but a particular medium, which is only a medium and not a personality.'

মিডিয়ম্ বা শিল্পপদ্ধতিকে যে কী ক'রে শিল্পী প্রকাশ দেবে সে-প্রশ্ন না-তুলে বলা যায় যে শিল্পী, প্রকাশ নয়, ব্যবহার করে তার শিল্পপদ্ধতি,—মানস ও শিল্পবস্তুর জ্যাবদ্ধ সহযোগিতার ও বাধার মধ্যে দিয়ে। মনের একতা-সমগ্রতাকে

এলিঅট একাকার সংমিশ্রণ ব'লে ভুল করেন, সে-প্রশ্নও এখানে তোলা নিষ্প্রয়োজন।

শুধু স্মরণীয় যে এই রোমাঞ্চসাধনা এলিঅটের ভাষা ব্যবহারের মাত্রাতেও দ্রষ্টব্য। জন্‌সনের পদাঙ্কে তিনি ন্যায়তই ধমক দিয়েছিলেন মিল্টনের অপ্রাকৃত ভাষা ব্যবহারকে। তিনি নিজে অবশ্য ভাষার ধর্ম বা প্রকৃতি অনুসারে শব্দ বাক্য ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। মিল্টনের মতো অমিত্রাক্ষরের চৈনিক প্রাচীর তৈরি করার গুরুচণ্ডালী দোষ না-থাকলেও কিন্তু কার্ল ক্রস্‌লের-এর অর্থে এলিঅটের ভাষাব্যবহারও খানিকটা অপ্রাকৃত। ধরা যাক, "ঈস্ট কোকরে" সেই ঝাঁকালো ছত্র যেখানে এলিঅট সেকেলে ইংরেজিতে পূর্বপুরুষের কথা বলেন কিন্তু উহ্য থাকে সমরসেটশিয়রের গণ্ডগ্রামের বর্ণনা। সপ্তদশ শতকে নাকি এলিঅটেরা ঐ-গ্রাম ছেড়ে সাগরপারে যান। কিংবা আগেকার কোন একটি কবিতা ধরা যাক্—"বর্ব্যাঙ্ক উইথ্-এ বায়ডেকে"র দেড় পৃষ্ঠার কবিতাটি ঐতিহ্যের ভাঁড়ার বল্লেই হয়। সেক্সপীঅরের নানা রচনা থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখের সংখ্যা অন্তত নয় হবে, তাছাড়া গতিয়ে, সেণ্ট অগষ্টিন্, হেন্‌রি জেম্‌স্, ব্রাউনিং, রস্‌কিন্, ডন্, মার্সটন্, ফোর্ড ও স্পেন্সর আছেন।

পেটার সম্বন্ধে এলিঅট লিখেছিলেন, '...it represents, and Pater represents more positively that Coleridge of whom he wrote the words, 'that inexhaustible discontent, languor, and home-sickness ··· the chords of which ring all through our modern literature.' সিম্বলিস্টদের গুরুস্থানীয় পেটারই প্রথম চর্চা করেন মুহূর্তমাহাত্ম্যের, হীরকদীপ্তিতে মুহূর্তে-মুহূর্তে জলার তীব্রতার : '...to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moments' sake.'

মুহূর্তের ক্ষণিকতাই যন্ত্রণার কারণ, মুহূর্তের এই নশ্বরতাই মহৎ কাব্যের বিষয় এলিঅটের শেষ চারটি কবিতায় :

The moments of happiness—
Not the sense of well-being, fruition, fulfilment, security or affection,
Or even a very good dinner, but the sudden illumination—
We had the experience but missed the meaning,

And approach to the meaning restores the experience
In a different form, beyond any meaning
We can assign to happiness.

অথবা :

For most of us, there is only the unattended
Moment, the moment in and out of time.
The distraction of it, lost in a shaft of sunlight,
The wild theme unseen, or the winter lightning,
Or the waterfall or music heard so deeply
That it is not heard at all, but you are the music
While the music lasts.

এইসব সুখের মুহূর্তগুলি—পাতার আড়ালে শিশুর দল, হাস্যরত, সূর্যের রশ্মিপাতে হঠাৎ উচ্ছল বা নিরুদ্দেশ; শুষ্ক সরোবরের শানে রৌদ্রের ছটা; গোলাপ-বাগানের কুঞ্জগলি; ত্বরিতে এখনই এখানে, এখনই, চিরকাল—এইসব মুহূর্তগুলি বারবার ঘুরে ফিরে আসে চারটি কবিতাতেই এবং 'পরিবারের পুনর্মিলন' নামক নাটকে। এই মুহূর্তগুলিই কি the spring of the turning world ?

ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থিরকেন্দ্রে দোলকযন্ত্রের প্রতীকটি এলিঅটের কাব্যে "কোরিওলান্" যাবৎ দ্রষ্টব্য। প্রতীকটি তাঁর বহু গভীর কাব্যাংশের কেন্দ্র। মনে হয় এই পরিবর্তমান বিশ্বের স্থিরবিন্দুটি, there where the dance is, যে-নাচে বিশ্বজন মোহিছে, নাচের গতিতে নেই, যতটা আছে ঐ-সব নিছক মুহূর্তে, আছে শৈশবের অমর স্মৃতিতে। অর্বাচীন রোমান্টিক ওঅর্ডস্ওঅর্থের মতো প্রবীণ ধ্রুপদী এলিঅটও গান করেন শিশুমনের নিরালম্ব শুদ্ধতার।

'Issues from the hand of God, the simple soul.' ("Animula") ঈশ্বরের হাত থেকে বাহিরিয়া সরল হৃদয় যদি বিজ্ঞানে চেষ্টা না-করে "পরিবর্তমান সদা আকারে ও বর্ণে চির জড় এ পৃথিবী" নিয়ন্ত্রিত করতে, তাহ'লে পেটারের মুহূর্ত-সাধনা ছাড়া উপায় কী বা ওঅর্ডস্ওঅর্থের শৈশবের অমরতাবাহক সংবাদ ছাড়া ? কারণ শিশু স্বভাবতই আত্মসচেতনতায় বিধুর নয়। কিন্তু ঐ-নাচের প্রতীক ?

প্রত্যক্ষ জীবনের অবসাদ ও বুদ্ধিগত পরোক্ষতত্ত্বের প্রাণবত্তায় চিন্তিত ভালেরি এই নাচের প্রতীক টেনেছেন তাঁর স্থপতি "য়ুপালিনস্—মন ও নৃত্যের

বিষয়ে" নামক সক্রাটিক্ আলাপে। ভালেরির যুক্তি এলিঅটের চেয়ে বেশি সম্পূর্ণ, সাধ ও সিদ্ধান্ত-সঙ্গত। দীর্ঘ এক আলোচনায় চিকিৎসার বাইরে এই জীবনাবসাদরোগ ক্ষণিক আরাম পেল শিল্পের স্বাধীন সত্তার স্পর্শে, আতিক্তের নাচের পরোক্ষ মুক্তিতে; এবং সক্রাটিস্ ব'লে ওঠেন :

হে অগ্নিশিখা!...
মেয়েটি আসলে হয়ত মস্তিষ্কহীন?...
হে অগ্নিশিখা!...
কে জানে ওর অতিসাধারণ মনটা কত কুসংস্কারে
আর কত খামখেয়ালে বোঝাই?...
হে অগ্নিশিখা, চির নিবাতনিষ্কম্প্র! প্রাণময় আর দেবতুল্য!...

এই অগ্নিশিখা, এ আর কি, বন্ধুগণ! যদি না এ হয় সাক্ষাৎ মুহূর্তটিই?... এলিঅট কিন্তু ঐ অবসাদ-সীমা ছাড়িয়ে নাচটাকে একেবারে এবস্ট্রাক্শন বা পরোক্ষতত্ত্বভাবে দেখেন না, নর্তককেও দেখেন না। অথচ নৃত্যের বিষয়ানুগ নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর মতো মহাকবিকে কাব্যবিষয় জোগাতে পারত। চিত্রকল্পটি সরল ও দ্বৈত—এক হচ্ছে দর্শক দূর থেকে ব'সে দেখে এবং নর্তকদের খণ্ডগতির সমষ্টিতে উপলব্ধ হয় নাচটার রূপ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কবি নৃত্যের মধ্যে সক্রিয়, নৃত্যের কেন্দ্র ঘিরে ঘুরে-ঘুরে এদিকে-ওদিকে সংলগ্ন নর্তকরা যেখানে নৃত্যকে মূর্তি দিচ্ছে। নৃত্যের খণ্ডিত কিন্তু সক্রিয় উপলব্ধিতে আসে নৃত্যের পরোক্ষ রূপটি, স্থানে কালে, সমগ্রে ও খণ্ডের সংলগ্নতায়। এখানে দর্শকের ব্যক্তিগত বিষয়ী চিন্তাবলিতে উপলব্ধির আরম্ভ নয়। অংশের ক্রমিকতায় নয়, নর্তকের স্বাতন্ত্র্যে নয়, সারা নৃত্যে সক্রিয় উপলব্ধি একাগ্র। আমার প্রতীকটা স্থূল হ'ল, কিন্তু এলিঅটের লেখনীতে এ-প্রতীকের কাব্যোৎসারে বিশ্ব ও ব্যক্তি, বিষয় ও বিষয়ীর চৈতন্য-কৈবল্য কী মর্মস্পর্শী রূপ নিতে পারে তা কল্পনীয়।

শেষ কবিতাগুলিতে এলিঅট এ-প্রতীকের খুবই কাছাকাছি আসেন। তাঁর অন্বিষ্ট—বিষয়সর্বস্ব বা বিষয়-বিষয়ীর দ্বন্দ্বাতীত স্থিরবিন্দুটি, স্থিতি যার গতির মধ্যে, অবিচ্ছিন্ন চিৎপদ্মের মধ্যমণিতে। বিষয়লগ্ন এই দৃষ্টি সম্ভব সক্রিয়চক্রের মধ্যে অস্তিত্বস্বীকারেই, উপর থেকে আবছা দেখায় বা পাশ থেকে তির্যক দৃষ্টির ছবিতে দ্রষ্টা দৃশ্যের মীমাংসা ঘটে না। এবং এই চক্রবৎ পরিবর্তন ত জীবনেরই গতি, যার পরিধির পারে শুধু মৃত্যুরই নেতি নেতি। তাই মৃত্যুর জীবন্ত ছলা—মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দর্শকের স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু এ-স্বাধীনতায় নৃত্যের রূপায়ণ

ব্যাহতই হয়, স্থিরবিন্দুটি হয় অস্থির। ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থিরবিন্দুর এ-প্রতিবাদে, মানছি, অশান্ত হৃদয় অনেক চমৎকার কল্পনা ছিটিয়ে বেড়ায়,—অনেক নরকল্প দেবদেবী, কাল্পনিক আয়রল্যাণ্ডের মৃত পুরাণ, অনেক তন্ত্রমন্ত্রের কুহক।

এলিঅট তাই অনিবার্য কারণে বিজ্ঞানবিদ্বেষী, মানবচৈতন্যের সমগ্রতা তাঁর কল্পনায় নেই, জড়প্রকৃতি বা সমাজে সম্ভব যে মানুষের নিয়ন্ত্রণ তা তিনি মানেন না। তাঁর সুর পণ্যবিপ্লবের দ্বিধাদীর্ণ বেদনার—what man has made of man! মানুষের মনের ভাঙন মর্ত্যলোকে চিরস্থায়ী, কারণ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' কিঞ্চিৎ সুখসুবিধাও আছে। সুতরাং:

> And hear upon the sodden floor
> Below, the boarhound and the boar
> Pursue their pattern as before
> But reconciled among the stars.

অমানুষিক ঐ-নক্ষত্রস্বর্গ আমাদের দায়িত্বের নাগালে নয়, অতএব কর্মফলহীন কর্মে কিবা লাভ? শিকার-শিকারীর প্রকৃতি নশ্বর জীবনে চিরাচরিত, তার থেকে আসে মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তার গভীর আবেদন।

এলিঅট অবশ্যই সাম্রাজ্যের স্তম্ভ নন, তবু তিনিও যে দায়িত্বহীন ব্যক্তি-স্বরূপের মতবাদ খাড়া ক'রে ইটন-হ্যারোর ব্যক্তিমাহাত্ম্য গান করবেন এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আর সমাজ-পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ও সংস্কৃতির প্যাটর্নস্ মানবেন না, তাতে সাম্রাজ্যের পাপই প্রমাণিত। সেই পাপেই জড়প্রকৃতি বা পশুপ্রকৃতির সঙ্গে মানবস্বভাবকে এক করা ইতিহাসের চোখে মার্জনীয়, ঈশ্বরের চোখে নারকীয় ভ্রান্তি। কিন্তু আমার মন্তব্যের স্থানে এলিঅটের আশ্চর্য কবিতা উদ্ধৃত করাই বাঞ্ছনীয়:

> At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
> Neither from nor towards; at the still point, there the dance is.
> But neither arrest nor movement. And do not call it fixity.
> Where past and future are gathered. Neither movement from nor towards.

Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.
I can only say, there we have been: but I cannot say where.
And I cannot say, how long, for that is to place in time.

অতুলনীয় এ-কবিত্বে শ্রদ্ধা স্বতই অসীমে পৌঁছায়; ভাবি এবারে বুঝি আইন্‌স্টাইন্‌-প্লাঙ্কের জগৎ, আধুনিক জীববিদ্যার মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞা কাব্যের গভীর রূপ পেল। কিন্তু এ-পরিগ্রহণ সাময়িক, এলিঅটের দ্বন্দ্ব যে নিরাকৃত হয়নি তার প্রমাণ ভিন্নস্তরের অভিজ্ঞতার ব্যর্থ মধ্যপদলোপী সন্ধিচেষ্টায়। গতি ও আপেক্ষিকতা এবং স্থিতিকেন্দ্র অস্বীকারের ব্যথিত ভিত্তিতে, ব্যক্তির চৈতন্যের কল্পিত তাঁর দ্বিধা:

I said to my soul, be still; and let the dark come upon you
Which shall be the darkness of God· As, in a theatre,
The lights are extinguished, for the scene to be changed
With a hollow rumble of wings, with a movement of darkness on darkness,
And we know that the hills and the trees, the distant panorama
And the bold imposing facade are all being rolled away—
Or as, when an under-ground train, in the tube, stops too long between stations.
And the conversation rises and slowly fades into silence
And you see behind every face mental emptiness deepen
Leaving only the growing terror of nothing to think about;
Or when, under ether, the mind is conscious but conscious of nothing
I said to my soul, be still, and wait without hope
For hope would be hope for the wrong thing; wait without love

For love would be love of the wrong thing ; there is
yet faith.
But the faith and the love and the hope are all
in the waiting ;
Wait without thought, for you are not ready for thought ;
So the darkness shall be the light, and the stillness
the dancing.
Whisper of running streams, and winter lightning,
The wild theme unseen, and the wild strawberry,
The laughter in the garden, echoed ecstasy
Not lost, but requiring, pointing to the agony
Of death and birth.

মর্মভেদী এ-কাব্যের 'পরে নতমস্তকে জানাতে হয় বিচলিত হৃদয়ের সম্ভ্রম। কিন্তু ধার্মিক মরমিয়ার এ কী মহাশূন্য ? মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সম্পূর্ণ জীবনের শেষে জীবনমৃত্যুর ছলার দৃপ্ত স্বীকার বা 'পূরবীর' ঐশ্বর্যের কথা—শূন্যতার অগ্নি-বাষ্পে ভরা।

এ স্থির মহাশূন্যের সমস্যাই আরো সহজবোধ্য নাট্যরূপ পেয়েছে 'ফ্যামিলি রিয়ুনিঅনে'। বুড়ো লেডি অন্‌চেন্‌সে এমি-র অতীতের শোকে নাটকের আরম্ভ :

O Sun that was once so warm.
O Light, that was taken for granted
When I was young and strong and sun and light
unsought for

স্থূলবুদ্ধি আইভি বলে : আমি হ'লে সূর্যের পিছনে ছুটতুম, সূর্যের আশায় থাকতুম নাকো বসে। চার্লস্ বলে : এমি আমাদের বনেদী ধরনে চিরটা কাল ঘোড়া ও কুকুর বন্দুক নিয়ে কাটিয়ে শেষে ইংলণ্ড ছেড়ে কোথায় কাটাবে শীত। এমির দিন কাটে উইশ্‌উড্ প্রাসাদে ছেলের প্রতীক্ষায়। লর্ড হ্যারি আট বছর ধ'রে সারা পৃথিবী ঘুরছে এক বাজে বউ নিয়ে। এগাথা বলে : তার প্রত্যাবর্তন নিশ্চয়ই হবে যন্ত্রণাকর,

I mean painful, because everything is irrevocable,
Because the past is irremediable,

Because the future can only be built

Upon the real past. ···

He will find a new Wishwood. Adaptation is hard.

এমি বলে : কিছুই ত পরিবর্তন হয়নি। এগাথা উত্তর দেয় : আমি বলছি যে উইশ্‌উডে হ্যারি দেখবে আরেক হ্যারিকে। যে-মানুষ ফিরবে সে দেখবে সেই ছেলেটিকে যে যাত্রায় বেরিয়েছিল। ইতিমধ্যে হ্যারি জাহাজ থেকে তার নির্বোধ স্ত্রীকে সাগরতলে পাঠিয়ে ফিরে এল। একা, তার পিছনে-পিছনে গ্রীক গল্পের বিবেকরূপিনী চণ্ডভগিনীরা প্রতিশোধের খোঁজে ছুটছে, ফিরে এল বর্ণ্ট নর্টনের মতো উইশউডের জমিদারবাড়িতে। হ্যারি দেখল সেইসব চেনা মানুষ, যারা আত্মঅচেতন, যাদের মনের তীরে ঘটনার ঢেউ বৃথাই আছড়ে-আছড়ে পড়েছে, আর সে নিজের মনের বালাই নিয়ে অস্থির।

হ্যারি বলে তার নিঃসঙ্গতার কথা, ভিড়ের মধ্যে একাকিত্বের বুকচাপা ভার, তার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, নিজের যন্ত্রণা। ছোটো মাসি এগাথা সান্ত্বনা দেয় আর বলে :

There is more to understand, hold fast to that

As the way to freedom.

যা আবশ্যিক, তার সীমা স্বীকারেই ত মুক্তি। এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হ্যারি বলে: মনে হয় বুঝি তোমার মানেটা, অস্পষ্টভাবে—সেই যেমন তুমি বুঝিয়েছিলে চিম্‌নিতে কান্নাটা বা অন্ধকার ঘরে সেই মন্দটার ভয়।

মেরি-র সঙ্গে ছেলেবেলা্‌র স্মৃতির আলাপের পরে হ্যারি বুঝতে পারে স্মৃতি-জীবী বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের ভ্রান্তি :

The instinct to return to the point of departure

And start again as if nothing had happened.

Is n't that all folly ?

নাটকে এলিঅট কিভাবে তাঁর মোট প্রশ্নগুলি তোলেন এবং নিজেই জবাব খোঁজেন, সেটা লক্ষ করবার বিষয়। কিন্তু চণ্ডিকাদের সামনে হ্যারি আবার ভয়ে আঁকড়ে ধরে বহুধা ব্যক্তিস্বরূপের অছিলা : আমি যখন তাকে (স্ত্রীকে) জানাতুম, সে-আমি আর এ-আমি এক নয়। চেম্বরলেন সরকারের দায়িত্ব আর চর্চিল্‌ সরকারকে ভুগতে হবে না। এগাথা বৃথাই ব'লে যায় যে শাস্তি এড়িয়ে অপরাধের দায়িত্ব এড়ানো যায় না :

That there is always more ; We cannot rest in being
The impatient spectators of malice or stupidity.
We must try to penetrate the other private worlds
Of make-believe and fear. To rest in our suffering
Is evasion of suffering. We must learn to suffer more.

প্রায় মার্ক্সিয় প্রজ্ঞার এ-আভাসে শেষটা অবশ্য হ্যারি চণ্ডিকাদের বহির্বিষয় করতে সক্ষম হ'ল এবং পেল মনের মুক্তি :

This time you are real, this time you are outside me
And just endurable.

এখানে হ্যারির যে-ব্যাখ্যা তার বাপমায়ের অপরিতৃপ্ত প্রেমের, সে-বিষয়ে একটা কথা বলা যায়—there was no ecstasy. তাই কি এলিঅটের সারা কাব্যে শুধু প্রেমের ক্লান্তি ও বীভৎসতা—the boredom, the horror-ই আছে, প্রেমের আনন্দ the glory শেষ dung and death-এ ? এত বড়ো কবির কাব্যসংগ্রহে মাত্র দুটি কবিতায় প্রেমের বিষয়ে এলিঅট একটু সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন—"লা ফিল্লিয়া কে পিয়ান্জে" এবং 'দি ওএস্টল্যাণ্ডে'র প্রথম অংশে। তাও সেখানে কবির বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতোই প্রেমের চঞ্চলতা, পিয়াস, প্রেমের সম্পূর্ণতা নয়। বোধহয় প্রেম দুই ব্যক্তির দ্বৈতে একটি চলিষ্ণু সম্বন্ধ ব'লে তাতে মুহূর্তবিলাসী দেখে শুধু ক্ষণিক সক্রিয়তার অনাচার।

'গীতা' এলিঅটকে তাঁর কাব্যের চমৎকার রসদ জুগিয়েছে, তাই 'গীতা'র ভাষাতেই বলা যায় যে কর্মেন্দ্রিয় নিবৃত্ত রেখে যে-ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহে মনে-মনে বাস করে, সে উদ্‌ভ্রান্ত জন কপটাচার করে। বলাই বাহুল্য, কাব্য আচরণ নয়, কাব্য হচ্ছে মনের অন্তরঙ্গ উদ্বেলতার বহির্বিষয়ে অঙ্গীকার, কাজেই কপটতা নয়, উদ্‌ভ্রান্তিই এখানে দ্রষ্টব্য। উদ্‌ভ্রান্তি ছাড়া এলিঅটের একাধারে আশ্চর্য সুকুমার প্রজ্ঞান্বেষণ এবং মৃত্যুর উপরে ভয়ানক ঝোঁক মেলানো যায় না। ক্ষুধা নয়, রোগ নয়, প্রেম নয়, ঝগড়া নয়, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ নয়, কারণ এ-সবই মানুষের সক্রিয় সাধ্যের ভিতরে, শুধু বিষ্ঠা আর মৃত্যু। মৃত্যু যে স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক নিয়ে শোক করা যে নির্বুদ্ধিতা, সে অবশ্যই এলিঅট জানেন তবু কেন এত ঝোঁক ? প্রাজ্ঞ কখনো বিচলিত হন না জীবিত বা মৃতের জন্য। এলিঅটের মুখ্য বিষয় নিশ্চয়ই আত্মসচেতনতার সমস্যা, আত্মসচেতনতা ও কর্মের আপাতদ্বন্দ্ব, কর্মফল নয়,

—কর্মের আর আত্মসচেতন মনের সঙ্গতির সন্ধান, বিচ্ছিন্ন জীবনের পুরুষার্থে ঐক্যের সমস্যা।

নিশ্চয়ই থিয়েটারসভার নিষ্কর্ম ঐ-অন্ধকার নয়। কারণ কৃষ্ণ উবাচ যে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে থাকলেও কর্মের দায় এড়ানো যায় না। প্রকৃতিজাত কারণে জীব-মাত্রেই প্রতিমুহূর্তে কর্মস্রোতে চলিষ্ণু। কর্মের স্বাধীনতা কর্মের মধ্যেই, সকল কর্মের সমগ্রতায়, হে পার্থ, জ্ঞানের উৎস। আগুন যেমন জলতে-জলতে ইন্ধনকে ক'রে দেয় ছাই, জ্ঞানের অগ্নি তেমনি জলে কর্মের জ্বলার মধ্যেই।

কিন্তু হৃদয় যদি মানে না মানা, যদি মুহূর্তেই ব'সে থাকে অনড় জড়পদার্থবৎ? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যদি সোনার হরিণের মায়ায় ডাকে? সে-বাসনার পরিণাম রাগে, কারণ এ পিয়াসী মন বৈজ্ঞানিকোচিত নৈর্ব্যক্তিকতায় ভেবে দেখে না কেন মুহূর্তের বাসনা চিরস্থায়ী বস্তু হ'তে পারে না, তাই হয় নিরাশ ক্রুদ্ধ। ক্রোধ থেকে আসে, কৃষ্ণ বলেন, ভ্রান্তি; ভ্রান্তি থেকে উচ্ছৃঙ্খল স্মৃতির দৌরাত্ম্য প্রতীকোৎসারী স্মৃতির যন্ত্রণা। যতই বিশৃঙ্খলা, যতই যন্ত্রণা, ততই জীবনে অসহিষ্ণুতা—বাসনা-সংকুল এই যে জীবন অসম্বদ্ধ, সামাজিক সমর্থনহীন, একক আত্মজ্ঞানের দ্বন্দ্বে স্মৃতিমুখর। আর দুর্মর এই স্মৃতি।

আমার বিশ্বাস এলিঅট এই ভাবগুলিই নাট্যকাব্যে রূপায়িত করেছেন। তাঁর persona (রূপায়ণে শিল্পীর নাট্যরূপ বা মুখোস) সুচিন্তিত; তিনি নিজে নন, তোমার-আমার মতো সাধারণ লোকই হচ্ছে নাট্যপাত্র, বাদবিসম্বাদে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই তিনি বলতে পারেন যে মুক্তির পথ শূন্যের পথ, মালার্মের নেতির মতো। ধর্মসাধকেরা অধ্যাত্ম উপলব্ধির এ-বর্ণনা মানেন না, এলিঅটের মতো সাধক নিশ্চয়ই সে-বর্ণনা করতে চাননি। এ-শূন্য বোধহয় শুধু যন্ত্রণার সুর নিখাদে চড়িয়ে দেবার কৌশল।

এলিঅটের এই সমস্যা। বিজ্ঞানবিরোধী, তিনি গতিশীল জীবনে কোন ডায়ালেক্‌টিক্সের হাল ধরতে পারেন না। সমস্যাটা অবশ্য একেবারে নতুন নয়। টমাস্ ব্রাউন্ এই সমস্যার শিং ধ'রে সমাধান করেন নিজের মতো, ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেতিবাচক ছিল না, বিজ্ঞানেও ছিল আস্থা; তিনি ভিন্ন স্বতন্ত্র ন্যায়বিশ্বের মতবাদে সমাধান খুঁজে পান যাতে অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান দুই-ই বিশ্বাস্য। মতেঁনের সমাধানও প্রায় এইরকম, যদিচ তাতে জিজ্ঞাসার ভাগটাই বেশি। মিল্টন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরই একচেটে ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁর ঈশ্বর প্রায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রূপক বললেই হয়। বেকন ত বৈজ্ঞানিক। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরায়

সেকালে ডনের কান্নাটা খুবই করুণ : 'And new Philosophy calls all in doubt.' এলিঅটের অবস্থা প্রায় ডনের মতো ; মনের গঠনে নেই অধ্যাত্মজীবীর ঐশ্বর্য, তবু তিনি ধর্মবাদী স্থায়ী বন্দোবস্তের মরীয়া ভক্ত। তাই এ বিচ্ছেদের, ভেদাভেদের গান। কৃষ্ণ ব্যাপারটা জানলে হয়ত বলতেন, যে-জ্ঞানে সর্বজীবের বিবিধ জীবনধারা বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত, সে-জ্ঞান বাসনাদুষ্ট।

বলাই বাহুল্য, 'গীতা'র অপব্যবহারে আমার কিছুমাত্র আর্যোচিত আপত্তি নেই। এলিঅট নিজেই ত "সেনেকা" প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কী ক'রে, অজ্ঞানে বা অল্পজ্ঞানের ভিত্তিতে মহৎকাব্য রচিত হ'তে পারে। "দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্"-এর জমকালো 'গীতা' ব্যবহারে আমার কাব্যাস্বাদ পরিতৃপ্ত; আর পাণ্ডিত্য না-থাকায়, পাণ্ডিত্যাভিমান সংযত করার প্রশ্নই ওঠে না। আমার মতে "দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্"ই কবিতাচতুষ্টয়ের মধ্যে সবচেয়ে আঁটসাঁট কবিতা। "লিটল্ গিডিং"-এর দান্তেশোভন ভাস্কর্য ও গাম্ভীর্য সত্ত্বেও এই শেষ কবিতাটি এক হিসাবে প্রত্যাবর্তন। এখানে এলিঅট শেষ করেছেন এয়র-রেড রাত্রির জঁাকালো বর্ণনার পরে নটিংহ্যামের রয়্যালিস্ট চ্যাপেলে প্রথম চার্লসের নৈশাভিযানে যখন অন্তর্যুদ্ধে রয়্যালিস্টরা হেরে গেল। অবিসম্বাদী কবিত্বে এলিঅট আর্তনাদ করেছেন পার্টি-রাজনীতির নশ্বরতায়। মৃত্যুতে, কালস্রোতে রয়ালিস্টও শূন্যে বিলীয়মান, কী হবে কিছু ক'রে, ল'ড়ে, তাই হায় হায়।

আমি শেষ করি তৃতীয় কবিতার আশাপ্রদ শেষ ছত্রে :

> We content at the last
> If our temporal reversion nourish
> (Not too far from the yew tree)
> The life of significant soil.

প্রুফ্রকের আত্মসচেতন নিষ্ক্রিয় কৈশোর থেকে এ-কবি-পরিণতির দীর্ঘ মহাপ্রস্থান নমস্য কীর্তি।

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

আমাদের সভ্যতার ইতিহাসে দেশ ও কাল, টাইম ও স্পেস্ কী ক'রে মানুষের মনে প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, তার বিবরণ আজকাল পণ্ডিত ব্যক্তিরা দিচ্ছেন। বহির্জগতের সম্বন্ধসংঘাতে এইসব প্রত্যয় জাগে আমাদের মনে। সভ্যতার আরেকটি বড়ো প্রত্যয় হচ্ছে ব্যক্তিত্ববোধ। কী ক'রে সমাজে ও ব্যক্তিত্বে দ্বন্দ্বাশ্রয়ী সম্বন্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে এই ব্যক্তির স্বরূপ মর্যাদা পেতে লাগল, তার ব্যাখ্যা সভ্যতারই ইতিহাস। বহির্জগতে বিরুদ্ধশক্তি, অন্ধপ্রকৃতি, জন্তুজানোয়ার, হিংস্র গোষ্ঠির দলাদলি যতদিন-না মানুষের শুভবুদ্ধির কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা পেয়েছে, ততদিন ব্যক্তির এই মহিমা কবিদের মনেও আসেনি। বাল্মীকি বা হোমর্ গোষ্ঠির মহাকাব্য রচনাই করেছেন, রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছেন ব্যক্তির স্বকীয়তার কথা :

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা !
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বিষয়ে যে-বোধ থেকে এই আশার জন্ম, সে-বোধ মানবসভ্যতার বিশেষ একটা পরিণতিতেই সম্ভব। কিন্তু এখনও সম্ভব নয় এই আশাকে সকলের পক্ষে সফল করা। ব্যক্তির এ-স্বাধীনতা কোথায়, যেখানে অর্থের

প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিত্বই পণ্যদ্রব্য মাত্র? বাণিজ্যচণ্ডীর তাড়নায় তাই রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছে:

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী,
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা!

সকল সচেতন মানুষের মধ্যেই ত অন্তরের ধ্যানখানি আপনার ভাষা খোঁজে। কিন্তু জীবনযাত্রার অমানুষিক রথচক্রঘর্ঘরে সে-ভাষা ডুবে যায়, মন ভবিষ্যতে খুঁজে বেড়ায় তার সম্পূর্ণ বাণী।

ভবিষ্যতের কথা বলতে গেলে আমার মনে পড়ে ইংরেজি কবি এলিঅটের ধরতাই বুলি: অতীত ও ভবিষ্যৎ দুয়ের অঙ্গুলিনির্দেশ একদিকে—এই বর্তমানে। বর্তমানের উৎসারিত স্বপ্নের সৃষ্টিই ত আমাদের ভবিষ্যতের ছবি—নানা স্বপ্নের ঐক্যতান, দুঃস্বপ্নেরও। বর্তমান যদিও কিছুমাত্র সুস্থ হ'ত, তাহ'লে হয়ত আমাদের স্বপ্নপ্রয়াণে সামঞ্জস্য থাকত! কিন্তু নানা লোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত। অভাবে যুদ্ধে প্রতিষেধ্য রোগে, অনাবশ্যক মৃত্যুতে আমাদের স্বপ্নগুলিও ছত্রভঙ্গ। তাই ঐক্যতান ছিন্নভিন্ন অন্ধকার কলকাতার উচ্চকিত রাস্তায় গলিতে। কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শিকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যম্ভাবিতায় বীজকম্প্র নীল অন্ধকারে বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন। বিসম্বাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়, উদয়াচলে মেশে অস্তাচলের রক্তস্রোত, ভগ্নদূতের মুখে জাগে প্রবল আশা, প্রাণের কবি অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীকালের ভাষা!

ব্যাপারটা নিছক কবিত্ব নয়। ইতিহাসের সাক্ষ্য এর পক্ষে। বিজ্ঞান এর সমর্থক। আর বিজ্ঞান আজ আমাদের সারা বিশ্বে বাহুবিস্তার করেছে, আজ আর বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে শেষ নয় বা স্বতন্ত্র পেশা বা বিশেষজ্ঞের জ্ঞানে আবদ্ধ নয়, আজ তার ব্যাপ্তি প্রায় জীবনের মতোই গভীর ও জটিল! কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই প্রচণ্ড ব্যাপ্তির মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষে একতার বহুধা বন্ধন, বাহির ও ঘরের, দেহ ও মনের, ব্যক্তি ও সমাজের, বস্তু ও রূপের হরিহর আলিঙ্গন!

আর বিজ্ঞান বলতে এই ছবিই ত আমাদের মনে জাগে। ভবিষ্যতের স্বপ্নে এই বিজ্ঞানই, আধুনিক বিজ্ঞানই জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আজ যেখানে মানুষ লোভে প'ড়ে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে না—পাছে মুনাফার হার ক'মে যায়, সেখানে বিজ্ঞানকে দূরে পরিহার করার ইচ্ছাটা আমার মতো লেখকশ্রেণীর অসহায় জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থনীতির স্তরকে ছাড়িয়ে যখন আমরা মানুষের স্তরে পৌঁছতে চাইছি, তখন এ-আশা অমূলক নয় যে জীববিদ্যায় মনোবিদ্যায় নির্মাণকার্য আরম্ভ হবে মানুষকে নিয়ে। জীবিকা বা জীবনযাত্রার শূলে চড়ানো আজকের মানুষ নয়, স্বাধীন জীবনের পটভূমিতে নিছক মানুষ। অর্থাৎ দু-জন মানুষের মধ্যে প্রভেদটা কেন হবে অর্থনীতিগত কারণে, তাদের জীবনযাত্রার আবশ্যিক প্রভেদের জন্য? কেন হবে না দু-জন মানুষের শারীরিক মানসিক ভিন্ন-ভিন্ন বিন্যাসের জন্যে, নিছক মানসিক কারণে? অবশ্য সাহিত্যের কারবার চিরকালই চলেছে মানুষকে নিয়ে, ব্যক্তিস্বরূপ বা পার্সনাল্যাটিকে নিয়েই।—কিন্তু সে-মানুষ প্রায়ই হয়েছে তার জীবনযাত্রার দাসানুদাস, ব্যক্তিস্বরূপ বিড়ম্বিত হয়েছে বহিঃসমাজের চাপে, আকস্মিকতায়।

ধরা যাক্ প্রেমঘটিত ঈর্ষ্যার কথা। 'ওথেলো' নাটকের মুখ্য ভাববস্তু সম্ভবত চিরকাল নরনারীর সম্বন্ধে যন্ত্রণার উৎক্ষেপ আনবে, কিন্তু ঈর্ষ্যার যে বিশেষ চেহারা ঐ-নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে ও তাদের কর্মধারার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তা হয়ত পরিবর্তনশীল। ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে ওথেলোর মুরিশ মত্ততা, ইয়াগোর কুটিল স্বার্থপরতা, ডেস্‌ডিমনার অসহায় অবলা ধরন ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ নিতে পারে ব্যক্তিত্বের ভিন্ন প্রতিষ্ঠায়। মধ্যযুগের দিকে তাকালেই আমরা এই ভিন্নরূপের একটা আভাস পাই, দান্তের মুখে পাওলো ও ফ্রানচেস্কার অবৈধ প্রেমের যে-ভাষ্য, সে-পুরুষার্থ মধ্যযুগের ধর্মের ছকে-ফেলা সামাজিক জীবনেই শোভন। কিংবা ত্রুবাদুর কবি প্যের ভিদাল্‌কেই ধরি, বৈষ্ণব কবির মতো ত্রুবাদুর রীতিতে পরকীয়াকে উপলক্ষ ক'রে প্রেমের কাব্য-সাধনা চলিত ছিল, কাউণ্টেস্ লোবা তাই হেসেই প্যের ভিদালের কবিতা শুনতেন, ভিদালের আজগুবি খেয়ালে কাউণ্টও কখনো বিচলিত হননি। এমনকি ভিদাল্ যখন আবেগে আত্মবিস্মৃত হন, এবং লোবা নিজেই কবির বিরুদ্ধে নালিশ জানান, তখনও কাউণ্ট ব্যাপারটা হেসেই ওড়াতে চান, কারণ ত্রুবাদুর রীতিই যে প্যের ভিদালের এই আতিশয্যকে সম্ভব করেছিল। সেইরকম বলা যায় যে বিধবাবিবাহ যদি সত্যিই সমাজে স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে কি রবীন্দ্রনাথের

'চোখের বালি'র রূপ ভিন্ন হ'য়ে যাবে না? ছেলেমেয়ের কাছে ভালোবাসার দাবি বৃদ্ধ মা-বাপের মনে বরাবর থাকবে; কিন্তু কিং লিয়ারের ট্রাজেডির মধ্যে কতখানি অংশ জুড়েছে রাজত্বের ভাগবাটোয়ারা? এমনকি এড্‌মণ্ডের মধ্যেও ত জারজ সন্তানের গ্লানি এবং পৈতৃক সম্পত্তির লোভটাই সবচেয়ে উগ্র আবেগ।

সাহিত্যের অবশ্য স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝোঁকটা দীর্ঘকালের, তাই এইসব বহির্জাত কারণকে, আকস্মিক সামাজিক হেতুকে সাহিত্যিকরা বরাবরই দাবিয়ে রেখেছেন, মর্যাদা দিয়েছেন মানুষকে, ব্যক্তিকে। তাই আমাদের মনে থাকে না যে গোবিন্দলাল বা রোহিণীকে স্বাধীন মানুষ বলার চেয়ে লোভের পুতুল বলাই সঙ্গত। এই অসঙ্গতি এড়াবার জন্তেই সেকালের সাহিত্যে পৌরাণিক গল্পের মাহাত্ম্য থাকত, না-হয় থাকত প্লটের মাহাত্ম্য। প্লটের সম্মোহনে আপাতস্বাধীন মানুষও জীবনমৃত্যুর কাছে নিজেকে দিত বিকিয়ে। কিন্তু সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহাসিক বিকাশে ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল সাহিত্যের আত্মমর্যাদা। ফলে আধুনিক সাহিত্যে প্লট্ গৌণ, চরিত্র বা ব্যক্তি ও তার সঙ্গে জড়িত আবহাওয়াই মুখ্য। কিন্তু সমাজ এখনও সেই পুরনো আর্থিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই চলেছে, ফলে এই আধুনিক সাহিত্যের স্বাধীন ব্যক্তিরা এতই স্বাধীন যে তাদের বহিঃরূপ প্রায় নেই বললেই চলে, আছে শুধু তাদের মনের অন্তরঙ্গ স্বাধীনতা।

সে-স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় মনোবিজ্ঞানের অচেতন বা অবচেতনে এবং সে নিরাকার জগতে রামশ্যামকে আলাদা ক'রে চেনা শক্ত। ফলে ব্যক্তিত্বের নির্বিশেষ সন্ধানের শেষে দেখি ব্যক্তিত্বলোপ। কারণ সাহিত্যের উপজীব্য শূন্যে ঝোলানো নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব নয়। সে-ব্যাপারটা বাস্তবে টেঁকেও না, নিরালম্ব ব্যক্তিত্ব একটা abstraction এবং সাহিত্যের কাজ প্রত্যক্ষ নিয়ে, বাস্তব নিয়ে। সাহিত্যে চৈতন্যের স্রোত বা stream of consciousnees-এর চর্চায় আমরা শিখেছি অনেক কিছুই, কিন্তু সে-পরীক্ষায় আর বিকাশের পথ রুদ্ধ।

বিকাশের পথ ব্যক্তিত্বের নব-নব উন্মেষে নূতন-নূতন বিস্তারে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সে-সম্বন্ধ যাতে আকস্মিকতাদুষ্ট না-হয়, যাতে মধ্যযুগের বৃত্তিতে সীমাবদ্ধ না-হয়, যাতে একালের প্রতিযোগিতা-মূলক জীবনযাত্রায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন না-হয়, তার জন্য চাই বিজ্ঞানশুদ্ধ মনুষ্যধর্ম। যে-ধর্মে অর্থকরী বৃত্তির সুযোগ সকলের পক্ষে সমান, অবসর প্রচুর, সংস্কৃতির ক্ষেত্র বিস্তৃত, ধনী-দরিদ্রের, উন্নত-অনুন্নত জাতির ভেদ অবান্তর; মৌরসীপাট্টা জীবন-যাত্রা নয়, জীবনই সেখানে মূল্যবান। টাকা সেখানে পুরুষার্থ নয়, প্রতিটি মানুষের

ব্যক্তিস্বরূপ সেখানে চরম মর্যাদা পায়, বিজ্ঞান সেখানে জীবনের সঙ্গে একাকার। সমাজের সেই ভাবী গৌরবের দিনে শিল্পসাহিত্যেরও পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত।

হেন্‌রি জেম্‌সের উপন্যাসের ভূমিকাগুলিতে আমরা এই স্বাধীনতার অভাব ও জেম্‌সের স্বকীয় সমাধানের চমৎকার ব্যাখ্যা পাই। লেখকের স্বকীয় সুরবিস্তার কাম্য যে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমাজের পটভূমিগত জটিলতায় ও ভেদাভেদে সে-বিস্তার হয় বারংবার বিড়ম্বিত। রূপকথায় যে-স্বাধীনতা দেখি সে-কল্পনার বা রূপায়ণের মুক্তি হয় ব্যাহত। জেম্‌সের অননুকরণীয় ভাষায়:

'...Yet the fairly tale belongs mainly to either of two classes, the short and sharp and single, charged more or less with the compactness of anecdote (as to which let the familiars of our childhood, *Cinderella* and *Blue-beard* and *Hop o' My Thumb* and *Little Red Riding Hood* and many of the gems of the Brothers Grimm directly testify), or else the long and loose, the copius, the various, the endless, where dramatically speaking, roundness is quite sacrificed—sacrificed to fulness, sacrificed to exuberance, if one will; witness at hazard any one of the Arabian Nights. The charm of all these things for the distracted modern mind is in the clear field of experience, as I call it, over which we are thus led to roam. ...

'Nothing is so easy as improvisation, the running on and on of invention; it is sadly compromised, however, from the moment its stream breaks and bounds and gets into flood. ...To improvise with extreme freedom and yet at the same time without the possibility of ravage, without the hint of a flood, to keep the stream, in a word, on something like ideal terms with itself.'

এই সুরবিস্তারে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় আজকের শ্রেণীগত জীবনযাত্রার বাহ্যরূপ, মানবেতর ভেদাভেদ, অহেতুক সম্ভব-অসম্ভবের মানদণ্ড। আমাদের ভবিষ্যতের ছবি তাই অর্থনীতির পরের স্তরের মানবজীবনে খুঁজি, যেখানে জীববিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান অর্থোত্তর নিছক মানবসমাজের পুরুষার্থ নির্মাণে কর্মঠ। সেখানেই

রিল্‌কের নিঃসঙ্গতা ও জীবনের ঘনিষ্ঠতা একাধারে সম্ভব, সেখানেই প্রুস্তের স্মৃতির ইমারৎ, জয়সের ভাষার বিহার ব্যক্তিগত চেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান প্রত্যক্ষ জীবনের মুক্তিতে মনের গভীরতর সার্থকতা পায়। কাফ্‌কার মানসিক দ্বন্দ্ব সেখানে রূপকে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন মানে না।

এ-কথাটা শুধু কাব্য-উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সীমা বিস্তৃত হবে ব'লেই বলছি না। লেখকে-পাঠকে যোগ ঘনিষ্ঠ হওয়ায় লেখকের শিল্পচর্চার স্বাধীনতাও বৃদ্ধি পাবে। কণ্টেণ্টের সীমানা সেখানে জানা ব'লে শিল্পী তদ্গত হ'তে পারবে ফর্মের ধ্যানধারণায়। তাছাড়া মানতে লজ্জা নেই, বই বিক্রীর বা লেখকদের সমাদর যে ভবিষ্যতে কতখানি হ'তে পারে, সোভিয়েট ইউনিয়নে আমরা এরই মধ্যে তার কিছু দেখতে পাই এবং সে-বিষয়ে আমরা যে কিঞ্চিৎ আগ্রহান্বিত, সেটা স্বীকার্য। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা মানুষের সম্বন্ধে, ব্যক্তিস্বরূপ সম্বন্ধে আমরা পাব আরো ব্যাপক জ্ঞান, আরো গভীর অনুভবশক্তি। তাই আজ কবিরাও আপন গরজে সে দীপ্ত ভবিষ্যতের নির্মাণে মন দেয়।

পরিবর্তমান এই বিশ্বে

পরিবর্তনের সাক্ষ্য আমাদের প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতার নানা স্তরে। সে-পরিবর্তন যেমনি দ্রুত আর তেমনি জটিল ও গভীর। শিল্পসাহিত্যেও এ-অভিজ্ঞতা সক্রিয়। সেখানে বরং ব্যাপারটা আরো অসরল, কারণ শিল্পসাহিত্যের নিজস্ব স্বভাব ও ঐতিহ্যের গুণে অভিজ্ঞতা বিশেষ-বিশেষ রূপ পায়।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য এই প্রচণ্ড ব্যাপ্তির মধ্যে বিশেষ ও নির্বিশেষে একতার আভাস। বিপরীত হ'য়ে উঠেছে আত্মীয়, ঘর বাহির, পর আপন। আশ্রমবাসী মৃগসুকুমার সিম্বলিস্ট পরিণতি পাচ্ছে মার্ক্সিজমে। তাছাড়া, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের, ন্যায়বিশ্বের ঘনসন্নিবেশ। এই প্রতিবেশিত্বের দৃষ্টান্ত মেলে সদ্যোমৃত সুর্রিয়ালিজমের কাব্যচিত্রে, শোএন্‌বর্গের বা হাবার সঙ্গীতে। সিম্বলিস্ট কাব্যে, সেজানের চিত্রে ও দ্যবুসি থেকে রুসেল অবধি ফরাসি সঙ্গীতেও এই গ্রাম-সম্পর্কের আত্মীয়তা। পিকাসো যে কবিতা লেখেন ও স্ট্রাভিনস্কি যে তাঁর বন্ধু, সেটা আকস্মিক নয়, যেমন নয় তাঁর ফ্যাশিস্ট-বিদ্বেষ। এস্‌ গীডিঅন্‌ যে (*Space, Time and Architecture*-এ) সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তা যথার্থ। যদি কারো শুধু আধুনিক সঙ্গীত ভালো লাগে অথচ আধুনিক কাব্য বা চিত্র অসহ্য মনে হয়, তাহ'লে তাঁর সততায় বা তাঁর স্বভাবের সমগ্রতায় সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

মার্ক্স থেকে বিকশিত সমগ্রতার পটেই কি বার্টকের হার্‌মনির সুরেলা এবং দেশজ ছন্দে বিস্তৃত আধুনিকতা সুবোধ্য নয়? ব্লখ্‌ বা ওঅল্টনের বেলায় এই কথাই কি ভিন্নভাবে প্রযোজ্য নয়? চিত্রে কিউবিজমের মতো সঙ্গীতে জ্যাজ্‌, পরিপ্রেক্ষিতের অচলায়তন ভেঙেছে ব'লেই কি রয় হ্যারিস্‌ বা কিছু সোভিয়েট সঙ্গীতের বর্তুল শব্দলহরীর তীব্র ঐক্যতান? আইসেন্‌স্টাইনের আশ্চর্য শিল্পতত্ত্বের বই (*The Film Sense*) থেকে একটি উদ্ধৃতি হয়ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না: 'Modern esthetics is built upon the disunion of elements, heightening the contrast of each other : repetition of identical elements, which serves to strengthen the intensity of contrast. ··· Repetition may well perform two functions. One function is to facilitate the creation of an organic whole. Another

function of repetition is to serve as a means of developing that mounting intensity. ...'

বৈজ্ঞানিকও এ-অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সমর্থন করেন। গেস্টাণ্ট ও আইডেটিক্স মনোবিজ্ঞান পদার্থবিদের সুরে তাল মিলিয়ে বলে যে সমগ্র অংশগুলির যোগফল মাত্র নয়। কারণ process বা পরিণতির যোগফলে নয়, সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ ক্ষেপেই অর্থের উদ্ভাস। আধুনিক বিজ্ঞানের সাধারণ তাৎপর্য ঐখানেই।

আর বিজ্ঞানের আধুনিকতা শুধু নব্যতা নয়। প্রকৃতি ও মানুষের ব্যাপক ও সূক্ষ্ম যে-জ্ঞান গত তিরিশ বছরে অর্জিত, সারা ইতিহাসের জ্ঞানসংগ্রহের চেয়ে পরিমাণ তার বেশি। কিন্তু এই বৃহত্তর জ্ঞানের উপলব্ধি সমাজে কমেছে আর তার প্রয়োগ হয়েছে দুষ্ট। শুধু বিজ্ঞান আজকাল জটিলতর ব'লে নয়, বিজ্ঞান আজ পেশা হয়েছে ব'লেও। বোঝাই যাদের পেশা, বুঝুক তারাই, বিজ্ঞান ত আজ প্রায় পণ্যদ্রব্য। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগে জগচ্চিত্র দেখতে ও গড়তে যদি হয়, তাহ'লে কপালে আছে গত আট-দশ বছরের মতো অনেক দুঃখ, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, প্রতিষেধ্য রোগে মৃত্যু, নানা বঞ্চনা।

দ্রুত পরিবর্তনে উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্বে তাল কেটেছে বস্তুর নব-নব উন্নতি আর সমাজমনের মধ্যেও। যারা বোঝে না এই পরিবর্তনের তাৎপর্য, তারাই সাজে হর্তাকর্তা। বিজ্ঞান বা অর্থনীতি নয়, বহু দেশেই কর্তৃত্বের চাবি শুধু বর্ধিষ্ণু ও বৃদ্ধের হাতে। ফ্যাশিস্ট দেশে এঁদেরই অল্পবয়স্ক জ্ঞাতিকুটুম্বরা জ্ঞানের তোয়াক্কা না-রাখলেও তার ব্যবহারে তৎপর, সৃষ্টির ব্যবহারে নয়, ধ্বংসের কলাকৌশলে।

শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে এই। বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে সম্ভব আজ সকলের হাতে খাদ্য দেওয়া আর সম্ভব কাজ, ভবিষ্যৎ ভরসা, স্বাধীনতা। কিন্তু পাতে শুধু পড়ছে নানা দুর্ভোগ, রক্তপাত, অনাহার আর অত্যাচার। বিজ্ঞানের সাহায্যে ঠিক বাস্তবে কতখানি পরিবর্তন সম্ভব তার বোধ যত বিস্তার পাবে, বর্তমানে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে তত বেশি, কপালফেরের ক্ষমতা ও ইচ্ছা বৃদ্ধি পাবে।

ব্যর্নালের মতে বিজ্ঞানের বিদ্যালয়প্রচলিত চিত্রটির স্থান বৈজ্ঞানিকের যাদুঘরে। নিরালম্ব শূন্যে সত্যের সাধনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জানে রজ্জুভ্রম।

তবু দ্রুতগতির জন্য দুর্বোধ্যতার অভিযোগ মানতে হয়। বিংশ শতাব্দীর বিকাশের মাত্রায় অষ্টাদশ অতিবিলম্বিত। ধরা যাক্, কোয়াণ্টামতত্ত্ব, যাতে অণু ও অণুকণার গঠন ও প্রক্রিয়ার ধরন বোঝা যায়। তার ফলে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের জাতিভেদ ঘুচে গেছে। জীবরসায়নের আরম্ভে আরেক পরিবর্তন

নিহিত, প্রাণবন্ত সবকিছুর রাসায়নিক ভিত্তি ; ক্রোমসোমে উত্তরাধিকারের জড়গত অস্তিত্ব ; তারপরে আছে জন্তু ও মানুষের আচারের বিজ্ঞান, যার জন্য শক্তিমদ-গর্বিত পরাবিদ্যার শেষ তুরুপ—মনের স্বাধীন বিভাগও আজ অচল।

বিজ্ঞানের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন আমূল ও দ্রুত পরিবর্তন আগে কখনো দেখা যায়নি। অবশ্যই শরীর ও মনের বিচ্ছিন্নতা আজ অস্বীকৃত। তাই প্রয়োজন হয়েছে পরিবর্তিত মানস, গ্রীক আমলের দীর্ঘ দায়ভাগ পিছনে ফেলে। প্রাচীন বৈয়াকরণিক ন্যায়ের status quo-তে আপেক্ষিকতা বা কোয়ান্টমতত্ত্ব পাগলের প্রলাপ, কিন্তু অণুকণা আর নক্ষত্রবিশ্বসমূহের আচার-ব্যবহার দেখতে গেলে এরাই সত্য। এইখানেই আধুনিক বিজ্ঞানে ও শিল্পসাহিত্যে মিল, স্থূলযুক্তির ব্যাকরণে এঁরা বিশ্বের চিত্র মনগড়া করেন না। সরলতা নয়, সততাই লক্ষ্য।

আরেকটা অগ্রগতির চিহ্ন নানা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। জীবন্ত কি মৃত যে-কোন ব্যবস্থাধারায় সমগ্রের মধ্যে এমন সব বিশেষত্ব ফোটে যা স্বতন্ত্রভাবে অংশবিশেষে প্রকাশিত নয়। এক স্তরে যা আকস্মিক ঘটনা মনে হয়, আরেক স্তরে তাই সংখ্যা-বিজ্ঞানের নিয়মে স্বয়ম্প্রকাশ। নিউটনীয় বিজ্ঞানের অসংলগ্নতা ও স্বাধীনতার অতিমাত্রা আজকাল গোষ্ঠিগত যৌথ ঘটনাবলির পর্যালোচনায় রূপান্তরিত। মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের চিন্তাধারা এই বিকাশের পথ দেখিয়েছিল, শতাব্দী পরে তার উপলব্ধি হচ্ছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ আজ কাছাকাছি এসে মিলছে। বিজ্ঞানের বিলিব্যবস্থায় তাই নতুন সমস্যা, নতুন যোগাযোগের প্রশ্ন। বিশেষজ্ঞের স্বাতন্ত্র্য ভেঙে যাচ্ছে সম্মিলিত চেষ্টার প্রয়োজনে। ফলে বিজ্ঞানের বাইরের জগতে নির্ভর করতে হচ্ছে বেশি। বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা আজ লক্ষ লক্ষ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎপাদনশিল্পে বিজ্ঞানকর্মীর প্রয়োগ ব্যাপক ও গভীর। টাকাও আসে ইণ্ডাস্ট্রি থেকে য়ুনির্ভাসিটির চেয়ে ঢের বেশি। তবু কেন বিজ্ঞান জনগণমন-অধিনায়ক দুঃখত্রাতার আসনে নেই? থাকা উচিত, সে-কথা পুরনো, কিন্তু তবু চিঁড়ে ভেজেনি। কারণটা নগণ্য নয়, এবং আজও অতিকায় জন্তুর মতো কারণটা বর্তমান আমাদের মানবসমাজে। এটা বুঝলেই তবে এটা দূর করা সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিকও তাই আজ সমাজকে বোঝায় মন দিচ্ছে, কেন সমাজকে উন্নত করায় শক্তিশালীর আপত্তি। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও সাহিত্যিকদের বা রাজনীতিকদের মতো নানান ঝোঁক। একদল ঘাড় ফিরিয়ে চান সেকালকে, ধর্ম, দেশাচার, পারিবারিক পরমার্থ। নাৎসিরা এই কথা স্বজ্ঞানে বলত, অসহায় পেত্যাঁর মুখে এর প্রতিধ্বনি শোনা যেত, ইংলণ্ডে আমেরিকায় ভারতবর্ষে কণ্ঠের চাষ ক'রে

যাঁরা খান, তাঁরা এ-কথা প্রায়ই ব'লে থাকেন। কিন্তু আত্মসম্পূর্ণ চাষীদের খণ্ড-খণ্ড গণ্ডগ্রামের সামাজিক ভঙ্গি আজ কোন যুক্তিতেই মানায় না।

বৈজ্ঞানিক আরেক দল, বলা যায়, উদারনীতিক ছুঁৎমার্গে বিশ্বাস করেন। এঁরা একাকিত্বের শুদ্ধতায়, নিরালম্ব সত্যে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানের ঐতিহ্যের গায়ে তার সামাজিক উৎসের গন্ধ আজও ধুয়ে যায়নি। ক্যাপিট্যালিজমের একক ব্যক্তি-মাহাত্ম্য এবং বুদ্ধির স্বাধীন খেলা তাই এখানেও তার প্রভাব রেখেছে। এই যুদ্ধের সর্বজাতিব্যাপী প্রস্তুতিতে অবশ্য লিবরাল এ-বিজ্ঞানমূর্তিটি ভেঙেছে। যুদ্ধকালীন এই প্রসার শান্তির মহত্তর প্রস্তুতিতে চলবে এবং তাতে বৈজ্ঞানিকের খাঁটি জ্ঞানচরিত্র নষ্ট হবে না, এটা কি দুরাশা? সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশ বছর ধ'রে ত এ-আশা দেখা গেছে বাস্তবে সফল।

অবশ্য জীবনযাত্রায় যে-দল নেতৃস্থানীয়, সেই নেতৃত্ব বিজ্ঞানের কর্মধারাও প্রচ্ছন্নভাবে নির্দেশ করে। সমুদ্রযাত্রী ব্যবসায়ীর যুগ সপ্তদশ শতকে তাই বিজ্ঞানে মাথা ঘামিয়েছিল দিগ্দর্শন ও বন্দুক জড়িত বিষয়ে। অষ্টাদশের শেষে কল-কারখানার ইশারায় হ'ল রসায়নের চর্চা ও তাপমানের সাধনা। উনবিংশে এল বিদ্যুৎশক্তির নেতৃত্ব। আজ শুধু একটা নতুন পুরুষার্থ এসেছে, অজ্ঞান নেতৃত্ব আজ স্বজ্ঞানে ব্যবহার্য।

বিজ্ঞানের জড়বাদে আর মন ও বস্তুজগৎ, রস ও রূপ, ম্যাটার ও ফর্মের আত্মাচেতন দ্বিধা নেই। নীডহ্যাম্ বলেছেন ভালো: গ্রীকরা, বিশেষত আরিস্টটল সবকিছুই দেখতেন গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ শিল্পের ভাষায়। ভাস্কর্যে প্রতিভাত হ'ত একপক্ষে বস্তু, শৃঙ্খলাহীন, নিরাকার মর্মর পাথর কি মাটি; অন্যপক্ষে রূপ, আকার। সুন্দর পুরুষ কি মেয়ের রূপ, যা শিল্পীর মন থেকে আনতে হয় বর্বর পাথরের মধ্যে প্রচণ্ড প্রহারের ঘায়ে। রূপকার তাই রূপবস্তুর চেয়ে মূল্যবান, প্রায় স্বয়ম্ভূ। ভারতীয় শিল্পকলাতেও ভাস্কর্যের উৎকর্ষ আর ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রেও তাই প্রেরণা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ আর শুদ্ধ রূপ acrhetype বা form দৈবত, অলিম্পীয় বা কৈলাসভাবনা। টমিস্ট দর্শনেও দেবদূতরা এ-কাজের ভার নেন। ভাববাদীর সমস্যার আরম্ভ এখানেই। ক্রোচের ভাববাদী অপিচ প্রশংসনীয় দ্বিধা-সন্ধির চেষ্টা আংশিক সমাধান হ'লেও আধুনিক—ব্রাঁকুসি বা হেনরি মূরের শিল্পে এ-সমস্যা নেই, আকার ও বস্তু সেখানে দ্বৈতাদ্বৈত।

কিন্তু গ্রীকদের এই রূপবিলাসে হয়েছিল জীববিদ্যার লাভ। চোখের সাহায্যে তারা এনেছিল শ্রেণীকরণের ক্ষমতা যদিও ব্যাখ্যা হয়ত প্রায় হ'ত ভ্রান্ত। ১৬৪০-

এর আগে অবধি আরিস্টটলের ব্যাখ্যাই য়ুরোপে চলত—গর্ভস্থ ভ্রূণের বিকাশ নাকি প্রায় মর্মরমূর্তিরই পরিণতি, বস্তু হচ্ছে রক্ত, রূপায়ণ পৈতৃক বীজকল্প। কিন্তু আপনার শরীর ত হর্মিস্-মূর্তি নয়, আমার হাতটা যেমন পেন্সিলের কাঠ নয়। জীবন্ত শরীর চরম ব্যাখ্যায় ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের সমষ্টি নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার গঠন ও প্রাণব্যবস্থার কলাকৌশল ফাইডিঅস্ মূর্তির চেয়ে অনেক বেশি জটিল ও গভীর। তাছাড়া বড়ো কথা হচ্ছে, জীবশরীরে তথা আধুনিক নন্দনতত্ত্বে রূপ ও রস, বস্তু ও আকার অঙ্গাঙ্গী।

জ্ঞান যেন তিনমহলা বাড়ি, বাইরে দেখা যায় স্থূল চেনা রূপগুলি—মানুষে-বাঁদরে, বাঘে-গরুতে যেখানে মিল নেই। তারপর এই চর্মচক্ষেই দ্রষ্টব্য চর্মতলস্থ, চেরা যায় এমনসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। জীবাণুবীক্ষণযন্ত্রের মহলে আবার নতুন জগৎ, কোটি কোটি প্রাণবল্লী কোষ, যারা সমগ্রের বাইরেও খণ্ডজীবনের শক্তিধর। ফর্মের দিকে এই কোষের তলার কোঠায় যে-মেদবর্তকণা, তার সন্ধানের দাম কম হ'লেও, কোষচক্রের অন্তরঙ্গ ক্রোমসোমে দায়ভাগবহ উত্তরাধিকার নগণ্য নয়। এই অণুগোষ্ঠীর জীবনে চলে অণুদের সঙ্গীত, ছোটোখাটো সৌরমণ্ডলের মতো তানমানলয়িত সঙ্গীত বললেই হয়। প্রোটন-ইলেক্‌ট্রনদের যেন সেখানে গ্রহকক্ষ-বিহার চলে।

আবিষ্কারটা মৌল। ১৯১৭-১৮ সাল অবধি লোকে বলত এই রাসায়নিক তত্ত্বটি কল্পনা। হার্ডি ও ল্যাংমিউরের একাণুগোষ্ঠি ফিল্মে এ-তত্ত্ব প্রমাণ হ'ল প্রত্যক্ষে। দীর্ঘ হাইড্রোকার্বন রেখা দেখা গেল সত্যই দীর্ঘ; জলের উপরে অম্লের মেদ-শৃঙ্খল সত্যই আটকে থাকে, এদিকে তার অম্লভাগ জলের তলায় মিলিয়ে যায়। কৌটা-মার্কা অণুগোষ্ঠীর কৌটাবৎই ধরনধারণ। এ-সব তথ্য প্রবল সমর্থন পেল ইউঅল্ড ও ব্র্যাগদের এক্স-রে প্রয়োগে, যখন অণুশৃঙ্খলার ছকের বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল। সুতরাং রূপ আজও রয়েছে। আণবিক স্তরে কিন্তু এই রূপ আর ব্যবস্থামাত্রা অভিন্নপরিচয়। যে-আবেগেই হোক্ এ-মাত্রাবৃত্তে ঘূর্ণায়মান অণুদলগুলি গোষ্ঠি বাঁধে এক আপাতস্থূল রূপে। পদার্থবিদেরা বলেন এই পরমাণুগুলি মুখ্যত বিদ্যুৎ-তাড়না। অর্থাৎ স্থূলবস্তুরূপ আসলে শক্তিস্রোতপুঞ্জেরই প্রকাশ। ম্যাটাব আজও বাস্তব, কিন্তু ম্যাটার ও ফর্ম আজ আর আলাদা করা যায় না। ফর্ম আজ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থারই নামান্তর, আর বস্তু আজ শক্তিপুঞ্জ, গতিশীল সম্বন্ধের রূপ।

আরেকটা মূল কথা হচ্ছে, বড়ো আর ছোটো। অণুগোষ্ঠীর প্রতিবেশিত্ব।

প্রোটিন-অণুগুলি বৃহৎ, যেমন হাইড্রোজেন অণুকণা সবচেয়ে ছোটো। প্রোটিনের রাসায়নিক কাঠামোতে জীবদেহ তৈরি আর এই প্রোটিনে দেখা যায় যে কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন অণুরা মেরুদণ্ড এবং পাশের সারিতে পাঁজরার মতো কার্বন নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন। গত কুড়ি বছরে উদ্ভিদ জন্তু ও মানুষের দেহে সংক্রামক রোগের সন্ধানে পাওয়া গেল এই ব্যাক্‌টিরিয়ার চেয়েও ছোটো জীবাণুবীক্ষণেরও অদৃশ্য ভাইরস্—যথা হামরোগের সংক্রামবহ অণু। এই জীবন্ত রোগাণু প্রোটিনের বিচ্ছিন্ন মৃত অণুর চেয়ে ছোটো, সুতরাং তাদের গঠনব্যবস্থা নিশ্চয়ই জীবদেহের পক্ষে অভাবিতভাবে সরল। বস্তু ও রূপ, জীবন ও মৃত্যুর এখানে সীমানা মুছে যায়। ভাইরস্-অণুর পা নেই বটে, কিন্তু বহু ব্যাক্‌টিরিয়া ও উদ্ভিদেরও নেই। হয়ত ভাইরসের শ্বাস নেই, কিন্তু বহু বীজ ও জীবাণুর শ্বাসক্রিয়া নগণ্য। অন্তত জীবনের তৃতীয় লক্ষণটি ভাইরসে প্রবল পরাক্রান্ত—প্রজনন। এই জীবন-মৃত্যুর সীমান্তের কনিষ্ঠ জীবদের একমাত্র ইলেক্‌ট্রনাণুবীক্ষণেই দেখা যায়।

এখানে আরেক বিস্ময়। সচরাচর অণুরা গোলাকারে ভিড় ক'রে কেলাসিত হয়, কিন্তু এই ভাইরস্-অণুদের চেহারা লাঠির মতো। এদের ভিড়ের পরিণামও বিস্ময়কর—তরল কেলাস liquid crystals. অর্থাৎ এরা তিন ডাইমেন্‌শন্সের বা আকারের নয়, এক কি দুই দিকে কঠিন। টিপে ধরলে ভেঙে যায় না, এলোমেলা এক ব্যবস্থায় আবার দানা বাঁধে। ডিমের ব্যাপারটাই ধরা যাক্, ডিমটা উল্‌টিয়ে-পাল্‌টিয়ে নেড়ে দিলেও আবার তার আভ্যন্তরীণ আণবিক ব্যবস্থার সাম্য ফিরে আসে এবং সেই যথাকালে বাচ্চা ফোটে। কোথায় এই ব্যবস্থাপক বা নিয়ন্ত্রক, এই সমাজকর্তা? সে-প্রশ্ন মুলতুবি রেখে ভিন্ন-ভিন্ন কিন্তু এক কার্বন অণুর কাণ্ড দেখা যাক্। জীবদেহে প্রবেশান্তে মার্কামারা এই অণুদের বিচরণ লক্ষ করা সম্ভব। যাতায়াত বলা যেতে পারে। মৃত বিচ্ছিন্ন প্রোটিনে নয়, মস্তিষ্কের বা পেশীর জীবন্ত প্রোটিনে ফস্‌ফোরাস্ বা নাইট্রোজেন অণু ঢুকে পড়তে পারে, বেরোতে পারে, শরীরের ভারসাম্য তাতে অবিচলিত থাকে। এরকম যৌথবৃত্তিতে, অণুস্তরে হ'লেও, নীডহ্যামের মতে সমাজের ভারসাম্যের ছকে ব্যক্তির স্বেচ্ছা-সেবার কথা মনে পড়ে।

প্রোটন, ইলেকট্রন, অণু, অণুগোষ্ঠী, তার থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণকণা, কোষ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তারপরে সারা শরীর জন্তু বা মানুষ। নীডহ্যামের প্রশ্ন, ততঃ কিম্? নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থা এখানেই থামবে কেন? মনের প্রতিবেশী ভাগগুলি সমাজের

যৌথ আঙ্গিক, পরিবার থেকে মানবসমাজের বিশ্বব্যাপী ঐক্যের অমোঘ গতিও ত জীবনযাত্রার শক্তির নিয়ন্ত্রণে দেশকাল-সন্ততিতে বিস্তৃত। অবশ্যই শুধু দেশ নয়, কারণ স্থানপাত্রের বিকাশ কালের বিবর্তনেই।

পণ্ডিত বলতে পারেন, প্রগতির এ-ছবি থার্মোডাইন্যামিক্সের দ্বিতীয় বিধিতে টেঁকে না। জীববিদ্যার জগৎ স্বতন্ত্র, এ-দ্বন্দ্ব তাই ভাববাদীর চিন্তার বিশৃঙ্খলা। তাই থার্মোডাইন্যামিক মত যে বিশ্বে ক্রমিক ব্যবস্থা কমছে, এ-তত্ত্বে জীবনের প্রগতি বাতিল হয় না। তাছাড়া এই পদার্থবিদের "অব্যবস্থা" নীডহ্যামের মতে মিশ্রতা বা ছকের মধ্যে "অব্যবস্থা", প্রায় সোভিয়েট ইউনিঅনে প্রাদেশিক স্বাধীনতার মতো, বা সুস্থ সমাজের স্বচ্ছল স্বাধীন ব্যক্তির মতো। তাই তিনি বলেছেন, মানুষের রাখীবন্ধনে যত বড়ো বাধাই আসুক কূটনীতি আর মহাযুদ্ধ, স্থিরপ্রজ্ঞ সাম্যবাদী তবু হত্যার আগে গ্যালিলিওর মতো বলতে পারে "তবুও পৃথিবী চলেছে"। From each according to his capacities, to each according to his need—এ-আর্যসত্যের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য।

বিজ্ঞানই সে-কাজে স্থপতি। মানুষ আজ আর বস্তুমাত্র নয়, ইটের মতো মানুষ দেহমনে একটি বিকাশের জীবন্ত যন্ত্র, মানুষে-মানুষে মৌলমিল, সমাজেরও নিয়ন্ত্রিত জীববৎ গতি ইত্যাদি কথা বিজ্ঞানের মোটা তথ্য। পেক্‌হ্যাম্ এক্স-পেরিমেণ্টের বিস্তৃত সমর্থন এ-তথ্যের পিছনে। উত্তরাধিকার বা বংশধর্ম আজ একদিকে দেহমনের অভেদ্য বন্ধন ও সমাজের সন্ততি প্রমাণ করে, তেমনি সেকেলে যান্ত্রিক অদৃষ্টবাদও উড়িয়ে দেয়। কারণ মেণ্ডেলের তত্ত্বে বলে—জন্তুর স্বভাবের মর্মে আছে অলাদা-আলাদা কয়েকটি স্বতন্ত্র বংশগত বিশেষত্ব, যেমন পদার্থবিদেরা বলেন যে ভিন্ন-ভিন্ন অণুতে মিলে একটি সন্তত বস্তু। ওয়াডিংটন একে বলেছেন, মিক্‌শ্চার নয়, ককটেল। ফলে হঠাৎ-হঠাৎ আমরা বিভিন্ন বিশেষত্ব দেখি দুই ভাইয়ের মধ্যে আর অবাক্ হই। কৃষিবিদ্বান্ তাই ফসলের বিশেষত্বগুলি ছাড়িয়ে-ছাড়িয়ে মেলান নিজের পছন্দসই ফসলের বীজপ্রস্তুতকার্যে। মর্গ্যান্ দেখান যে, এই জীবদায়ভাগ আস্তানা গড়ে সূতার মতো এক বসতিতে যার নাম ক্রোমসোম। এইখানেই জীবদেহের স্বভাবে ঐক্য। জীবদৈহিক বিবর্তনের আলোচনায় এই ঐক্য বা সমগ্রতা স্পষ্ট হয়, যেমন আধুনিক মনস্তত্ত্বে মনের বিকাশের নিরীক্ষণ থেকে ব্যক্তিস্বরূপের ঐক্য বা সমগ্রতা প্রতিভাত হ'ল। আধুনিক জীববিজ্ঞানের এই আপাতদ্বন্দ্ব প্রথমে অনেককে বিমূঢ় করেছিল। ১৯১৮ সালে সেমান্ আবিষ্কার করলেন যে নিউটের আস্ত কাঁচা ডিমে একটা

অংশ থাকে যেটা বাকিটার বিকাশ চালিত করে। এর নাম হ'ল 'আদিম নিয়ন্ত্রক'। একটা ডিম থেকে এই ব্যবস্থাপকটিকে কেটে আরেক ডিমে যথাস্থানে —ভাবী উদরের অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় ডিমটি দু-জন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম আরম্ভ করে এবং ডিমটিতে দুটি ভ্রূণ গজায়। ওয়াডিংটন এ-পরীক্ষা মুরগী ও খরগোসের উপর ক'রে সফল হয়েছিলেন। জর্মানি ও আমেরিকায় মাছের উপরেও এ-পরীক্ষা করা হয়।

এই নিয়ন্ত্রণকর্তার পরিচালনার কাজ হচ্ছে ভিন্ন-ভিন্ন ধারার মধ্যে ভারসাম্য আনা। ইনি একাই আমাদের শিরদাঁড়া আর মগজ তৈরি করেন না, এঁর কাজ হচ্ছে স্থপতির মতো, নানা মিস্ত্রীর কাজের মধ্যে এঁর কাজ সোভিয়েট নির্মাণে কমিউনিস্ট পার্টির মতো। একটা প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে evocator। এই ব্যঞ্জনাকার শিল্পীটি নিয়ন্ত্রণকর্তার আদেশে বেরিয়ে পড়েন পাশের কোষাবলিতে এবং ফলে তৈরি হয় স্নায়ুকোষ। এইসব প্রক্রিয়াগুলি পারস্পরিক। জন্মের ৮$\frac{১}{২}$ মাস আগে আপনার নিয়ন্ত্রণকর্তা যদি এই জাগানিয়া জিনিসটির $\frac{৩}{১০০০০০০০}$ ভাগ আউন্স না-ছড়াতেন, তাহ'লে আপনার মস্তিস্ক গজাত না, হে বঙ্কিমযুগের পাঠক!

কিন্তু ঐ-দ্বন্দ্ব? দ্বন্দ্ব থাকছে না, কারণ ভিন্ন ও এক স্রোতধারা, বা ধারাগুলি মিশছে মিলছে ছড়াচ্ছে, দ্বন্দ্বাত্মক তাদের ঐক্য। চেয়ার টেবিল নয়, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের তরঙ্গে এর উপমা। স্টেশনের ওয়েটিংরুম নয়, আমাদের বিষয় হচ্ছে সারা ট্রেনযাত্রাটাই, বহু স্টেশনের যতিতে একটি progress বা প্রগতি। বদ্‌রাগী আর দয়ালু দুই-ই কী ক'রে এক ব্যক্তির পক্ষে হওয়া একসঙ্গে সম্ভব, তার জবাব এখানে। ঐ-রাগ ও দয়া মনের দুটো গতি যার ঐক্য—ধরা যাক্, রাসবিহারী ঘোষের ব্যক্তিস্বরূপের সমগ্রে। বিজ্ঞানের এই সত্তার—স্থাবরতা নয়, গতি বা বিকাশের মনোভাব আমাদের জীবনে ধীরে-ধীরে ছড়াচ্ছে। তাই আমরা এখন ব্যবসায়ী বলতে বিরলা বা টাটার কথা ভাবি না, শ্রমিকশ্রেণী বলতে একজন শ্রমিক নয়, সারা শ্রেণীর কথা ভাবি—কারণ যে-গতিস্রোত আমাদের চোখে ভাসছে, তাকে বলা যায় শ্রেণীসংঘর্ষের ধারা। এই যে, বস্তু নয়, তার বিকাশপদ্ধতি, তার গতির উপরে ঝোঁক, এ-ঝোঁক আধুনিক শিল্পসাহিত্যেও দ্রষ্টব্য। রিপ্রেসেণ্টেশনের সুবোধ্য সুবিধাবাদ সত্ত্বেও আমরা আজ অভিজ্ঞতার গতিশীল যাথার্থ্যই খুঁজি। তাই কবিতায় গল্প থাকে না, ছবিতে থাকে না বহির্বস্তুর যথাযথ নকল। আর বিজ্ঞানে বিশ্বের ছবির কারবার একেবারে উঠে গেছে।

আমাদের এই মাত্র দুশো কোটি বছরের পরিবর্তমান বিশ্ব। বিরাট তার দেশকালের পটভূমি, যেখানে নাকি আমাদের ছায়াপথ বা Milky Way— একবার পাশ ফিরে ঘুরতে পারে ৩০০,০০০,০০০ বছরে, যেখানে নাকি সেকেণ্ডে বারো মাইল ক'রে আমরা, মাটির এনটিউস্‌-রা সূর্যসহ ঝাঁপিয়ে চলেছি হারকিউলিস্‌ পুঞ্জের দিকে। ক্রোথর্‌ এ-বিরাটের পরিমাণ-বিষয়ে উপমা দিয়েছেন ভালো, রেলপথের মধ্যে স্টেশন প্লাটফর্মে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, মেল্‌ ট্রেন গেল ছুটে। এঞ্জিনের তীক্ষ্ণস্বর কেন ভিন্ন-ভিন্ন আওয়াজ ব'য়ে আনে? অতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের স্বর জোরালো হয় যত কাছে আসে, সামনে দিয়ে যখন চ'লে যায়, তখন তীক্ষ্ণতা থেমে যেন গলা ভেঙে যায়। এঞ্জিন্‌ যদি দাঁড়িয়ে থাকত, বায়ুতরঙ্গ তাহ'লে কানে ভেঙে পড়ত সমান আবৃত্তিসংখ্যায়। এঞ্জিন্‌ যদি চলে, তাহ'লে শব্দের বেগ স্থির পরিমিত ব'লে তরঙ্গগুলির পারম্পর্য হয় দ্রুততর বা ফাঁকটা হয় ছোটো, ফলে বেশি ঢেউ একই সময়ে কানের পারে আছড়ায়। স্বরগ্রাম তাতে চড়া শোনায়। স্বরের মাত্রা এঞ্জিনের বেগের মাত্রার সঙ্গে সংলগ্ন। মজা হচ্ছে নিশ্চল এঞ্জিনের স্বর যদি মাপা থাকে, তাহ'লে আর চলন্ত এঞ্জিনের বেগ জানতে আমাদের এঞ্জিনে চেপে বসতে হয় না, ঐ-স্বরের মাত্রাতেই এঞ্জিনের বেগ জানা যায়। এতে এঞ্জিনের দূরত্বের হিসাব নিষ্প্রয়োজন।

শব্দের মতো আলোর বেলাতেও এই হিসাব চলে। চোখের রংধরা যন্ত্রে আলোর তরঙ্গক্ষেপে রংবাহার খেলে, লাল, কম্‌লা, হল্‌দে, সবুজ, নীল থেকে বেগনি। নিশ্চল সবুজ আলো কাছে চললে নীল, দূরে চললে হল্‌দে লাগে। এই থেকে গ্রহনক্ষত্রের আলোক-বেগ—কারা আমাদের দিকে, কারা আমাদের দিকে পিছন ফিরে, পরিমেয়। আলোর বেগ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল, এর চেয়ে ক্ষিপ্র কিছু বিশ্বে নেই। আর ফিজো দেখান যে, আলোর বেগ একই থাকে, তা সে-বায়ুস্তর স্থির বা অস্থির যাই হোক্‌-না কেন। মাইকেল্‌সন্‌ এবং মর্‌লির পরীক্ষাতেও জানা যায় মর্ত্যচর আলোর যাতায়াত মর্ত্যের আপন বেগের প্রভাবের বাইরে। আলোই এ অস্থির ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মকৈবল্যের অধিকারী। (আমার নামটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু বোধহয় এলেন্‌ নামক এক ক্যানেডিয়ান্‌ অধ্যাপকের ছড়াটা এখানে উদ্ধৃতি করছি :

There was a young lady named Bright
Who walked faster than light.
She started one day

In the relative way,
And came back the previous night.)

আইন্‌স্টাইন্‌ এরপরে এসে দেশকালের সমস্যার উদ্যত শিংদুটো ধরলেন আর দার্শনিক-ষাঁড়টি জব্দ, দেশকালের দ্বিধা একই ষাঁড়ের দুটো শিং। দেশ ও কাল তথা জড়বস্তু ও তড়িৎশক্তি। বস্তুপুঞ্জ বেগের আবেগে জ্ব'লে ওঠে আলোকসত্তায়। বেগের উপরেই নির্ভর করে জড়বস্তুর আকার, যতই জোরে চলা ততই ওজনে বৃদ্ধি আর আকারে হ্রাস। আর এই আলোর তরঙ্গ যেন এই বস্তুপিণ্ডের পিঠে চাপ দিয়ে আকাশকে ক'রে দিলে অর্ধচক্র। যামিনী রায়ের ছবিতে যেমন, বিশ্বেও তেমনি সরল রেখা নয়, জ্যাবদ্ধ বক্রটানের চলতি।

তারপরে বর্ণবীক্ষণযন্ত্রের এবং বর্ণবেগমাপের যন্ত্র। স্পন্দমান অণুর আবেগ লেবরেটরিতে যে-মাত্রায় চলে, সেই মাত্রাই আমাদের সূর্যে আর দূরদেশের নক্ষত্র-পুঞ্জেও সেই এই একই মাত্রা, প্রথম যন্ত্রটি তা প্রমাণ করে। বর্ণস্পিডোমিটরে জানা যায় নেবুলাদের ধরনধারণ। নেবুলা হচ্ছে দু-রকম, এক দীপ্যমান বাষ্পের পিণ্ডসমষ্টি, আরেকটি কোটি নক্ষত্রের স্বাধীন সংঘ। আমাদের কাব্যের চেনা ছায়াপথ প্রথম শ্রেণীর এক নাক্ষত্রিকপুঞ্জ, আর ঐ স্বাধীন সংঘগুলি আরো দূরে। ঐ দ্বৈপায়ন বিশ্বগুলির দূর নক্ষত্র প্রায় সনাক্ত করাই যায় না, তবু চেনা নক্ষত্রের মতোই তাদের আলোকক্ষেপের ভঙ্গীতে বোঝা যায় যে, ওরা কোটি কোটি নক্ষত্র দীপাবলির শোভাযাত্রা। এদের মধ্যে নিকটতম তারার ঝাঁক হচ্ছেন আণ্ড্রোমিডা। এই বিরাট অশ্রুমতী অগ্নিশিখাও পরিমেয় এবং জানা যায় ইনি সেকেণ্ডে বিশ মাইল বেগে মর্ত্যের আমাদের দিকে আসছেন। অভিসার বলা যায়, কারণ তাঁর সহচরীরা দূর থেকে দূরান্তরে চ'লে যাচ্ছেন।

কিন্তু আলোর যাত্রার মাত্রা কি? প্রদীপের দূরত্ব জানা যায় সহজে; কারণ আলোর তেজ কমে দূরত্বের বর্গ অনুসারে। নক্ষত্ররাশির আলোর ধরন দু-রকমে জানা যায়, কোন-কোন ক্ষেত্রে ঘূর্ণায়মান সঙ্গীর ছায়ায় নিয়মিত গ্রহণ লাগে। কোন-কোন নক্ষত্রের বিচ্ছুরণ ছন্দিত স্পন্দনে। সেফাই-তে প্রথমে দৃষ্ট ব'লেই এই শ্রেণীর নাম হয়েছে সেফাইড্‌, এ-দলে বিখ্যাত আমাদের ধ্রুবতারা এবং এর ছন্দের বৃত্ত চারদিক ঘিরে চলে। সাহিত্যের ধ্রুবতারায় প্রেমাবেগ দেখছি নিছক ধ্রুব নয়, যদিও এই ছন্দোগত ওঠাপড়া আপাতনগণ্য।

ম্যাজেলানি তারকা-মেঘে শ্রীমতী লীভিট্‌ দেখেন এক ব্যাপার। সেটা হচ্ছে এই কোটি কোটি প্রায় সমদূর পুঞ্জের নক্ষত্রদের স্পন্দনকাল ও সূর্যশক্তির মধ্যে

স্পষ্ট একটা অনুপাত। দশদিনব্যাপী উত্থান-পতন যে-নক্ষত্রের ছন্দে, সে আমাদের সূর্যের চেয়ে ৯৬০ গুণ সূর্যশক্তিতে উজ্জ্বল, একশো দিনের ছন্দে ২০,০০০ গুণ উজ্জ্বলতর। যে-কোন পুঞ্জে তাই একটি সেফাইড্ লাইট্হাউসের নিশানা থাকলে, সে-নক্ষত্রগোষ্ঠির দূরত্ব মাপা যায়। দূরত্বের কথায় বলা যায় যে, ঐ দ্বৈপায়ন দূরযান বিশ্বের যেটি খালি চোখে সবচেয়ে বড়ো, আণ্ড্রোমিডা নেব্যুলা, সে শুধু একটি নগণ্য তারার মতো দেখায়। আণ্ড্রোমিডা কিন্তু বিরাট একটি ছায়াপথের তুল্য, দূরত্বের মাপ থেকে কষা যায় এর আকারের অঙ্ক আর দীপশক্তি। একশো কোটি সূর্যের আলো এই আণ্ড্রোমিডার দীপ্তি। এদের কারো-কারো আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পঞ্চাশ কোটি আলোকবর্ষ কেটে যায়। সবচেয়ে যে দূর দৃশ্যমান দ্বীপবিশ্ব, সে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলেছে সেকেণ্ডে ষাট হাজার মাইল বেগে, রেডিয়ম্-ফাটানো হেলিয়ম্ অণুর চেয়ে পাঁচ গুণ দ্রুততর, আলো বা রেডিওর এক-তৃতীয়াংশ গতিতে।

এই যাতায়তের ব্যাখ্যা মিন্ দিয়েছেন। ডানদিকের ধাবমান ছেলে আমার দিকে ছোটে ততক্ষণই, যতক্ষণ-না সে আমাকে ছাড়িয়ে যায়, তারপরে সে আমাকে ক্রমেই দূরে রেখে বাঁয়ে ছোটে। তাছাড়া বিশ্ব বর্ধমান, বেলুনের মতো। ফলে প্রথম স্ফীতির অবস্থার দুটি মাছির একটি মাছি আরো বেশি স্ফীতির পরে দ্বিতীয় মাছির থেকে আরো দূরে চ'লে যায়। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে কিন্তু এই বিশ্বের ছবি আঁকা যায় না। প্রতিচিত্রের যুগ গেছে। বিপ্লবীসমাজের বিজ্ঞানে পুরানো চিহ্ন সব বদলাচ্ছে। আধুনিক শিল্পসাহিত্যে এই অভিজ্ঞারই ভিন্ন-জাগতিক সমর্থন। বিজ্ঞানের সন্ততিবোধে আপাতদৃষ্টিতে তাই ভাঙন ধরেছে যেমন ধরেছে মানবসমাজের ঐতিহ্যবাদে। সন্ততিবোধ থেকেই কার্যকারণ সন্ধান আসে। প্রাত্যহিক জীবনে দুই-ই সার্থক এবং সেই থেকেই এদের সর্বত্র প্রয়োগের ইচ্ছা। কিন্তু বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে এ-প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। ম্যাক্সওয়েল্ তাই তাঁর চাকার mangles ত্যাগ করেন যখন তার থেকে তাঁর বিদ্যুৎসন্ধান সফল হ'ল। কারণ বিদ্যুতের আচরণ চেনা প্রতিচিত্রে বিকৃত হ'তে বাধ্য। ম্যাক্স-ওয়েলের শুদ্ধবুদ্ধি অবশ্য অসামান্য, ধর্মভীরু হ'য়েও তিনি বলতেন আত্মায় তাঁর বিশ্বাস আছে কিন্তু সে-বিশ্বাসই পাছে ঈশ্বরের আবির্ভাবে দুর্বল হ'য়ে যায়, তাই অবতার মানেননি। প্রতিচিত্রের সম্বন্ধে তাঁর এই সন্দেহ ছিল ব'লেই তিনি আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক। ফিজো এবং মাইকেল্সন্ মর্লির প্রমাণ যে আলোর গতি নির্ধারিত, স্থির। আলোর চেয়ে দ্রুত চিহ্ন নেই এবং চিহ্ন বা প্রতীককেই

বিজ্ঞানের কারবার। প্রতীকের অপরিমেয় বেগ রইল না, এ এক সমস্যা। আপেক্ষিকতত্ত্বে হ'ল এর দুর্বোধ নিরাকরণ। দ্রষ্টার সম্বন্ধই নির্দেশ দেয় চলন্ত বস্তুর দৈর্ঘ্য, ভার ও সময়ের পরিমাণে। সেকেলে বিজ্ঞান এই প্রতীকহীন প্রতিচিত্র-হীনতায় একেবারে ভেঙে পড়ল। দ্বিতীয় ধাক্কা এল প্লাঙ্কের কোয়াণ্টা। তিনি বলেন তাপ বা শক্তি যেন বিশেষ মাপের এক-এক মোড়কে থাকে। অর্থাৎ চলন্ত চাকাটা ক্রমিকভাবে বেগ বদলায় না, এক বেগ থেকে আরেক বেগের অনুপাতে চলে না, বিপ্লবের মতো লাফিয়ে যায়। এক মোড়ক ওষুধ খেয়ে আরেক মোড়ক, মিক্‌শ্চারের বোতল খুলে ফোঁটা-ফোঁটা সমানে খাওয়া নয়। ফোঁটা-ফোঁটাও অবশ্য অবিরাম নয়, তাতেও স্বাতন্ত্র্য। এই নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকেই প্লাঙ্কের কোয়াণ্টাম বা পরিমাণতত্ত্ব।

এর প্রয়োগ হ'ল বহু ক্ষেত্রে। লেনার্ডের পরীক্ষায় দস্তার পাতে অতিবেগনি আলো ফেললে বিদ্যুৎ-অণু লাফিয়ে ওঠে। তার বেগ কিন্তু আলোর মাত্রা বাড়ালে বাড়ে না, বাড়ে অণুদের সংখ্যা। সমুদ্রের ঢেউয়ের উৎক্ষেপের সঙ্গে এ মেলে না। আইন্‌স্টাইন্ তাই দিলেন বিপ্লবকর আভাস—আলোর ঐ-রশ্মিগুলি তরঙ্গ নয়, আণবিক টুক্‌রো। প্রতি টুক্‌রোই খানিকটা শক্তির মোড়ক বা আধার। দস্তার পাতে তারা ধাক্কা দিলে বিদ্যুৎ-অণু লাফিয়ে ওঠে, সমান বেগে, কারণ আলোর টুক্‌রোগুলির সমান নির্ধারিত শক্তি। পরিমাণতত্ত্ব কি প্রমাণসাইজ পণ্যের যুগেই শোভন নয়?

নীল্‌স্ বোর দেখালেন এই পরিমাণ নির্ধারণ থেকেই জড়বস্তু বা ম্যাটারের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য আছে। আর এই তরঙ্গ ও খণ্ড বা টুক্‌রোর দ্বন্দ্ব মিলে যায় নতুন অঙ্কে, যেখানে ক×খ আর খ×ক এক নয়। এ-বীজগণিতে প্রতিমূর্তি গড়া যায়। কিন্তু তাহ'লে ঐ বিদ্যুৎ-অণুদের আদিনিবাস জানা যায় কী ক'রে? হাইসেন্‌বের্গের প্রতিভা বললে অনিশ্চয়তার নিয়মে। প যদি হয় ইলেক্‌ট্রনের সংস্থান আর ম তার বস্তুরূপ আর বেগের ফল, তাহ'লে প নিশ্চয় মাপা যাবে, কিন্তু ম-র নির্ণয় হবে অনিশ্চিত। তেমনি নির্ণীত ম-র বেলায় প হবে অনিশ্চিত।

মোটামুটি, বিষয়-বিষয়ী দ্রষ্টা-দৃশ্যের স্বীকারে ফিরে আসি। আইন্‌স্টাইনের বিজ্ঞানে দেশকালের ভেদাভেদ ও চিরমূল্য নেই, কিন্তু দ্রষ্টা আবার সক্রিয়, সে নিয়ম খোঁজে ও খুঁজে পায়, কার্যকারণের লাঙল আবার তার হাতে। অবশ্য বোর ও হাইসেনবের্গের চর্চা বিশেষ অণু নিয়ে আর আণবিক সত্তা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ। কার্যকারণ সেই বিশেষের ক্ষেত্রে অবান্তর। তার মানে এ নয় যে, দ্রষ্টার অগম্য অণুর ধরন-

ধারণ অঙ্কে ধরা পড়ে না। অঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে ভাবীকথকও বটে। বলাই বাহুল্য, এ-সব আণবিক সত্য কোটি অণুর সমষ্টি মানুষ বা ইট-কাঠের জগতের ব্যবহারিক নিয়মাবলি বাতিল করে না। কার্য-কারণ দেশ-কাল সবই সেখানে গ্রাহ্য। অনিশ্চয়তার বিধি অনুসারে আমাদের মগজের উপরে বংশের ও পারিপার্শ্বিকের নিশ্চিত প্রভাব অস্বীকৃত হচ্ছে না। রাত্রির অন্ধকারে নৈশ পাইলটের আকাশ-যাত্রার কর্তৃত্ব দিনের অনেক স্পষ্ট সাফল্যের চেয়ে মহৎ। তাছাড়া, দিনের সাফল্যে বাজার ব'সে যায়, সেখানে অনেক গ্লানি, আত্মপ্রসাদের অনেক ক্লেদ, সোভিয়েট-বিদ্বেষজ বহু ভ্রান্তিবিলাস।

সোভিয়েট শিল্পসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'রাশিয়ায় যখন যাত্রা করলুম খুব বেশি আশা করিনি। কেননা কতটা সাধ্য এবং অসাধ্য তা'র আদর্শ ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকেই আমি পেয়েছি। ভারতের উন্নতিসাধনের দুরূহতা যে কত বেশি সে-কথা স্বয়ং খৃষ্টান পাদ্রী টম্‌সন্ অতি করুণ স্বরে সমস্ত পৃথিবীর কাছে জানিয়েচেন। আমাকেও মানতে হ'য়েচে দুরূহতা আছে বই কি, নইলে আমাদের এমন দশা হবেই বা কেন? একটা কথা আমার জানা ছিল, রাশিয়ায় প্রজাসাধারণের উন্নতিবিধান ভারতবর্ষের চেয়ে বেশি দুরূহ বই কম নয়। প্রথমত এখানকার সমাজে যারা ভদ্রেতর শ্রেণীতে ছিল আমাদের দেশের সেই শ্রেণীর লোকের মতোই তাদের অন্তর বাহিরের অবস্থা। সেই রকমই নিরক্ষর নিরুপায়, পূজা অর্চ্চনা পুরুত পাণ্ডা দিনক্ষণ তাগাতাবিজে বুদ্ধিশুদ্ধি সমস্ত চাপা-পড়া, উপরিওয়ালাদের পায়ের ধুলোতেই মলিন তাদের আত্মসম্মান, আধুনিক [বৈজ্ঞানিক যুগের সুযোগ সুবিধা তা'রা কিছুই পায়নি, প্রপিতামহদের ভূতে পাওয়া তাদের ভাগ্য, সেই] ভূত তাদের বেঁধে রেখেচে হাজার বছরের আগেকার অচল খোঁটায়, মাঝে মাঝে য়িহুদী প্রতিবেশীদের 'পরে খুন চেপে যায় তখন পাশবিক নিষ্ঠুরতার আর অন্ত থাকে না। উপরওয়ালাদের কাছ থেকে চাবুক খেতে যেমন মজবুৎ, নিজেদের সমশ্রেণীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার ক'র্‌তে তা'রা তেমনি প্রস্তুত।

'এই তো হ'লো ওদের দশা,—বর্ত্তমানে যাদের হাতে ওদের ভাগ্য, ইংরেজের মতো তা'রা ঐশ্বর্য্যশালী নয়, কেবলমাত্র ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে নিজের দেশে তাদের অধিকার আরম্ভ হ'য়েচে—রাষ্ট্রব্যবস্থা আটেঘাটে পাকা হবার মতো সময় এবং সম্বল তা'রা পায়নি—ঘরে-বাইরে প্রতিকূলতা—তাদের মধ্যে আত্মবিদ্রোহ সমর্থন করবার জন্যে ইংরেজ এমন কি আমেরিকান্‌রাও গোপনে ও প্রকাশ্যে চেষ্টা ক'রেচে। জনসাধারণকে সক্ষম ও শিক্ষিত ক'রে তোলবার জন্যে তা'রা যে পণ ক'রেচে তা'র "ডিফিকাল্‌টি" ভারতকর্ত্তৃপক্ষের ডিফিকাল্‌টির চেয়ে বহু গুণে বড়ো।

'অতএব রাশিয়ায় গিয়ে বেশি কিছু দেখ্‌তে পাবো এ-রকম আশা করা অন্যায় হ'তো। কী-ই বা জানি কী-ই বা দেখেচি যাতে আমাদের আশার জোর বেশি

হ'তে পারে! আমাদের দুঃখী-দেশে লালিত অতি দুর্ব্বল আশা নিয়েই রাশিয়ায় গিয়েছিলুম। গিয়ে যা দেখ্‌লুম তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়েচি।...

'শোনা যায় য়ুরোপের কোনো কোনো তীর্থস্থানে দৈবকৃপায় একমুহূর্ত্তে চিরপঙ্গু তা'র লাঠি ফেলে এসেচে—এখানে তাই হ'লো; দেখতে দেখতে খুঁড়িয়ে চল্‌বার লাঠি দিয়ে এরা ছুটে চল্‌বার রথ বানিয়ে নিচ্চে—পদাতিকের অধম যারা ছিল তা'রা বছর দশেকের মধ্যে হ'য়ে উঠেচে রথী। মানবসমাজে তা'রা মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।

'আমাদের সম্রাট-বংশীয় খৃষ্টান পাদ্রীরা বহুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়েচেন, ডিফি-কাল্‌টিস্‌ যে কী-রকম অনড় তা তাঁরা দেখে এসেচেন। একবার তাঁদের মস্কৌ আসা উচিত। কিন্তু এলে বিশেষ ফল হবে না—কারণ বিশেষ ক'রে কলঙ্ক দেখাই তাঁদের ব্যবসাগত অভ্যাস, আলো চোখে পড়ে না, বিশেষত যাদের উপর বিরাগ আছে।'

বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে এই যে-নবজীবনের আশ্চর্য সূচনা, তা যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নের সব দেশের সব শ্রেণীর মধ্যে ছড়ানো, তেমনি শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, কারখানায়, চাষে জীবনের উন্নতির সব ক্ষেত্রেই তার প্রভাব শীঘ্রই স্পষ্ট হ'ল। ওএব্‌দের বই পড়লে এই বিপুল ও গভীর প্রভাবের সীমানা পাওয়া যায় এবং ট্রট্স্কিদের কথা মনে রাখলে কীরকম ভিতরের বাধার মুখে সোভিয়েটকে কাজ করতে হয়েছে, তা কিছু আন্দাজ করা যায়। কিন্তু বাইরের ও ভিতরের বহু বাধাই ব্যর্থ হ'ল। এই নূতন সর্বব্যাপী নির্মাণের অন্তরঙ্গ প্রেরণা থেকে সাহিত্য-শিল্পও বাদ পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনার বিবরণেই এই আর্টের উৎসাহ দেখা যায়।

বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে কীভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের মর্যাদা জনসাধারণে ছড়িয়ে পড়ল সে-বিবেচনা মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিকের মনোমতো বিষয়। অবশ্যই সোভিয়েট ইউনিয়নে এ-মর্যাদা মানবধর্মের বিকাশেরই একদিক। যে-সমাজব্যবস্থায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষের মহত্ত্ব স্বীকৃত এবং ব্যক্তিত্বের অধিকার অঙ্গীকৃত, সেখানেই শিল্পসাহিত্যের এ-রেনেসান্স সম্ভব! এর জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টার সঙ্গে শিল্পীদের সহযোগও দায়ী, আবার যে-জীবনের আনন্দ ও সার্থকতা এসেছে, যার জন্য শিক্ষার হার ক'বছরে শতকরা ৯৮ জন লোকে পৌঁছয়, যার জন্য আঠারো থেকে চল্লিশ বছরের সবাই পড়তে পারে, সেই জীবনযাত্রার পরিপূর্ণতাও দায়ী।

এখানে শুধু শিল্পসাহিত্যের দিকটাই সংক্ষেপে দ্রষ্টব্য। রাশিয়ার সাহিত্য-

প্রতিভা সবাই জানে আকস্মিক নয়। গোগোল্, পুশ্‌কিন্, টুর্গেনিভ, ডস্ট-এভস্কি, টলস্টয়, চেখভ বা গোর্কির বই-ই আমরা পড়ি। এইসব বিরাট লেখক ছাড়াও রাশিয়ান সাহিত্যের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। তার পরিচয় কিছু-কিছু ইংরেজি অনুবাদেও পাওয়া যায়! লের্মণ্টভ, বা নেক্রাসভকে বাদ দিয়ে এই শতকের আরম্ভের রাশিয়াতেও সাহিত্যের পরীক্ষার যে নানারকম চেষ্টা হয়েছিল, তার তুলনা ফ্রান্সেই মেলে। ভিন্ন-ভিন্ন সাহিত্য বা শিল্পের দল যে সৌখীন কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিল, সেটা সামাজিক কারণে খানিকটা ব্যর্থ, তিক্ত বা আসন্ন যুগান্তরের পূর্বাভাসে অস্পষ্ট চাঞ্চল্যে তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল। ৩৫ সালে ইউনিয়নব্যাপী যে ১৫০০ লেখকের সভা হয়েছিল তাতে বুখারিন একটি দীর্ঘ ও উচ্চশ্রেণীর সমালোচনাও পড়েন। সেই বক্তৃতায় মার্ক্সিস্ট সমালোচনার বহু প্রশ্ন গোড়া থেকে আলোচিত হয়েছিল। আধুনিক সাহিত্যের বিস্তৃত সমালোচনাও এ-বক্তৃতার মুখ্য অংশ। বক্তৃতাটি ইংরেজিতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিএলি, ব্লক্ ও ব্রিউসভের আলোচনা আছে। এঁদের সমসাময়িক অনেকে বিপ্লবের সময়ে পালান, এঁরা নবযুগকে মুখোমুখি দেখেছিলেন। কিছু-কিছু অনুবাদ প'ড়েও এঁদের কবিত্ব ও বুদ্ধির সাহসে শ্রদ্ধা হয়। ব্লকের বিখ্যাত দ্বাদশ-নামের কবিতার অনুবাদ পাঠে পুরাতনে মানুষ এই দিশাহারা আবেগের কবির নূতন জগৎকে গ্রহণ করবার মূল্য কিছু বোঝা যায়। ব্রিউসভ আরো ভালো কবি এবং বুখারিনের ভাষায় "এই কোন্ দূরাগত দীপ্ত অতিথি" আজ রাশিয়ায় জনপ্রিয় ও মান্য। অকাল-মৃত্যুর আগে ব্রিউসভ লেখেন :

Days will shine forth with matchless Maytime lustre,
Life will be song ; a red and golden cluster
Of flowers will bloom on all the graves that be.
Though black the furrow, though the wind be stinging,
Deep in the earth the sacred roots are singing—
But you the harvest will not live to see.

পলাতকদের ছেড়ে দিলেও যে-সব শিল্পী আবার মতান্তরে দেশে ফিরে যান, তাঁদের মধ্যে কুপ্রিন্, প্রোকোফিয়েভ, মিরস্কি উল্লেখযোগ্য। কুপ্রিন্ আর যাই হোক্, দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক ত বটেই এবং প্রোকোফিয়েভ পশ্চিমা সঙ্গীতের আধুনিকতার একজন ভূতপূর্ব দিক্‌পাল। প্রোকোফিয়েভের কঠিন টেক্‌নিক সাধনা কী ক'রে সর্বজন মনোরঞ্জনে গেল, সঙ্গীতজগতে সেটা স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর

শিশুদের জন্য লেখা সিম্ফনি সারল্যে তাঁর পক্ষে যেমন বিস্ময়কর প্রতিভার নমুনা, তেমনি তাতে শিল্পের সততা বা অবৈকল্য অবিসম্বাদী। কুপ্রিন্ মস্কৌতে ফিরে আবাল্য চেনা শহর প্রায় চিনতে পারেনি, নতুন বাড়ি বড়ো-বড়ো রাস্তার চেহারা বদ্‌লেছে একেবারে, যেমন বদ্‌লেছে মেয়েপুরুষ। কুপ্রিন্ এ-বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন খুব সোজাসুজি তাঁর বিস্ময় ও গর্বের বর্ণনা এবং নিজের লেখার সঙ্গে এর ভাবী যোগের আলোচনা ক'রে।

সেটা যে কুপ্রিনের ভাববিলাস নয়, তার প্রমাণ আলেক্সিস্ টলস্টয়ের মতো শান্ত স্থিতধী লেখকও এই কথাই বলেছিলেন মাদ্রিদে লেখকসভায় এবং সোভিয়েট সভ্য নির্বাচিত হবার আগে। শোলোকভের মতো প্রবল স্পষ্টভাষী লেখক এই কথাই বলেন স্বদেশ-বিদেশে—ইংলণ্ডে যখন যান, তখন। এ-সমর্থন স্টানিস্লাভস্কির মতো নাট্যশিল্পী, মসকভিনের মতো নট, ডাইনেকার মতো প্রতিভাবান্ চিত্রকরের উক্তিতেও পাওয়া যাবে। স্বকীয়তাবাদী বুর্জোয়া শিল্পবাদীদের ব্রিউসভ তাই বলেছিলেন :

That which flashed in a far-off dream
Is embodied now in smoke and thunder ;
Then why do you frown with the unsteady eye
Of a frightened roe-deer in the woods ?
Oh, to you, aesthetes, and to you, dreamers,
The dream was sweet but as the far-off distance
And only in books and in accord with poets
Did you love originality.

আর মায়াকভস্কি ত গতযুদ্ধের আরম্ভেই লেখেন :

Where peoples's short vision is cut short
By the heads of the hungry crowds,
In the thorny crown of the revolution
The year 16 will burst in.

মায়াকভস্কির বজ্রনির্ঘোষ বিপ্লবের আগে বুর্জোয়া আত্মপ্রসাদের বিপক্ষে বেজেছিল—'পাব্লিকের রুচির মুখে থাবড়া' তাঁর এক বইয়ের নাম। তখন অবশ্য তাঁর বিদ্রোহ সৌখীন সাহিত্যের প্রবল কিন্তু গণ্ডিবদ্ধ আস্ফালনেই শেষ হ'ত। যখন তাঁর প্রবল কণ্ঠস্বর সত্যকার উপলক্ষ পেল, শ্রোতা পেল, তখন কবিত্বের

বিপ্লব প্রাণ পেল কাব্যে। তাঁদের মাসিকপত্র *Life*-এর চেহারাই বদ্‌লে গেল। তাঁর সহকর্মীরা যে সমান তালে চলতে পারলেন, তা নয়। খেভনিকভ তাঁর ভাষার উৎস সন্ধানে জয়সের মতো ধাঁধায় ঘুরে মারাই গেলেন। আসেইএভ বা কামেন্‌স্কিও হয়ত আশা পূরণ করলেন না। কিন্তু মায়াকভস্কির অট্টনাদ ইউনিয়নের শেষ প্রান্তে চীনেও পোঁছল। আজ নির্মাণের বাস্তবজগতে নেতিমূলক agitverse-এর মূল্য নির্ণীত, কিন্তু আজও মায়াকভস্কির ছন্দোবিস্তার ও জটিল টেক্‌নিক নিয়ে লেখক-পাঠক মাথা ঘামায়, যেমন ঘামায় স্বকবি পাস্টেরনাকের প্রতীক প্রয়োগের কঠিন ভাবানুষঙ্গের রহস্যোদ্‌ঘাটনে। মায়াকভস্কির আত্মহত্যা বিষয়ে অনেক মিথ্যা গুজব বিদেশে রটেছিল। আসলে এই আত্মহত্যার কারণ ব্যক্তিগত ট্রাজেডি। ভাঙার আন্দোলন যখন সংহত নির্মাণ প্রচেষ্টায় জ'মে গেল, মায়াকভস্কির অস্থির প্রতিভা তাতে তৃপ্তি পেল না। তিনি *Lef* থেকে *Ref*-এ এলেন, প্যারিস গেলেন, মঁপার্‌নাসে পান করলেন, মনাকোতে জুয়া খেললেন, মস্কৌ ফিরে কয়েকমাস পরে আত্মহত্যা করলেন। প্রেম বা ব্যক্তিগত সব-কিছুই তিনি নিজের ছক্ থেকে বাদ দিয়েছিলেন, অন্যকেও বলেছিলেন—তাঁর "Command to the armies of art"-এ : 'I don't believe in flowery Nice! I sing once again of men as crumpled as hospital beds and women as trite as a proverb.'

আর আত্মহত্যার আগে লেখেন :

> 'As they say, 'the incident is closed.' Love boat smashed against mores. I'm quits with life. No need itemizing mutual griefs, woes, offences. Good luck and goodbye.'

স্টালিন তাই মর্মাহত হ'য়ে বলেন যে কম্যুনিস্ট কবিদেরও 'সমগ্র মানুষ' হ'তে হবে। উৎসাহের ছাঁটাই করা বিশুদ্ধতা পরিণামে করুণ ত হবেই প্রকৃতির প্রতিশোধে।

এসেনিনের কবিপ্রতিভা মায়াকভস্কির মতো নয়। তাঁর মন গ্রাম ও গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথে উদাস হ'য়ে যেত। লোকসাহিত্যের সরসতায় তিনি কাব্যের যে সহজ ও সরল রূপ সংগ্রহ করেছিলেন, সেইটেই তাঁর দান। মনে-মনে তিনি যন্ত্রসভ্যতা চাননি, গস্‌প্লানে তাঁর ফিরে চলার নিষ্ক্রিয় স্বপ্ন ভেঙে যায়। এই জনপ্রিয় কবি মদ্যপ হ'য়ে ওঠেন, ইসাডোরা ডানকানকে বিয়ে ক'রেও দুর্দান্ত কুসঙ্গে শক্তিক্ষয় ক'রে শেষটা আত্মহত্যা করেন। এই দুই কবির কথা স্মরণীয় এই জন্য

যে পলায়নের মতোই উন্মত্ত উৎসাহের মূলেও রোমান্টিক ভ্রান্তি। বিএড্‌নিও এর কবলে পড়েন। তাই উশাকভ, সেভটলভ, টিখোনভ ইত্যাদি নেতি ছেড়ে আশ্বাস খোঁজেন সৃষ্টিতে, নির্মাণে, সমাজতান্ত্রিক রিয়ালিজমের আশ্রয়ে। এ-বিষয়ে বহু আলোচনার মধ্যে গোর্কির লেখকসভার মহৎ গভীর বক্তৃতায় মূল্যবান্ কথাগুলি পাঠ্য। রচনাটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। গোর্কির উৎকৃষ্ট সমালোচনা ছাড়া বুখারিনের প্রবন্ধটিও এই সভার একটি দান। এরেনবুর্গ, লিওনভ, রাডেকও এই আলোচনায় যোগ দেন। অবশ্য রাশিয়ায় ভুল স্বীকার ও সংশোধন সমধিক প্রচলিত, বরং তা এত দ্রুত হয় যে অনেক অলস ব্যক্তিই উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে যায়। আন্দোলনযুগের ত্রুটিসংশোধনে Rapp গঠিত হ'ল। আবার Rapp-এর কর্তৃত্ব দেখা গেল শিল্পসাহিত্যে অবান্তর ও ভ্রান্ত। এখন তার পরিবর্তে Central Art Committee ও তার সঙ্গে-সঙ্গে ভিন্ন-ভিন্ন শিল্পের সংঘের স্বাধীন কিন্তু সমবেত কাজ। অবশ্য এইসব ছেয়ে আছে জনসাধারণ। অদ্ভুত ও প্রবল তাদের তাগাদা। ঐ-লেখকসভাতেই ডন্ অঞ্চলের কয়লাশ্রমিক, পূর্ব সাইবিরিয়ার পায়োনিঅর, মস্কৌ কারখানার শ্রমিক, সৈন্যদল, নাবিক, শিশুর দল ইত্যাদি দলে-দলে তাদের উৎসাহ, তাগাদা ও দাবি জানিয়ে যায়।

এরা সবাই চায় আরো বই, আরো ছবি, আরো বিষয়বস্তুর প্রসার, বর্তমান প্রাত্যহিক নবজীবনের জটিল রূপ শিল্পের মননে সুসংবদ্ধ, সহজ ও আবেগবোধ্য দেখতে। এইখানেই socialist realism-এর উৎস। জীবনে তথা বিষয়বস্তুর মহিমায় লেখকগণ ভাবিত, অন্য দেশে যেমন লেখকরা বিষয়ের সন্ধানে দিশাহারা। নূতন সভ্যতার উৎসাহে তাই মহাকাব্যজাতের উপন্যাসই আদর্শ। কৃষিসমবায় সাহিত্যবিষয় হ'ল শোলোকভে। গ্লাড্‌কভের প্রেরণা কারখানায়। সুদূর এশিয়ার সভ্যতাপত্তন, চীন-জাপান সংঘর্ষ, সিয়ামে জাপান ইত্যাদি হ'ল পাভ্‌লেঙ্কোর *Red Planes Fly East*-এর বিষয়। বিপ্লব ও অন্তর্যুদ্ধের মধ্যেও অনেকে বস্তু পেলেন —ফুর্‌মানভের 'চাপাএভ', ইভানভের *The Armoured Train*। গোর্কির 'ঈগর্ বুলিচেফ' ও 'ডস্‌টিগাএফ' নামে নাটকের বিষয়েও এই ঐতিহাসিক মনোযোগ মনস্তত্ত্বে মিশেছে—১৯১৭-র মার্চ থেকে নভেম্বর অবধি এর কাল। অত্যন্ত বিবেকী লেখকরা এতে উৎসাহী; ফরাসি বিশ্লেষণে এঁরা অনেকেই সিদ্ধহস্ত—টলস্টয়, লিওনভ, প্যারিস্‌বাসী এরেনবুর্গ, শাগিনিয়ান, এঁরা যে-কোন সাহিত্যের গৌরব। ট্রেটিয়াকভের bio-interview ডেন্-শী-শুআ-র বিশ্লষণে চীনের তরুণ মন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। নাটকেও এই সুকুমার মনস্তত্ত্ব বিপ্লবে

সার্থক হয়েছে—ভিশ্‌নেভস্কির *An Optimistic Tragedy*, পোর্গোডিনের *The Aristocrats*, আফিনো-জেনেইভের 'ভয়', *The Distant Point*, অকালমৃত ওস্ট্রভস্কির নাটকগুলি। সমালোচনা ও নিজেদের হাস্যরসের প্রচুর নমুনা মেলে উপন্যাসে নাটকে—*Six Soviet Plays*-এর 'Squaring the Circle'-এ বা 'Another Man's Child'-এ কম্যুনিজম নিয়ে ঠাট্টা উপাদেয়। পিল্‌নিয়াক ইত্যাদি এরকম গল্পও লিখেছেন যাতে বোঝা যায় যে গোর্কি-নিন্দিত leaderism সত্যই এখানে ভূত হ'য়ে চাপেনি। জানি, কেউ হয়ত ধাঁ ক'রে বাবেলের নাম বা পাস্টেরনাকের নাম করবেন, বলবেন কর্তৃপক্ষের চাপে এঁরা এত কম লেখেন। মজা হচ্ছে বাবেল নিজে হেসে এর জবাব দিয়েছিলেন যে তিনি মধ্যে-মধ্যে মৌনতার শিল্পচর্চা করতে চান। এরেনবুর্গ এ-বিষয়ে আলোচনায় বেশ বলেন যে তিনি নিজে বেশি লেখেন, তবে কেউ-কেউ, যেমন বাবেল, যদি কমই লেখেন ত সেই নিয়ে উত্তেজনা বৃথা, কারণ এটা শুধু স্বভাবের কথা। তিনি নিজে খরগোসের মতো, মুহুর্মুহু তাঁর বাচ্চা হয়, আর বাবেল হাতির মতো, দীর্ঘ তাঁর লেখনীর গর্ভযন্ত্রণা।

কিন্তু ইউনিয়নের সাহিত্যের বিস্তার বিষয়ে এ সামান্য প্রবন্ধে কিছু আভাস দেওয়া যায় না। সবক'টি দেশে সবক'টি ভাষায় এর বিস্তার। এমন দেশও এই সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার পূর্ণ প্রসাদ পেয়েছে যেখানে আগে বর্ণমালাও ছিল না। আজ তাই রাশিয়া ছাড়া ইউনিয়নের সর্বত্র সত্তরটি ভাষা সমৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউক্রাইনে মিকিটেঙ্কো, শ্বেত রাশিয়ায় অশীতিপর শির্‌ভান্‌ ঝাডে বহু ভাষায় অনূদিত, আর্মেনিয়া জর্জিয়াও মাথা তুলেছে। আর্মেনিয়ার প্রবীণ কবি আকোপিয়ানের অনুবাদ পাস্টেরনাক ও বিএড্‌নি করেছেন। জর্জিয়ার কবিদের মধ্যে টাবিড্‌জে, চিকোভানি ও শাল্‌ভা ডাডিআনির নাম শোনা যায়। সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছেন উজবেকিস্থানের মহাকবি আবদুল্লা কাদিরি। 'প্রগতি' নামক পুস্তকে এঁর অনুবাদ বেরিয়েছিল। তাজিক কবি সাত্রেদ্দিন আইনি ও হাশেম লাহুটিও উল্লেখযোগ্য। কির্‌গিজস্তানে ক'বছর আগে বর্ণমালাই ছিল না, এখন সেখানে বহু বিদ্যালয়, হাসপাতাল, লাইব্রেরি, কাগজ ও রেডিওর সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও চলে এবং আলি টোকোম্‌বাএভ সে-দেশের মহাকবি। লাখুটির নামও সারা ইউনিয়নে মান্য। এই ইরানি কবি ইউনিয়নকেই মাতৃভূমি ব'লে বরণ করেন।

শুধু সংখ্যা ও প্রসার নয়, সার বা গভীরতার দিকে ইউনিয়নে নজর সমধিক। অবশ্য প্রসারও আশ্চর্য। গোর্কির বই কুড়ি বছরে শুধু রাশিয়ানেই ৩ কোটি ৩০

লক্ষ কপি বিক্রি হয়। তরুণ লেখক শোলোকভের বই ক'বছরে ৩০ লক্ষ কপি কাটৃতি। শোলোকভের বছরে কাটৃতি ৫ লক্ষ থেকে ৬ লক্ষ, টলস্টয়ের ৩ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ। পুশকিনের কাব্যগ্রন্থ ৩৫ ও ৩৬ সালে ১,৭৫,০০,০০০ কপি বিক্রি হয়। বিদেশী লেখকের বইও চলে খুব। গয়টে, শেক্সপীঅর, স্কট্, ডিকেন্স, বাল-জাক্, ফ্লোবেয়র, মোপাসাঁ ও হাইনের চল্ বিস্ময়কর। সরকারি প্রকাশকেরাও পাঠকের তাগিদ রাখতে পারে না, ফয়খ্‌ট্‌বাঙেরের উপন্যাসের চাহিদা হয়েছিল ১ লক্ষের উপর, কিন্তু ছাপা হ'ল মাত্র ৬০০০০। রোলাঁর 'কোলা ব্রুঞঁও'-র ক'বছরে ১২০টি সংস্করণ বার করতে হ'ল। ড্রাইসার, ডস্ পাসস্, হেমিংওএ, কন্‌রাড, গল্‌সওআর্দি, ওএল্‌স্, টমাস্ মান্, জিদ্, বার্‌বুসেরও দারুণ বিক্রি।

একটা কারণ অবশ্য লাইব্রেরির বিস্তার। সবরকম ধ'রে ৩৬ সালে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ১৩৫৮৪৭। তার মধ্যে ১৫০০০ লাইব্রেরির পুস্তকসংখ্যা ১০ লক্ষের বেশি ক'রে। এই বিস্তার অবশ্য ব্যাপক। যথারীতি অর্কেস্ট্রা ও গানের দল ছাড়া সখের গানের দলই ৩৬ সালে তিরিশ হাজার এবং অর্কেস্ট্রা পঁচিশ হাজারে উঠে-ছিল। সরকারি অর্থসাহায্যেই শুধু এর ব্যাখ্যা হয় না। থিয়েটার সিনেমা ইত্যাদির সংখ্যাই ছিল চুয়াল্লিশ হাজার।

চল্লিশটি ভাষা বিপ্লবের পরে প্রথম ছাপাখানার মুখই দেখল। এই যে সংস্কৃতি প্রসার প্রাচ্যের আদিম জাতিদেরও দ্রুত সভ্যতায় নিয়ে এল, তা আমাদের কল্পনা করাও কঠিন। জাতীয় জীবন যে একতায় অখণ্ডতা পেয়েছে, সেই অবৈকল্য সংস্কৃতির জগতেও, শিক্ষা ও সৃষ্টির মধ্যে আর বিরোধ নেই। সর্বত্র শিক্ষার ব্যবস্থা, সে-ব্যবস্থার পিছনে যে ব্যাপক চিন্তা, সহযোগ ও অর্থ তার পরিচয় এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু একটা প্রভেদ দ্রষ্টব্য। অন্য দেশে শিল্পসাহিত্যে যা-কিছু সৃষ্টিকার্য, যা-কিছু সৎ তা কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে যেতে বাধ্য—সরকারি বা সামাজিক প্রতিপত্তির বিপক্ষে। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ও হ'য়ে দাঁড়ায় সংস্কৃতির ছদ্মবেশী শত্রু ও মাস্টাররা লজ্জাকর রসিকতা মাত্র। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে সরকার স্রষ্টা ও সৃষ্টির ভক্ত। শিক্ষায়তনও তেমনি আর্টের সহায়। শুধু আর্টিস্টদের সাহায্য করতে বা ভাবী আর্টিস্টকে গ'ড়ে তুলতে নয়, পাঠক দর্শক শ্রোতা তৈরি করতে, সমালোচক তৈরি করতে। কারণ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি শুধু দর্শনে বা কলকারখানায় নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সার্থক। তাই জ্ঞানের ও বিশেষজ্ঞের এত মর্যাদা, শিক্ষার এত সম্মান। জ্ঞানের সম্মান খুঁটিনাটিতেও দেখা যায়। কির্‌শোন্ বিমানব্যাপার নিয়ে নাটক লেখেন, নামজাদা বিমানবিহারীরা তাঁর নাটক শুনে, দু-একটা তথ্য

ব'লে দিলে, কির্‌শোন্ লেখা বদলালেন। শিশুশিক্ষা থেকে শিল্পসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে কী ক'রে সভ্যতার হাতেখড়ি হয় তা একটা বিরাট ও জটিল ব্যাপার। তারপরে ত বরাবরই ছবি ও গান, সাহিত্য ও নাট্যশালা ও সিনেমা আছেই। মার্শাক্ ও চুভস্কির আলোচনায় বোঝা যায় কী পরিশ্রমে ও কী সুচিন্তায় শিশুদের জন্য শ্রেষ্ঠ আর্টের প্রয়োগ। তাদের ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা, পত্রিকা ও প্রকাশক ব্যবস্থাও আলাদা। নাটালিয়া সাট্‌সের কাহিনীটি প্রসঙ্গত মার্জনীয়। একদা ১৮ সালে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেই ভীষণ দুরবস্থাতেই যখন সোভিয়েট গঠনকার্যে তৎপর, মস্কো সোভিয়েটে একটি পঞ্চদশী এসে হাজির। কী ব্যাপার? না, সে শিশু থিয়েটার করবে এবং তার একটা ভালো বাড়ি চাই। ডিরেক্টর কে? মেয়েটি বললে, আমি, আর কে? অনেকেই হাসলেন, কিন্তু কের্‌দ্‌জেন্‌জেভ হলেন উৎসুক। হ'ল থিয়েটার। অন্তত ৪০ লক্ষ বালক-বালিকা আজ সাট্‌সের ভক্ত। Kerdzenzev আজ C.A.C.-র সভাপতি। সাট্‌সের প্রভাব আজ দেশব্যাপী এবং তাঁর মন্ত্র হচ্ছে: Children must be shown great art.

শিল্পীর বয়স্ক পরিণতিতেও এতে অনেক সুবিধা। ভাবি নটনটী শিশুপ্রতিভার লীলাতেই বিকাশ পায়। অবশ্য বয়স্ক নাট্যশালাতেও বিস্তৃত ও গভীর শিক্ষা দেওয়া হয়—যেমন অন্যসব শিল্প ব্যাপারেও স্থপতি, লেখক, চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীতকার, কারুকার, সকলেরই অবাধ শিক্ষাসুযোগ। দীর্ঘ ও ক্রমিক সিলেবস্ রচনায় বিশেষ জ্ঞানের পরিচয়। তাছাড়া শিক্ষাকালে অর্থের চিন্তা ও পরে বেকার সমস্যা নেই। শিক্ষার সময়ই অর্থলাভ সম্ভব। শিক্ষায়তন থেকে বেরিয়ে সংঘে যোগদান করাই রেওয়াজ। মস্কোতে ধরুন ১৬০০ স্থপতি, ১২০০ স্থপতি-সংঘের সভ্য, তাঁরা সবাই ৪০০০ থেকে ৫০০০ রুবল মাইনে পান, অধিকন্তু নক্‌সা গৃহীত হ'লে কমিশন।

অন্য দেশের সমাজব্যবস্থায় সব শিল্পীই অল্পবিস্তর নিজের উপর নির্ভর, তাতে অনেকটা শক্তি দুশ্চিন্তায় বা সম্মার্জনে নষ্ট হয়। তাছাড়া নেতিমূলক আত্মরক্ষায় একটা কাঠিন্য আসে। ওরই মধ্যে তবু লেখক কিছু শিল্পসাধনা করতে সক্ষম, কিন্তু নাট্য বা স্থাপত্য পরমুখাপেক্ষী অনেক বেশি। সোভিয়েট নাট্য বা স্থাপত্যের উৎকর্ষ ও প্রসার তাই স্বাভাবিক। নাট্যে স্টানিস্লাভস্কি নেমিরোভ ডান্‌চেঙ্কো প্রাচীন উৎকর্ষের স্থায়ী উদাহরণ; তেমনি তরুণ ওখলপকভ, টাইরোভ বা মায়ারহোল্ড, ভাখ্‌তাগোনভের শিল্পের উৎকর্ষ ও নানা পরীক্ষার সুযোগ অন্যত্র দুর্লভ। এবং এঁদের নাটক নির্বাচন পৃথিবীব্যাপী, সোফোক্লিস্ থেকে সেক্সপীঅর,

রবীন্দ্রনাথ, ও'নীল যে-প্রযোজনা রাশিয়ায় পেয়েছেন, তার তুলনা নেই। থিয়েটারের এই সর্বব্যাপী উন্নতির সঙ্গে রাশিয়ার ফিল্ম আর্টের উৎকর্ষ মনে রাখা ভালো। অনেক ডিরেক্টরই আজ জগদ্বিখ্যাত—আইজেন্‌স্টাইন্, পুডোভকিন, ডভশেঙ্কো, চাওউরেলি, জিগান, এম্‌লের, ভাসিলিএভ সিনেমা ও সমাজকে অভূতপূর্ব উৎকর্ষের মধ্যে বেঁধেছেন। এখানে বলা যায় যে ইউনিয়ন-খ্যাত 'Peter the First' ছবিটি কলকাতায় এসেছিল। এই ডিরেক্টরদের একজন অন্তত অন্য হিসাবে পরিচিত—আলেক্সাণ্ডার রমের শিল্প-সমালোচনা 'মাতিস্' মাতিসের উপর একটি অত্যন্ত ভালো বই বটেই, সম্ভবত ফ্রাই যে গোলকধাঁধায় আমাদের ঘোরান, তা থেকে মুক্ত ব'লে শ্রেষ্ঠ বই-ই।

থিয়েটারের মতো সিনেমাও ইউনিয়নে সবদেশে ছাড়ানো। স্থাপত্যেও তাই ভিন্ন দেশের জলহাওয়া, পারিপার্শ্বিক, লোকের অভ্যাস অনুসারে স্থপতিদের কাজ করতে হয়। কালিনিন একবার বলেন :

'Our people say to the architect, "Plan us an underground, remember that people will have to travel on this underground to and fro from work ; think how to make the journey as little fatiguing as possible." '

স্থাপত্য তাই এখানে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন একটি সুন্দর বাড়ি ক'রে শেষ নয়। গ্রোপিউস্ বা ল্যকোরবুসির ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা এখানে নেই, আবার স্থাপত্যের সমস্যাও এখানে আরো জটিল। বাড়ি নয়, পাড়া, সারা রাস্তা হবে একটা সমগ্র একক। তাছাড়া যাদের জন্য, তারা কী চায় তাও ভিতরে দেখতে হবে, যাতে আনাগোনার পথ সোজাসুজি হয়, সময় ও শ্রম বাঁচে। সচরাচর রাশিয়ায় বাড়িঘর পাঁচ-ছ তলার হচ্ছে—ধরা যাক্ মস্কো শ্রমিক-ক্লাবের ছবিগুলি —তাতে আছে স্টুডিও, থিয়েটার, জিম্‌নাসিঅম্, লাইব্রেরি, নার্সারি, একাধিক হল্, ক্লাসঘর, খাবারঘর ইত্যাদি। সংস্কৃতিপ্রাসাদগুলিও এইরকম জটিল। বিল্ডিং কোঅপারেটিভ বাড়ি ত একটি সম্পূর্ণ গ্রামই মস্কোর মধ্যে, সরকারি সাহায্যে সংঘের রচনা। সম্পূর্ণ নগররচনাও সোভিয়েট স্থাপত্যের প্রচলিত কাজ, মাগনিটোগোরস্ক, ডিনিএপেট্রভস্ক, বোল্‌শোয় জাপোরজিএ, মেরুদেশে ইগরেকা, আভরোস্ট্রয় ইত্যাদি প্লান্ করা সহর। কোলখোজেও স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ হচ্ছে। সুদূর—আমাদের নিকট—স্টালিনাবাদ, আশখাবাদ্, আল্‌মা আটা-রও চেহারা আধুনিক রুচিতে স্বাস্থ্যকর সুবিধাকর হ'য়ে উঠেছে। সব হয়ত সমান

শিল্পে উৎকর্ষলাভ করে না, কিন্তু ‘প্রাভদা’র বাড়ি, সোচি সানাটোরিয়া, রেভস্কো-ভস্কি অগুরুগ্রোণ্ড স্টেশন, খারকভের ‘House of Projects’ ইত্যাদির ছবি উন্নাসিকেরও তৃপ্তিকর।

অবশ্য স্থাপত্য তথা চিত্রশিল্পের সম্বন্ধে কিছু জানা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। তবু বই কিছু ইংরেজিতে পাওয়া যায়। তবে যখন জানা যায় যে ১৯৩৬-এ ২৪০ জন চিত্রকর, ৮০ জন গ্রাফিক্ শিল্পী ও ৬০ জন ভাস্কর শিল্পীসংঘের চুক্তিতে প্রায় ৩০ লক্ষ রুবল পান বা ১৯৩৭ সালে কর্তৃপক্ষ ৬ লক্ষ রুবল খরচ করেন শুধু ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীতে, তখন শিল্পের মর্যাদা বোঝা যায়। বলাই বাহুল্য, শুধু দেশীয় শিল্পে নয়, প্রাচীন ও আধুনিক সব শিল্পীর সম্মান, হার্মিটেজ, ট্রেটিয়াকভ ওয়েস্টর্ন আর্ট গ্যালারি পশ্চিম য়ুরোপের চিত্রশালা হিসাবে একান্ত মূল্যবান। ইসোগিজ প্রকাশিত পুস্তকে এদের শিল্পসম্ভার আন্দাজ করা যায়। এই শিল্পচর্চার সুফল সোভিয়েট চিত্রেও পাওয়া যায়। কোরিনের গোর্কি, ব্রডস্কির মিলে-ধাঁজের ছবি, লেবেডেভার সুকুমার ডেকরেটিভ চিত্রাবলি একাডেমিক ঐতিহ্যেরই বিকাশ। গোগ্যাঁর বর্ণবিলাস পেট্রভডকিনের বা কুজনেট্‌সভে সার্থক, যেমন সার্থক আর্মেনিয়ার সারিয়ানের স্বদেশচিত্র মাতিসের বর্ণাঢ্যতায়। সোভিয়েটে সুবিধা হচ্ছে, শিল্পীদের দূরদেশে পালিয়ে সৌখীন exotic চিত্র আঁকতে হয় না, নতুন জীবনের উল্লাস, নানা প্রদেশের নানারকম দৃশ্যপটে ও জীবনযাত্রায় চিত্র-করের জীবন্ত উপলক্ষ্য জোটে। এখনও অবশ্য ইম্প্রেশনিস্ট বর্ণতারল্য চল্‌তি, পিমেনভের ধারালো ব্যঞ্জনাতে তার আভাস। প্যারিস্ বা লণ্ডন যেমন মোনে, পিসারো, হুইস্‌লার প্রভৃতির ছবিতে লোকের চোখে লাগল, সোভিয়েট ইউনিয়নে তেমনি শিল্পের ম্যাজিকে সহর গ্রাম ঘনিষ্ঠ হ’য়ে উঠেছে। মস্কৌর মেট্রো রেলপথ, চেলিউস্‌কিন, মাগ্নিগুইন্ ক্রাশিনের মেরুদেশ, কলকারখানা, প্রাচ্যের চাইখানা ইত্যাদি সব ছবির বিষয়। পোর্ট্রেট চল্‌তি খুব, জেরাসিমভের কাট্‌জমানের সামোখভালভের চরিত্রদৃষ্টি প্রশংসনীয়। জর্জিয়া ইউক্রাইনে ও অন্যান্য অঞ্চলে চিত্রকলা বর্ধিষ্ণু। পোস্টার চিত্রের কুক্রিনিক্সি-নামে শিল্পী তিনজনের নাম বিখ্যাত। ক্রাভচেস্কো ফাভর্স্কিও উল্লেখযোগ্য চিত্রকর। মানের সার্থকতা যেমন পিমেনভে, দেগার যেমন জেরাসিমভে, তেমনি আধুনিক পশ্চিমে শিল্পকাঠিন্য বিপ্লবী বিষয়ে আবেগবান্ প্রাণবন্ত হয়েছে ডাইনেকার চিত্রে।

ভাস্কর্যে শোনা যায় সোভিয়েট শিল্প এখনও তেমন প্রতিভার পরিচয় দেয়নি। তবু কোরোলেভের প্রতিমূর্তিগুলি, লেবেদেভার সুকুমার মূর্তি নগণ্য নয়। মেকুর্‌রভ

বা নেরোভার স্টালিনও শক্তিশালী নিদর্শন। দিমিত্রি চাপাপিন্ বা ইভানভের বিস্ময়কর শক্তিও তুচ্ছ নয়। এঁরা অনেকেই সোশ্যালিস্ট সমাজের সন্তান, সামান্য শ্রমিক থেকে শক্তিবলে শিল্পীর শিক্ষাসুযোগ অর্জন করেছেন। তাই আশা হয় এই জীবনে যাঁরা monumental কীর্তি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, শিল্পেও তাঁরা সেই আধুনিক শিল্পের কাম্য monumentality প্রকাশ করবেন। তার বহু আভাস এরই মধ্যে শিল্পসাহিত্যের রচনাতে পাওয়া গেছে, তাই দেশবিদেশের শিল্পীরা সোভিয়েটে সম্মান ও মনোযোগ পান। রোলাঁ, মাল্‌রো, ব্লক্‌, ড্রাইসার, আণ্ডেরসেন্-নেক্সোয়ে প্রভৃতি তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুর মেলান। বর্নার্ড শ-ও তাই মস্কৌতে এক সভায় বলেন :

'We know that there have been many civilisations, that their history has been very like the history of our civilisation and that when they arrived at the point which Western capitalistic civilisation has reached, there began a rapid degeneracy, followed by complete collapse of the entire system and some thing very near to a return to savagery by the human race.···

'Now Lenin organised the method of getting round that corner. If his experiment is pushed through to the end, if the other countries follow his example and follow his teaching ··· we shall have a new era in history.···

'And that is what Lenin means to us. If the future is the future as Lenin foresaw it, then we may all smile and look forward to the future without fear. But if the experiment is overthrown and fails, if the world persists on its capitalistic lines, then I shall have to take a very melancholy farewell of you, my friends.

'I shall bid you farewell in any case, because I have already spoken quite enough.'

জনসাধারণের রুচি

"যাকে এক ভঙ্গিতে আকস্মিক বা এলোমেলো ঘটনা মনে হয়, আরেকদিক থেকে তাই স্ট্যাটিস্টিকাল্ বা সংখ্যাবিজ্ঞানের নিয়মে প্রকাশিত। নিউটনীয় বিজ্ঞানের স্বয়ম্ভরতা ও স্বাধীনতার অতিমাত্রা এখন সমষ্টিজীবযৌথ ঘটনাবলির পর্যালোচনায় রূপান্তরিত।··· যুদ্ধের আগে থেকেই উদারনীতিক ভাববাদীর বিজ্ঞানের চিত্র কল্পনাবিলাসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীন বৈজ্ঞানিক প্রায় লুপ্ত জীববিশেষ।"

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন একবার নিখিল ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞান সম্মেলনে বলেছিলেন যে বিজ্ঞানের সত্য যেমন এক হিসাবে সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যে সমীকৃত তত্ত্ব, তেমনি সংখ্যাবিজ্ঞানের তথ্যপ্রমাণ রসদ জোগায় আধুনিক মানুষের উন্নতির পরিকল্পনায়। ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানাগার এরই মধ্যে ১৯৩৫-৩৬ থেকে ১৯৪২-৪৪ অবধি প্রায় ১১৫৯ তথ্যানুসন্ধান এবং নানাবিধ বড়ো সুমারের কাজ করেছে। দেশের লোকের মধ্যে এ-কাজের গুরুত্ববোধ কেন এত কম জানি না। বিজ্ঞানাগার অবশ্যই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান নয়, ফলে তার আত্মসম্মান প্রচারকার্যের উঞ্ছবৃত্তিতে শেষ হয় না। কিন্তু আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় নৈরাশ্য কমবে আর বৈজ্ঞানিক মনোভাব বৃদ্ধি পাবে এবং সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্য আমরা নানাদিকে গ্রহণ করতে পারব। তত্ত্ব ও তথ্য, জীবন ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই এ-বিজ্ঞানের কাজ, প্রত্যক্ষের সমস্যায় এখানে রাশি-প্রত্যয়ের কূটচর্চা হয়। বলা বাহুল্য, আমরা বিজ্ঞানের অর্থ বিদ্যালয়ের নিরালম্ব মৃত ও নিরাপদ জ্ঞান বুঝি না। জে ডি বার্নলের ভাষায় বহুকাল হ'ল বিজ্ঞানের সীমা প্রসারিত। বিজ্ঞান এখন হয়েছে উৎপাদন-যন্ত্রের ও কৃষির একাত্ম অংশ। স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণে এর হাত, ব্যবসায় ব্যাঙ্কে আপিসে সরকারি কাজেও বিজ্ঞানের নির্দেশ। বিজ্ঞানের বিধিব্যবস্থাগুলি আর মনোনীত ভাবগুলিই একালের চিন্তা ও কর্মধারার রূপ নির্ণয় করে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানাগারের অনুসন্ধান ও সুমারির যে-তালিকা পাওয়া যায়, তাতে এই ব্যবহারিক সার্থকতা স্পষ্ট হবে, ১৯৪১-এ অনুসন্ধানের মধ্যে কৃষিসমস্যা ৮১, নৃতত্ত্ব ৩, অর্থশাস্ত্র ৩০, শিক্ষা ১৭, বন ৭, যন্ত্রশিল্প ১১, গণিত ১২, স্বাস্থ্য ২০, আবহতত্ত্ব ও জলসেচন ১৪ এবং অন্যান্য বিষয় ২০টি ছিল।

শুধু ব্যবহারিক সার্থকতা ধরলে নিঃসন্দেহ অন্যায় করা হবে। মহলানবিশের সমীকৃত বিস্তার নিছক বৈজ্ঞানিক অবদান, নমুনা-সুমারের পদ্ধতির বিকাশও বিজ্ঞানজগতে কলকাতার দান। আজকে শুধু জনসাধারণের রুচিসন্ধানে যে তিনটি সুমারি হয়েছিল, সাহিত্যের সামাজিক ঝোঁকে তার বিশেষ দাম ব'লে সে-বিষয়ে সামান্য কিছু আলাপ করা যাক্।

২

প্রথমত, এরকম কাজ যখন জড়প্রকৃতিতে সন্ধান হয়, তখন যেমন নিছক বৈজ্ঞানিক তথ্যই সন্ধানীর উপজীব্য হয়, তেমনি ব্যক্তি বা মানুষের সমাজঘটিত সন্ধানে একটি মূল্যস্বীকার আরম্ভেই করণীয়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯৪১ সালে *Modern Review*-তে জনরুচি বিষয়ে প্রবন্ধে এই পুরুষার্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ব্রাইসের মতো সকলকেই মানতে হয় যে অতি দীর্ঘকাল থেকে স্বীকার বা অস্বীকারের মধ্যে দিয়ে মানবসমাজ জনসাধারণের অধিকার কিছুতেই ভুলতে পারেনি। পারেনি ব'লেই তাকে গ্রীসে দাসপ্রথা গড়তে হয়েছে, ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রমের বিস্মৃতিকৌশল তৈরি করতে হয়েছে। কালস্রোতে ভেসে যায় সবই, শুধু থাকে জনসাধারণ, মৃত্যুহীন নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিসমষ্টি।

এ-কথা স্বীকারের পরে জনসাধারণের সাধারণ্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি হবে না। এবং এই আর্যসত্যের উপরে সংখ্যাবিজ্ঞানের নমুনা-সুমারের ভিত্তি। দশ হাজারের ভিড়ে তাই দুশো লোকের মন্তব্য শুনলেই রিপোর্ট যথাযথ লেখা সম্ভব। কথা উঠবে, সাংবাদিকের দলীয় দৃষ্টি যাবে কোথা? আর, ঐ দুশো লোক হয়ত হবে এককোণে ভিড় ক'রে ব'সে একটি দল। প্রতিকার সহজ। প্রথম কথা, একজন সাংবাদিকের একপেশে মন্তব্য এখানে মানছি না, মানছি বিশজনের ভিন্ন দৃষ্টি, পরস্পরকে কাটাকুটি ক'রে যেটা একটা ভারসাম্য পায়। তাছাড়া আছে সতর্ক হিসাবের ছক, যাতে একই জিজ্ঞাসায় বিশজন লোক বিশটি এলাকায় বা আলাদা-ভাবে চল্লিশটি এলাকায় ঘুরবে। স্বেচ্ছায় নয়, অতিসতর্ক ছকের নির্দিষ্ট এলোমেলো হিসাবে। কথাটা উঠবে ঐখানে, এলোমেলো কি হিসাবে প্রতিনিধি? কাপড়ের নমুনা যে-হিসাবে, এক চুপ্‌ড়ি আমের উপরে-নিচে এ-পাশে ও-পাশে যে-কোন পাঁচটা যে-হিসাবে। পক্ষপাত-সম্ভাবনা দূর করবার জন্যই এলোমেলো বাছাই।

১৯৪১-এ জনরুচি সুমারে তিনটি ভাগ করা হয়েছিল:

(ক) থ্যাকারের রাস্তার নির্ঘণ্ট থেকে কলকাতায় খাপছাড়াভাবে বাছাই

করা হয় ১৫০৩টি পরিবার বিস্তৃত প্রশ্নমালার উত্তরের জন্য।

(খ) অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহায্যে ৮৩০ জন রেডিও লাইসেন্সি ধরা যায় এক নম্বর সাধারণ সুমারের এলাকা থেকেই। তাতে ফলাফলের তুলনা করা সম্ভব হয়েছিল।

(গ) হ্যারিসন ও ম্যাজ্‌ প্রবর্তিত বিলেতি ম্যাস অবসার্ভেশন্ ধরনে ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও আলাপের মধ্যে দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল মুখ্যত মিত্রশক্তি, নিরপেক্ষ (১৯৪১ সালে নিরপেক্ষের সংখ্যা কিছু ছিল, সুইডেন তুর্কি ও স্পেন ছাড়াও, যারা বোধহয় আগামী বৎসরে মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করবে) এবং অক্ষশক্তির বেতারবার্তা বিষয়ে। এতে কলকাতায় ৩৮৬ জন লোক পরীক্ষা করা হয় এবং জগদ্দলে ১০১ জন। দ্বিতীয় সুমারে কলকাতা ছাড়া জগদ্দল এবং আসানসোলেও গণনা হয়েছিল।

৩

সংস্থানের দিকে, কলকাতায় সমস্ত ক্ষেত্রটি ছটি ভূগোল-এলাকায় বা মহলে ভাগ করা হয় এবং খবর আনেন প্রতি মহল থেকে তিনটি ভিন্ন সন্ধানী দল। ফলে একই মহল থেকে তিনটি স্বাধীন তথ্যের ত্রিবেণী পাওয়া যায় এবং সমস্ত ক্ষেত্রটাতে তাই খানিকটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ফলাফল সংগ্রহ করা যায়।

৪১-এর ২৩শে মার্চ রেডিও লাইসেন্সের ফর্দ লেবরেটরিতে পৌঁছায়। দু-সপ্তাহ কাটে নমুনার পদ্ধতিটা ঠিক করতে, অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিবারগুলি আর লাইসেন্সিদের বাছাই, এবং ক্ষেত্রকার্যের ছক তৈরি করতে। ১৬ই এপ্রিল তথ্যসংগ্রহ আরম্ভ ও ছয় সপ্তাহে শেষ হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চে ছোটোখাটো সংগ্রহের পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় পুরো সময়ের কর্মী দিয়ে। তারপরে চেষ্টা করা হয় বাইরের স্বেচ্ছাকর্মীর সাহায্য নেবার। দুটোর কোনটাই সুবিধা না-হওয়ায় কাজ ও অর্থব্যয় বিবেচনার পর শেষে লেবরেটরির কর্মীদেরই খণ্ডকর্মী হিসাবে প্রয়োগ করা স্থির হয়। বিবেচনা ক'রেই কর্মীর সংখ্যা বেশি করা হয়েছিল: কলকাতায় জন পঞ্চাশেক, জগদ্দলে ৫ জন, আসানসোলে ৪ জন। সংখ্যাধিক্যের একটা সুবিধা হচ্ছে তথ্যসংগ্রাহকদের ব্যক্তিগত মতামতের পক্ষপাত এতে পরস্পরকে নাকচ করে। তাছাড়া বেশি লোকের কাজটা জানা হয়ে থাকে, যাতে ক'রে ভবিষ্যতে যোগ্যতরদের বেছে নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নতালিকার উত্তর সংগ্রাহকেরা লিখেছেন পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীকে

জিজ্ঞাসা ক'রে। এই উত্তরই ব্যবহার করা হয়েছে যদিচ একই পরিবারে ইচ্ছুক অন্য ব্যক্তিদেরও উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছিল, সে পারিবারিক তুলনা এ-কাজের বাইরে। ইতিমধ্যে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে জনতানিরীক্ষার কর্মী বাছাই করা হয় সাধারণ বুদ্ধি ও শিক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা, বিবেচনা ও সামাজিকতা ইত্যাদির দিক থেকে। এ-কাজ কলকাতায় করেন আংশিক সময়ের কর্মী ২২ জন। মে-র শেষ সপ্তাহে ও জুনের প্রথমে এ-নিরীক্ষা সমাধা হয়।

তখনকার বড়ো খবর ছিল রুডল্‌ফ্‌ হেসের ইংলণ্ডে অবতরণ এবং জর্মানির সঙ্গে ভিশি-র বশ্যতাব্যবস্থা। বল্কান্‌ অঞ্চলে তখন জর্মান জয়যাত্রা। স্বদেশে তখনো সাতশ প্রদেশে লাটের শাসন চলছিল এবং কংগ্রেসের দাবিদাওয়া মেটেনি। তারপরে যুগোশ্লাভিয়ার পতন, আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সাফল্য, ইরাকে গোলমাল ও তৈলনলপথের ইংরেজি অধিকার, স্টালিনকে প্রধানমন্ত্রীপদে আরোপ, ক্রীটের যুদ্ধ, এবং এ-পক্ষে হুড্‌ ও-পক্ষে বিস্‌মার্ক জাহাজডুবি। পাট আর আরেক পোকার দুটি বিপুল সুমারির মধ্যে লেবরেটরির কর্মীদের এ-কাজ করতে হয়েছিল, সে-হিসাবে কাজটা খুবই দ্রুত বলতে হয়।

মোটামুটি, নমুনাগুলি মধ্যবিত্তশ্রেণীতেই আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, কারণ বেশির-ভাগ কর্মীই শুধু এই শ্রেণীর পরিচয় রাখতেন। তাছাড়া এই শ্রেণীই জিজ্ঞাসার প্রধান বিষয়। খবর নেওয়া হয়েছিল নিম্নোক্ত বিষয়ে : মেয়ে কি পুরুষ ; বয়স ; অবিবাহিতা, বিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা ; ধর্ম ; মাতৃভাষা ; শিক্ষা ; জীবিকা বা কাজ ; এবং আর্থিক অবস্থা,—শেষেরটি রোজগার কত এ অপ্রতিভ প্রশ্নের বদলে মাসিক সংসার খরচার হিসাব। রেডিও রিপোর্টে প্রশান্তবাবু বিশেষ ক'রে লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, আর্থিক অবস্থা এবং জীবিকার কী প্রভাব পছন্দ-অপছন্দ নির্দিষ্ট করে, সে-বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। অক্ষশক্তি মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ শক্তির যুদ্ধের বেতারসংবাদে রুচিভেদ আলোচনায় ধর্ম, ভাষা এবং প্রদেশও বিচার্য।

৪

রিপোর্ট থেকে সামান্য কিছু তথ্য-আলোচনা হয়ত পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি করবে না।

প্রথমে রেডিও ও দৈনিক সংবাদ ধরা যাক্‌। কলকাতায় সংবাদে অনুরাগ দেখা গেল পুরুষের মধ্যে শতকরা ৯১, মেয়েদের মধ্যে ৮৬। রেডিও থেকে সংবাদ পান পুরুষ শতকরা ৩৫, মেয়ে ৪৪। খবরের কাগজ থেকে সংবাদ পান পুরুষ শতকরা ৬৬, মেয়ে ৩৯। আর্থিক হিসাব এখানেও খাটে। ৪০ টাকা মাস খরচার দলে

রেডিও সংবাদ শোনেন শতকরা ১৭ এবং ৪০০ টাকার উপরের ভদ্রলোকেরা শতকরা ৪১। খবরের কাগজে খবর চান পুরুষ ৭১, মেয়ে ৩৫। সবসুদ্ধ রেডিও শোনেন মেয়ে শতকরা ৩৬·৪ এবং পুরুষ মোটে ১৯·৬। তেমনি আবার কখনও রেডিও শোনেন না, এমন মেয়ে শতকরা ৩৬·৪ আর পুরুষ ১৫·৪। মেয়েদের গার্হস্থ্যই অবশ্য এ-দুয়ের কারণ। এখানে বলা ভালো যে সাধারণ রুচি-সুমারের প্রশ্নমালার একটি হচ্ছে রেডিও নিজের ঘরে, পথে বা দোকান কোথায় শোনেন। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল খেলার খবর শ্রবণরত ভিড় পথে-ঘাটে দোকানের সামনে সন্ধ্যাবেলার সাধারণ দৃশ্য। বলাই বাহুল্য, কম মেয়েই বাড়িতে রেডিও না-থাকলে বাড়ির বাইরে গিয়ে রেডিও শোনেন। আর গল্পগুজব থেকে সংবাদ পান শতকরা ১৯·৪ অন্তঃপুরিকা, ম্যাট্রিক-পূর্ব ১২·২, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী শতকরা ২০·৫ এবং চল্লিশ টাকার তলায় ১৮·৪। বয়সের সঙ্গে রেডিও-সংবাদে আবেদন কমে, শোনায় ও চাহিদায় দুয়েই, যেমন বৃদ্ধি পায় আর্থিক উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে।

৫

এবারে রেডিও ও আমোদপ্রমোদ ধরা যাক্। রেডিও, সিনেমা, গ্রামোফোন এই তিন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। রেডিওর কপালে পুরুষ শতকরা ৪৬·৭ এবং মেয়ে ৫১.১ পাওয়া গেল, প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সিনেমায় যাতায়াত আছে এবং গ্রামোফোনের শ্রোতা মাত্র শতকরা ১৭·৮। অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রমোদশক্তি এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে না; হচ্ছে চাকুরিয়া গৃহস্থের সকাল-সন্ধ্যা খানিকটা গার্হস্থ্য-জড়িত. খানিকটা বিশ্রামঘটিত অভ্যাস। এ-হিসাবে রেডিওর আরো চল্‌তি হওয়া উচিৎ। না-হওয়ার বড়ো কারণ ভারতীয় দারিদ্র্য এবং আরেকটা কারণ নিশ্চয়ই য়ুরোপীয় অর্থে, একটি দম্পতির সাংসারিক সম্পূর্ণতা আমাদের দেশে এই সবে আসছে। এখনও ভারতবর্ষে ব্যক্তির স্বয়ন্তরতা জাতীয় অভ্যাসে দাঁড়ায়নি, একদিকে যেমন আমাদের public জীবন ব্যক্তিগত, তেমনি অন্যদিকে private জীবন পুরানো পঞ্চায়েৎ আর একান্নবর্তিতার জেরে আত্মীয় কুটুম্বের প্রতাপে প্রায় প্রকাশ্য বললেই হয়।

সেইজন্যই কি গৃহকর্তার কর্তৃত্বের সুযোগে রেডিওর ব্যবহার বয়সের সঙ্গে বেড়ে চলে? কারণ টেবলে মাননির্ঘণ্টে দেখা যায় যে শিক্ষার তারতম্যে এখানে প্রায় কিছুই আসে যায় না। সিনেমার প্রায় সমান চল্‌তি সব শ্রেণীতে। গ্রামোফোনের দুর্গতিতে দুঃখ লাগলেও অবাক্ হইনি। গৃহস্থের স্বাধীন উপভোগ বর্তমান লেখক

ও তার অনেক বন্ধুদের কাছে গ্রামোফোনেই সম্ভব, পছন্দসই ভালো রেকর্ড বাজারে পাওয়া যায় প্রচুর, শুদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীত আর তার চেয়ে অনেক বেশি য়ুরোপীয় সঙ্গীতের। কিন্তু এখানে দেখা যায় মনিহারি দোকানদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-জগতে গ্রামোফোনের সবচেয়ে খাতির—শতকরা ২৬।

আবার যদি শোনা আর শুনতে চাওয়ার তুলনা ধরা যায় তাহ'লে দেখা যায় বয়স, শিক্ষা অর্থ বা কর্মস্থান নির্বিশেষে আরো বেশি সিনেমা যাওয়ার এবং কম গ্রামোফোন ব্যবহারের বাসনা সুলভ। অভ্যাস নয়, পছন্দের দিক থেকে সিনেমা রেডিওর চেয়ে জনপ্রিয় বলা যায়।

৬

রেডিওর নমুনা-সুমারের বিষয়ে কিছু বলা দরকার। সে-সময়ের রেডিও আর্টিস্টদের পুরো তালিকা দেওয়া হয় প্রশ্নপত্রের এক পিঠে, অন্য পিঠে নানা দফায় প্রশ্ন ছিল। যথা, রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত, বক্তৃতা, ওস্তাদি সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি। "প্রায়ই" শোনন কি "মধ্যে-মধ্যে" শোনেন, "কদাচিৎ" বা "কখনো নয়"। তাছাড়া দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল "আরো বেশি" না "আরো কম" শুনতে চান। প্রশান্তবাবু ১৮ দফায় প্রশ্নগুলির বিচার করেছেন। সংক্ষেপে

যুদ্ধের খবর	শতকরা	৭৭.৪
মন্তব্য	„	৭৪.৪
আধুনিক সঙ্গীত	„	৭৮.৪
রবীন্দ্র „	„	৭৪.৪
যন্ত্র „	„	৭৩.৪
নাটক	„	৬৮.৮
ধর্মসঙ্গীত	„	৬৬.৩
ওস্তাদি সঙ্গীত	„	৪৫.১ ব্যক্তি শোনেন।

অবশ্য এর মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। ভিন্ন লোকের ভিন্ন প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব, যেমন সম্ভব দিনক্ষণের প্রভাব। সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় সবসময়ে সব দফা থাকে না, তাতে শোনার সুবিধা-অসুবিধা নিশ্চয়ই কমে-বাড়ে। নাটক যদি দুপুরে দেওয়া হ'ত, তাহ'লে শতকরা ৩৮.৮ গৃহস্থেরা ঘুম বাদ দিয়ে আর চাকুরিয়ারা অফিস কামাই ক'রে, কলকাতা বেতারের বিখ্যাত নাটক বা সঙ্গীতের ইতিহাসে কলকাতার কিম্ভূত সৃষ্টি "আধুনিক ভাবগীতি" শুনতেন কিনা

সন্দেহ। গ্রাম্যসঙ্গীত, শিশু ও মহিলা আসর, সঙ্গীতশিক্ষা আর গ্রামার্থে অনুষ্ঠান-গুলি যে কলকাতায় এত অপ্রিয়, তার মধ্যেও নিশ্চয় এ দুই কারণ বর্তমান। বোঝা শক্ত সঙ্গীতশিক্ষা কার উদ্দেশ্যে ? তাছাড়া আমাদের নমুনায় শিশু, মহিলা ও গ্রাম্যজন কমই ছিল। তবে রেডিও কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, থেকে-থেকে রেডিও অফিসে রাজবংশের পরিবর্তন, বা তাঁদের বন্ধুবৎসলতা এ-সবই নমুনা-সুমারের বাইরের ব্যাপার। তথ্যসংগ্রহে ঔচিত্যের পক্ষপাত নেই।

তাছাড়া অর্থের নানা দিক ধর্তব্য। বয়সের তারতম্যে রুচির পরিবর্তন লক্ষণীয়। আধুনিক সঙ্গীত শতকরা ৭০·৮ থেকে পঞ্চাশোর্ধ্বে ১২·২-তে পরিণত হয়, রবীন্দ্রসঙ্গীত ৬৬·৬ থেকে ২১·২। কিন্তু ভক্তির দাম বয়সে বাড়ে, ধর্মসঙ্গীত ২৫·০ থেকে ৫১·৫-তে ওঠে। ওস্তাদি গান আঠারো বছরের কনিষ্ঠদের মধ্যে শ্রোতা পায় শতকরা ১৬·৭, উনিশ থেকে পঁচিশ বছরের যৌবনে পায় ২৯·৯ এবং পঁয়ত্রিশের পরে মধ্যবয়সে নেমে যায় ১২·১-এ। যাকে রেডিও স্টেশনে তাঁরা হাস্যকৌতুক বলেন, সে দফা শতধারা ক্লিওপেট্রার মতোই বয়সে শুকোয় না। শিক্ষার সঙ্গে স্বভাবতই বক্তৃতাগুলির আদর বাড়ে। আধুনিক সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমাজে যথাক্রমে বেশি ও কম এবং বৃত্তিজীবী সমাজে কম ও বেশি চলে। মেয়েরা যে এত বেশি ঘরে ব'সে সাপ্তাহিক নাটক শোনেন, তার কারণ অবশ্য বাংলা ভাষায় রেডিও-নাট্যের বিকাশ নয়।

রিপোর্টে যথার্থই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে নৈরাশ্য এত গভীর যে অনেকেই কম-বেশি চাহিদার দফায় নিরুৎসাহ। সবই যেন কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এই ভোট না-দেওয়ার ব্যাপারেও বৈশিষ্ট্য আছে। অর্ধেকের বেশি লোক সংবাদ ও মন্তব্য বিষয়ে চাহিদার কম-বেশি জানিয়েছেন, মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি আলাপ বিষয়ে মতামত দিয়েছেন, শতকরা ৭০-এর বেশি লোকের রেডিওর শিশু, মহিলা আর গ্রাম্যজন অনুষ্ঠান বিষয়ে কোন উৎসাহ নেই। আবার আধুনিক ভাবগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত ভোট পেয়েছে শতকরা ৫০-এর বেশি লোকের কাছে। ভোট গণনায় যথাক্রমে দেখা যায় চাহিদা বেশি আধুনিক গীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, নাটক, যুদ্ধের খবর এবং ধর্মসঙ্গীতের। ওস্তাদি গানের সময় গড়পড়তায় দেখা যায় লোকে আরো কমাতে চায়। প্রসঙ্গত, মেয়েরা পুরুষের চেয়ে মহিলা অনুষ্ঠান, আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত

এবং নাটকের ভক্ত। আর তাঁরা খবর বক্তৃতা এসব বিশেষ পছন্দ করেন না। বয়স, শিক্ষা ও পেশা অনুসারে এইসব চাহিদার নানারকম তারতম্য ঘটে। পঞ্চাশোর্ধ্বে যেমন ভক্তিমার্গে মন যায়, ম্যাট্রিক্ পাস করার পরে তেমনি যুদ্ধ-সংবাদ ও মন্তব্য, বিদেশী সংবাদ, বিজ্ঞান, সাহিত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের দাবি বৃদ্ধি পায়। ঐ-সব দফায় দেখি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর অনুরাগ নেই, তাঁদের উৎসাহ নাটকে ও ধর্মসঙ্গীতে। বৃত্তিজীবীরা তার বিপরীত। ছাত্রেরা প্রায় সব দফাতে ক্ষুধার্ত। এবং এই চাওয়ার ক্ষমতায় ভূসম্পত্তিবানেরা ছাত্রের 'পরেই। ওস্তাদি গানের একমাত্র ভক্ত কিন্তু ভূসম্পত্তিবানদেরই বলা যায়, ওস্তাদি ঐতিহ্যের অবশেষ ও সময়ের প্রাচুর্য তাঁদের হাতে ব'লেই সন্দেহ নেই। গায়কের যে-দায়িত্ব রূপায়ণে বা ইণ্টারপ্রিটেশনে, সে দোভাষী দায়িত্বও বলা বাহুল্য ওস্তাদি গানে বেশি, যেমন বেশি রবীন্দ্রসঙ্গীতে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সৌকুমার্য গায়ক-গায়িকা সমাজে সুলভ, কিন্তু কণ্ঠশক্তির সাধনা ও ব্যক্তিত্বের আবেগ রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও রূপায়ণে একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু, কবির ব্যক্তিস্বরূপের প্রবল পটভূমিতেই সার্থক তাঁর গানের সুকুমার ব্যঞ্জনা।

৮

আঠারো দফার মধ্যে পাঁচটি সবচেয়ে বেশি পছন্দসই দফা কী, এ-প্রশ্নের গড়পড়তা উত্তরে প্রথম স্থান হ'ল আধুনিক গীতি নামক দফার, শতকরা ৫০·৬। রবীন্দ্রসঙ্গীত ৪২·৮, নাটক ৩৯·৪, যন্ত্রসঙ্গীত ৩৯·২, ধর্মসঙ্গীত ৩১·১, যুদ্ধের খবর ৩২·০ এবং বাকিগুলি পরীক্ষায় বিকল বললেই হয়।

একটা লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে শোনা এবং চাহিদার মধ্যে প্রভেদ। যুদ্ধ-সংবাদ শোনেন অনেকে, কিন্তু শ্রবণেচ্ছুক সংখ্যায় কম। সঙ্গীতশিক্ষার দফাতেও তাই। এ দুটি ঠিক সময়হরণার্থে প্রমোদও নয়। ওদিকে, নানাবিধ সঙ্গীত ও নাটকের বেলায় শোনার চেয়ে চাহিদা বেশি—হয়ত এগুলিকে আরো শ্রাব্য আর আরো সুবিধাকর সময়ে করা যেতে পারে ভেবে। রবীন্দ্রসঙ্গীত চাহিদার প্রমাণে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে কিন্তু শোনার কপালগুণে ষষ্ঠ। এর কারণ কি শিল্পীনির্বাচন আর রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাগে অতি অল্প সময় বিতরণ? প্রশ্নপত্রগুলি ঘাঁটলে মনে হয় শিল্পীর ব্যক্তিত্ব শিল্প দফার মহিমা বা মহিমার অভাব অনেক সময়ে নির্দিষ্ট করে। গ্রাম্যসঙ্গীতে নিরুৎসাহ কলকাতাবাসিনী তাই দেখি আব্বাসউদ্দীনকে নম্বর দেন। কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাধারাণী প্রভৃতি শিল্পীবিষয়েও পক্ষপাত দ্রষ্টব্য।

৯

রেডিও-র দাম ও মেক্ মিলিয়ে দেখলে হয়ত ভিন্ন-ভিন্ন স্টেশনের বেতারস্পষ্টতার উত্তরটি বেতারযন্ত্রকর্তার কাজে লাগতে পারে। দশটি বিদেশী, দশটি ভারতীয় বেতারকেন্দ্র বিষয়ে চারটি জিজ্ঞাসা ছিল : ভালো শোনা যায় কি চলনসই শোনা যায়, অস্পষ্ট না একেবারে শোনা যায় না। কলকাতার স্থমারে স্বভাবতই স্থানীয় কেন্দ্র প্রথম হয়েছিল—শতকরা ৯০। দিল্লী শতকরা ৪১। তারপরে একবারে সমুদ্র পারে যেতে হয়, তৃতীয় স্থান বি-বি-সি-র। চতুর্থ বোম্বাই। বিদেশী ফর্দে লণ্ডনের পরে আসে বের্লিন, টোকিও, চুং কিং। ইণ্ডো-চায়না শতকরা ১৬·২, ফ্রান্স ১৩·০, সোভিয়েট ইউনিঅন ১২·৫, তুর্কির শ্রোতা কলকাতায় শতকরা ৮·৪।

এরপরে আমার সংক্ষিপ্তসারে অক্ষ, মিত্র ও নিরপেক্ষ শক্তির যুদ্ধসংবাদ ও মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আসা যাক্। এ-সন্ধানে অনেকেই জবাব দেওয়া সঙ্গত মনে করেননি। তবু কলকাতায় শতকরা ৬০ আর জগদ্দলে শতকরা ৬৭ জনের মতামত পাওয়া যায়। প্রশ্ন ছিল তিনটি পক্ষের বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে—ইনটরেস্টিং, বিশ্বাস্য এবং প্রপাগাণ্ডা হিসাবে সার্থক কিনা।

মনে রাখবেন, সময়টা ১৯৪১। কাজেই বেশি লোকের কাছে যে শত্রুর বেতারঘোষণা মনোজ্ঞ বিশ্বাস্য, তাতে আশ্চর্য কি? অনেকের পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে আর্থিক প্রাদেশিক ও ভাগফলটা। রেওয়াজ যে বাংলাদেশেই জর্মান-প্রীতি সমধিক ছিল নিম্ন এবং মধ্যবিত্তে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার উপর-তলায় বেশি আস্থা ছিল বটে নিরপেক্ষ বেতারবার্তায়, তবে মাসিক চারশো টাকার উপরে গেলে ফ্যাসিস্ট ক্ষমতা, সত্যবাদিতায় ভক্তি বেড়ে ওঠে। আবার বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে মিত্রপক্ষ ও নিরপেক্ষ বেতারে আস্থা বর্ধমান। যুক্তিযুক্তভাবে বৃত্তিভোগী বা পেশাজীবীরা নিরপেক্ষ সংবাদে নির্ভর করেন, তারপর মিত্রশক্তির আত্মপ্রচারে। যে ভাগ্যবান ব্যক্তিরা বিনাকর্মে কালাতিপাত করেন, তাঁরা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বহুবিধ বাঁধা চাকুরিয়া নিছক মিত্রশক্তির অনুরাগী। মেয়েদের কৌতূহল কিন্তু নাৎসি আবেদনে। মুসলমান নমুনা সংখ্যায় সামান্য হ'লেও, প্রতিনিধিমূলক বলা যায়। মুসলমান প্রতিক্রিয়া শত্রু-বেতারের পক্ষেই গিয়েছিল। তেমনি অবাঙালির সংখ্যা-স্থমারে তথা কলকাতাতে কম হ'লেও মতামতের তারতম্য বিস্ময়কর। হিন্দি, উর্দু ও মারাঠি ভাষীরা দেখা যায় বাংলাভাষীর চেয়ে বেশিরকম অক্ষশক্তিকে বিচক্ষণ ভাবেন। প্রাদেশিক ভাগে এই সংক্ষিপ্ত টেব্‌ল্‌টি পাঠকের কৌতূহল জাগাতে পারে :

	মনোজ্ঞ			বিশ্বাস্য			সার্থক প্রচার		
	শত্রু	মিত্র	নিরপেক্ষ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ	শত্রু	মিত্র	নিরঃ
আসাম	১০০	০·০	০·০	১০০	০·০	০·০	৫০	০·০	০·০
বাংলা	৫৪·৮	২৮·০	১৭·২	৫৪·৯	১৮·৯	২৬·২	৬১·০	২৮·৫	১০·৫
বিহার	৯৩·৩	৬৭·০	০·০	৮৬·৭	১৩·৩	০·০	৯২·৯	৭.১	০·০
বোম্বাই	৬০·০	২০·০	২০·০	৫৫·৬	৩৩·৩	১১·১	৮৮·৯	১·১	০·০
মধ্যপ্রদেশ	৬৬·৭	৩৩·৩	০·০	১০০·০	০·০	০·০	১০০·০	০·০	০·০
মান্দ্রাজ	০·০	১০০·০	০·০	০·০	০·০	০·০	০·০	০·০	০·০
পাঞ্জাব	১০০·০	০·০	০·০	৬৬·৭	০·০	৩৩·৩	১০০·০	০·০	০·০
ত্রিবাঙ্কুর	৭৫·০	০·০	২৫·০	৫০·০	৫০·০	০·০	৭৫·০	২৫·০	০·০
যুক্তপ্রদেশ	৭৬·২	১৪·৩	৯·৫	৬৩·৬	১৩·৬	২২·৭	৭৬·২	১৯·০	৪·৮

সাধারণভাবে বলা যায় যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া মোটামুটি বেশিরভাগ মতই অক্ষশক্তির বেতারবার্তার পক্ষে যাচ্ছে—বা ১৯৪১-এ যাচ্ছিল।

বহু কাজ এখনো করা যায় শুধু এই রেডিও-সুমার নিয়েই। তাছাড়া জনরুচির সাধারণ সুমারে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান মিলবে। ইংরেজি লেখকসূচি, বাংলা লেখকসূচি, ইংরেজি ও বাংলা ফিল্মসূচি মিলিয়ে বেশ সামাজিক মানস ও সংস্কৃতির ছক পাওয়া যায়। যিনি এড্‌গার ওয়ালেসের ভক্ত তিনি কি দীনেন্দ্র-কুমার রায়েরই ভক্ত না অনুরূপা দেবীর ও / বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরও? এমিল্ জোলা, মারি আঁতোয়ানেৎ ও কিং কং ফিল্ম কী ক'রে একই সঙ্গে প্রিয় হয়? বা ষ্টিভন্ স্পেণ্ডর ও এড্‌গার ওয়ালেস্? আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের কৌতূহলও জাগতে পারে যেমন—বুদ্ধদেব বসু ও সজনীকান্ত দাসের পরিচিতি এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সমর সেনের আপেক্ষিক পাঠকের অভাব। তাছাড়া বিধবাবিবাহ, বিপত্নীকবিবাহ, স্বগোত্রবিবাহ ইত্যাদি বিবাহ বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনার বস্তু আছে। আরেক জিজ্ঞাস্য হচ্ছে বোম্বাইয়ের কংগ্রেস ঐক্য বিষয়ে, এবং জাপানের ও আমেরিকান যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনার বিষয়। খেলাধুলা, রোজকার পাঠ্য খবরের কাগজের নাম, বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা বিষয়ে মতামত—চা কফি ইত্যাদি নেশা, এলোপ্যাথ্যাদি চিকিৎসাপদ্ধতির পক্ষপাত। সাধারণ সুমারের একটি ভাগ হচ্ছে কোষ্ঠী-বিচার ও কর-বিচার: বিশ্বাস আছে কিনা, নিজের বা অন্যের ক্ষেত্রে মিলেছে কিনা প্রভৃতি প্রশ্ন। এর সঙ্গে লেবরেটরি থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র যে-সন্ধান হয়েছিল, দুটি মিলিয়ে অসহায় বাঙালির অতিপ্রাকৃতে আস্থার উপরে মূল্যবান্

একটি বই লেখা যায়। ১৯৪১-এ নমুনা-সুমারে দেখা গিয়েছিল যে কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে দুই-তৃতীয়াংশ লোকের ঠিকুজি আছে এবং এক-তৃতীয়াংশের আছে গণনায় বিশ্বাস। ১৯৪২-এ এক শিশুসদনে ৩০০ শিশুর জন্ম ও অকালমৃত্যু জ্যোতিষ গণনার সঙ্গে মেলানো হয়েছিল।

উপরের সামান্য আভাসেও বোঝা যাবে, আমাদের জীবনের নানা সমস্যায় সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যের মূল্য কতখানি। বিংশ শতাব্দীর মানুষের সমস্যা অভূতপূর্বভাবে বিরাট ও জটিল, তার সমাধানও কঠিন ও সমষ্টি-সাধ্য। তবু— বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কথাতেই শেষ করি :

কোন সমাধান যে হ'তে পারে সে শুধু বিজ্ঞানের বৃত্তি ও বিজ্ঞানের নানা পদ্ধতির বিকাশের জন্যেই সম্ভব। বিশ্বব্যাপী মানুষের পুনর্গঠনের বীজ এরই মধ্যে সেখানে রোপিত। আমরা আজ প্রয়োজনীয় যা-কিছু দ্রব্য সবই তৈরি করতে পারি, বিতরণের ব্যবস্থাও আমাদের আয়ত্তে, বিতরণের জন্য দেশে-দেশে যোগা-যোগ নির্মাণ আজ সম্ভব। আর তার চেয়ে মূল্যবান্ হচ্ছে বিজ্ঞানের আহরিত সেই জ্ঞান, যাতে আমরা অনুসন্ধান করতে পারি, পারিমাণ করতে পারি একটা মানবসমাজের পরিবর্তনশীল নানা প্রয়োজনের মতো বিরাট ও জটিল তথ্য।

হাল্‌কা-কবিতা

The Oxford Book of Light Verse, chosen by W. H. Auden.

কোন-কোন যুগে সাহিত্য উচ্ছল হ'য়ে ওঠে প্রাচুর্যে, কোন যুগে বা হয় ক্ষীণকায়। বিষয়বস্তু বা লিখনরীতি সব যুগে একরকম হয় না, কখনো কাব্য হয় অনায়াস, কখনো-বা দুর্বোধ্য কঠিন। অডেনের মতে এ-সবের কারণ খুঁজতে হবে কবিদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছেড়ে অন্যত্র।

কারণ কালাতীত কারয়িত্রী প্রতিভাই শুধু সর্বযুগের কবিদের সাধারণ সম্পদ। ভাষামার্গ, কথ্য ও লেখ্যভাষার প্রতি পক্ষপাত, প্রত্যক্ষপ্রয়োগ, শ্রোতাদের গুণাগুণ ইত্যাদি সবই পরিবর্তনশীল রুচির গতিবিধি। কবির মুক্তি অবশ্য সত্যভাষণেই, বন্ধুবান্ধবকে আনন্দদানেই। কিন্তু সে-সত্যের রূপ আর সে-বন্ধুদের কুলশীল-নির্ণয়ের ভার সমাজের এবং অংশত হয়ত কবির জীবনযাত্রার উপরে। যখন কবির প্রত্যক্ষপ্রজ্ঞার জগৎ সমাজচৈতন্যের অখণ্ডতায় মোটামুটি পাঠকের জগতে সাযুজ্য লাভ করে, তখন কবি বহুর এক হয়, তার ভাষা হয় সরল, মুখের ভাষার পাশ-ঘেঁষা, রুচির প্রগতি হয় বাঁধাসাধা। ছিন্নভিন্ন সমাজে কবি হ'য়ে ওঠে কবিবিশেষ, তার ভাষা হয় বিশেষজ্ঞের, তাকে অস্থির হ'য়ে বেড়াতে হয় চৌষট্টি সতীতীর্থে। অডেনের মতে প্রথম অবস্থায় লাইট্‌ বা অনায়াস বা লঘু কবিতার সম্ভাবনা। এই কাব্যশরীরে অনায়াস কবিতা মর্মে-মর্মে জীবনবেদে গভীর হ'তে পারে। লঘু কবিতা বলতে অনেকে যে ভাঁড়ামি বা ইয়ারকি বা সামাজিক পদ্য বোঝেন, তার কারণ রোমান্টিক উজ্জীবনের পরে সমাজবিপ্লবের ফলে কবি ও পাঠক এতই বিচ্ছিন্ন যে কবিদের গম্ভীর আত্মস্থতা থেকে ছুটি নিলে শুধু এই খেলো হাসিতে, নাগরিক আলাপের মৌখিকতায় বা ঠুনুকো ব্যঙ্গেই নামতে হ'ত।

কিন্তু চিরকাল এমনি ছিল না। এলিজাবিথান্‌ যুগ পর্যন্ত প্রায় সব কবিতাই অনায়াস ছিল। ধর্মের ঐক্যে, জগচ্চিত্রের একতায়, জীবনযাত্রার রীতি পরিবর্তন যতদিন ক্রমিক মন্থর ছিল, ততদিন কবি-পাঠক ছিল সমগোত্র। এলিজাবেথের সময় থেকে নটরাজের পদক্ষেপ হ'ল দ্রুত এবং সম্ভব হ'ল সেক্সপীঅরের কিছু-কিছু এবং ডন্‌ প্রভৃতির কঠিন কাব্য। দুর্বোধ্যতা সর্বদাই নিন্দনীয় নয়। কারণ লঘিমা-

সিদ্ধি যতই লোভনীয় হোক্, এ-কথাও সত্য যে, সমাজচৈতন্যের একতার জন্যই লঘু-কাব্য ক্রমে হ'য়ে দাঁড়ায় মামুলি রক্ষণশীল সমাজের আত্মপ্রীতির আওতায় সংকেতিত বা অভ্যাসিক। আপনকালে গতানুগতিক কৃতার্থে কবি তখন চিরকালের মানবিক পুরুষার্থকে দেয় বিসর্জন। তাই সমাজ যতই অস্থির হয়, কবি যতই সমাজ থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়ে. তার দৃষ্টি ততই স্বচ্ছ হয়। কিন্তু সেই পরিমাণেই তার প্রকাশ হয় দুরূহ। কদাচিৎ এমন যুগও থাকে যখন এই দুয়ের দোটানায় একটা প্রচণ্ড ভারসাম্য আসে এবং এলিজাবিথান্ যুগের এই সৌভাগ্য হয়েছিল এবং হয়ত আজকাল সেরকম যুগের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

সপ্তদশ শতকে দেখি ধর্মের মতো কাব্যেও উৎকেন্দ্রিক লীলা চলছে। স্পেন্সর্‌কে বাদ দিলে মিল্টনকেই বলা যায় প্রথম আত্মসর্বস্ব উন্মার্গ কবি। এই ছন্নছাড়া ভাব হর্বার্ট, ক্র্যাশ প্রভৃতির কাব্যে, ব্রাউনের গদ্যেও দ্রষ্টব্য। এক মার্ভেলেই কিছু এবং হেরিকেই ঐতিহ্যের প্রভাব বর্তমান।

রেস্টোরেশনে আবার সমাজ দানা বাঁধল—যদিচ শুধু সমাজের উপরতলায়, উজ্জীবিতরাজ্যের আশেপাশে। কবির মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। ড্রাইডেন্ এবং পোপ্ তাই অবলীলায় কবিতা লিখলেন। সীমাবদ্ধ তাঁদের কবিতা, তাঁদের পাঠক-সমাজের মতোই। কিন্তু সেই গণ্ডীর ভিতরে তাঁদের বিচরণ কম-বেশি স্থিতধী, স্বচ্ছন্দ।

তারপরে রোমান্টিকদের পালা—যান্ত্রিক বিপ্লবে ছত্রভঙ্গ, অস্থির। গ্রাম হ'ল গৌণ, সমাজ হ'ল সহুরে, বিবাহে সম্পর্ক স্থাপন না-করলে বা কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী না-হ'লে মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ রাখা দুরূহ হ'য়ে উঠল। শ্রেণীবিভাগ হ'য়ে উঠল বহুধা আর আরো ধারালো। চাকুরিয়া বা জমিদারদের দায়িত্ব ঘাড়ে না-পেতেই হ'ল এক নতুন শ্রেণী—ডিভিডেণ্ডজীবীর দল। যেন জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা বা লালগোলা বা শোভাবাজারে আর কবিদের আসন পড়ল না, পাঠক হ'য়ে দাঁড়াল অপরিচিত মিশ্র এক জনসাধারণ নামে নির্বিশেষ প্রত্যাহার। 'লিরিকল্‌ব্যালাড্‌সে'র প্রস্তাবে এর আলোচনা পঠিতব্য। ফলে কবিরা সমাজের দেয়ালে মাথা ঠোকা ছেড়ে মন দিলেন আত্মচর্চায়, অথর্ববেদ ছেড়ে বেদান্তে। ফলে ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ পোপের চেয়েও সৌখীনমার্গে লিখলেন তাঁর স্তবগুলি, আত্মজীবনীর নাম দিলেন—"এক কবির মনের বিকাশ"। রোমান্টিকেরা সবাই ছুটলেন ঘরকে করতে বাহির, কেউ নিসর্গে কেউ স্বর্ণভবিষ্যতে, কেউ অতীতের মায়াকাননে, কেউ-বা নিরালম্ব কাব্যের সাত্ত্বিক তপোবনে।

কবির কাজের চেহারাও গেল বদ্‌লে, কবিতা হ'ল গৌণকথকের অরণ্যে-রোদন। ব্যক্তিগত জগতে কিছুকাল চলল ঘোরাফেরা, আবিষ্কার ও আত্মজ্ঞানের সীমা এসে মিশল মনোবিশ্লেষণে। নব্যসমাজতন্ত্রের বামাচারীই আজ ভরসা। কারণ ডিভিডেণ্ডজীবীদের ভবিষ্যৎও আজ শ্রমিকদের উদ্যত বাহুতে নির্দিষ্ট।

কিন্তু এর মধ্যেও লঘুকাব্য জন্মেছে। চাষাসমাজে বর্নস্‌ আর বনেদি বায়রন্‌ দুজনেই স্কচ্‌। কিন্তু বর্নসের সমাজে চল্‌তি ছিল বহু একতার ধারা—ধর্মে, লোকাচারে, লোকসঙ্গীতে। ফলে বর্নসের বিহার ব্যাপক, কান্নাহাসির জগৎ তাঁর প্রত্যক্ষ ও কৈবল্যে অভিন্ন। কিন্তু বায়রন্‌কে হয় শুধুই গর্জন বা মজা করতে। কাব্যের অন্তরঙ্গ গাম্ভীর্য বা কবিত্ব তাঁর নেই, কারণ স্মার্ট সমাজে সে-বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাই প্রীডও প্রাঅরের চেয়ে অসার।

তারপরে উনিশ শতকে দেখা যায় গ্রামসম্পর্ক ছিঁড়ে যাওয়ায় জ্ঞাতিকুটুম্বহীন ব্যক্তিদের একমাত্র নিরাপদ ও প্রকাশ্য সম্বন্ধ দাঁড়ায় পিতামাতা ও শিশুর সম্বন্ধ। সেই ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠল শিশুসাহিত্য ও নন্‌সেন্স-কাব্য। অবশ্য লোকসাহিত্য চিরকালই রয়েছে, কিন্তু সমাজের ঘূণ তাতেও ধরেছে। তাই সেকালে যে ট্রাজিক্‌ মাহাত্ম্য বর্ডর্‌-ব্যালাডেও পাওয়া যেত, তা একালের গানঘরের পালাগানে দুর্লভ। তাই এখন মনঃসম্পন্ন অনায়াস কাব্য লিখতে গেলে গা ভাসাতে হয় কোন প্রবল শ্রেণীস্বার্থের নির্দিষ্ট স্রোতে। কিপলিং মধ্যবিত্তের সাম্রাজ্যবাদে ডুবে তাই করেছিলেন। এবং বেলক্‌ ও চেস্টরটন্‌ রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌।

আজকে তাই কবিকেও নিজের গরজে ভাবতে হয় ভাবীসমাজের প্রয়োজন, যেখানে অন্যায় সুযোগের পক্ষপাতে জাতভেদবুদ্ধি থাকবে না। সচেষ্ট চৈতন্যেই তার সম্ভাবনা, নচেৎ আজকে তার অধঃপতন। সেই সমাজের একতানির্দিষ্ট স্বাধীনতাতেই সম্ভব বয়স্কবুদ্ধিসম্পন্ন অনায়াসবোধ্য বা লঘুকাব্য। এবংবিধ মুখবন্ধ যাঁদের অভিরুচিমতো নয়, তাঁদেরও কিন্তু চয়নিকাটি ভালো লাগবে তার বহুবিধ কবিতার সন্নিবেশে। অনেক কবিতা নতুনও লাগতে পারে—'দি মেজরও মাইনর প্লেসর্‌স্‌ অব লাইফ', 'দি উইক্‌-এণ্ড বুক', 'দি বুক অব্‌ লাইট্‌ ভর্‌স্‌' সত্ত্বেও। বইটি আরম্ভ "দি সং অব্‌ লিউইস্‌" দিয়ে:

> Richard, that thou be ever trichard,
> tricchen thou shalt be nevermore.

সব শেষ ক'রে স্কেলটন্‌:

By Saynt Mary, my lady,
Your mammy and your daddy
Brought forth a godely baby।

ডনবরের কবির লড়াই বা "Flyting" কবিতাটিও বর্তমান। মধ্যে অজস্র নামকরা, কম নামকরা কবির কবিতা ও বহু নামহীন কবিতা ও গান শেষ ক'রে এসে পড়া যায় বেলক্, চেস্টরটন্ প্রভৃতিতে। সওয়া পাঁচশ পৃষ্ঠার চয়নিকার প্রতি সুবিচার উদ্ধৃতিতে সম্ভব নয়, যার বৈচিত্র্যের মধ্যে লিডেল এবং স্কটের গ্রীক অভিধান শেষ করার উপলক্ষে হার্ডির মজার কবিতা নির্বিবাদে খাপ খেয়ে যায় লিঅর্ বা ক্যরলের সঙ্গে বা অনামী কবির এই উপদেশের সঙ্গেও :

Then to each gay flighty wife may this a warning be,
Don't write to any other man or sit upon his knee ;
When once you start like Mrs. Maybrick perhaps you couldn't stop,
So stick close to your husband and keep clear of Berry's drop.

অথবা এডমণ্ড ক্লেরিহিউ বেণ্টলির :

What I like about Clive
Is that he is no longer alive,
There is a great deal to be said
For being dead.

গদ্যকবিতা

শ্রীসমর সেন প্রণীত ও প্রকাশিত 'কয়েকটি কবিতা ও গ্রহণ'।

চিরাচরিত কাব্যে অভ্যস্ত আমাদের পক্ষে নতুন কোন কাব্যরূপ ভাবনার বিষয় হ'য়ে ওঠে। শ্রেণীবিভাগের সহজ চেষ্টায় তখন কাব্যপাঠ হ'য়ে ওঠে বিড়ম্বনা। বিশেষ ক'রে বাংলা গদ্যকবিতার প্রথম সাক্ষাতে। কারণ ইংরেজি গদ্য আর পদ্যের চেয়েও বাংলা গদ্য আর পদ্যের মধ্যে বিরোধ বেশি; রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ এবং আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ তুলনা করলে এই লজ্জাকর সত্য বুঝি। অথচ গদ্য ও পদ্য শত্রু নয়, সে-কথা বুঝতে সংস্কৃত অলংকার বা এরিস্টটলের কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এবং গদ্য ও পদ্যের এই আপাতবৈষম্য দূর করতে যিনি পুরোধা, সে-মহাকবির কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই আমাদের অভ্যাস।

সাধারণ জীবনে যদি সাহিত্যের ভিত্তি গাঁথতে হয়, তাহ'লে যে বাংলা কবিতার নিতান্তই কবিজনোচিত ও উন্মার্গ সৌখীন চাল পরিত্যাজ্য, সে-বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এবং যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে, ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলা কবিতার যাতায়াত রুদ্ধ। আর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ-বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কবিতার পাঁচিল তিনিও ভাঙেন না, দরকারমতো শুধু গদ্যকে চমৎকার কাব্যমণ্ডিত ক'রে পাঙক্তেয় করেন। কিন্তু কায়স্থরা পৈতা ধরলেই কি সমাজ-সংস্কার শেষ? বিকালে এলবার্ট হলে বক্তৃতা দিয়ে বা চাঁদা দিয়ে ফ্রি রীডিংরুম ক'রে, সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুমে নাগর-জীবন যাপন করার মতোই এ-সংস্কার লিবারল মাত্র। রবীন্দ্রনাথের আগেকার নানা গদ্য লেখায়, অবনী ঠাকুরে, এমনকি রমেশ দত্তের 'জীবনসন্ধ্যা'য়, স্বভাবতই এই গদ্যচর্চা ঘটেছে। তফাৎ শুধু এই হয়ত যে সেকালে বড়ো-বড়ো গদ্যরচনায় এই রঙিন অংশগুলি অংশমাত্র, আর একালে এগুলি সর্বস্ব ক'রে লিখলে ও লাইন ভাগ ক'রে ছাপলে তাদের নাম দেওয়া হয় গদ্যকবিতা।

একান্ত সুখের বিষয়, সমর সেনের কবিতায় সংস্কারের অন্যদিকে সম্ভাবনা আছে। তিনি ফর্মের দিক থেকে, আমাদের দুর্ভাগ্যত, কবিতা থেকে গদ্যে, গদ্য থেকে কবিতায় না-গেলেও তাঁর ভাষাব্যবহার কবিতারই, গদ্যের নয়। ভাষা তাঁর

অবশ্যই গদ্য ব্যাকরণের, কিন্তু তার প্রয়োগরীতি কবিতার মতো ঐন্দ্রজালিক, গদ্যের মতো বিতর্কবাহক নয়। প্রত্যয়প্রতিজ্ঞায় তাঁর মন চলে না, তাই তাঁর গদ্য কাব্যালংকারে মণ্ডিত হ'য়ে নিজেকে ও পাঠককে স্তম্ভিত করে না; তাঁর কবিতার আধার স্বকীয় জগৎ বানিয়ে প্রজ্ঞাপথে এসে সাক্ষাতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ীর সম্পূর্ণ সাযুজ্য তাঁর কবিতায় ঘটে, ফলে হয়ত ক্রোচের মতেই, কবিতা আর তার ভাষায় আলংকারিক বুদ্ধির স্থান থাকে না। থাকে-থাকে গদ্যপন্থী নির্বাহকাব্যে বাক্যবহুল তাই সমর সেনকে হ'তে হয় না, নাটকের পাত্রপাত্রীর মর্মোক্তির মতোই তাঁর কবিতা আমাদের সামনে একেবারে আবির্ভূত হয়। এই হিসাবেই পাউণ্ডের গদ্য-কবিতা কবিতাপন্থী আর হুইট্‌ম্যানের কবিতা গদ্যপন্থী বলতে হয়। সমর সেনের যে-সব কবিতায় বিষয়মাহাত্ম্য নেই, সেরকম একটি কবিতারই সঙ্গে, ধরা যাক্ 'পুনশ্চ'র কোন কবিতা, যথা "কোপাই" নামে কবিতার তুলনা করলে কথাটা স্পষ্ট হবে।

ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ;
বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কিসের হাহাকার।
ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি
নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।

ঘনায়মান অন্ধকারে
করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল
দীর্ঘ দ্রুত যান—
বিদ্যুতের মতো :
কঠিন আর ভারি চাকা, আর মুখর—
অন্ধকারের মতো সুন্দর
অন্ধকারের মতো ভারি।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে দেখি;
দেখি আর শুনি

গন্ধস্নিগ্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার :—
অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ,
দীর্ঘ লৌহরেখার সহসা শিহরণ—
আর অস্ফুট শীর্ণ বহুদূরে কিসের আর্তনাদ
কঠোর কঠিন।
বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কিসের হাহাকার।

এ-কবিতাতে বিষয় মহৎ নয় এবং আবেগতাপও প্রবল নয়। সেই কারণেই এর কাব্যগুণ স্পষ্ট। আর এ-কথাও বোঝা যায় যে সমর সেনের কাব্যলোকের জলবায়ুও একান্তই কবিতার, রবীন্দ্রনাথের কবিতাগানের। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোন কবিতার নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা ও গান এবং 'লিপিকা', "শরৎ", "আষাঢ়" ইত্যাদি নানা লেখার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত সমাজব্যাপী যে বর্তমান আবহ, সেই জলবায়ুই তাঁর সার্থক পটভূমি। সমর সেনের কবিতা যে কোন লোকোত্তর শূন্যের জীব নয়, সেইটেই তাঁর কীর্তির সূচনা। তাই তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথ-লালিত ক্লান্ত করুণ বিষাদ শালমহুয়া-বনে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে-ডালে, চাঁদের পাণ্ডুর আলোয়, পাহাড়ের দূর নীলে, সহরের এলোমেলো গলিতে, দূর দিগন্তে স্থিতি পায়। আর সে-স্থিতি স্বকীয় ভারসাম্য পায় কবির নিজের প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক দেহবিতৃষ্ণা আর ফিলিস্টাইন শরীরসর্বস্বতার দ্বন্দ্বে আতুর ক্লান্ত আবেশে এবং সমাজজীবনের মর্মান্তিক ব্যর্থতাবোধে। এই ব্যর্থতাবোধের সম্ভাবনার জন্যই সমর সেনের বর্তমানে ক্ষান্ত না-হ'য়ে পাঠকেরা তাঁর ভবিষ্যতে আশান্বিত।

ব্যক্তিস্বরূপের কী কৈবল্য থাকলে প্রথম যৌবনের আবেশকে জগচ্চিত্র না-ভেবে সেই রোমান্টিকমন্যমাত্র ভাবকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তা হঠাৎ কল্পনা করা শক্ত। কিন্তু যখন এদিকে মোহিতলাল বা ওদিকে জীবনানন্দ দাশের মতো দক্ষ কবিকে এই সঙ্গতির অভাবে পীড়িত দেখি, তখন এই নবীন কবিকে প্রশংসা করতেই হয়। এবং এতই সৎ এই কবির ব্যক্তিস্বরূপ যে তাঁর মধ্যে এই শ্রেণীবিরোধের ব্যথা গোপনই আছে—কারণ তাঁর নিজের কবিপরিণতি, আর বাংলা কাব্যের বিকাশে এ-ব্যথা এখন শিকড়ই গাঁথতে পারে, স্বভাবত বনস্পতি হ'য়ে উঠতে পারে না। অথচ এই বিষয়ে আত্মবঞ্চনার লোভ সমর সেনের মতো সজাগ কবির কাছে যে-বেগে আসতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। মার্ক্স এবং প্লেখানভের অনুমোদন কবিরই পক্ষে, শিষ্যেরা যাই বলুন।

তাই সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নেতিতেই উৎস খোঁজে। ফলে অন্যমনস্কের কাছে 'কয়েকটি কবিতা' একঘেয়ে লাগতে পারে। তার যথার্থ কারণও আছে। যথারীতি পদ্য এবং সংস্কৃতজ্ঞ গদ্যের গম্ভীর তালমানবিলম্বিত ছন্দের সফল প্রয়োগে যে-বৈচিত্র্য ও প্রচণ্ড জোর পাওয়া যায়, তা সমর সেন অবহেলা করেছেন। তাঁর নেতিবাচক ছন্দ আর ভবিষ্যতের প্রবলসম্ভাব্যঞ্জক ছন্দ একই রেশে বাজে। 'কয়েকটি কবিতা'য় তিনি ভিন্ন প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু "১৯০০", "বসন্তের গান", "একটি প্রেমের কবিতা", "সিনেমায়", "মেঘদূত" ইত্যাদি কি এদিক থেকে অন্যথা নয়? অবশ্য শিথিলসমাধি সব লেখকেরই হয়। আর গদ্য-কবিতায় মুশকিল হচ্ছে যে এখানে কোন অধিদৈবত প্রমাণ বা প্রতিমাণ নেই, এমনকি কোন কবিনিরপেক্ষ সংকেতিত মার্গও নেই। তাই কবির আবেগ এবং পাঠক এখানে মুখোমুখি ব'লে কান দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে বিপদে পড়ে। এবং সমর সেন যখন কাব্যের এই archetypal pattern বা কৈলাসভাবনাহীন ক্ষুরধার পথই নিয়েছেন, তখন তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। প্রথম কবিতাতেই তিনি লাইনভাগে অনবহিত হয়েছেন। সে-ত্রুটি "Amor stands upon you"তেও দ্রষ্টব্য। "নাগরিক" নামে উৎকৃষ্ট কবিতাতে তাই ৪২ লাইনে যে হুঁচট্ খেতে হয় তা কোন নাটকীয় কারণে নয়। ২৫ পৃষ্ঠার "মুক্তি"তে ডাস্টবিনের সামনে মরা-না-হ'য়ে ম'রে-যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায় সময় এখানে কাটে। "মৃত্যু", "পোস্ট-গ্রাজুয়েটে"ও ছন্দ ঢিলা হ'য়ে গেছে এক-আধবার। অবশ্য গদ্যকবিতার ছন্দের বাঁধুনিতেই এ-অনিশ্চয়তা। আবেগেই শুধু এ-ছন্দের বেগ নির্দিষ্ট করে এবং দুই ব্যক্তির আবেগে মাত্রা এক চালে না-ও চলতে পারে। যথারীতি পদ্যে এক-এক শ্লোকের বা যমকের বাঁধনে ছন্দ দানা বাঁধে, কিন্তু গদ্যকবিতার ছন্দের দম সম্পূর্ণতা পায় সমগ্র বক্তব্যের এক-এক পর্যায়ে—strophic unit-এ। সমর সেন নিশ্চয়ই strophic সম্পূর্ণতা পেয়েছেন "কয়েকটি দিন" কবিতার নিপুণ এই শেষ পর্যায়ে:

> মড়কের কলরোল, নতুন শিশুর কান্না,
> চিরকাল বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম!
> অতীতের শবসম্ভোগী মন
> কালের স্থবিরযাত্রায় স্থির অশান্তি আনে।
> আজ দুঃস্বপ্নে দেখি,
> বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল

স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে ;
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।—

আমার গলায় স্বভাবতই এর শেষ লাইনে চমক লাগে এবং পড়তে ইচ্ছা করে—স্তব্ধ মহানদী। দু-একবার বোধহয় শব্দ বা কথা সম্বন্ধেও কবির অসতর্ক ভাব দেখা যায়—লাইনের শেষে ক্রিয়া কঠিন বা বর্ণান্তক শব্দে, হ'তে শব্দটার সর্বদা ব্যবহারেও হয়ত, এবং বিশেষণের দুর্বলতায়, যথা চমৎকার কবিতা এই "মদনভস্মের প্রার্থনা"য় :

মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

এরকম জায়গায় মালার্মে বা বদ্‌লেয়র কি 'অদ্ভুত' ব'লে স্থির থাকতেন? সমর সেনের কবিতাতে এগুলি চোখে পড়ে, তিনি ত গদ্যকবিতায় লরেন্সমার্গী নন, তিনি পাউণ্ড-পন্থী। ব্যুৎপত্তি বা ব্যাকরণার্থে তাঁর ছন্দ বা ভাষাপ্রয়োগ ত ঢিলা হবার কথা নয়, কারণ কবিতার উপযুক্ত তাঁর ভাষা ব্যবহার ব্যঞ্জনায়, রূঢ়ার্থে গভীর, সমগ্র কাব্যের তাৎপর্যার্থে অখণ্ড।

কিন্তু ছিদ্রান্বেষীকেও থামতে হয়, এত সার্থক তাঁর অধিকাংশ রচনার আত্মস্থ শিল্পসৌন্দর্য। আর এ-কবির মনই শুধু বৃহত্তর পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্বন্ধে উগ্র নয়, দৃষ্টিও প্রখর। "বিস্মৃতি" কবিতাতে এর ব্যতিক্রম হয়ত কেউ পাবেন, কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রসঘন উপমা-উপচারে অন্বিত। "রাত্রি" বা "বিরহ" নামে কবিতাগুলি প্রায় জাপানি কবিতার মতো সরল স্পষ্ট ব্যঞ্জনায় গভীর, তাই "রক্তকরবী", "মহুয়ার দেশ" ইত্যাদিতে উপমা-উপচারের জটিলতার সহজ সাহস ও ব্যঞ্জনাঢ্যতা বিস্ময়কর লাগে। এগুলি কবির গভীর চৈতন্যের মননজীব ব'লেই দেখি এই উপমা-উপচারাদি এলিয়টের মতো মধ্যে-মধ্যে হ'য়ে ওঠে symbol বা পরোক্ষ প্রতীক, যার লীলা বিশ্বজনীন। সেজন্যেই একটু বিড়ম্বিত হ'তে হয় যখন একই প্রতীক কখনো পরোক্ষদীপ্ত হ'য়ে ওঠে আর কখনো প্রত্যক্ষেই লুপ্ত হয়।

কিন্তু ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ এই নাগরিক কবিকে আশা দিয়েছে, সেই আমাদের আশা। তাঁর সম্পদ তাঁর মননে, যার সাহায্যে তাঁর আত্মজ্ঞান ব্যঙ্গে হ'য়ে ওঠে নবসম্ভাবনায় চঞ্চল—শেষ কবিতা "একটি বেকার প্রেমিকে" :

চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে
খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি
মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি
আর সহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি—
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙ্গে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

প্রগতিবাদী কবি

মণীন্দ্র রায়, 'একচক্ষু'।

আমার চেনাশোনার মধ্যে দু-জন তরুণ কবিকে আমার ঈর্ষ্যা হয়। তাঁরা দু-জনেই একান্ত অল্পবয়স্ক, ছাত্র এবং কবিপ্রতিভান্বিত। তাঁদের একজন অবশ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যশোরশ্মি যাঁর দেশব্যাপী এবং মার্ক্সিস্ট অঞ্চলে যিনি প্রতিনিধি-বিশেষ। মণীন্দ্র রায়ের আরম্ভ তাঁর বন্ধুর মতো আপাতবিস্ময়কর নয়। কিন্তু কবিত্ব তাঁর অবিসংবাদী এবং প্রগতির স্বাস্থ্যে তাঁর স্বকীয়তার আভাস উজ্জ্বল।

হয়ত সে-দীপ্তি কিঞ্চিৎ তির্যকচারী ব'লে ঈষৎ অস্পষ্ট। মণীন্দ্রের মনে সমাজ-চৈতন্যের বেদনাতেই হয়ত একটা বাঁকা হাসির ভাব আছে! সেটা প্রকাশ্যও ঠিক নয়, কিন্তু একটা কিম্ভূত মজার ভাব—grotesquerie ও drolleryর এই মিশ্রণ মণীন্দ্রের পুস্তকাদির নাম দেওয়াতেই দ্রষ্টব্য। তাঁর 'ত্রিশঙ্কুমদন', 'ত্র্যম্বক' বা 'একচক্ষু' শুধু নামেই নয়, চেহারাতেও ঘাব্‌ড়ে দেবার মতো।

কিন্তু এই কিম্ভূত মজাদার চটক কাব্যের রূপে, ছন্দের দক্ষতায়, বক্তব্যের চাপে সৌভাগ্যবশত সংযত হয়েছে। বলা যায়, রূপান্তরিতই হয়েছে কবিতার ঐশ্বর্যে, একটা দ্বিধাগ্রস্ত বৈদগ্ধ্যের আমেজে, যেটা পরিণত মনোবৃত্তির, জীবনের অভিজ্ঞতারই লক্ষণ। তাই প্রথম কবিতার যে-আরম্ভ, তার গাম্ভীর্য হ'য়ে ওঠে স্বাভাবিক, আন্তরিক অথচ ভারিক্কে বা বামপন্থী বুলি নয়।

ম্রিয়মাণ হৃতশক্তি হে স্বদেশ—

কারণ এ-স্বদেশসম্ভাষণ সস্তার বহিরঙ্গবিলাস নয়। তা লেখকের আত্মজিজ্ঞাসারই অবশ্যম্ভাবী ও ক্রমবর্ধিষ্ণু বিকাশ। বহির্বিলাসী প্রগতিবাদের তুচ্ছতা ও অন্তর্বিলাসী আত্মসর্বস্বের ব্যর্থতার গ্লানি মুক্তি পায় যে মার্ক্সিস্ট অবৈকল্যে, চৈতন্যের অখণ্ডতায়, মনে হয় তার আভাস মণীন্দ্রের কাব্যচৈতন্যে বর্তমান। অন্তত তার বোধ যে কবির আছে তার প্রমাণ "একচক্ষু" নামক কবিতায়:

তথাপি ছিলাম আমি প্রথামতো আত্মসচেতন,
প্রাণপণ যত্ন ছিল শান্তিকামী হৃদয়ে তখন।

যে একচক্ষু আত্মাভিমান আরেক চোখ চেয়ে

জনসভা ধর্মঘটে করেছি সতত
সাম্যের অনন্ত সুখ আমিও কীর্তিত।
—এবং ক'রেও জানল তাতে মুক্তি অসম্ভব।
এ দুর্যোগে নেই অব্যাহতি,
আমারে টানিছে মোর আত্মঅসঙ্গতি।…

ভগ্নজানু এ কালের উজ্জীবনসম্ভাবনাহীন
নির্বাত বুদ্ধির শূন্যে একচক্ষু পলায়নে মরি মূর্খ বিভ্রান্ত হরিণ॥

অভ্যস্ত দক্ষিণ একচক্ষুপনা থেকে সত্তার বাম একচক্ষুপনার সহজ প্রলোভনে না-ভুলে লেখক তাই খোঁজেন সত্তার সম্পূর্ণতা—কম্যুনিস্টদের ভাষায় সততা দ্বন্দ্বাশ্রয়ী ভৌতিকবাদে যার দার্শনিক সমর্থন। লেখকের নানা কবিতায়—এমনকি প্রেমের কবিতাতেও এই সন্ধান দেখি। এবং অনেক জায়গায় তা কাব্যসার্থক হয়েছে: যথা, "নবচতুর্দশপদী"র ১ নম্বর, ৪ নম্বর ও ৫ নম্বর, "উইঢিবি", "নববর্ষ", "বৈশাখ", "পরস্পর", "অক্রূর-সংবাদ", "আশ্বাস", "পঞ্চাঙ্কে"র (৪) ও (৫) ভাগ এবং অংশত "সুভাষ-কে আবেদন":

এ কালসন্ধির ক্ষণে
কোন্ প্রভাতের দিকে চাহ তুমি ভাস্বর নয়নে
বলো বন্ধু? —…
…হে বান্ধব
এ অসাম্যদুর্যোগের তুমি তো উত্তর
পেয়ে গেছ। আমারেও শেখাও সে-স্তব।

আশা করি এ-আবেদন সুভাষের কানে যাবে। কারণ মণীন্দ্রের রচনায় বুদ্ধির সততা থাকায় এবং কর্মীসুলভ বাধ্যতামূলক সরলীকরণের চেষ্টা না-থাকায় তাঁর কাব্যধর্মে বিপ্লবটা অনেক বেশি সার্থক—হয়ত বা সুভাষের সাম্প্রতিক রচনাবলির চেয়েও। অবশ্য কম্যুনিস্ট ব্যবহারে এবং ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রচারে সুভাষের অধুনাতন লেখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান। এবং সে-কাজে সারল্য অবশ্যম্ভাবী খানিকটা। কিন্তু তাতে কবিতার ক্ষতি কতটা, সেটাও ভাবা দরকার। কথাটা সুকান্ত ভট্টাচার্যের বিস্ময়কর কবিপ্রতিভার বিষয়ে ভাবলে আরো স্পষ্ট হয়। তত্ত্বের দিক থেকে তাঁর মন মার্ক্সিজমের চরম পরিণতিতে পাকা কিন্তু তথ্যের দিক থেকে তাঁর চোখ কান মন—অভিজ্ঞতার সাক্ষাৎ কাব্যরূপে ভালো জমে না।

বর্তমান প্রতিভার স্বাক্ষর তাঁর কাব্যে চমক লাগায়। কিন্তু সে-স্বাক্ষরে পরিণতির সম্ভাবনা গালামোহর করা। আর গভীরতা দূরে পরিহারে যে শেষ অবধি কবি তথা পাঠক কারো লাভ নেই, সেটাও মনে রাখা ভালো। একটা শুধু মহৎ লাভ হয়েছে স্বদেশপ্রেম ও ফ্যাসিস্টবিরোধে। সেটা হচ্ছে যে প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক তাড়নায় বিলাসী বিপ্লব হ'য়ে উঠেছে সত্য এবং বুদ্ধির উপলব্ধি হয়েছে স্বভাবে অখণ্ড। সে-সত্যের সারল্যে সুভাষের 'পদাতিক' বইয়ের কোন-কোন কবিতার যে ভাবগত অস্পষ্টতা ও অসংহতি পীড়িত করে, তার পক্ষাপক্ষ দ্বিধা এখন নেই। মণীন্দ্রেরও এ-দোষ ছিল, 'একচক্ষু'তে তার একাধিক উদাহরণ মেলে। সুখের বিষয়, মণীন্দ্রের সাম্প্রতিক কাব্যে সে-সব দোষ প্রায় নেই। তাছাড়া তাঁর ছন্দ, ভাষার উপরে বিস্ময়কর কর্তৃত্ব আজকাল যে সদাজাগ্রত লেখনী ও কানের পরিচয় দেয়, সেটা জাগ্রত মনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে ব'লে আমি তাঁর ভবিষ্যতে শ্রদ্ধাবান্। আশা করি সুভাষের কবিপ্রতিভা ও চরিত্রবান্ সমাজকর্মিষ্ঠতার নেতৃত্ব এবং চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মণীন্দ্রের গম্ভীর কাব্যজিজ্ঞাসার মিলিত বন্ধুত্বে আমাদের পথ সহজ হবে। কারণ মণীন্দ্রের একটা ঝোঁক আছে ভাবালু অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে, যাতে বিকাশ রুদ্ধ।

বুদ্ধিবাদীর উপন্যাস

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'আবর্ত'।

জ্ঞানী সমালোচকের সঙ্গে অন্তত এক বিষয়ে সাধারণ পাঠক সায় দিতে পারে যে চরিত্রপাত্রের মাহাত্ম্যেই উপন্যাসের মুখ্য সার্থকতা। উপন্যাসে চরিত্রপাত্রের অস্তিত্ব অবশ্য একাধিক লোকেও সম্ভব। বহির্জগতের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে ঝোঁকটা বহির্জগতের উপর পড়তে পারে, ব্যক্তির উপরেও পড়তে পারে। সেই অনুসারে পাত্রপাত্রীর চরিত্র অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল বা গতিচঞ্চল হয়। আবার তাদের স্বভাব অন্তর্মুখ বা বহিরঙ্গ হওয়াও আশ্চর্য নয়।

ধূর্জটিবাবু সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানী পাঠকের নানারকম আপত্তিতে আমার মতো সাধারণ পাঠকদের কিংকর্তব্যবিমোহ খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ ক'রে যখন বোঝা যায় না যে উক্ত জ্ঞানী সমালোচকেরা, যাকে বলে মূল্যজ্ঞান, হৈ জগচ্চিত্রজ শ্রেয়-প্রেয়ের মানদণ্ডে তাঁকে বিচার করেন কিংবা এরিস্টটেলীয় প্রতিভাসযাথার্থ্য নিরূপণেই তাঁরা ব্যস্ত।

কারণ ধূর্জটিবাবু সম্বন্ধে আমাদের মুশকিল হচ্ছে যে তিনি শুধু গল্প বা উপন্যাস-লেখক নন, তিনি প্রবন্ধও লেখেন এবং তার প্রসারে এবং প্রসঙ্গে তাঁর দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য স্বয়ম্প্রকাশ। তাই পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে প্রতিযোগী পাণ্ডিত্যাভিমানীদের আপত্তিও হয়ত ধূর্জটিবাবুর গল্প-উপন্যাসের সম্বন্ধে অনেককে দ্বিধান্বিত করে। অবশ্য প্লেটনীয় আপত্তিও তাঁর উপন্যাস সম্বন্ধে কেউ-কেউ হয়ত করেন, কিন্তু সে-আপত্তি ত সব সাহিত্যিকেরই ভাগ্যে বর্তমান।

তাঁর ভাষা সম্বন্ধে আপত্তি বরং আরো বিবেচ্য। তাঁর প্রবন্ধাবলি সম্বন্ধেও এ-আপত্তি উঠেছে নানামুখেই। সেখানে হয়ত খানিকটা ধূর্জটিবাবু দায়ীও কারণ আমরা তথ্যান্বেষী; পণ্ডিত লেখকের কাছে আমরা পাঠ নিতে চাই, প্রবন্ধে তাই আমরা পাঠশালার আবহাওয়া খুঁজি, খামখেয়ালি শিল্পীর বহুধাভক্ত গ্রন্থবিহারে আমরা বিমূঢ় হ'য়ে পড়ি, ভুলে যাই যে অধ্যাপক-শিক্ষকের বিদ্যালয়োত্তর জ্ঞান-প্রচার বেকন কিছু করলেও বার্টন করেননি, ফ্লোরিওর কাছে সেক্সপীঅরও কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিও রেমোঁ সেবোঁ-র পরিচয়ে বিশ্বকোষের কৃপণ সেবকদের তথ্যবৃদ্ধি হয়।

না। এবং এখানে ধূর্জটিবাবুরও ভুল হ'য়ে যায়; তাই তিনি ইলিয়া-র চর্চা ছেড়ে অধ্যাপকী প্রবন্ধ লিখে ফেলে নিজেকে এবং পাঠককে দু-নৌকায় দাঁড় করিয়ে দেন। আর এই দুই ভিন্ন জগতের দ্বিধায় তাঁর প্রসঙ্গনির্ণয় বাক্যবিন্যাসাদি অর্থাৎ এক কথায় ভাষাব্যবহার বিড়ম্বিত হ'য়ে ওঠে; শব্দের অভিধায় তাঁর স্বকীয় ভাষার লক্ষণা হারিয়ে যায়; যে-স্থায়ীভাবে তাঁর রচনার পুরুষার্থ, সেই শুদ্ধবাসনামূলক তাঁর সাধারণ্য তথ্যের অরণ্যে, বা ব্যুৎপত্তিতে কণ্টকাকীর্ণ নির্বাহের অন্ধকারে অনিশ্চিত হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু গল্পের বা উপন্যাসের উপলক্ষ্যই অন্য হওয়ায় ধূর্জটিবাবুর ব্যক্তিস্বরূপ ও তাঁর সাধনা সার্থকতর মার্গ পায়। তাঁর দংশন শুধু গ্রন্থলোকেই প্রবল নয়, ব্যক্তি-তেও তা ক্লান্তিহীন। যে-কারণে উপরোক্ত আপত্তি তাঁর প্রবন্ধ সম্বন্ধে ওঠে, ব্যক্তি-স্বরূপের সেই বিশেষত্বেই সামাজিক মানুষ সম্বন্ধে তাঁর চৈতন্য প্রখর। সেইটেই তাঁর কীর্তির পক্ষে যথেষ্ট, আর-কিছু যদি তাঁর না-ই থাকে। কারণ আমাদের নতুন সভ্যতায় নতুন সমাজ এই দেড়শ বছর মাত্র দেখতে হচ্ছে। সমাজের নানা স্তর ভাঙছে, গড়ছে। তার মধ্যে শুধু কবিতার সরল আদিম চৈতন্যের হৃদয়-সংবেদ্যতায় কাজ গভীরে চললেও নানামুখিত্ব চৈতন্যলোকে আনতে হ'লে দরকার জটিল বহিরাশ্রয়ী সাকার তেত্রিশ কোটির বাহন গদ্য এবং রসাত্মক গদ্যরচনা। সেই-জন্যেই ত বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক বা জাতীয়তা-ঘটিত মূল্য ছাড়াও যা-কিছু সামান্য মূল্য থাকে, না-হ'লে মাইকেলের মনীষা বা কবিপ্রতিভা যারা বুঝেছে, বা দীনবন্ধুর মানবিকতার স্বচ্ছ দৃষ্টিতে যারা তৃপ্ত, তারা বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রাহ্য মাত্র করলেন কেন? অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শিল্প নয়, এই চৈতন্যসঞ্চারেও ফাঁকি দিয়েছেন। আমাদের বর্তমান অতীতে ও ভবিষ্যতে জড়িত, তিনি অতীতকে নিয়েই ব্যর্থশ্রম হয়েছেন। যেহেতু ইতিহাস চলে ভবিষ্যতের দিকেই নাক-বরাবর এবং আমরা সবাই অনিচ্ছায় বা অজ্ঞানেও ইতিহাসের একসঙ্গেই পাত্রাধার, আকাশনীড়, সেইহেতু আমরা রবীন্দ্রনাথকে বারংবার অদম্য কৃতজ্ঞতা জানাই। সেইজন্যেই আমরা অনুরূপা দেবীর ফিল্ম সাফল্য সত্ত্বেও মোটামুটি শরৎচন্দ্রের চৈতন্যসঞ্চারের চেষ্টায় অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের বোধনপ্রয়াসে কৃতজ্ঞ হতুম। কারণ রাস্তায় যখন চলতে হবেই, তখন সঙ্গী যদি পথের আভাস না-দিয়ে ভূতেরা কীরকম পিছু হেঁটে বা শূন্যে লাফিয়েই চলে, সে-বিষয়ে খুব বাস্তবপন্থী বর্ণনাও দেন, ত তাতে লাভ কি?

ধূর্জটিবাবুও এইজন্যেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বিভূতিভূষণ হয়ত সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁর 'পথের পাঁচালী'তে, কিন্তু সে-পথ প্রায় প্রাক্-পুরাণিক এবং তিনি

এই প্রাক্‌-পুরাণিক জগতের সঙ্গে বর্তমান জগতের দ্বন্দ্বে তাঁর অপুকে ট্রাজিক্‌ হিরো ব'লেও ভাবতে পারেননি, সে অপরাজিত মাত্র, কোন্‌ দ্বন্দ্বে যে, সেটা মনে হয় গ্রন্থকারও জানা দরকার মনে করেন না। ধূর্জটিবাবু হয়ত এখনো সিদ্ধিলাভ করেননি তাঁর সাধনায়, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি জীবনধর্মী। তাই বাংলা সাহিত্যের দুরবস্থায় যথেষ্ট লাভ, বিশেষতঃ যখন দেখি প্রেমেন্দ্র বা বুদ্ধদেবের মতো দক্ষ লেখকেরা বারবার আশান্বিত ক'রেও শেষ পর্যন্ত প্রায়ই আশাভঙ্গ করেছেন।

'অন্তঃশীলা' ও 'আবর্ত' দুই উপন্যাসেই বা এক উপন্যাসের দুইভাগেই তাই দেখি যে, মানুষগুলি সমাজের যে-অংশ মনন, ভবিষ্যৎঘেঁষা, সেই পাড়ার বাসিন্দা। এবং তাদের নিয়ে যে-জগৎ বা অবস্থান, সে-বিষয়ে লেখক শুধু সজাগ নয়, সেই পরিস্থিতির উপরেই তাঁর আশা-ভরসা বোধহয় জ'মে উঠছে। তাই তাঁর পাত্র-চরিত্র সম্বন্ধে যাঁরা প্রাণহীন বা যাথার্থ্যহীন ব'লে আপত্তি করেন, তাঁদের কাছে এই বক্তব্য :

But this conclusion is reached without any direct examination of character as an illusion or as a symbol at all, for "character" is merely the term by which the reader alludes to an author's verbal arrangements. Unfortunately, that image once composed, it can be criticized from many irrelevant angles—its moral, political, social or religious significance considered, all as though it possessed actual objectivity, were a figure of the inferior realm of life. And because the annual cataract of serious fiction is as full of "life like" little figures of such, and no more, significance as drinking water is of infusoria ... the meagre stream of genuine literature, being burdened with "the forms of things unknown," is anxiously traced to its hypothetical source—a veritable psychologico-biographical bog.

কারণ পাত্রপাত্রীচরিত্র উপন্যাসে আসলে একটা স্বসমুত্থ বা ইমার্জেন্ট ব্যাপার। লেখকের পুরুষার্থ ও তাৎপর্যার্থের আবশ্যিকতায় যে-ছন্দোসমগ্র রচনার অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে, সেই ছন্দের নির্দেশে, ভাষাব্যবহারে, প্লটগতিতে, গল্পের বিকাশেই পাত্রপাত্রীর আবির্ভাব। শুধু চরিত্রই যদি উপন্যাসের উৎস হ'ত, তাহ'লে টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি', হোমারের 'ওডিসি' বা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', এমনকি প্রুস্তের

'অতীতের অন্বেষণে'র মতো ব্যক্তিমনসর্বস্ব উপন্যাসেও কার্যকারণ নির্ণয় করা যেত না। সুখের বিষয়, ধূর্জটিবাবুও পুরুষার্থ যে তাৎপর্যার্থেই অস্তিত্ব পায়, এ-কথা বোঝেন। আর এ-কথাও স্বীকার্য যে তাঁর অন্তত দু-এক পাত্র তাদের বিশেষ অবস্থানে থেকেই প্রাণৈশ্বর্যে প্রায় স্বয়ন্তর। খগেনবাবু আজ খগেনবাবুর শত্রুদের কাছেও মূর্ত। সুজনও খানিকটা—যদিচ সুজন 'অন্তঃশীলা'য় সামান্য দু-চার কথায় যে-যাথার্থ্য পায়, 'আবর্ত'তে বহু বাক্যব্যয়েও তার বিপরীত দেখে আশ্চর্য লাগে। 'অন্তশীলা'য় ধূর্জটিবাবু আত্মনেপদের আভ্যাসিক আশ্রয়ে অর্থ-নিশ্চিত অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও যে তিনি 'আবর্ত'তে বহিরাশ্রয়ী তীর্থযাত্রা করেছেন, সে-জন্যে তাঁর শিল্পশ্রদ্ধা ও সাধনার নিষ্কামতা বিস্ময়কর। কিন্তু প্রথমভাগে যার সামান্য আভাস আছে, দ্বিতীয়ভাগে সেই আভাস তাঁর উপন্যাসের ক্ষতি ক'রে লেখকের সাহসী উদ্দেশ্যকে প্রকাশ ক'রে দেয়। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের কতটুকু সহায়তা তিনি পেয়েছেন, তা দেখলে তাঁর কীর্তিই শুধু বিবেচ্য হ'য়ে পড়ে, ত্রুটি নয়।

আর বিশেষ ক'রে সে-ত্রুটি যদি নেহাৎ শিল্পত্রুটি না-হয়, যদি লেখকের ব্যক্তি-স্বরূপের বিশেষত্বই হয়, তাহ'লে সে-বিষয়ে হাহুতাশ করা নির্বোধ পাঠকের অকৃতজ্ঞতামাত্র। রমলা দেবীর চরিত্র যদি পটভূমি না-পেয়ে থাকে বা সুজনের জীবিকা ও জীবনযাত্রার চৈতন্য লেখক যদি পাঠকগোচর না-ক'রে থাকেন, ত সেটা তাঁর হাতের বাইরেই ধরতে হবে। হয়ত ধূর্জটিবাবুর জগচ্চিত্র এখনও অস্পষ্ট, হয়ত তিনি পুরুষার্থ সম্বন্ধে অনিশ্চিত। হয়ত তাই আবশ্যিক ছন্দ তাঁর মধ্যে-মধ্যে কেন্দ্রচ্যুত হয়, পাত্রপাত্রী আশ্চর্য ঘটনাবিন্যাস সত্ত্বেও সবসময়ে ঠিক বোঝা যায় না। এবং তাঁর কাটা-কাটা বাক্যবিন্যাস যা অনেকের মধুরাভ্যস্ত কানে খারাপ লাগে, কিন্তু যা তাঁর ছন্দের পুরুষার্থের অনন্যগতি, তাও ঘুলিয়ে ওঠে। এবং এমন সব উপমা আসে, যেগুলি সংস্কৃতরীতির সংকেতিত মার্গে হয়ত আশ্চর্য দক্ষ, কিন্তু ধূর্জটিবাবুর সক্রিয়, আধুনিক ভাষায় খাপছাড়াই মনে হয়।

মনে হয় এ সমস্তই আসলে ধূর্জটিবাবুর মধ্যে একটা রুচিবাগীশ নীতিপরায়ণ উত্তরাধিকারের জন্যেই ঘটে। নিরক্ত ও বিলম্বিত ভিক্টোরিয়ান্ অল্ডাস্ হাক্সলির মতো ধূর্জটিবাবু ট্রাজিক্ ও সাটিরিকের দ্বিধায় অনিশ্চত। প্রবল প্রেম বা প্রচণ্ড ঘৃণা কিছুই তাঁর উপন্যাসের মানুষেরা তাঁর কাছে যেন পায় না। তিনি যেন মনে হয় প্রায়ই ক্লান্ত, বিমুখ। এবং লেখক তাঁর জগৎ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ বা bored হবার আভাস দিলে, সে-জগতের বাসিন্দারাও প্রায় শুধু বিতৃষ্ণ নয়, বিতৃষ্ণাকর হবার সম্ভাবনাও এসে পড়ে।

কিন্তু 'আবর্ত' তৃতীয়ভাগের অপেক্ষা রাখে। হয়ত সে-ভাগ বেরোলে সবশুদ্ধ জড়িয়ে ধরলে এ-সব আপত্তিই অবান্তর হবে। সেই আমাদের আশা এবং সে-আশা লেখকেরই ইতিমধ্যের সাফল্যে প্রণোদিত।

রিচার্ডসের কল্পনা

সম্প্রতি এজ্‌রা পাউণ্ডের 'প্রবন্ধ সংগ্রহে' তাঁর কাব্যাদর্শের কথা পড়ছিলুম। তারপরে 'বায়োগ্রাফিয়া লিটেরারিয়া' প'ড়ে আশ্চর্য হলুম উভয়ের কাব্যাদর্শের অনগভীর মিলে। তাই বেন্থামি রিচার্ডস্‌ও যে নভোচারী কোল্‌রিজে পাবেন তাঁর শ্রুতি, তাতে আর কী আশ্চর্য। রিচার্ডসের গভীর পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞাননিষ্ঠা ও থিসিস্-জাতীয় পরিশ্রমকে ধন্যবাদ। বইটি কোল্‌রিজ-ভাষ্য শুধু নয়, কোল্‌রিজ-সংস্কারও বটে। কোল্‌রিজ কাব্য বলতে শুধু কবিতা বুঝতেন না ; কাব্য মানবজীবনে পরম প্রয়োজন ও মূল্যবান্, এ-বিশ্বাস তাঁর ছিল ; রিচার্ডসেরও আছে। কাব্যসমগ্র মানবের সম্পূর্ণ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যক্তির অখণ্ডচৈতন্যের ঘনীভূত মূর্তি, এ-কথাও রিচার্ডস্ মানেন। কিন্তু এই মূর্তিলাভ ও তার প্রক্রিয়া পারলৌকিক লীলা, কোল্‌রিজের এ-কথা মানতে তাঁর বাধে। রিচার্ডস্ বলেন, ঈশ্বর আমাদের কাছে আজ মৃত হ'লেও আমাদের মুক্তির প্রয়োজন উগ্রই আছে এবং কাব্য সে-মুক্তির ফোয়ারা বহন করবে, ঈশ্বর মানার মতো অবৈজ্ঞানিক দাবি জারি না-ক'রে। পৃথিবী ভারসাম্য হারিয়েছে, সভ্যতা দিশাহারা, মানুষ আজ ভ্রান্তির জীবনশোষক গোলকধাঁধায়। ধর্মপ্রেমাদি সব বিশ্বাসের আশ্রয় আজ ভেঙেছে, এখন অন্ধজনে আলো কে দেবে ? না, এই শিশুতীর্থের নবশিশু, কাব্য। অথচ কাব্য প্রাণ পেয়েছে বিজ্ঞানপূর্বজ ঐ-সব বাতিল বিশ্বাসের আশ্রয়েই। অবশ্য এ-বৈজ্ঞানিকমন্ত্র নাটকীয় ভাব রিচার্ডসের এ-বইটিতে কমেছে।

এবং রিচার্ডস্ পাঠকের কাছে প্রায় সর্বদা যে বুদ্ধির জাগ্রত অবস্থা দাবি করেন, এ-বইয়ে তা না-ক'মে বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে। তাঁর তীক্ষ্ণ সতর্কতা ও রুচিমণ্ডিত পাণ্ডিত্য স্বাস্থ্যকর। বহুকষ্টসাধ্য স্পষ্টতা বর্তমান ব'লেই তাঁর কথায় মতান্তর ঘটা সহজ, যদিও তাঁর সুবিন্যস্ত বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া শক্ত। অবশ্য কেম্ব্রিজের কূটবুদ্ধি পণ্ডিতের সঙ্গে কোল্‌রিজের অনেক বিষয়ে মতৈক্য। কোল্‌রিজের সঙ্গে রিচার্ডস্ বিশ্বাস করেন যে বিশেষ অবস্থায় মানুষের চেতনা হ'য়ে ওঠে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদাতীত মিলনে স্বচ্ছ। দু-জনেরই মতে এই অসাধারণ অপিচ ক্ষণ-স্থায়ী দিব্যজ্ঞান অতিশয় মূল্যবান। সেণ্ট টমাস করেছিলেন এই অন্তর্জ্ঞানকে যোগসাধনার যাত্রাপথ। কোল্‌রিজও এর মধ্যে পেয়েছেন পরমার্থের ইঙ্গিত। এবং

তিনজনেই—সেণ্ট টমাস্ অবশ্য কথাটা ব্যবহার করেননি—এর সঙ্গে দেখেছেন শুদ্ধ কল্পনার সম্বন্ধ। এই শুদ্ধ কল্পনা কোল্‌রিজের মতে ব্যবহারিক ও নৈতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সেইজন্যেই নাকি সেক্সপীঅর gentle। গিল্‌খি কিন্তু কবিদের জীবনে গোলযোগই দেখেন। তবে আধুনিক কবিজীবনী লেখার রীতি ত কোল্‌রিজ দেখেননি, আর ভের্‌লেন, বদ্‌লেয়র প্রভৃতিও তখন জন্মাননি। প্রসঙ্গত মনে রাখা ভালো যে কবি দার্শনিক সঙ্গীতকার প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের নিয়ে মনোবিজ্ঞানে কাজ চলেছে এবং কেন যে দিব্যজ্ঞানবান্ কবিতার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জীবন মানিয়ে নিতে পারে না, সে মানস-জাগতিক প্রশ্ন হয়ত একদা উত্তর পাবে। বিজ্ঞানের এ-সিদ্ধি সম্বন্ধে রিচার্ডসের বিশ্বাস প্রচণ্ড—যদিচ তিনি মার্ক্সিস্ট বস্তুবাদের দ্বন্দ্বে সমস্যার সমাধান পাননি।

কোল্‌রিজ শুধু এই বিজ্ঞানের বর্ণনায় ক্ষান্ত হননি। এই জ্ঞানের মাত্রা যে সামাজিক সভ্যতার ওপর নির্ভর করে, সে-সত্যও গত শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁর চোখে পড়েছিল। এবং আত্মজ্ঞানের ফলই শুধু বুদ্ধিগত নয়, এ-জ্ঞান একটা ক্রিয়া ও একটা নির্মাণ, আর এ-জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় সঙ্গে-সঙ্গে নবমূর্তিলাভে, নব আত্ম-প্রকাশে। তার ফলে আসে শুদ্ধকল্পনা। রিচার্ডসের আয়াসসাধ্য পুনর্ভাষ্যে বুঝলুম যে কোল্‌রিজের মতে এই সঞ্জীবনী কল্পনার শ্রেষ্ঠ রূপ কাব্য হ'লেও এ-অক্ষয়বটের শুভফল অন্যত্রও ফলে। যা-কিছু অভ্যাসজর্জর জীবযাত্রার একান্ত প্রয়োজনসাধনের বাইরে, যা-কিছু সুকুমার মানসক্রিয়া, তারই মধ্যে এ-শুভের লীলা। সেণ্ট টমাসের মতে এই লীলার চরম ও শুদ্ধতম রূপ ঈশ্বরের প্রেমে। কুয়াসাচ্ছন্ন কোল্‌রিজেরও এরকম একটা ধারণা ছিল। এ-বিজ্ঞান ছাড়া ঈশ্বরের কথা রিচার্ডসের কাছে অসম্বদ্ধ। তিনজনের মিল জীবনযাত্রায় কাব্যের উচ্চস্থান সম্বন্ধে। কোল্‌রিজ ও রিচার্ডস্ ত স্পষ্টত কাব্যকে জীবনযাত্রার প্রধান সহায় বলেছেন। এবং বিকল্পনা বা কল্পনাবিলাসের মূল্য যে কম ও তার স্থান নিচে, এর কারণ বিকল্পনা আর শুদ্ধকল্পনার তফাৎ প্রায় ততখানি, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সজ্ঞান স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া ও জড় অভ্যাসজাত ক্রিয়ার মধ্যে যতটা। এইখানেই হার্টলিকে ছেড়ে কোল্‌রিজে কাণ্টের অনুগমন। এইখানেই ক্ষমতাবানে প্রতিভাশালীতে ভেদ। এ-প্রসঙ্গে ইচ্ছার স্বাধীনতায় কোল্‌রিজের বিশ্বাস নিয়ে বস্তুতান্ত্রিক রিচার্ডস্ একটু অসুবিধায় প'ড়ে একটা যাহোক্-তাহোক্ প্রাক্-নিয়ন্ত্রী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অমার্ক্সিয় আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এ ছাড়া অবশ্য উপায়ও নাই। এখানে রিচার্ডস্ সততা সহকারে

মেনেছেন যে ব্যক্তি ও বহির্জগতের সম্বন্ধ-সমস্যা শুধু ব্যক্তিবাদীকে বিচলিত নয়, বস্তুতান্ত্রিককেও ভাবিত করে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ ও উদ্ধৃতিবহুল এ-আলোচনার আরেক কথা হচ্ছে কল্পনা-বিকল্পনার সঙ্গে বিকার বা delirium ও mania বা উন্মত্ততার তুলনা। চলিত কথায় যে কবিকে পাগলের জাতে না-হোক্, মাথায় ছিটওয়ালার দলে ফেলে, সে-ভুল অবশ্য এ-তুলনায় নেই। কারণ বিকল্পনা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা হ'লেও কল্পনার স্পষ্ট তিলক হচ্ছে তার চিন্তাক্রিয়া ও সঞ্চয়ী স্মৃতির ঐশ্বর্য। বিকল্পনা এ-কল্পনারই জের, তবে তাতে কল্পনার সত্য-চেতন অবৈকল্য নেই। সেই-জন্যেই কল্পনাবিলাস আমাদের অভিভূত করে না, করে চমৎকৃত। তার উৎকৃষ্ট আলোচনা কোল্‌রিজ ক'রে গেছেন গ্রে ও কলিন্‌স্‌এর কবিতা নিয়ে ও 'ভিনাস এণ্ড অ্যাডনিস্' থেকে দুই জাতীয় কয়েকটি লাইন তুলে। সে-উপলক্ষে রিচার্ডস্ উৎকৃষ্ট টীকা করেছেন। এ-টীকা বিচারবুদ্ধির সাধারণ প্রয়োগেও সার্থক। যথা ডিটেকটিভ নভেলকে রিচার্ডস্ বিকল্পনার পর্যায়ে ফেলেন, 'টু দি লাইট্ হাউস্' বা 'টম্ জোনস্'-কে কল্পনার। অথবা হার্ডির নভেলে তিনি পান খণ্ডে-খণ্ডে কল্পনা, কিন্তু সমগ্রে শুধু বিকল্পনা। অবশ্য এ-ভেদজ্ঞান সহজ নয়। কারণ মানবমনে ঘটনা সব যে এক জাতের নয়, সে-বোধের উপর এ-ভেদজ্ঞানের ভিত্তি এবং এই ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে জানলেই হবে না, জানতে হবে সমস্ত মনের হিসাবে। এবং তা-ও শুধু ব্যক্তিবিশেষের মনেই শেষ নয়, তার মধ্যে মেরুদণ্ডরূপে থাকবে সর্বমানবের বিশেষত্ব। অর্থাৎ আমরা এসেছি ভ্যালিউস্ বা তুলামূল্যের জগতে। এ-মূল্যের ঐতিহাসিক ও ব্যক্তিক আপেক্ষিকতার মার্ক্সিয় জটিলতায় রিচার্ডস্ নামেননি। বলেছেন কল্পনা-বিচারে সৌভাগ্যবশত মূল্যমানদণ্ড না-নিয়ে কথা বলা যায়। কারণ সাধারণ সভ্য-মানুষমাত্রেরই কখনো-না-কখনো কল্পনার সঙ্গে দেখাশুনা হয়েছে। কিন্তু মুখচেনা জ্ঞানকে বিচারের ভিত্তি করলে যে ব্যক্তিনির্বিশেষ বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা হয় না, সে-কথা বৈজ্ঞানিক রিচার্ডস্ চেপে গেছেন—মনোবিজ্ঞানের শৈশবের জন্যে বাধ্য হ'য়ে। অথচ সুধী কাব্যজ্ঞদের মধ্যেই মতভেদ আছে। গ্রে এবং কলিন্‌স্ সম্বন্ধে কোল্‌রিজের কল্পনা-বিকল্পনা বিচার রিচার্ডস্ মানতে পারেন না।

অতঃপর শব্দার্থতাত্ত্বিক আলোচনা। শব্দার্থতত্ত্ব যে গভীর মেধায় চর্চনীয় বিজ্ঞান, সে বলাই বাহুল্য। রিচার্ডস্ পূর্বে এ-বিষয়ে অন্যতম অগ্রদূত দুটি বই লিখে আমাদের কৃতজ্ঞ ক'রে রেখেছেন। কোল্‌রিজের প্রাগাধুনিক আশ্চর্য দূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টিও সেমাসিওলজির বিপ্লববহ মাহাত্ম্য দেখেছিল। কোল্‌রিজের সেই নানা কারণে

অসম্পূর্ণ তবুও মহান্ চেষ্টা থেকে রিচার্ডস্ শব্দার্থের রহস্য ধরবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যদিচ মোটা ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, একটু ভেতরে গেলেই আমরা পড়ি আবার অন্ধকারে। অবশ্য শব্দার্থের রহস্যেতিহাস না-জানলেও আমরা ফস্‌লের রিচার্ডস্ গ্রেভস্ এম্পসনাদির সাহায্যে পূর্ণতর পাঠরীতি শিখছি। তাছাড়া সাধারণভাবে রিচার্ডসের আলোচনা যদিও অসম্পূর্ণ তবুও উপকারেই লাগবে। যথা, সবচেয়ে মোটা কথাই ধরা যাক্, কথা বা শব্দ সর্বদা অর্থৈকক বা স্বসম্পূর্ণ অর্থপিণ্ড নয়। এ-জ্ঞান যে অনেকের নেই, তার প্রমাণ সুধী পণ্ডিত হর্বার্ট রীডের একটি বচন : কাব্য একটি কবিতায় বা একটি লাইনে বা একটি-দুটি কথায় থাকতে পারে,—উদাহরণ, সেক্সপীঅরের incarnadine, কীট্‌সের shady sadness, কোল্‌রিজের Mount Abora ইত্যাদি। অথচ ওষ্ঠরঞ্জনের বিজ্ঞাপনে incarnadine দিলে multitudinous seas লাল হ'য়ে ওঠে না।

এ-সম্পর্কে কল্পনা-বিকল্পনা প্রয়োগ শিরোধার্য। যেখানে এ-মানসক্রিয়ায় উক্ত কথাগুলি সার্থক-সংযোগে কাব্য হ'য়ে ওঠে সেখানে পাই শুদ্ধকল্পনা। বিপরীতে অর্থাৎ কথার একক অর্থের, আভিধানিক অর্থের প্রাধান্য যেখানে, সেখানে বিকল্পনা। যথা, এই শ্লোকে কথাগুলির অর্থ অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র :

Through wood and dale the sacred river ran,
Then reached the caverns measureless to man,
And sank in tumult to a lifeless ocean

কিন্তু এ-শ্লোকে কথার অর্থ অভিধান ফেলে সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে গেছে :

She looks like sleep—
As she would catch another Antony
In her strong toil of grace.

তারপরে কোল্‌রিজের "শুভবুদ্ধি"র বিচার হ'ল রিচার্ডস্‌সের আলোচ্য। এ-শুভবুদ্ধির অস্তিত্ব বিনা কল্পনা হ'য়ে ওঠে প্রলাপী বিকার, বিকল্পনা হয় মহাব্যসন। মুশকিল হচ্ছে এই শুভবুদ্ধির মাত্রা নির্ণয়ে। কোল্‌রিজ বিকল্পনাবিহারী কৃলির যে পিণ্ডারীয় ওড-এ শুভবুদ্ধির অত্যন্ত অভাব দেখছেন, রিচার্ডস্ তাতে বিকল্পনাই পেয়েছেন—যদিও নিচুদরের বিকল্পনা। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জের দর রিচার্ডস্ আজও বাঁধতে পারেননি, কাজেই নিচুদর উঁচুদর অস্পষ্ট কথাই রইল। কোল্‌রিজের মতে এ-শুভবুদ্ধি আসে ব্যাকরণ, ন্যায় ও মনোবিজ্ঞানের সহজ বা জাত জ্ঞানে। এবং জ্ঞান হচ্ছে তাই যা কালে হ'য়ে উঠতে পারে ক্ষমতা, পাওয়ার।

এ-বিষয়ে অবশ্য আমাদের জ্ঞান অদ্যাবধি পরিমিত। রিচার্ডস্ তাই ভাবীকালের দিকে দীর্ঘশ্বাস ছুঁড়ে বলেছেন যে একদা বিজ্ঞানের নিশ্চিত নিকষে কবিতার ভালোমন্দের নির্বিশেষ বিচার করা যাবে। ইতিমধ্যে তিনি মেনেছেন কোল্‌রিজ-কৃত reason-এর জয়গানের জটিল সার্থকতা।

কোল্‌রিজের কবিতায় 'বায়ুবীণা'র রূপক সবার পরিচিত। "বায়ুবীণা" নামে পরের অধ্যায়ে রিচার্ডসের সূক্ষ্ম বিচারের বিষয় হচ্ছে নিসর্গ সম্বন্ধে কোল্‌রিজের দুটি মতবাদ। সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচিত সে-মতদুটি রিচার্ডসের কঠিন শব্দসংকুল নব বেশে হচ্ছে এই:

The mind of the poet at moments, penetrating 'the film of familiarity and selfish solicitude,' gains an insight into reality, reads Nature as a symbol of something behind or within Nature not ordinarily perceived.

এবং

The mind of the poet creates a Nature into which his own feelings, his aspirations and apprehensions, are projected.

রিচার্ডস্ স্থির করতে পেরেছেন যে অন্তত এ-মতদুটি যথার্থই মানসিক ব্যাপার। কিন্তু সতর্ক বিচারে সাবধানী ভাষায় প্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতির চাররকম অর্থ ও তার বর্ণনা রিচার্ডস্ করেছেন। প্রথম অর্থে প্রকৃতি শুদ্ধ, মানবমনের আয়ত্তের বাইরে, স্বাধীন, দুর্জ্ঞেয় এবং মানুষের ওপর প্রভাববিস্তারে সমর্থ এ-প্রকৃতিতে মানসলোক আরোপ করতে মানবীয় কল্পনা অক্ষম। দ্বিতীয় অর্থে প্রকৃতি মানবমনের লীলা-ক্ষেত্র। এ-লীলায় ভণ্ডামি নেই, কিন্তু যে-সব রূপগুণ এতে প্রকৃতির উপরে আরোপিত হয়, তারা সব mythical। রিচার্ডসের এক অধ্যায় হ'ল পৌরাণিকের সীমানির্দেশ। যাঁরা fiction-এর সঙ্গে ও রিচার্ডসের বিশ্বাস বা belief-এর সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা এ-অধ্যায়ে খুশি হবেন। বলা বাহুল্য, আমাদের জীবনযাত্রায় একান্ত প্রয়োজন এইসব বিশ্বাসকে 'পুরাণ' আখ্যা দিয়ে রিচার্ডস্ আমাদের অন্ধ পৌত্তলিক বলেননি। কারণ এ-সব পুরাণেই আমাদের সভ্যতা। এদের অনুবর্তনেই আমাদের ইচ্ছাশক্তি সংহত, মানস তথা ইন্দ্রিয়, শারীরক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও আমাদের বিকাশ সমঞ্জস হয়। একান্তসহায় এই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সর্বমানবীয় পুরাণগুলিতে অবশ্যই বিপরীত বিপদ আছে। যুক্তিবিচার যেখানে কম বিকশিত, সে অসভ্য আদিম সমাজে পুরাণ মানুষকে অনেকসময় পুরাণহীন বানরের চেয়েও

ভয়ানক ক'রে তোলে। সভ্য সমাজেও তা ক'রে তোলে, যার ফলে জাতিতে-জাতিতে লাগে নৃশংস দ্বন্দ্ব। যদি কোন পুরাণ অন্যান্য নৈতিক সামাজিক বা আন্তর্জাতিক পুরাণের বিপক্ষে না-যায়, তাহ'লে আমরা তাকে হয়ত বলি ধর্ম কিংবা আদর্শ লীগ্ অব্ নেশন্স। এ-সব পুরাণে বিশ্বাস অল্পবিস্তর সবাই করে। কিন্তু পূর্ণবিশ্বাস তাকেই বলে, যে-বিশ্বাস জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, আচরণকে চালিত করে। এ-পূর্ণবিশ্বাস দুর্লভ। যাদের এ আছে, তাদের কেউ ঈশ্বরের দূত ব'লে বা লেনিন ব'লে পূজা পায়, কাউকে পাঠানো হয় উন্মাদ আশ্রমে। ভগ্নাংশ থাকলে এ-বিশ্বাসের জোরে কেউ হয় ট্রট্স্কি, কেউ প্যের ভিদাল্, কেউ শেলি, কেউ ডন্ জুয়ান্। সেইজন্যেই কোল্‌রিজের মতে অত প্রয়োজন শুভবুদ্ধির, যে-বুদ্ধি দেয় সামঞ্জস্য। We receive but what we give, তার বেশি চাইলেই ঘটে অসাধারণত্ব—প্রতিভা বা উন্মত্ততা। এই পুরাণ-সৃষ্টিতে কাব্যের স্থান ব্যাপক ও উচ্চে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পুরাণের সঙ্গে কাব্যের পুরাণের প্রধান তফাৎ হচ্ছে যে শেষোক্তের মধ্যে প্রথমের অবশ্যস্বীকার্য দাবি নেই। নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে আমরা বিপদসংকুল সাগরে ও জনহীন দূর দেশে না-ও যেতে পারি, কিন্তু মোটরকারের সামনে থেকে না-সরলে হাসপাতালে যেতে হয়। যাঁরা রিচার্ডসের অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিকমন্যতায় বিরক্ত হতেন, এবারে তাঁরা খুশি হবেন। ব্র্যাডলির কথা তুলে জ্ঞানী রিচার্ডস্ এবার বলেছেন যে কোল্‌রিজিয় ঈশ্বরের মতো বিজ্ঞানও পুরাণ-জীবী ও ব্যবহারী। কেন, সে-প্রশ্নের উত্তর অবশ্য রিচার্ডসে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় *Capital* পুস্তকে।

যা-হোক্, কোল্‌রিজের সঙ্গে সেণ্ট টমাসের মিল দেখানো এখানে অসম্ভব। তাছাড়া তফাৎই বেশি। সেণ্ট টমাসের বিপুল সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞান ও খর বুদ্ধির সম্পূর্ণতার অভাবের জন্যেই কোল্‌রিজ থেকে রিচার্ডস্ তাঁর কাব্যতত্ত্ব বিকশিত করতে পারেন। তাছাড়া টমাস স্পষ্টত কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করেননি। এমনকি মারিতঁ্যা *Art and Scholasticism* লেখবার আগে আমরা জানতুম না যে এ ভগবদ্বাদী দর্শনে কাব্যাদির কোন স্থান আছে। কিন্তু ডমিনিকানব্রতী গিল্‌বি তাঁর আদিগুরুর বিপুল দর্শন থেকে কাব্যতত্ত্ব গঠন করতে পেরেছেন। ন্যায়শিক্ষিত ঘনসন্নিবদ্ধ এই সুলিখিত ছোট বইটি তাই প্রতি পৃষ্ঠায় উক্ত বৃহত্তর দর্শনের সঙ্গে পরিচিতি ধ'রে নেয়। স্থানসংকোচে তাঁর দার্শনিক ভাষার আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক ভাষ্য করা কঠিন এবং এক জায়গায় মূলগত প্রভেদ এ-কাব্যতত্ত্বকে আধুনিক বিজ্ঞান-প্রণোদিত তত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র করেছে—সে হচ্ছে ঈশ্বরেই সব জ্ঞানের, সব আচরণের

পূর্ণতা। তা না-হ'লে এ-তত্ত্বালোচনায় মধ্যে-মধ্যে চিন্তনীয় ও গ্রাহ্য কথা পেয়েই দ্বিধায় ক্ষান্ত হ'তে হ'ত না। প্রথমত বইয়ের আরম্ভ ধরা যাক্, জ্ঞান যে শুধু আধিপ্রত্যয়—conceptual নয়, প্রত্যক্ষও হয়, এবং সে প্রত্যক্ষজ্ঞানই মানবের পক্ষে প্রেয় ও গভীরতর জ্ঞান, এই ধ'রে গিল্‌বির সূত্রপাত। কারণ শুদ্ধ প্রত্যয় নয়, অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রতি মানবমনের গভীর প্রেম, এই প্রেমই ঈশ্বরের দিকে টমাস্‌কে নিয়েছিল। এরই জন্যে ঈশ্বরে বিশেষের চরম বিশেষত্ব। কাব্য এই অনবচ্ছিন্ন বিশেষের প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অপেক্ষাকৃত পূর্ণ পরিচয়—অপেক্ষাকৃত, কারণ মানুষের মনের গঠনে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় শুধু ঈশ্বরেই। কোল্‌রিজের মতাবলির সঙ্গে এ-মতের সম্বন্ধ নির্ণয় স্থগিত রেখে প্রত্যক্ষানুভূতির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে একালের বৈজ্ঞানিকরাও বাগ্‌বহুল, সে-কথা এখানে মনে রাখা ভালো। কোল্‌রিজ হয়ত এবং গিল্‌বি স্পষ্টই আগামী ব্যঙ্গের উত্তর দিয়ে গেছেন। টমাসের দর্শনে অপরাবুদ্ধির বা প্রত্যয়গত জ্ঞানের কারবার অবচ্ছিন্ন সার্বিক নিয়ে—সেখানে ইন্দ্রধনু দেখলে তার ব্যাস-দৈর্ঘ্যের মাপ করতে হয়, কিন্তু কবির যে বিশেষ ইন্দ্রধনু, তার সত্তা ও তার জ্ঞান সেই বিশেষ ইন্দ্রধনুত্বেই। সেখানে মাপের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ টমাসের মতে form প্রত্যক্ষজ্ঞানের নয়, প্রত্যয়জ্ঞানের কারবার।

বলা দরকার যে টমাসকে বুদ্ধি-বিদ্বেষী ভাবলে ভুল হবে। কারণ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সঙ্গে প্রত্যয়বুদ্ধির তিনি পূর্বাপরমধ্য সম্বন্ধ রেখেছেন। তাই এ-তত্ত্বকে Thingism তথা ব্যক্তিসর্বস্ব ব'লে ঝেড়ে ফেলা যায় না। টমাসের কাছে মন প্রাকৃত বিশ্বের অংশ, শরীর এবং এই মনেরই এক প্রক্রিয়ায় কোল্‌রিজিয়ান সুরে বিষয় ও বিষয়ী, ব্যক্তি ও বস্তু এক হ'য়ে ওঠে। অবশ্য এই অখণ্ডমিলন পদার্থিক নয়, চৈতন্যগত। ছবি যে দেখি, তাতে কয়েকটি রেখার যোগফল আমরা দেখি না, দেখি একটা সমগ্র ছবি। তেমনি মন দিয়ে দেখি না, বা অক্ষিতারা দিয়ে, দেখি সমস্ত ব্যক্তি দিয়ে। Gestalt মনোবিজ্ঞানের সমর্থনে গিল্‌বি দুটো ছবি এঁকেছেন। সে-ছবিদুটিতে চারটি ক'রে রেখার মধ্যে একটিতে শুধু তফাৎ, কিন্তু সমগ্র ছবিদুটি হ'ল ভিন্ন। স্টার্লিং-কৃত উপায়ে স্নায়ু সম্পর্কহীন ক'রে হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষিত হয়, কিন্তু সে-হৃদয় শুধু একটি মাংসপিণ্ড যন্ত্র। যা-হোক্, এই সমগ্রের সঙ্গে সমগ্রের প্রেমালাপের বাহন ইন্দ্রিয়াদি এবং এই ইন্দ্রিয়গুলির সকলের জ্ঞান-রাজ্যে সমান মর্যাদা নেই। এ-সব মানসিক ক্রিয়াদি কিন্তু চেতনারই কোলে। চেতনার বর্ণনা টমাস্ করেছেন। তার শুধু এক অংশ হচ্ছে স্মৃতি। চেতনার পরিচয় দিয়ে গিল্‌বি ভগবৎ-করুণার তুলনায় কাব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

আবে ব্রেমোঁর প্রার্থনা ও কাব্য তাকে প্রামাণ্য দিয়েছে। বইয়ের বাকি অর্ধেকের মোটামুটি এই জ্ঞানতত্ত্বের কাব্যে আরোপ। কোন বিশেষ কবিতা তাতে আলোচিত হয়নি, পূর্বোক্ত কথাগুলি অল্পবিস্তর কাব্যার্থে বিশ্লিষ্ট, ব্যাখ্যাত, বিস্তৃত হয়েছে। তার শেষ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে কাব্য পরমার্থজ্ঞানেরই জাতের প্রক্রিয়া, তবে বাধ্যতই নিচুদরের এবং একটু অসম্পূর্ণ। রিচার্ডস্ অবশ্য কাব্যের পারমার্থিক গোত্র মানেন কিন্তু পরমার্থ মানেন না। মার্ক্সের সঙ্গে দেখছি ম্যাথু আর্নল্ড্ এখনও আমাদের সমসাময়িক। রিচার্ডস্ আজও একলা নয়।

সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

অবনীন্দ্রনাথ

এক হিসাবে চিত্রশিল্পের সংবেদনমার্গে যে-শুদ্ধির অবকাশ, তাতেই সাধারণ মানুষের আবেগ সহজে জাগে এবং সে-আবেগের কথা বলতে গিয়ে তাকে প্রথাসিদ্ধ শিল্পসমালোচক সাজতে হয় না। বাঙালি শিল্পীর রচনা এক হিসাবে এ-দেশের নবজাগরণে, যাকে বলে জাতীয় রেনেসাঁসে সক্রিয়তার একটি দিক। যে-সাধারণ্যে রুচি মূর্তি নিচ্ছে, সেই জনরুচির মানেই তাই এ-ক্ষেত্রে কান্তিবিত্তার মানদণ্ড প্রয়োগ সম্ভব। ভাষাবহ শিল্পেও অবশ্য ছন্দের প্রাথমিক অঙ্গীকার আছে, এবং ছন্দ মূলত শুদ্ধ সন্দেহ নেই, নৃত্যের শারীরিকতা ও সামাজিকতাতেই ছন্দের বংশনির্দেশ। কিন্তু বংশপরিচয়ে পুরুষার্থ সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাথমিক ছন্দের প্রত্যক্ষ আবেগ আমরা দীর্ঘকাল হ'ল হারিয়েছি সভ্যতার প্রগতির অনিবার্য কারণে, যেমন শ্রুতির মিথ্ বদলেছে স্মৃতির পুরাণে, প্রতীক বদলেছে ব্যক্তিগত কল্প-প্রতিমায়। ভাষার বহুধা ব্যবহার ও সামাজিক ক্রমচ্ছেদের গতি সভ্যতার সঙ্গে সমান তালেই চলেছে। কিন্তু একদিকে সঙ্গীত আর অন্যদিকে দৃশ্যশিল্পে এখনও বিভিন্ন আবেদনের পরিচ্ছন্নতা খানিকটা বর্তমান। রং এখনও কৃষি বা যন্ত্র বা মসীজীবীর জীবনবোধের বৃদ্ধি সাধন করে, রূপাকার এখনও আমাদের স্পর্শাবেগে সম্পূর্ণতা আনে, শেষ পর্যন্ত আমাদের পেশলতন্ত্রের তারে মোচড় দেয়।

এই আবেগে ধরা দেয় বস্তুর অধরাসত্তা, শিল্পীর চৈতন্যে এবং শিল্পের মাধ্যমে চারিয়ে রূপান্তরে। শিল্পীমানসের আততিতে, তাঁর প্রকাশের তাগিদের বিচারেই তাঁর বাস্তব উপলব্ধির সততার বিচার। আমাদের শিল্প-রেনেসাঁসের ইতিহাস এ-বিচার ছাড়া বোধ্য নয়। এ-বিচারেই অবনীন্দ্রনাথের সূত্রপাত ঐতিহাসিক সার্থকতা পায়, এ-বিচারেই সেই ধারা পরিণতি পায় যামিনী রায়ের পাকা তুলিতে এবং তারই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পাই তরুণ শিল্পীদের কাজে, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল, চিত্তপ্রসাদ, তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের শিল্পচেষ্টায়।

প্রথমেই নমস্য তাই অবনীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর গভীর শিল্পস্বভাবে আর সেই শুদ্ধ কারণে বাংলার লৌকিকজীবনের সঙ্গে দুর্মর সাযুজ্যে বুঝেছিলেন কোথায় বাংলার নবজাগরণের উৎস। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব, সমাজসংস্কার, ব্রাহ্মধর্ম

আন্দোলন ইত্যাদি যে এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য নয়, সে-বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথই প্রথমে আমাদের সচেতন করেন, পাল্টা গোঁড়ামির বাঁধি গতে নয়, সৃষ্টিময় শিল্প-চৈতন্যেরই সার্থক এষণায়।

এ-কাজে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী হ্যাভেলের ভাষার পথনির্দেশ এই: 'Present methods of education have opened a rift between the artistic castes and the 'educated' such as never existed in any previous time in Indian history. The remedy lies, not in making Indian artists more literate in the European sense ... nor in manufacturing regulation pattern books but in making the literate, educators and educated conscious of the deficiencies of their own education....'

সম্প্রতি ইংরেজ সমালোচক এলিক্ ওয়েস্ট এক প্রবন্ধে ('মডার্ন কোয়ার্টার্লি', "মার্ক্সিস্‌ম ও কালচার") ভারতবর্ষে এখনো অবশিষ্ট এই লোকশিল্পের স্থান আলোচনায় প্রায় এই প্রশ্নই তুলেছেন, তিনিও মনে করেন যে আমাদের শিল্প-ভবিষ্যৎ খানিকটা স্বচ্ছ, কারণ ঐ তথাকথিত য়ুরোপীয় শিক্ষার যে অ্যাকাডেমিক বা মাছিমারা বস্তুতান্ত্রিকতার বন্ধন সেটা এখনও আমাদের জনসাধারণের রুচি একেবারে নষ্ট করেনি। কথাটা পুরান বা নতুন কোন রেগুলেশন কপিবুক তৈরি ও চালু করার আগে সবার পক্ষে, মার্ক্সিস্টেরও পক্ষে স্মর্তব্য। বলাই বাহুল্য, ভবিষ্যৎ রচনা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ঐ হ্যাভেলোক্ত 'শিক্ষিত' ও ইংরেজিহীন শিল্পকর্তা জনসাধারণের মধ্যে ভেদটা নগণ্য নয়, এমনকি চিত্র বা গঠনমূলক শিল্পাদিতেও, যদিও ভেদটা সাহিত্যেই বেশি প্রকট ভাষাগত কারণে। ভেদের জোড় লাগবে অবশ্যই বৃহত্তর সমাধানে, নিছক শিল্পক্ষেত্রেই যে-চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকবে না। হ্যাভেল তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতির অগাধ জ্ঞান ও শ্রদ্ধা নিয়েও এ-কথা ঠিক বোঝেন-নি, যদিও মার্ক্সের ভারতীয় পত্রাবলিতে এর নিশানা মেলে। হ্যাভেল তাই সামাজিক জীবনের সমগ্রতার ঘোড়ার মুখে জুততে চান শিক্ষার আংশিক সমাধানের গরুর গাড়ি।

কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের দান কতখানি হ'তে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের নবজাগরণে, সে-বিষয়ে হ্যাভেল প্রায় এলিক্ ওয়েস্টের মতোই দৃষ্টিবান্: '... behind all this intellectual and administrative chaos there remains in India a native living tradition of art, deep-rooted

in the ancient culture of Hinduism, richer and more full of strength than all the eclectic learning of the modern academies and art-guilds of Europe....'

এর থেকে যদি ঐতিহ্যধারায় মানুষ অনাত্মচেতন কারুশিল্পী, অভ্যাসিক যাঁর কর্মপদ্ধতি এবং যাঁর স্থিতীয় মন বিশেষ কিছু স্বীয় কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না তাঁর সঙ্গে, যে-শিল্পীর কাজ মোটামুটি তাঁর মানসের সমগ্রতায় সচেতন কর্ম, সে-শিল্পীকে এক ক'রে ফেলি তাহ'লে আজ সেটা মারাত্মক ভুল, প্রতিক্রিয়াশীলতা বা অতীতসর্বস্বতারই নামান্তর। তার অর্থ এ নয় যে আমাদের লোকশিল্প যে বছরে-বছরে নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে বা শিল্পীরা ভিক্ষায় যা অকাজে নামবেন, সে-বিষয়ে কিছু কর্তব্য নেই। কিন্তু অতীতকে জীয়ানো যায় না, ইতিহাসকে এড়িয়ে কিছু শৌখিন বাড়ি সাজানোর জিনিস হয়ত পাওয়া যায়। ঐতিহ্যগত লোক-শিল্পে শিল্পীর কোন বিকাশ বা বিবর্তন নেই।

আসলে হ্যাভেলও কার্যত তা জানতেন, নাহ'লে তিনি কী ক'রে অবনীন্দ্র-নাথের সাহায্যে শিল্পশিক্ষার সরকারী স্কুল চালালেন শিল্পীর সম্ভাবনা ভেবেই, প্রথাসিদ্ধ তথাকথিত ভারতীয় কারুশিল্পী তৈরি করতে নয়।

শিল্প ও কারুকারের ঐক্যসাধনের প্রশ্ন এখানে উঠছে না, যদিচ উভয়ের সুস্থ সম্বন্ধপাত এবং একই ব্যক্তির মধ্যে শিল্পী ও কারুকারের ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক শিল্পের কিছুটা নিরক্তা, কিছুটা টেক্‌নিক্‌গত দুর্বলতা নিশ্চয়ই এই ঐক্যের অভাবে। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে আজ সজ্ঞান নির্বাচন অনিবার্য। আমাদের এই প্রাচীন চিরাচরিত মহাদেশেও জীবনের রূপ বদলেছে এবং এই প্রতিযোগিতার যুগে পণ্যের যুগে মানুষ তার মানসকর্মে বৃত্তিনির্ভর ধারাবাহিক স্বাক্ষরহীনতা হারিয়েছে, যেমন শক্তি লাভ করেছে ব্যক্তিস্বরূপের সাধারণ ঐশ্বর্যে, আত্মচেতনায়, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নির্বিশেষ ক্ষমতায়—সর্বদা না-হ'লেও অন্ততঃ নির্বাচনের সম্ভাবনায়। অবনীন্দ্রনাথ সে-নির্বাচন করেছিলেন, তিনি য়ুরোপীয় যাথার্থ্যমার্গে ওস্তাদ হ'তে পারতেন, বড়ো প্রতিচিত্রকর হ'তে পারতেন, মহত্তর রবিবর্মা হ'তে ত পারতেনই। কিন্তু তিনি স্পষ্টই হলেন ভারতীয় শিল্পের রেনেসাঁসের নেতা।

এটা প্রাদেশিকতা নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে প্রায় অপাংক্তেয় বাংলায় যে কেন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কারবার পাতল, তার কারণ অবশ্যই কোন জাতি-তত্ত্বে খোঁজবার দরকার নেই। সূত্রপাতে এবং সাংস্কৃতিক পক্ষপাতে অনার্য, ব্রহ্মণ্যের সবচেয়ে দুর্বল ঘাঁটি, দিল্লী থেকে বারাণসী কাঞ্চী থেকে দূরে বাংলার কিন্তু ছিল

স্বকীয় সমস্যা ও সমাধান চেষ্টা—জীবনেরই মতো, লৌকিক শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। এবং বাংলাতেই গজাল ও বিকাশ পেল প্রথম ভারতীয় মধ্যবিত্ত, নব্যশিক্ষিত, সংস্কারক, প্রতিসংস্কারক, ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব থেকে জাতীয় ভারতের স্বপ্নের রাত অবধি।

অবনীন্দ্রনাথের সত্তার শিকড় এই বাংলার আদিম গভীরে। অবশ্যই তিনি নবাবী আমেজ পেয়েছিলেন, ব্রিটিশ-পূর্ব ও প্রাক্‌-ব্রিটিশ দরবারী সংস্কৃতি তাঁরও স্মৃতিতে সঞ্চারিত এবং মুঘল তস্‌বিরের বিলাসী সৌকুমার্য, রাজপুত চিত্রের গীতায়িত আবেগ, জাপানী-ছবির সূক্ষ্ম পেলবতা ও ওয়াশ্‌ টেক্‌নিক্‌ তাই তাঁর আয়ত্তে এল অত সহজে।

কিন্তু এ-ও বাহ্য। প্রথম উৎসাহে এবং খানিকটা তখনকার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের দরুন তাঁর হ্যাভেল কুমারস্বামী প্রভৃতি বন্ধু ও ভক্তরা এবং ছাত্রেরা অবনীন্দ্রনাথের স্বভাব ও কাজের আরেকদিক, স্থায়ীতর দিকটা গৌণ ভাবেন। তাঁর প্রতিভার সে-দিক দেখি তাঁর বাংলার নিসর্গদৃশ্যমালায়, চণ্ডী কৃষ্ণলীলার চিত্রে, ঠাকুমা, শিশু, ইত্যাদি ঘরোয়া ছবিতে। তাঁর প্রতিভার এইদিক থেকেই তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ লেখকও বটে। তাঁর গল্পের বইতে, তাঁর মজাদার নাটকে, ছড়ায় অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে গ্রামীণ বাংলার সংস্কৃতি তাঁর স্বরূপ খুঁজে পায়। আমাদের ছড়া, গান, কথকতা, রূপকথা, মেয়েলি ব্রতে বাংলার প্রত্যক্ষ নিসর্গে তাঁর প্রতিভা ক্ষীরের পুতুল গড়ে, হাঁসের ঝাঁকে বাংলাময় ওড়ে, কুঁকড়োর গানে জাগে। আমাদের অজাতমৃতমূর্থপ্রায় সংস্কৃতিতত্ত্বে ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় তাঁর 'বাংলার ব্রত' প্রাথমিক বই। গমনাগমনের শিল্পপ্রতিভা শুধু রচনায় নয়, শিল্পবিচারের অন্তর্দৃষ্টিতেও অসামান্য। আমাদের নদীমাতৃক মাটির যে সংস্কৃতেতর লৌকিক সরস প্রত্যক্ষধর্মী মানবিক সংস্কৃতি, দ্বারকা ঠাকুরের গলির পাঁচ নম্বরের শৈশবার্জিত তার জ্ঞান ও জীবনবোধই তাঁর মুখ্য দান, যার স্বীকৃতি ভবিষ্যতে বিস্তৃত।

নিজ বাসভূমে পরবাসী সে-যুগে অবনীন্দ্রনাথের এই আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ণয় অর্থাৎ নবজাগ্রত আন্দোলনের ঐতিহাসিক মর্যাদা কতখানি তা বোঝা যায় চিত্রের মাধ্যমের বাইরে এই আন্দোলনের খতিয়ানে বিশেষ ক'রে ভাষাবহ কর্মক্ষেত্রে, যথা সাহিত্যে। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাবেই বোধহয় আজও ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতির বিচারে এই ব্রহ্মণ্যহীন লোকায়ত পক্ষপাত প্রায় দুর্লভ—একদিক থেকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং ক্ষিতিমোহন সেনের কোন-কোন লেখা ছাড়া। এ-তির্যক ইংরেজ-পক্ষপাতের জন্যেই বোধহয় সাহিত্যবাদী

সাহিত্যিকও আপন অজ্ঞাতে অবনীন্দ্রনাথের ভাষারচনার অসামান্য সাহিত্যমূল্য—কি শিল্পমর্যাদায় কি বৈচিত্র্যে, নির্ধারণে দুর্দান্তরকম কার্পণ্য করেন। শিল্পবিচার বা কান্তিবিদ্যার চর্চাতেও অবনীন্দ্রনাথের লেখা সংখ্যায় বা গৌরবে কম নয়।

অথচ ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়, কারণ এ-স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে যে শুধু মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু, এমনকি তারাশঙ্করের বিচার কিংবা পট বা পাটার আলোচনা তা নয়, এরই সঙ্গে জড়িত আমাদের ইতিহাসের পাঠোদ্ধার, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের রূপায়ণ। রামমোহনের দেশ, বঙ্কিমের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ আরও অনেকেরই ত দেশ, তাছাড়া তার অতীত বাদ দিয়ে কি শুধু উকিল মোক্তারে মাস্টারে কেরাণীতেই তার বর্তমান নিঃশেষ? তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি শুধু দিল্লীতেই ফুরিয়ে যায়? এবং যদি ভাবা যায় যে এটা অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাহ'লে ভুলই হবে কারণ যদিও অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুধা বৈচিত্র্য আরেক দেশের বৃহত্তর ও মৌলিক রেনেসাঁসের কথা মনে আনে—দা ভিঞ্চি বা বেলিনির যুগের কথা, তবু তাঁদেরই মতো অবনীন্দ্রনাথও তাঁর কালেরই মানুষ, অর্থাৎ একা নন।

গগনেন্দ্রনাথের মধ্যেও বাংলার জীবন ও জনসংস্কৃতির সঙ্গে এই যোগাযোগেরই আরেক প্রকাশ। 'ভারতী'তে এবং বিশেষ ক'রে 'জীবনস্মৃতি'র সহজ কিন্তু মনোরম ব্যঞ্জনাময় চিত্রাবলিতেই তাঁর বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ। তারপরে বৈষ্ণব ভাবধারায় তাঁর ঐশ্বর্য বিস্তারের অধ্যায়। কিন্তু সে-অধ্যায়েই তাঁর হাত ক্ষান্তি মানেনি, এল প্রখর সমাজ-বেদনাহত ব্যঙ্গচিত্রাবলি এবং যেন একজন শিল্পীর পক্ষে এই যথেষ্ট কীর্তি নয়, গগনেন্দ্রনাথ শুরু করলেন তাঁর তথাকথিত ঘনকাঢ্য যুগ, ভাস্বর কোণমিতির সাক্ষাৎ কাব্য। আর্টিস্ট যে কী সম্পূর্ণতায় স্বকীয় সীমাবদ্ধতার সদ্ব্যবহার করতে পারেন, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলি তাঁর আশ্চর্য উদাহরণ।

তারপর আরেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ যখন দু-হাতে দিলেন উড়িয়ে নব্যভারতীর ভাববিলাস আর অ্যাকাডেমির যথাযথবাদের দাবি। আমাদের কালের সবচেয়ে প্রচণ্ড মনের উলঙ্গ স্বপ্ন, অফুরন্ত কল্পনা রেখার রঙের অজস্র কিন্তু নিশ্চিত ছন্দে ভাসিয়ে দিলে অশিক্ষিতপটুত্বের পুঁথিগত দ্বিধা, যেমন ভেঙে দিলে রবীন্দ্রনাথেরই বিরাট সাহিত্যকীর্তিলালিত তাঁর শুচিবায়ুগ্রস্ততার শালীননীতির পুরাণ।

আরেকজন মহৎ শিল্পীর কাজেও এই দ্বৈততার আভাস দেখা যায়, নন্দলাল বসুর বিরাট চিত্রকর্মে। নন্দলালের রূপায়ণে অন্তহীন নব-নব বিকাশ, তাঁর নানা

রীতির অন্বেষা যে-কোন শিল্পগোষ্ঠীর গর্বের বিষয়। দীর্ঘ কীর্তির পটে আজও তাঁর কল্পনার সাবেক ঐশ্বর্য কমেনি, অধিকন্তু এই কথাই বলা উচিত যে তাঁর মানস-সম্পদের প্রাচুর্যই তাঁকে তাঁর রেখার ও রঙের অমিত ঐশ্বর্যের সাততলা মহলে বারবার নিয়ে যায় রূপের শুদ্ধ মাটি থেকে। নন্দলালের পোস্টারচিত্রে অবশ্য লোকশিল্পের ব্যবহার দ্রষ্টব্য, যেমন তাঁর বাংলার গ্রাম্যজীবন ও নিসর্গের অজস্র চিত্রাবলিতেও তা দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে আমাদের নতুন শিল্পান্দোলনে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে প্রদোষ দাশগুপ্তের মতো শিল্পী থাকা সত্ত্বেও চিত্রের অনুরূপ কিছুই বিশেষ কাজ হয়নি। স্থাপত্য ত বটেই এমনকি ভাস্কর্যের প্রসারে সামাজিক সমর্থন আশু প্রয়োজন। আমাদের জীবনযাত্রায়, জীবনের প্রত্যেক স্বচ্ছ উপভোগে কোথায় সে-সমর্থন? সে-অভাবেই বোধহয় চিত্রকলাতেও এত মৌল রূপ-ভাবনায় শৈথিল্য, কোন ব্যক্তিগত ত্রুটির চেয়ে বেশি এই ঐতিহাসিক কারণেই।

এইদিক থেকেই যামিনী রায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁর মধ্যে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, তাঁর বন্ধু নন্দলালের সাধ সম্পূর্ণ। তাঁর কাজে আমাদের শিল্প রেনেসাঁসের পটে বাংলার স্বকীয় সমগ্রতালাভ। এদিকে তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অ্যাকাডেমিক বা বস্তুতান্ত্রিক রীতির পাকা চিত্রকর, অসামান্য রেখাশিল্পী, আবার বাংলার লোকমানসে ও শিল্পে তাঁর গভীর সাযুজ্য। তাঁর প্রথম যুগের অনলস কঠিন সিদ্ধির মধ্যে তাঁর যে-শিল্পমানসের বিপ্লব এল, তার দীর্ঘ ও বিস্ময়কর বিবর্তনের ইতিহাসে, গ্রহণে ও বিচারেই আমাদের শিল্পের ভাবী সম্ভাবনা।

যামিনী রায়

যামিনী রায়ের চিত্রাবলি এতই চিত্রগুণে শুদ্ধ, যে তাঁর বিষয়ে ভাষায় লেখা সক্ষম হ'লেও খানিকটা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। সচরাচর এই চিত্রগুণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আক্রমণে কাবু দেখা যায়। তাই আমরা গল্প না-পেলে চিত্রকে দুর্বোধ্য ত বলিই, তার সামাজিক সত্তাও দেখতে পাই না। মাতিসের মতো যামিনী রায়ের দীর্ঘ চিত্র-সাধনার বিষয়ে এ-কথা বিশেষভাবে সত্য। ফলে আমরা হয়ত তাঁর বিশেষ দু'-একটি ধরনের ছবি পছন্দ করতে পারি, কিন্তু তাঁর কীর্তির সামগ্রিক উৎকর্ষ উপলব্ধি আমাদের বোধের বাইরে থেকে যায়।

কারণ মাতিসের সঙ্গেই তাঁর শিল্পস্বভাবের কিছুটা তুলনা সম্ভব হ'লেও, এক হিসাবে তাঁর বিকাশের বহুবিধ ঐশ্বর্যের তুলনা মেলে খানিকটা পিকাসোরই সঙ্গে, যদিচ পিকাসোর বুদ্ধিখর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদীর অস্থির কৌতূহল বা পিকাসোর মায়ামমতাহীন গ'ড়ে-ভাঙা ও ভেঙে-গড়া এক স্বতন্ত্র শিল্পস্বভাবের ইতিহাস।

চৌষট্টি বছর আগে বাঁকুড়ার এক অন্তর্বর্তী গ্রামে তাঁর জন্ম। লোকসংস্কৃতির অবশেষে ও অপেক্ষাকৃত আঞ্চলিক সচ্ছলতার মধ্যে বেলেতোড় গ্রামে তাঁর শৈশব তাঁর জীবনের বিকাশে নিরর্থক নয়। শিল্পের প্রাণ সন্ধান এবং সামাজিক জীবনের আত্মসম্পূর্ণতার স্বপ্ন তাঁর এই গ্রামীণ পটভূমিতেই আরম্ভ। এরই স্মৃতি তাঁকে ভুলতে দেয়নি কলকাতার নকল বুর্জোয়া জগতের পশ্চিমা প্রাকৃতবাদী শিল্পমার্গের অসারতা, তাঁর নিজের হাতের অসামান্য সাফল্য সত্ত্বেও। কারণ য়ুরোপের প্রথাসিদ্ধ শিল্পরীতিতে যামিনী রায়ের কৃতিত্ব য়ুরোপের বাইরে অভূতপূর্ব। অবশ্য এই য়ুরোপীয় রীতির যুগে তাঁর বিস্তৃত কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী সাধনার প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছে, বিশেষ ক'রে দেশের মানুষের ভিন্ন-ভিন্ন দেহ ও মুখের টাইপের জ্ঞান তাঁর তুলিতে মজ্জাগত হ'য়ে গেল এই পোর্ট্রেটের যুগেই। এবং রেখাসংক্ষেপের দখলও এসে গেল এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে।

সুনাম ও পসারের মধ্যে যামিনী রায়ের মানসিক যন্ত্রণা মোড় নিলে, সন্ধিক্ষণের বিপ্লবী দিকে, ব্যক্তিগত স্টাইল বা রীতির সামাজিক শিকড়ের আন্বেষায়। প্রথমত রূপান্তরের তাগিদ এল তাঁর তৎকালীন শিল্পসাফল্য এবং তাঁর দর্শক-ক্রেতা বাবুসমাজের সম্বন্ধের মধ্যে মানসিক অসারতা বা উভয়ত প্রাণবস্তু শিল্পপ্রেরণার

অভাব উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে। দ্বিতীয়ত তিনি দেখলেন যে ঐ পূর্বোক্ত কারণেই আমাদের জেবলী বা উন্মুল শিক্ষিত শ্রেণীর সংস্কৃতিতে য়ুরোপের ওস্তাদের ঐতিহ্য চালান করা ব্যর্থ চেষ্টা। তাছাড়া এ-দেশের কড়া রৌদ্রের আলোয় ছায়াবর্ণাঢ্য প্রথাসিদ্ধ তৈলাঙ্কনের অর্থহীনতাও তাঁর কাছে স্পষ্ট হ'ল।

তখন থেকে তাঁর তপশ্চর্যা, সারল্যের অভিযানে অবিশ্রাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রথমদিকেই তাঁর সাফল্য দেখা যায়—বহুর মধ্যে একটিধরনের উদাহরণই নেওয়া যাক্, তাঁর সাঁওতাল মেয়েদের মনোরম ছবিগুলি, কিংবা কৃশ বাংলার মা, বাহুতে ছেলে। যামিনী রায় তখনও তেল রং ব্যবহার করেন, কিন্তু লঘু মসৃণ টানে। এ-সময়েই দেখা যায় তাঁর ছবিতে রংগুলির পারস্পরিক সমান চাপের দিকে একটা ঝোঁক। দেখা যায় আকারগত এবং রেখাগত শুদ্ধতা এবং রঙের একটা ভাবব্যঞ্জক গঠনমূলক ব্যবহার।

অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য চিত্রকর হয় আকারের ভাস্কর্যমূলক সমস্যায় কম-বেশি ভাবিত থাকেন (সেজন্ থেকে পিকাসোর অনেক কাজ অবধি) নয়ত রঙের লিপি-মূলক ঐশ্বর্যবিস্তারে ঝোঁক দেন (ইম্প্রেশনিস্ট থেকে মাতিসের অনেক কাজ অবধি)। যামিনী রায় চিত্রের গঠনময়তা আর ভাস্কর্যে কঠিন স্পর্শসহতা কখনও এক ভাবেননি, আবার বর্ণাঢ্য রেখার স্পষ্টতাও তিনি কখনও হারাননি বর্ণের বিলাসে। ভারতবর্ষের শিল্পের ঐতিহ্যে তিনি দরবারী মিনিয়েচর রীতিবিলাসকে কোনদিনই মূলধারা ভাবেননি।

তিনি খুঁজেছিলেন মৌলিক আকারের ও সমবর্তী রঙের উচ্ছল রূপায়ণ এবং তা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন বাংলার পুতুলের চৈত্যরূপের নিশ্চিত ঋজুতায় তাঁর ঘরের ও সর্বদেশের শিশুদের শুদ্ধ ভাবগঠনের দৃষ্টিতে, আদিম বর্ণপংক্তির রঙীন শক্তিতে। তাই তাঁর পরীক্ষা চলল আমাদের চোখের প্রাথমিক অন্তরস্থ জালিধূসরের সারল্যে, যে-ধূসর, চোখ খুললেই রূপের কাঠামোতে হ'য়ে পড়ে আকাশের অনন্ত নীলিমা। এইধরনের ছবিগুলি আঁকা তুলির একটানে, ধূসর পটভূমিতে, ভূসোরঙে ; যামিনী রায়ের চোখের এবং কব্জির ধ্রুব নিশ্চিত শক্তিতে এইসব ছবিতে আসে বিষয়বস্তুর গঠনবেদ্যতা—তা সে মা হোক্ বা শিশু হোক্ বা বৃদ্ধ মানুষ বা হরিণ বা বাংলার বিধবা মেয়ে। এবং সেটা আসে পরিপ্রেক্ষিতের স্তরবিন্যাসে নয়, আসে শুধু অধরা ধূসরের পটে কৃষ্ণ রেখার ধৃতসীমার সবল টানের চাক্ষুষ ব্যাপ্তিতে। এইসব রেখা-শরীরের দেহভার হয়ত যাঁরা শুধু পারসীক মিনিয়েচর দেখে কাটান বা তথাকথিত নব্য-ভারতীয় ছবির ভক্ত তাঁদের চোখ এড়িয়ে যাবে, যেমন যাবে তাঁদের কাছে

যাঁরা শুধু ক্যামেরার চড়া ছায়াতপে অভ্যস্ত, যে কড়া শাদা-কালোর তুলনাবৃত্তিতে চোখ খোলার মুহূর্তে মানবচক্ষুর পক্ষপাতহীন ধূসরিমার কোন স্থান নেই।

যামিনী রায়ের প্রতিভা অবশ্য এই সিদ্ধিতে বিরাম মানেনি। যাঁরা তাঁর তুলির অবিরাম রেখার সঙ্গে কালীঘাটের জের-টানা রেখার তুলনা ক'রে সন্তোষ পান যেন তাঁদেরই অধিকতর হতভম্ব করতে তিনি শেষ করলেন বিরাট দেয়াল-চিত্রের একটি গোটা সারি। রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার কঠিন মাধুরীতে এই চিত্র-মালার মূর্তিগুলিতে এক নতুন সৌন্দর্যের উন্মেষ। বলাই বাহুল্য, যে-কোন গুণী শিল্পীর মতো যামিনী রায় সর্বদাই পাঠ নিতে প্রস্তুত, এবং বাংলার পট বা পাটা, রেম্ব্রাণ্ট বা ভানগখ কিছুই তিনি তুচ্ছ করেননি। কিন্তু তিনি চূড়ান্তভাবে নির্বাচনক্ষম সজ্ঞান শিল্পী এবং তাঁর রুচি ক্ষণকালের জন্যও তাঁর তুলিকে ছাড়েনি, অন্যপক্ষে লোকশিল্পীরা প্রায় অভ্যাসিক কারিগর এবং সুরুচির সমান মাত্রা সচেতনতা ছাড়া না-থাকাই স্বাভাবিক। এই বড়ো-বড়ো ছবিগুলিতে চৈত্যমাত্রিক বলিষ্ঠ আকার যেমন মুখ্য তেমনি এদের আলঙ্কারিক সৌষ্ঠবও অবিচ্ছেদ্য। এই সার্থকতা সম্ভব শিল্পীর হাতের অসামান্য দক্ষতায়, তাঁর চিত্তের একাগ্র অনুসন্ধিৎসায় এবং একান্ত শিল্পী-দায়িত্ববোধে আর দেশের লোকের ভালোবাসার উৎসে নিজের ব্যক্তিগত ভালোবাসাকে ডোবাতে পারলেই। এই ছবিগুলিতে ঘনতা পটসন্ততিতে বা স্থানযোজনায় এমনভাবে বিন্যস্ত যে শিল্পীর গঠন-মৃন্ময়তার কর্তৃত্ব আপাত-দৃষ্টিতেও স্পষ্ট অথচ তাঁর মূর্তিগুলি বা চিত্রদেহগুলি চিত্রগতই, ভাস্কর্যগত নয় এবং এ-ভেদেই তাঁর শিল্পসিদ্ধির আরেক প্রমাণ।

কিন্তু যামিনী রায় এখানেও থামেননি। যেন রামায়ণ বা কৃষ্ণলীলার পরিচিত রসাভাসে পাছে তাঁর পরীক্ষা বহির্মুখ থেকে যায়—আসলে অবশ্য এ-পরীক্ষা তাঁর মানসের গভীর আবেগবহ দ্বন্দ্বময় প্রেরণাই—তাই শুদ্ধির খোঁজে তিনি খুঁজলেন পুরাণের বাইরে, তৈরি অনুষঙ্গের বাইরে তাঁর চিত্রের উপজীব্য। বাউরি, সাঁওতাল, সাধারণ চাষী, সাধারণ জীবনযাত্রারত মেয়ে-পুরুষ এরা হ'ল তাঁর চিত্রের বিষয়বস্তু। শুদ্ধ চিত্রসাধনায় তারা অবশ্যই নির্বিশেষ, সাধারণ, কিন্তু তবু তারা টাইপ, প্রতিভূ মানুষ সব। তাঁদের মুখ ভিন্ন, শরীর ভিন্ন, ভঙ্গী ভিন্ন এবং বাঙালির কাছে তারা চেনা, আত্মীয়। তাই তারা মনকে এত নাড়া দিয়ে যায়, শুদ্ধ ছবির বেষ্টনীতে প্রত্যক্ষ জীবনের রসাভাসে—মহৎ শিল্পের আপাতবৈপরীত্যগুণে খণ্ডিত সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধের শিল্পগত ডায়ালেক্‌টিকে। বুর্জোয়া স্বার্থে য়ুরোপের শিল্পে যে মানুষে-মানুষে ভেদের উপরেই ঝোঁক পড়েছিল গত কয়েকশত বছর ধ'রে, সে-

ঝোঁক তিনি শুধু নেতিতে ভাঙেননি, ভারতবর্ষের বিশেষ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের কিছুটা সাহায্যে তাঁর সমাধান শ্রেণী-উত্তীর্ণ না-হ'লেও কিছুটা আস্তিকও বটে।

শিল্পের সীমা যামিনী রায় সর্বদাই মানেন, সেইখানেই তাঁর শিল্পসাধনার মুক্তি। আধুনিক পশ্চিমা শিল্পবিদ্রোহীদের কথা তিনি প্লেটোর মতোই মানেন— জ্যামিতির আকারে, ঘন, গোলনলিকা ও উপবৃত্তই হচ্ছে প্রাথমিক রূপাকার। তবে, তারপরে, তিনি বলবেন যে শিল্প কিন্তু প্রাথমিক রূপাকার নয়, অন্তত মানুষের কাছে। মানুষের কাছে শিল্প প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের রসায়িত আকারের রূপায়ণ, দর্শনের বা স্মৃতির দৃশ্যের রূপান্তর বা নির্মাণ—অর্থাৎ মানবিক, সামাজিক। তিনি তাঁর বিষয়বস্তুর মৌলিক বস্তুপরিচয় অস্বীকার করেন না। পাবলো পিকাসোর মননী নেতিবাদ বা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় সব সম্বন্ধপাত ভেঙে যায়। পশ্চিম য়ুরোপের বুর্জোয়া বিকাশের অন্তিম ক্ষণে সেটাই সঙ্গত, পুনর্নির্মাণের, পুনঃপ্রাণপ্রতিষ্ঠার আগে। এ-দেশে বুর্জোয়া যুগ আরম্ভে অপ্রকৃত ও বিকাশে অসম্পূর্ণ। গ্লানি তাই বিস্তর, পুনর্নির্মাণে লাভ শুধু দ্রুতমুমূর্ষু লোকসংস্কৃতির বিড়ম্বিত ঐতিহ্যের অবশিষ্ট সুযোগটুকু।

যামিনী রায় সেই ক্ষীণ সুযোগ তাঁর শিল্পসাধনায় সার্থক করেছেন। আমাদের শিল্পীদের মধ্যে য়ুরোপকে চিত্রে উপলব্ধি করবার ক্ষমতা তাঁরই সমধিক, এবং তিনিই বুঝেছেন আমাদের দুশো বছরের মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া যুগের প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতা। এইখানেই তাঁর ক্ষমতার উৎস এবং হয়ত এইখানেই অসম্পূর্ণতার দোটানায় কিছুটা-বা তাঁর অতীতের স্বপ্নাতত্তি ও তাঁর ইউটোপিয়া। নিজের সাধনার একক ও প্রবল তীব্রতায় তিনি হয়ত ক্লাইভ হেস্টিংস ডালহৌসি থেকে কংগ্রেস অবধি, রামমোহন থেকে বাংলার প্রগতিতাত্ত্বিক অবধি যে নববাবুবিলাস তাকে একটু বেশি অস্বীকার করেছেন, ভাঙা সেতুর প্রশ্নটা বড়ো করেননি, মানেননি ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসাবে। বেলিন্‌স্কি একবার বলেছিলেন যে রুশ মহাকবি পুশকিন অর্ধেকটা জাতীয় কবি। কথাটা তখন সত্যই ছিল, আজকেই শুধু দেশের মানুষের সামগ্রিকতায় জাতির অখণ্ডতার রুশদেশের সেই পুশকিনকেই বলা যায় জাতীয় কবি। রুশ বুর্জোয়ার তুলনায় বাংলার অসম্পূর্ণ বুর্জোয়া আরও বিচ্ছিন্ন, তাই রবীন্দ্রনাথের বিরাট সার্বভৌমত্ব আজও ইতিহাসের ভবিষ্যতে নিহিত, কর্মের ভাবী সিদ্ধির পটে সম্ভাবনায়। রুশদেশে রোমান্টিক বিদ্রোহী পুশকিনের চেয়েও কথাটা মাউন্টব্যাটেন-প্যাটেল যুগে এখানে আমাদের পক্ষে আরও কঠিনভাবে সত্য— রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিদ্রোহী যদিচ আস্তিক প্রতিভার অসামান্য ব্যাপ্তি সত্ত্বেও।

সম্ভবত মহৎ শিল্পীর আবশ্যিক একাগ্রতায় এই সমাধানের জটিলতার প্রশ্নে ঝোঁক কম পড়ে। সে যাই হোক্, যামিনী রায়ের এইসব চাষী মজুর বাউল ফকির, লালপাখি হাতে নীল চাষার ছেলে, কামার, লাঠি হাতে বা টোকা মাথায় কৃষক, গৃহস্থ, বৃদ্ধা প্রবীণ ও নবীন, কুমারী ও বিবাহিত মেয়েরা মায়েরা—এরা সবাই দেশের চেনা মানুষ, যামিনী রায়ের দীর্ঘ পরিচয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষের মমতার শুদ্ধ রূপান্তর। এবং এসব ছবিতে রঙের সেই প্রয়োগ যাতে চোখ পটের উপরে ঘুরে মরে না বস্তুর গোটা রূপের সন্ধানে ভ্রাম্যমাণ যোগবিয়োগে। যামিনী রায় এই সিদ্ধি অর্জেছেন তাঁর বৈচিত্র্যের সীমায়নে এবং বিশেষ ক'রে প্রাণময় রেখাগণ্ডির মধ্যে রঙগুলির সমলেপ চাপে এবং পারস্পরিক সঙ্গতিতে; তার দ্বারা তাঁর ছবি একটা সামগ্রিক সাযুজ্য লাভ করে, এমন একটা সত্তা যা স্পষ্টত ন্যস্ত এবং চাক্ষুষভাবে সাক্ষাৎবোধ্য, সান্ধ্য আলোকছটায় প্রশান্ত স্বচ্ছ সীমাসংহত একটা সমগ্র নিসর্গদৃশ্যের মতো।

এই একদৃষ্টিভাত রূপ যে সম্ভব হয়েছে তার কারণ অবশ্যই মূলত তাঁর রীতি-বিন্যস্ত রিয়ালিজম্ বা বাস্তবিকতা, যা তিনি অর্জন করেছেন প্রাকৃতবাদের বা সাংবাদিকতার বিসর্জনে, সম্ভব হয়েছে কারণ তাঁর ছবিতে প্রতি অংশ প্রাণ পায় প্রতি অংশের সঙ্গে প্রতিসংস্থানে মামুলী চিত্রের ভারসাম্যের বা বাদপ্রতিবাদের জ্যামিতিক বা যান্ত্রিক কৌশলের রসাভাসে ততটা নয় যতটা সমগ্রোৎসারী সক্রিয় অঙ্গাঙ্গিতায়, রঙেরই স্বকীয় গুণের সম্বন্ধপাতে, যা তাঁর অনবদ্য রেখাকর্তৃত্বের সঙ্গে হাতবাঁধা।

প্রাচ্যশিল্পে এই রং ব্যবহার খুব প্রচলিত রীতি নয়। ভারতীয় চিত্রে এ আমরা কদাচিৎ দেখি, কিছুটা হয়ত বাশোলীচিত্রে এবং কিছুটা অজন্তায়। কিন্তু অজন্তা ভারতশিল্পে একটা দুর্লভ এবং অসাধারণ কীর্তি; অজন্তা, বলা যায়, স্থাপত্যচিত্র। তাছাড়া অজন্তায় পাওয়া যায় তার পরিমাণ বা আকার সত্ত্বেও মধ্য-যুগের পুঁথি সচিত্রকরণের গাল্পিক চলমানতা। যামিনী রায়ের ছবি যেন স্থানসন্ততিতে কাটা ফ্রেম থেকে বেরিয়ে-আসা স্নায়ুতে-গাঁথা মানুষের রূপ। তাছাড়া অজন্তার ওস্তাদদের পাথরের গায়ে যে উপরভাসা বর্ণাভাস আনতে হয়েছিল তাও তাঁকে আনতে হয়নি।

যামিনী রায় যেসব নানারকম টেক্‌নিক্ প্রয়োগ করেন বা তিনি কীভাবে টেম্পেরা বা তেল রং তৈরি করেন সেসব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে আপাত-বর্ণলয়হীন টেম্পেরা রঙে তৈলচিত্রের

ভাস্বরতা ও গভীরতা আনবার অপূর্ব নৈপুণ্যে, যাঁরা তাঁর রেলওয়ে লাইনের বা বাগবাজারের গলি বা বাঁকুড়ার বাড়ি বা দক্ষিণেশ্বরের ছবি দেখেছেন তাঁরাই অবাক না-হ'য়ে পারেন না। এবং এ-প্রসঙ্গে সচরাচর অবহেলিত জমি তৈরির প্রয়োজনীয় কাজেও তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়। রঙের ও কাপড়ের বা কাঠের বা বোর্ডের এই বিজ্ঞান তাঁর নখদর্পণে ব'লেই তাঁর নৈসর্গিক ছবিগুলি এত আশ্চর্য সুন্দর। তিনি অবশ্য এগুলিকে তাঁর খেলা বা ব্যায়াম মনে করেন, যদিচ যে-কোন ইংরেজ চিত্রকর এরকম কৃতিত্বে খুশিই হতেন।

এ ছাড়াও যামিনী রায়ের বহু ছবি আছে: গরু, ঘোড়া, হরিণ, বাঘ, হাতি—দীপ্তবর্ণ; শিশুর মতো সরল কিন্তু যে নিশ্চিত সরলতা চরম বিদগ্ধ ও অভিজ্ঞ কলাকুশলীরই আয়ত্তে। তাঁর বাইবেল-পুরাণঘটিত ছবিতে এই কুশলীপনার সর্বপটীয়সী প্রতিভা স্পষ্ট। খৃষ্ট-ঘটিত এই চিত্রগুলিতে তাঁর বৈষ্ণব চিত্রেরই কারুণ্য ও স্নিগ্ধতা, আবার বাইজান্টিয় ও রুশ আইকনের সমতুল্য তীব্র আততিও তাতে মেলে।

বাগবাজারের নোংরা গলিতে তাঁর বাড়িতে যাওয়া একটা আনন্দের উৎসব ছিল। এখন তাঁর ডিহি শ্রীরামপুর লেনের বাড়িতে যাওয়াও আনন্দের ব্যাপার, আমাদের ভবিষ্যতের সুখীজগতের শান্তিময় একটা সপ্তবর্ণ আভাস।

যামিনী রায়ের চিত্রসাধনায় যে শুধু আমাদের শিল্পের মুক্তি, তাই নয়, আমাদের সাধারণ বাংলার মানুষের চোখের আনন্দে তিনি আমাদের মনো-জগৎকেও রূপ দিয়েছেন—দৃশ্যপথে। এবং এই আনন্দ যেহেতু দেশের আনন্দে, মানুষের শান্তিতে প্রসাদে মৃন্ময়; তাই আমরা সবাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মাতিসের কথায় এই অক্ষম পরিচিতির আরম্ভ, তাই দিয়ে শেষ করি। লুই আরাগঁ বলেছেন, মাতিস্ হচ্ছেন এ-শতকের ফ্রান্সের তথা সুখের বা আনন্দেরই চিত্রকর। এক শতাব্দী ধ'রে এই আনন্দ নাকি য়ুরোপে নতুন ধারণা। একশো বছরে নাকি এই তারাটি আজ (১৯৪৮) মানব-আকাশে ধ্রুব হ'য়ে উঠেছে। এবং মাতিসের চিত্রাবলি নিশ্চয়ই এই আনন্দের যুক্তি ও প্রবল সমর্থন। মনে হ'তে পারে চিত্রিত বা কল্পিত এই আনন্দের ধ্যানে দর্শনে আনন্দের জন্য লড়াই থেকে লোকে নিরুদ্ধ হবে, আরাগঁ কিন্তু তা অস্বীকার করেন। তাই তিনি মাতিস্‌কে মনে করেন সার্ত্র-মার্কা জরের যম, মনে করেন অতীতের জীর্ণ রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, আজকের আনন্দের কর্মিষ্ঠ মিছিলে মাতিস্ যেন একটা বিরাট নিশান।

যামিনী রায়ের শান্ত ও রঙিন আনন্দের চিত্রলোক আমাদেরও যেন সেই নিশান

নির্দেশে সমৃদ্ধ করে—আমাদের দ্বিধান্বিত অসম্পূর্ণতায়, গৌণতার গ্লানির মধ্যে অপরাজেয়। মাতিস্ বলেছিলেন, শ্রমকাতর লোককে বিশ্রামের শান্তি দিতে চাই। যামিনী রায় চান, ঘরোয়া মানুষকে আনন্দ দিতে। এ-আনন্দ শুধু বিশ্রাম নয়, এ-প্রতিবাদ ভেঙে গড়ারই প্রেরণা।

বাংলা সাহিত্যের ধারা

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান ধারা নির্ণয়ে সাহিত্যের ইতিহাস নগণ্য ত নয়ই, বরঞ্চ প্রথমেই বিবেচ্য। অবশ্য এ-বিবেচনা শ্রমসাপেক্ষ এবং সাহিত্য-নিষ্ঠা ও বোধ ছাড়া এ-বিবেচনা শুধু পণ্ডশ্রম নয়, ভ্রান্ত নির্দেশেও পরিণত হ'তে পারে। বিপদ আছে দুই দিকেই। পাণ্ডিত্যের অচলায়তনে উৎস ও মূল্য, বিকাশের সন্ধান ও পুরুষার্থ এক হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে; যার ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শুধু অতীতের অভ্যাসিক দিকটাই গ্রহণে নিঃশেষ হ'য়ে যায়; তখন চণ্ডিদাস বা কবিকঙ্কণ বা আর কোন মহাজনকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চেয়েও উৎকৃষ্ট কবি। আবার অন্যদিকে ভয় থাকে আমাদের বিচ্ছিন্ন, ইংরেজি আমলের মধ্যবিত্ত শিক্ষা-দীক্ষার আত্মসর্বস্বতার দরুন উনিশ শতকেই বাংলা সংস্কৃতি তথা বিশ্বসংস্কৃতিরই আরম্ভ ও শেষ কল্পনায়। অথচ সাহিত্যের ধারা আজ জ্ঞানত সত্যই দীর্ঘ সংগ্রাম ও বহুবিস্তৃত যোগাযোগের বিকাশের ধারা। এবং সে-ধারায় রবীন্দ্র-প্রতিভার মতো মহৎ কীর্তির বিচার পূর্বাপরহীন নয়, অন্তত সাহিত্যের ইতিহাসের অর্থাৎ তার কর্মঠ বিকাশের আলোচনার স্তরে।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ তাই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। তাঁর বই 'বেঙ্গলি লিটারেচর' যে শুধু পণ্ডিতি পুস্তকজগতে আশ্চর্যরকম সুপাঠ্য দান, তাই নয়, তাঁর মতো সাহিত্যিক রুচি ও বোধ এবং জ্ঞান আমাদের দেশে দুর্লভ। তদুপরি, তাঁর দৃষ্টি ঐতিহাসিক, সে-হিসাবেও তিনি অগ্রগণ্য। অবশ্য দীনেশ সেন মহাশয় অসামান্য উৎসাহে ও শ্রমে যে যুগান্তকারী কাজ ক'রে গেছেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বা 'বৃহৎ বঙ্গে', তারই পটভূমিতে এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়েছে। ঘোষ মহাশয় এনেছেন তাঁর সরস লেখনী ও সজাগ মনের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের মানবিচার এবং মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতকের বিচারে প্রায় মার্ক্সীয় ঐতিহাসিক চৈতন্য।

তাই তিনি সূত্র খুঁজেছেন নৃতত্ত্বের জ্ঞানব্যবহারে, বাংলার মিশ্রিত আরম্ভে, কোল-দ্রাবিড়-মোঙ্গল-আর্যের তথাকথিত বর্ণসংকরতায়। এ-সূত্র আপাতদৃষ্টিতেও আলোকদান করে, যথা পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চারণ পার্থক্যবিচারে পশ্চিমের দ্রাবিড় মিশ্রণের প্রাধান্য ও পূর্বে মোঙ্গলের প্রভাব বিবেচ্য। বলাই বাহুল্য এ-বিচারে আর্য কিছু একটা কালাতীত স্থির সংজ্ঞা নয়, কারণ ভারতবর্ষে আর্য প্রসার

ক্রমান্বয়ে অনার্যের সংঘর্ষে ও সংযোগে আততি ও আত্মসাৎকরণের দীর্ঘ ও নব-নব বিন্যাসের ইতিহাস ; জ্যোতিষবাবু ঠিকই বলেছেন : বাংলার উপাদান এসেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়তই অনার্য প্রভাবে ; শেষোক্তটি এসেছে অনার্য-আক্রান্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত থেকে। কথাটা মনে রাখা দরকার ; ভাণ্ডারকরের মতো পুরোধা পণ্ডিতব্যক্তিও এই দ্বন্দ্বময় সংযোগের কথা মনে রাখেননি ব'লেই, অনার্য শিবের হিন্দুসমাজে অভিযানের ব্যাখ্যা খুঁজেছেন শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদের রুদ্রমহাদেবের উল্লেখে, যেন একটি যুগের একটিমাত্র গ্রহণস্বীকারে ও রূপান্তরেই এই অভিযান শেষ হ'য়ে গেল। কৃষ্ণ-বাসুদেবের ইতিহাস বিচারেও সেকালে এই অসম্পূর্ণতা দ্রষ্টব্য। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এই অসম্পূর্ণতা অনেকটা দূর করেছেন, আশা করা যায় এ-বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞানের সাহায্য আমরা আরও বিস্তৃত-ভাবে পাব।

আমাদের প্রয়োজন আপাতত সেই বিচার যাতে এই সংঘাত-সংযোগে বহমান ও পরিবর্তমান সাংস্কৃতিক বিন্যাসের ধারার রূপ স্পষ্ট হবে এবং বর্তমান সাংস্কৃতিক রূপায়ণের চেষ্টায় অপচয়হীন নির্দেশ দেবে। যাতে শুধু ঋগ্বেদীয় রুদ্র ও শিবের যোগ নয়, রুদ্রমহাদেবের বাংলার ঘরোয়া মানবিক শিবের গাজনে পরিণতির ইতিহাস পাওয়া যাবে, স্পষ্ট হবে মথুরা-দ্বারকার বাসুদেবের গৌড়ীয় বৃন্দাবনে রূপান্তর। বাংলার এই লৌকিক আততির স্রোত কিছুটা ইতিহাসের এবং নৃতত্ত্বেরই বিষয়, কিছুটা হয়ত ধর্মতত্ত্ব এবং কিছুটা সাহিত্যগতও। দ্বিতীয় বিচারের সন্ধানে শশিভূষণ দাশগুপ্তের বাংলার অপজ্ঞাত ধর্মসাধনা বিষয়ে বিরাট বইটি নিশ্চয়ই কার্যকর, কিন্তু তিনিও আচার অনুষ্ঠানের দিকে মন দেননি এবং এ-অবহেলার কারণ দেখিয়েছেন সেগুলির আদিবাসী উৎসে। সেদিক দিয়ে বিস্ময়কর কাজ করেছেন এবং সমানে ক'রে যাচ্ছেন ভেরিঅর্ এল্উইন। এল্উইন, আর্চর, গ্রিগ্‌সন বা হাইমেন্ড্ফের্'র কাছে আমাদের ভাবী ইতিহাসকার এবং সাংস্কৃতিক কর্মী ঋণ-স্বীকারে কুণ্ঠিত হবে না। এল্উইনদের নিষ্ঠা ও বিরাট কর্মক্ষমতা শুধুই শ্রদ্ধেয় নয়, সাক্ষাৎ সাহায্য করবে, যদি তিনি বা সহকর্মীরা তাঁদের আদিবাসীতত্ত্ব উদ্ঘাটনে আমাদের অর্থাৎ সাধারণ ভারতীয়ের কথা মনে রাখেন। আর্য-অনার্য, বর্ণ-বর্ণেতর হিন্দু, আদিবাসী, হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি নানা সুবিধাজনক ভাগে সেকালের ইংরেজ আমাদের ভাগ করেছিল। আশা রাখি, সে-ভ্রান্তির জের এল্উইন বা আর্চর তাঁদের ভারতীয় সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের মহৎ সূচনায় দূর ক'রে দিয়ে তাঁদের মূল্যবান্ গবেষণা ও রচনা কথঞ্চিৎ দিশাহারা আর থাকতে দেবেন না। এখনও মনে হয়,

এঁরা তথাকথিত বর্ণহিন্দু নামক প্রত্যয় থেকে তাঁদের আদিবাসীদের মৌলিক বিভাগের উপরেই তাঁদের অসাধারণ গবেষণা ও গ্রন্থরচনার ভিত্তি গড়েন। অবশ্যই ইতিহাসের পর্বে-পর্বে বিভেদের স্তরগুলি গৌণ নয়, কিন্তু নব-নব যোগাযোগের স্তরগুলিও মৌল। তাছাড়া এতদিন যে মহেন্‌জোদারো ছন্দুদারো বা হরপ্পাকে একটা আকস্মিক ঘটনা ব'লে নিশ্চিত হবার দিকে য়ুরোপীয় পুরাতাত্ত্বিকের ঝোঁক ছিল, সে-ঝোঁকও নর্মদা উপত্যকায় এবং দক্ষিণাপথে প্রাচীন সভ্যতার নানা আবিষ্কারে ক্রমেই ভিত্তিহীন প্রমাণিত হচ্ছে। আপাতত হয়ত আমরা সবকটি ঐতিহাসিক সম্বন্ধপাতে অক্ষম, কিন্তু তারও আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অধিকন্তু এলউইন বা আর্চর যদি তাঁদের আদিবাসীতত্ত্বের স্বয়ংসর্বস্বতা ত্যাগ ক'রে, আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী বিচারের মানদণ্ড ছেড়ে ভারতীয় অপভ্রংশ নামে অপখ্যাত ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিচারে নেন, তাহ'লে নৃতত্ত্ব তথা সাহিত্যশিল্প-বিচার দুয়েরই লাভ। তাহ'লে গোণ্ডি বা সাঁওতাল বা উরাঁও কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত প্রথাসিদ্ধ রূপবর্ণনা বা উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যাখ্যায় রহস্যের সাহায্য নিতে হয় না, কোন-কোন আচার-ব্যবহার বা দেহতত্ত্বঘটিত ধারণাও এই প্রসঙ্গে বোধ্য হয় অর্থাৎ সংলগ্ন হয়। এল্‌উইনের অপূর্ব চিত্রসম্ভারেই প্রমাণ করে যে মহেন্‌জোদারোর ব্রোঞ্জ নর্তকী থেকে শুরু ক'রে ভারতীয় পাথর বা ব্রোঞ্জের মূর্তির শরীরবিন্যাস আদিবাসী সৌষ্ঠবেরই প্রতিবেশী। তাছাড়া পাথরের কাজ, কাঠের কাজ, সংসারের জন্য নানান হাতের কাজের বিস্ময়কর উৎকর্ষ প্রমাণ করে যে এই যন্ত্রের, টুল্‌সের ব্যবহারে যারা অগ্রগত, তারা জাতিগতভাবে পশ্চাৎবর্তী মাত্র নয়, ভৌগলিক ও গোষ্ঠীগত ব্যবধান সত্ত্বেও।

সেইজন্যই একটু অবাক লাগে যখন এঁরা দেবর-বৌদিদির রসিকতার সম্বন্ধ শুধু আদিবাসীজগতেই সীমাবদ্ধ মনে করেন বা যৌনজীবন সম্বন্ধে সুস্থ-স্বাধীন ধারণা মনে করেন ভারতের আদিম জাতিদের এবং য়ুরোপের আধুনিক শিক্ষিত-জনের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ। এল্‌উইনের মুড়িয়া গোটুলের উপরে এই বিরাট গ্রন্থে আমরা আমাদের উপকারের দিকটা থেকে নতমস্তকই হব। মুড়িয়া গোটুলের বস্তুত যে আচার-অনুষ্ঠান তা যে ব্যভিচার নয়, সে-কথা বাংলা দেশে, যেখানে সহজিয়া সাধনা একদা শক্তিশালী ছিল, সেখান মানা শক্ত হবে না। অথচ এই গোটুলের বিষয়ে এল্‌উইন আশ্চর্য পরিশ্রমে তথ্যসংগ্রহের শেষে যে-কারণ দেখিয়েছেন তা এক হিসাবে নাগরিক সভ্যতার অবক্ষয়েরই আভাস নয় কি? পিতা-

মাতা যেখানে প্রজননক্রিয়াকে বলে লজ্জাকর আদিম কর্ম, সেখানে কি আদিবাসীর আদিত্ব অবিমিশ্র ?

এদিক থেকে আর্চরের উরাওঁ কবিতা ও জীবনের বিষয়ে এই দ্বিতীয় মূল্যবান্ [বই] 'দি ডাভ অ্যাণ্ড দি লেপার্ডে'র একটি বিশেষত্ব উল্লেখ ক'রে আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে যাই। আর্চর কবিতাগুলির প্রতীকী রূপ আলোচনার প্রসঙ্গে যে দেশ-বিদেশের কবিতার তুলনা দিয়েছেন তা খুবই উপভোগ্য ও শিক্ষাপ্রদও বটে। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয় যে উরাওঁ প্রতীকের তুল্য তিনি এলুয়ার, ডাইলান টমাস্ থেকে এল্উইনের বৈগা, গোণ্ডি অবধি খুঁজেছেন ; তবু—আমার কথাটি ফুরোল নটে গাছটি মুড়োল—এ বাংলা ছড়ার সাদৃশ্য তিনি পাননি এই উরাওঁ কবিতাটিতে :

ও রাখাল, কেন বাঁশী কাটিস্ ? গরু কেন আসে না ? গরু, কেন আসিস্ না ? ঘাস কেন গজায় না ? ঘাস, কেন গজাস্ না ? বৃষ্টি কেন পড়ে না ? বৃষ্টি, কেন পড়িস্ না ? ব্যাং কেন ডাকে না ?—ইত্যাদি

জ্যোতিষবাবু দেখিয়েছেন আর্যেতর বাংলার স্থান কোথায় ছিল। এবং বাংলা এখানে বিহার থেকে আলাদা নয়। তৈর্থিকীয় বা ব্রহ্মণ্যবিরোধী বৌদ্ধ জৈন ধর্মবাদগুলির জন্ম এই অঙ্গবঙ্গেই। আবার পরের যুগে বৈষ্ণববাদ এবং ধর্ম, নাথ, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি সংঘটিত লৌকিক ধর্মও এই সাধারণজনেই উৎস ও শক্তি পেয়েছিল। বাংলার এই উদার পরিগ্রহীতা স্বভাবেই পরের যুগে হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল। এই লৌকিক চাপের সঙ্গে সংস্কৃতের যোগাযোগের রাজধানী চম্পা, গৌড়, নদীয়া।

ঐতিহাসিক বিকাশের চর্চায় সামাজিক বা অর্থনৈতিক যেটুকু তথ্য আমরা পাই, জ্যোতিষবাবু তাও অবহেলা করেননি। কালাপানির কাছে ব'লেই, ব্যবসা-বাণিজ্যের চাপে গৌড় থেকে নেতৃত্বের ক্ষেত্র সমুদ্রের কাছে বদ্বীপে দক্ষিণে এল। এই দ্বন্দ্বময় প্রগতি তিনি ধর্মবিচারে তথা সাহিত্যবিচারেও ভোলেননি। বৈষ্ণব-ধর্মের নিহিত গতিহীনতার দিকটাই তিনি সম্যক্ আলোচনাই করেছেন, যদিচ বাংলা দেশের জাতীয় জীবনে এই বৈষ্ণব-প্রভাবান্বিত পঞ্চদশ-ষোড়শ শতককে তিনি রেনেসাঁসেরই তুল্য বলেন। তারই পটে তিনি ইংরেজি আমলের খণ্ডিত নাগরিক মধ্যবিত্ত জাগরণের পরীক্ষায় তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন।

হয়ত তিনি সংস্কৃত প্রভাব বিষয়ে সব জায়গায় সমান অবহিত থাকেননি, যেমন বাংলা পদ্যের স্বভাব তিনি সংস্কৃত ছন্দের সমজাতি ভেবেছেন। কিন্তু মোটামুটি তিনি মূল সূত্রটি ঠিকই ব্যাখ্যা করেছেন : বাংলা সাহিত্যের এবং

সংস্কৃতির প্রথম বিকাশ লৌকিক জীবনযাত্রায় এবং ঐতিহাসিক তাৎকাল্যবশত ধর্মবাদে—সহজিয়া, নাথ, মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ইত্যাদি পন্থায়। ছোটো ক্ষেত্রে আরও লোকপুরাণের উদ্ভব হয়েছে, যেমন দক্ষিণ রায়, সত্যপীর ইত্যাদি।

'They were the main power behind the resurgence of Hinduism in the 16th, 17th and 18th centuries, and they provided the subject-matter of the bulk of Bengali literature in the Gaur and Nadiya periods. They were non-aryan, anti-brahminic, opposed to the caste system, and mainly prevalent among the lower sections of the population. They were called *laukik* or vulgar....

বলা বাহুল্য, এখানে লৌকিক-বিদ্বেষ শুধু ব্রাহ্মণেই সীমাবদ্ধ নয়, চাঁদ সদাগর বা ধনপতি বিত্তবান্ বণিক সমাজের মানুষ। অথচ এই লৌকিক সংস্কৃতির প্রসার ক্রমেই জাতিব্যাপী হ'য়ে দাঁড়াল। 'চৈতন্যভাগবতে' তাই জানা যায় যে মনসা বা চণ্ডী-পূজারীর রোজগার শুদ্ধতর ব্রাহ্মণের চেয়ে বেশিই হ'ত। এ-ব্যাপারেও পরিগ্রহণ ও রূপান্তর লক্ষণীয়, চাঁদ ধনপতিদের বংশধররাই অছুৎ দেবদেবীর পৃষ্ঠপোষক, মনসা কৌলীন্য পেয়ে গেলেন শিবের মেয়ে হ'য়ে, চণ্ডী হলেন শিবানী।

এ-যুগের সংস্কৃতি মুখ্যত লোকসংস্কৃতি, যার উত্থান জনসাধারণের মধ্যে থেকে খানিক অসহায় বিশ্বাস কিন্তু খানিকটা প্রতিবাদেরই রূপায়ণে। মুসলিম যুগে এ-লোকসংস্কৃতি শক্তি পেয়েছিল কারণ এটা সাধারণ হিন্দু ও মুসলিম জনগণের জীবনের মধ্যে একাকার ছিল এবং ভাষাও একই ছিল কি হিন্দু কি মুসলিম সাধারণ মানুষের। জ্যোতিষবাবুর ভাষায় :

'The difference which different religions impose on human beings vanish before the deep realities of communal life, and the lower sections of humanity have a natural tendency towards unity and uniformity. Until the disruption of Bengal's village life in British times, the basic unity of her Hindu and Muslim population was never disturbed. The unity arose out of racial oneness, common economic interest, and the communal life of the village.'

পঞ্চদশ শতকের শেষের জাগরণকে তাই ব্রহ্মণ্যের বা প্রতাপ প্রতিপত্তির জয় ভাবলে ভুল হবে। এই রেনেসাঁস ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যে স্থান অর্জন এবং সংস্কৃতবিদ্যার

প্রবর্তন করল, কিন্তু তাই ব'লে ভুললে চলবে না যে এই রেনেসাঁসের চালনা-শক্তি এল তলার থেকে, লৌকিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায়। এরই ভিত্তিতে বাংলার অনেকগুলি গণ-আন্দোলনের স্বরূপ বোঝা যায়, বৈষ্ণব আন্দোলন তারই মধ্যে বড়ো একটি।

জ্যোতিষবাবুর ভাষায় দেশজ জনগণ-সম্ভূত এই ধারাই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রাণ, যদিচ তার দৈহিক প্রয়োজন মিটেছে বারবার সংস্কৃত খাদ্যে। তারপরে উনিশ শতকে এল যুগান্তর বিপর্যয়, এল ইংরেজি প্রভাবের মধ্যবিত্ত জাতকের প্রচণ্ড কিন্তু সীমাবদ্ধ জাগরণ। আমাদের পিতামহেরা বললেন, ফিরে চলো সংস্কৃতে, ব্রহ্মণ্যের কালোত্তর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উপনিষদে আর এগিয়ে চলো কালকের য়ুরোপে। প্রাণ না-হোক্‌, খাদ্য মিলল কিছু। ঐতিহ্য হ'য়ে গেল খাপছাড়া, মধ্যপদলোপী, অথচ জ্যোতিষবাবুর ভাষায়, যে-য়ুরোপ এল সে এদিকে তৃতীয় শ্রেণীর বাজে মাল আর আবার অতিখর্বকায়, মুখ্যত শুধু উনিশশতকী এবং তাও ইংলণ্ডাবদ্ধ। জ্যোতিষ-বাবু বলেছেন :

'Saratchandra Chattopadhyay and his followers have imported them ready-made from third-rate European novels, and our present school of pseudo-realistic fiction is a glaring instance of the bastard culture that is an off-spring of the meeting of the East and the West.'

অবশ্য জ্যোতিষবাবু এই দোটানায় সর্বদা তাঁর প্রশংসনীয় দৃষ্টিস্থিরতা রক্ষা করতে পারেননি। হয়ত সংস্কৃত বা ইংরেজি পদ্যছন্দ কানে আছে ব'লেই বাংলা পয়ার বা ত্রিপদী তাঁর সমধিক একঘেয়ে লেগেছে। আটাশ পৃষ্ঠায় তিনি ঠিকই ধরেছেন যে পূর্ব-উনিশ শতকী বাংলা কাব্য সঙ্গীতধর্মী, তাই তার বিচারমান শুদ্ধ কাব্যবিচারের মান হ'লে দুর্বোধ্য হবে, কিন্তু তিনি কথ্য ভাষার ঝোঁক ও সম-অসম মাত্রার কথাটা মনে রাখেননি। সেইজন্যই তিনি লৌকিক বাংলার ঐতিহ্যের আকর্ষণেই বোধহয়, মাইকেলের বিষয়ে অবিচার করেছেন। কারণ মাইকেলের শব্দচয়নে অনভ্যস্তের হাতড়ানি যদিও থাকে, তাঁর ছন্দের নিহিত স্বভাব হচ্ছে দেশজ বাংলারই চালে, কথ্যরীতির বিন্যাসের ছন্দের গতিতেই। অথচ জ্যোতিষ-বাবুর মতো সংবেদ্য কান পণ্ডিতসমাজে বিরল। বিদ্যাসাগরের কীর্তিবিচারে জ্যোতিষবাবু তার চমৎকার প্রমাণ দিয়েছেন : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যেই প্রথম বাংলা গদ্যছন্দের বিন্যাস এল।

কবিকঙ্কণের জীবনধর্মী সরস বস্তুতান্ত্রিকতা বা ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্য বিষয়ে জ্যোতিষবাবুর আলোচনা উপাদেয় কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার প্রথাসিদ্ধ আতিশয্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি মৃত অভ্যাসিক পরোক্ষতার যে-উদাহরণটি দিয়েছেন, সেটি নেহাৎ তাঁর বিরূপতারই ভ্রান্তিবিলাস : প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। সে যা হোক্, জ্যোতিষবাবু এই গ্রন্থে বাংলার দু-ধারার দোটানায় প'ড়ে সম্পূর্ণভাবে সমগ্র ছবি দিতে না-পারলেও, সততাসম্পন্ন জিজ্ঞাসু তাঁর গ্রন্থপাঠে প্রশ্নের সব উত্তর না-পান, কিছুটা পাবেন, এবং অন্তত প্রশ্নের দেখা পাবেন। এবং আশা করা যায়, দ্বিতীয় সংস্করণে এই অসমতা তিনি দূর করবেন। আপাতত তিনি যে আরম্ভ থেকে উনিশ শতক অবধি বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে উনিশ শতকের বাংলার বিচ্ছেদের লক্ষণ ধরেছেন ও বলেছেন তাই আমাদের উপকার। তাঁর টিপ্পনীর সারগর্ভতা বাংলা সংস্কৃতির অনুরাগী, বাঙালিমাত্রেই বোঝে :

'Bengali literature had a prevailing rustic character before the 19th century, it has since acquired a prevailing petty-bourgeois character.'

তার কারণ অবশ্য সাহিত্য ছাড়িয়ে, বাংলায় ইংরেজি শাসনের বুর্জোয়াসির অপূর্ণতায়। এবং যে-কারণে আমাদের উপরতলা মূলত পেতি-বুর্জোয়া, সেই কারণেই আমাদের মজুরেরা এখনও বস্তুত, নিদেন মানসে, গ্রামীণ। এই কারণেই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা পেয়েছি মূলত 'ম্যাস্-প্রোডিউস্ড্ ব্রিটিশ গুড্স্'।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটকাবলি জ্যোতিষবাবু অনবধানতাবশত প্রায় বিচারেই আনেননি। কিন্তু বঙ্কিমের বিস্তৃত আলোচনা প্রচুর চিন্তার খোরাক জোগায়। তাঁর মতে বঙ্কিমের মূল্য বাংলা উপন্যাসের ঐতিহাসিক কারণে, তিনি একজন পুরোধা। কিন্তু সাহিত্যিক বিচারে বঙ্কিম নেহাতই সামান্য ঔপন্যাসিক। জ্যোতিষবাবু বঙ্কিমের আটটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বিচারে এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন যে তার একটিও ঐতিহাসিক পদবাচ্য নয়; 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ' প্রভৃতি উপন্যাসের বিশ্লেষণে তাই প্রমাণ হয়। সামাজিক উপন্যাসকার হিসেবে বঙ্কিমের সহানুভূতি অগভীর ও অপরিসর দুই-ই। বঙ্কিমের মধ্যে জ্যোতিষবাবুর মতে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাও নেই, অথচ একটা ব্যাপক মানবিকতাও নেই। তাঁর অধিকাংশ পুরুষচরিত্র পেস্টবোর্ড এবং তাঁর মেয়েরা আরম্ভে প্রাণবান হ'লেও শেষটা একটা বেসুরে মিলিয়ে যায়। কারণ বঙ্কিমের পুরুষার্থ তৎকালীন ও তৎশ্রেণীর গয়ংগচ্ছ স্রোতে চলামাত্র। জ্যোতিষবাবু দীর্ঘ বিশ্লেষণের পরে বলেছেন যে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সজাগ মানুষের যুগে বঙ্কিমের এই অভ্যাসিকতা তাঁর নিজেরই দুর্বলতা। জ্যোতিষবাবুকে বঙ্কিম-বিরোধী ভাবলে ভুল করা হবে, তিনি 'ইন্দিরা'র প্রশংসায় ন্যায্যতই পঞ্চমুখ। কিন্তু বঙ্কিমের রাজ-সমাজতাত্ত্বিক উপন্যাসের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিগুলি নগণ্য নয়। অবশ্য জ্যোতিষবাবু স্বীকার করেন যে বঙ্কিমের ইংরেজ-আনীত সংস্কৃতি সম্ভাষণে কিছুটা সত্য আছে যদিচ। 'The view is too idealistic and ignores the economic and political aspect of British rule.' তাছাড়া এ একচক্ষু মত বঙ্কিমের একার নয়: 'It runs through the synthesis between the East and the West made by Indian thinkers from Rammohan Roy to Rabindranath Tagore. We should also note that except in the work of small number of intellectuals, the best elements of European literature cannot be said to have arrived in Bengal or, having arrived, to have struck roots.'

তাই জ্যোতিষবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'imported from the West the sentimental languors of the Celtic Twilight, the affections of the *fin de siecle* aestheticism, and the misty vagueness of Maeterlinckian symbolism.'

কিন্তু জ্যোতিষবাবু তাঁর শেষ অধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ অধ্যায়ে, একটু হতাশই করেছেন। প্রথমত তাঁর শেষ পাতায় উদ্ধৃতিটি: জানি গো জানি দিন যাবে: গানটি কবির শেষ দিকের রচনা বলেছেন নেহাৎ অসতর্কতায়। দ্বিতীয়ত তিনি 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসগুলির বিচারই করেননি। অথচ 'গোরা', বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসই নয়, বাংলা জীবনের ও সংস্কৃতির দু-ধারার ব্যর্থ সমন্বয়-চেষ্টায় আমাদের জাতীয় রূপকও বটে; তারপরে জীবন এগিয়েছে, ইতিহাস ও তার জ্ঞান এগিয়েছে কিন্তু এখনও 'গোরা'র স্থান নেবার ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়নি। এইদিক থেকে অবাক লাগে যখন কোন সমালোচক 'গোরা'র সঙ্গে এবং 'গোরা'র চেয়েও সার্থক হিসেবে 'শেষের কবিতা'র সামাজিক রূপকান্বয় দেন, যদিও সাহিত্যবিষয়ে সচেষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই জানে যে 'শেষের কবিতা' প্রতিভার খেলা মাত্র।

জ্যোতিষবাবু গীতিনাট্য প্রসঙ্গেও অসম্পূর্ণ। 'মায়ার খেলা' ও 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র নাম ক'রে তিনি ক্ষান্ত, অথচ তিনি কি জানেন না যে বিশ্বের শিল্পে 'চণ্ডালিকা' ও

'চিত্রাঙ্গদা' অপূর্ব সৃষ্টি? অধিকন্তু রবীন্দ্রনাথের আপাতলঘু 'ক্ষণিকা' এবং শেষকবিতার নগ্নকঠিন বইগুলি যদি তিনি উল্লেখ এবং তাদের যন্ত্রণা ও জিজ্ঞাসা বিচার করতেন, তাহ'লে তাঁর রবীন্দ্রনাথের অন্যথা গভীর বিশ্লেষণ সার্থক হ'ত। তাহ'লেই তাঁর সিদ্ধান্ত তার প্রকৃত ব্যাখ্যা ও নির্দেশ পেত: 'The lack of any deep-seated conflict in his nature, while it gave him spontaneity and saved him from morbid introspection and self-analysis, was also responsible for many a facile sentiment and gilded platitude.'

শেষে শুধু একটা কথা বলা দরকার। ইংরেজি পাঠকের পক্ষে তথা অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের পক্ষেও প্রত্যক্ষ বাংলা সাহিত্যর ক্রিয়াকাণ্ড স্পষ্ট হ'ত যদি জ্যোতিষবাবু যাত্রা, কথকতা, কবিগান, কীর্তন, গাজন ইত্যাদির একটু বর্ণনামূলক উল্লেখ করতেন। যেমন স্পষ্ট হ'ত তাঁর মূল তত্ত্ব: বাংলা সাহিত্যের মুখ্য লৌকিক ধারার শক্তির কথা, যদি তিনি রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া' এবং অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রত'র পথে লৌকিক মানসের এ-দিকটার সন্ধান নিতেন ও দিতেন। রূপকথার উল্লেখ অবশ্য তিনি করেছেন। কিন্তু সে-বিষয়েও হয়ত আরও বিস্তৃত আলোচনা পেলে ভালো হ'ত, কারণ আজও দেখা যায় কোন-কোন সমালোচক পথনির্দেশের সংক্ষিপ্ত উৎসাহে উনিশশতকসর্বস্ব আবেগে লোকসাহিত্যের ধারায় ও নির্মাণে রূপকথার ব্যঞ্জনা জনবৈরিতা ভাবেন।

বীরবল থেকে পরশুরাম

আমাদের অক্ষমতার অনেকটা যে ব্যক্তিগতের বাইরের কারণে, বাংলা সাংস্কৃতির, সমাজের, দেশের জীবনে ছড়ানো, সে-বিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত। অন্তত দেশের দুর্ভোগের ছবিটা কম-বেশি স্পষ্ট, তার ব্যাখ্যা আপাতবহু হ'লেও। বাংলার মানচিত্রই তার স্থূলপ্রমাণ, ১৯০৫ থেকে ১৯৫০-এ। আর ভাগ্যবান্ মুষ্টিমেয় ছাড়া কে না-জানি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার গ্লানি, অপমান, অভাব, অত্যাচার। কোথায় সেই রামমোহন-বিদ্যাসাগরের, মাইকেল-দীনবন্ধুর, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বাংলা, সেই মানস, এমনকি সেই জীবনের পুরুষার্থ। তারই মধ্যে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির শিবসদাগরের দুরবস্থা। শুধু যে সাহিত্যের প্রসারে বা মূল্যস্বীকারে তা নয়, বুদ্ধির দুরবস্থায় আজ আমরা কেউ-বা বিমূঢ় ব্যথিত, কেউ-বা একেবারে অন্ধ। অথচ আমাদের এই অতীতহীন চাকুরিজীবী ভদ্রলোকের ছোট্টো এবং অগভীর সংস্কৃতিতেও চর্চা ছিল, চেষ্টা ছিল, সময়ে-সময়ে প্রতিভার রসায়নে মহান কীর্তিও হ'ত সূচিত।

সেই চর্চার পটেই শুভবুদ্ধির মাহাত্ম্যে একাধিক মনীষী বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত সমাজেই দুর্লভ সভ্যমানুষের বৈদগ্ধ্যলক্ষণ অর্জন করেছিলেন।

সম্প্রতি 'বীরবলের হালখাতা' পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে, ঐ উপভোগ্য বইটির শিক্ষণীয়তা আজও ঘোচেনি। বীরবলের লিখননৈপুণ্যে শুধু নয়, তার মধ্যে বীরবলের যে লোকায়ত মানবতা, যে প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসহ বিচারে আস্থা এবং সে-বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রতিষ্ঠায় তাঁর আজীবন যে-চেষ্টা, তার প্রয়োজন আজও এত বেশি বাস্তব যে মনে হয় বীরবলের সভ্যতাপ্রচার বাংলা দেশের দিক থেকে বুঝি বৃথায় গেছে। 'বীরবলের হালখাতা', শোনা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি পাঠ্য নির্বাচিত হয়েছে বা হবে। সুখের কথা, কিন্তু তা কতটা বীরবলের স্মৃতির পক্ষে তা বলা শক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যব্যবস্থা, পরীক্ষাব্যবস্থা, অন্যান্য বই নির্বাচন, সাহিত্য-সংস্কৃতির রুচি ও বিচারবুদ্ধির স্থান, এসব দিক থেকে বীরবলের জ্ঞান ও রুচি, বুদ্ধিতে বিশ্বাস, তাঁর সন্ধানী মনীষা বিপরীতই বটে, ধোবার উঠানে তেজি তুরাণি ঘোড়ার মতোই। অবশ্য এ বিপরীত শক্তি, ভণ্ডুলবৃত্তি বাংলায় বরাবরই প্রবল। এরই জোরে বংগাল সরকারও রবীন্দ্র-সংস্কৃতির প্রসারে নয়, রবীন্দ্র-স্মৃতিপূজার উপহাসে মাতেন, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিককে পুরস্কার দেন, আমলাতন্ত্রের হাতে

আবেদনের অপমান সইতে হয় প্রার্থীদের, কাগজে বিজ্ঞাপনের কদিনের মধ্যেই লটারির তারিখ শেষ হয়, বিচারকদের নাম শিক্ষিতসাধারণদের আগে ত নয়ই, পরেও জানানো হয় না।

বীরবলের প্রায় প্রতিটি রচনাই তার প্রতিবাদী সাক্ষ্য, যার জন্যে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় নাকি বাংলার অধ্যাপকপদের যোগ্য মনে করেনি—দীনেশ সেনের পরে। দুর্বুদ্ধির বিপরীত শক্তির বিরুদ্ধে একদা বীরবলকে লিখতে হয়েছিল "বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ", বঙ্কিমকে নামাতে হয়েছিল পৌরাণিক ভক্তির থেকে সমালোচনার মঞ্চে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা বিপিনচন্দ্র পালকে হাস্যের বলদচক্ষু হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছিল মুক্ত বুদ্ধির মানবিক তাগিদেই।

বীরবল আমাদের সেই অত্যল্প কৃতবিদ্যদের একজন যিনি উনিশ শতকের বাইরে ইংরেজি সাহিত্যের কথা জানতেন এবং ইংরেজির বাইরে একটা য়ুরোপীয় সাহিত্যের খবর রাখতেন। ফলে তাঁরই পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আপাতবিরোধী হ'লেও বাংলার ইংরেজেতর, লৌকিক সাহিত্যের শিকড় সন্ধান। তাই তিনি পদাবলি, চণ্ডী, মঙ্গলকাব্য থেকে ভারতচন্দ্র অবধি ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে-সঙ্গে—বলাই বাহুল্য গুরুচণ্ডালী না-ক'রে—উপভোগ করেন। উপভোগ করেন শুধু বিলাসী ব্যক্তির আতিশয্যে নয়, সাহিত্যিকের, বাংলা সংস্কৃতিকর্মীর প্রাণের গরজে, শিকড়ের সন্ধানে। রুচি ও অগ্রগতির মান ছিল তাঁর মানবতায় জাগ্রত, কাজেই শিবে-বানরে গোলমাল তিনি করেননি। পরিবর্তনের আভাস-ইঙ্গিত, ইতিহাসের ধর্ম তিনি বুঝেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী তাঁর মতো বোদ্ধা খুব কমই মেলে, তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের কীর্তিতেই বাংলার আদি-অন্ত খোঁজেননি। নাৎসি জর্মানির কাউন্ট হেরমান্ কেইসেরলিঙের কথা তাঁর মনঃপূত হয়নি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের যে-উৎসে ও প্রসারে মুখ্যত ইংরেজি-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কৃত্রিম মধ্যবিত্ত এবং সময় হিসাবে শুধুই উনিশশতকী সংস্কৃতি, তার সঙ্গে তাই যোগ খুঁজেছিলেন বিস্তৃত লৌকিক শিল্পসাহিত্যের ধারার, ব্যাপকতর অতীতের ও বর্তমানের। আমাদের আগের পুরুষের "প্রগতিরহস্য" তাই তাঁকে যন্ত্রণায় হাসিয়েছিল। তাই তিনি ভবিষ্যৎ ভেবে কাতর হননি, ঈঙ্গবঙ্গের ব্যাপ্তিও চাননি, হিঁদুয়ানীও চাননি। তাঁর এই চোখখোলা কঠিন সাধনার আস্থা আজও আমাদের আত্মীয় লাগে।

সাধনা যে কঠিন তার প্রমাণ বীরবল দিয়েছেন। এমনকি পরিবেশের প্রভাব পরোক্ষে হয়ত তার রচনাতেও স্পর্শেছে। তারই জন্যে হয়ত ব্যঙ্গের স্রোতে তাঁর লেখনী হ'য়ে ওঠে থেকে-থেকে অতি চপল, হাস্য হ'য়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত স্ফীত, যেমন

হয়েছে 'আমরা ও তোমরা'য়। অবশ্য তাঁর পরিবেশ ছিল পরাক্রান্ত; গ্রামভারী মূর্খতা, প্রাদেশিকতা, কূপমণ্ডুকতা, যুক্তিহীন বুলি, অন্ধ বিশ্বাসের নেকড়ের পালের মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র। তাঁর নৈঃসঙ্গ্যে প্রায় একমাত্র আশ্রয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একমাত্র কিন্তু প্রবল, অলোকসামান্য প্রতিভার মহীরুহ। আমবা জামে হয়ত সে-কীর্তির তুলনা নয়, কিন্তু বট বা পিপুলে বটে। এবং প্রমথ চৌধুরী তা জানতেন, বহুবিস্তৃত প্রতিভার শতঝুরি ছায়ায় তিনি নিশ্চিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর রচনাবলি ব্যক্তি-স্বরূপকে তিনি অর্ঘ্য দিয়েছেন কিন্তু অনুকরণ করেননি, রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পাশে প্রমথ চৌধুরীর মুক্তদৃষ্টি সত্তা তাই আজও বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বিষয়। তাঁর চেয়ে দূরস্থ ও দুর্বল অনেকেই ভেবেছেন ও ভাবছেন যে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণীয়। ভেবেছেন ও ভাবছেন যে রবীন্দ্রনাথের বাংলা সাহিত্যে রূপকর্মের উত্তরাধিকার নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তাও অনুসরণীয়। এ যে শুধু মদালসের বিলাস তা নয়, এ নকলী মানবতার সৌকুমার্য, এর আন্তর্জাতিক আত্মিক মৈত্রীর বাণী চরিত্রের দিক থেকে মারাত্মক মিথ্যা।

কারণ সে প্রচণ্ড গতি অবসান, হিমালয় সংহতিতে একক। অথবা বলা যায়, সে-জলধারা লঘুবায় তুষার দেশের স্বচ্ছ নীল হ্রদে আত্মস্থ। কারণ রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে মেলান তাঁর মানসশক্তির চূড়াপ্রাচীর, তাঁর সমাহিত শান্ত বিশ্বাস। বঙ্কিমের মতো অপেক্ষাকৃত স্থূল ও অসংহত ধর্মাশ্রয়ী বিশ্বাস নয়; সুকুমার, মার্জিত, আরও মৌলিক, কবিকর্মের দিক থেকে, ঈস্‌থেটিক দিক থেকে আরও সমগ্র সংহত এক অধ্যাত্মবিশ্বাস। এর প্রচণ্ড সত্য ও সততা রবীন্দ্রনাথের অনুপম জীবনের ও সাহিত্যের সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত, মাঝে-মাঝে সমাহিত একাত্মতা তাঁর ভেঙেছে, বহির্জগৎ এসে হানা দিয়েছে বসুন্ধরার বেশে, কন্যার বেশে—যেতে নাহি দিব ব'লে। শেষ বয়সের কবিতায় তিনি আবার রিক্ততার, ছলনার প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন রূপ-নারাণের কূলে, যেখানে ছলনাময়ীর মুখে মেলে না উত্তর। তবু মোটামুটি রবীন্দ্র-নাথের ধ্যানের অচ্ছোদ মানসসরোবরের নীলিমায় মাটি লাগেনি। সেখানেই তাঁর সৌন্দর্যের অপূর্বতা; তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক নৈঃসঙ্গ্য আত্মিক নৈঃসঙ্গ্যের যন্ত্রণায়, নেতির দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়নি, সেই তাঁর বৈশিষ্ট্য; তাই তাঁর চারিত্র্য ইয়েট্‌সেরও প্রণম্য।

এবং এই একাত্ম অধ্যাত্মবিবেকে তাঁর সাযুজ্যই তাঁকে করেছে সুন্দর ও সৌন্দর্যের অনুরাগী, প্রকৃতির প্রিয় ও প্রেমিকও। সেইজন্যেই তাঁর সুন্দরে মিলেছে সত্য ও মঙ্গল। তাঁর এই অধ্যাত্মসিদ্ধি ইংরেজ সৌখীন ঈস্‌থিট্‌দের আয়ত্তের

বাইরে। এর সম্পূর্ণতা ও বহুবিধ প্রকাশে বাংলা দেশে আমাদের হৃদবৃত্তি, সংবেদ্যতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ বিষয়ে অনুরাগ, প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতির আরম্ভ ও বিকাশ যেমনি সত্য, তেমনি সত্য এর ভিত্তি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ঐ-আধ্যাত্মসিদ্ধির অননুকরণীয়তা। তাছাড়া, আমরা কজনই-বা ভাবলোকের নিত্যস্বর্গে বসবাসের ক্ষমতা বা ইচ্ছাই রাখি বা সে লোকোত্তর আস্তিক্য চাই? আর রবীন্দ্রপ্রতিভার কাব্য পরিক্রমায় তার দরকারই-বা কি? প্রমথ চৌধুরী উদারতন্ত্রী অর্থাৎ আস্তিক্য-হীন থেকেই তাঁর মানবতার সমরেখায় রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মোৎসারী কিন্তু টমাস মোরের মতোই প্রকৃত মানবতার প্রসাদ মিলিয়েছিলেন।

অনুকরণের এই সমস্যাতেই এক কবি-সমালোচক লেখেন যে কবিমার্গের আদর্শ হওয়া উচিত মহাকবি দান্তে, কারণ তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' মর্ত্যের মার্গে, পদচারী মানুষের অনুসরণীয় কিন্তু সেক্সপীঅর অনুকরণের উর্ধ্বে, স্বকীয় প্রেরণায় আকাশচারী।

তাছাড়া, সমাহিতি কি আমাদের সাধ্যে? ত্রিশঙ্কুত্বে কি শেষে আমাদের পরিণাম? না, আমাদের বর্তমানে আমরা ভবিষ্যৎ চাই, পরিবর্তনে আমাদের আশ্বাস? যুক্তিতে, ন্যায়বুদ্ধির মুক্ত প্রাত্যহিক পদাতিক অভিযানে চেষ্টায় আয়ত্তে আনতে চাই সমাধানের অভাব, শান্তির অনটন, অন্যায় অনর্থ নিঃশেষ করতে চাই প্রাথমিক স্বীকারে নয়, উপসংহারে? দেখা যাচ্ছে এ-বিষয়ে বাদবিবাদে ঝোঁক পড়ছে দু-দিকেই একপেশে, একচক্ষু হরিণ শুধু-শুধু ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের উত্তরাধিকার স্বীকার করতে গিয়ে তাঁকে লেনিনের সঙ্গে তুলনা বাহুল্য, বরং টলস্টয়ের বিচারের সঙ্গে খানিকটা তুল্য তাঁর বিচার। আবার, তাঁর বিচিত্র দান সিপাহী বিদ্রোহের অজ্ঞাত কাল্পনিক সাহিত্যে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও অর্থহীন। সমালোচনা আজও আমাদের একান্ত প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরীর সমসাময়িক আবহাওয়াতে যে-চেষ্টা ছিল, তা আমরা আজকের বহুবিধ সুযোগে কেন সম্পূর্ণতর করা প্রয়োজন মনে করব না?

১৩১৪ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রে এইরকম সমালোচনার একটি সুলিখিত উদাহরণ প্রকাশিত হয়েছিল; প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের অনুমতিতে প্রকাশিত হয়; রবীন্দ্রনাথ লেখককে ডেকে আলাপ করেন এবং এ-প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের জবাবে 'বঙ্গদর্শনে'ই রবীন্দ্রনাথের "দুঃখ" নামে ওজস্বী লেখাটি বেরোয়। পাঠকেরা লক্ষ ক'রে থাকবেন, বহুকাল পরের বিখ্যাত কবিতা—যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলিতে এই প্রবন্ধের মূল প্রশ্নটি কবি আবার তুলেছেন।

বলাই বাহুল্য, শ্রদ্ধেয় লেখকের সমস্ত মতামত হয়ত আমাদের পক্ষে ঠিক

ঐভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অক্ষয়বাবুর সতর্কবাণীর পুনরুক্তি ক'রে, আবার বলা ভালো, মহাকবির সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ অবতারণায় তাঁর জীবনবেদ গ্রহণের কথা নেই; যেমন নেই বঙ্কিমের কোন সার্থক উক্তি উদ্ধৃতিতে বঙ্কিমকে সমালোচনা বর্জনের নীতি।

এ-কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধ্যাত্ম-অন্বয়ে সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর পট-ভূমিতে, পারিবারিক ও সামাজিক। এবং পরোক্ষ সাহায্য পেয়েছেন উপনিষদের যে-দিকটা কর্মকাণ্ডহীন আধ্যাত্মিক, ঈস্‌থেটিক, সেই উৎসে। বৈষ্ণবকাব্য ও বাউল সাধনা তাঁর সমন্বয়ে সহায় ছিল। কিন্তু তাঁর মূল সহায় ছিল প্রকৃতি, নিসর্গ-প্রকৃতি। ঠিক ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের প্রকৃতি নয়, কারণ তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ স্বকীয় স্বতন্ত্র, কারণ বাংলা দেশে যন্ত্রবিপ্লব আঠারো শতকের শেষে ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কারণ ভারতীয় ধর্মসাধনা ইংলণ্ডের গির্জাসাধনা নয়। কিন্তু সেইরকম প্রকৃতি-ঘটিত গভীর একটা অভিজ্ঞতাই, যার অঙ্কুর সদর স্ট্রিটেই, কিন্তু বিকাশ পদ্মার চরে-চরে। তাই তিনি বলেছিলেন, শুধু সাহিত্যিক হ'লে হয় না, দাঁড়াতে হ'লে চাই আর কিছু আবেগ, একটা প্রিডমিনেটিং প্যাশন্, আমি কবি হিসাবে দাঁড়িয়ে গেলুম প্রকৃতিকে ভালোবেসে; মানুষকেও আমি ভালোবেসেছি কিন্তু প্রকৃতিই আমাকে বাঁচিয়ে দিলে। এই অধিষ্ঠাতা আবেগ ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান; তাঁরই গানে কবিতায় গদ্যে প্রকৃতি এল আমাদের ইন্দ্রিয়বেদনে, নানা রূপে, চোখে কানে হৃদয়ে চিন্তায়।

সে-প্রকৃতি মুখ্যত হিংস্র নয়, হিংস্র হ'লেও শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধ নয়; তার কারণ এ নয় যে প্রকৃতি, এ-প্রকৃতি পশ্চিম য়ুরোপের মতো মানুষের প্রায় পোষা প্রকৃতি, কারণ রবীন্দ্রনাথের এ-প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত একাত্মা, ঈশ্বরেরই অর্থাৎ এক হিসাবে নির্বিশেষ মানুষেরই বাহির-রূপ। জীবন তাই তাঁর কাছে মৃত্যুর প্রতিবাদ নয়, পরিপূর্ণতা। তাই মানুষের জীবনের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে ট্রাজেডি নয়, ট্রাজেডির ঊর্ধ্বে। ট্রাজিক দৃষ্টিতে জীবন বিরুদ্ধশক্তির সংঘাত, জয়পরাজয়। তাই ক্রিস্টোফর হিলই লিখতে পারেন: ইতিহাস ত ট্রাজেডির উত্তরণপরম্পরা। হ্যামলেটের মৃত্যুর পরেও ডেনমার্ক থাকে, দেশবাসী থাকে, ফর্টিনবাস থাকে, হোরেশিও-ও। অবশ্য ব্রহ্মণ্যচিন্তায় জীবনের উপমা ট্রাজেডিতে দুর্লভ, উপমা মেলে মাস্কে, প্যাজেন্ট্রিতে। জাতিভেদ, জন্মান্তর, কর্মফলের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় তাই ত সম্ভব। প্রতিবাদের প্রতিষেধকও আছে; কারণ সবই ত এক, পরমাত্মার অংশ, তোমার অনাহার ও আমার ভূরিভোজ-জনিত অজীর্ণ আখেরে অভিন্ন। যে আর্য-অনার্য,

ব্রাহ্মণ-শূদ্র, কর্তা-দাস ব্যবস্থায় এই একাত্মদর্শনের অনীহার ভিত্তি, সে-বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা চর্চা করবেন। অবশ্য সে-চর্চা সংক্ষেপে করায় বা সত্যের অপলাপে লাভ নেই, যার ফলে ডাঙ্গে-র বৈদিকযুগের উপর বইটি প্রশংসনীয় চেষ্টার নমুনা হ'লেও এঙ্গেল্সের কথার যান্ত্রিক প্রয়োগের ফাঁকিতে স্থানকালপাত্রজ্ঞানের অর্থাৎ ইতিহাসের অভাবে বিপজ্জনক সরলীকরণ।

মুশকিল হচ্ছে আমাদের ইতিহাস মোটেই সরল নয়, তাতে কালের ও নানা পাত্রের নানান জট, এবং সে-জট খোলবার জ্ঞান সমাধিক প্রয়োজনীয় হ'লেও তথ্য এবং পণ্ডিতদের ধৈর্যও দুর্লভ। তাই ডাঙ্গে বামের সোজাপথে চ'লে দিশাহারা; সমস্ত বৈদিক যুগটি তাঁর কাছে পরিবর্তনহীন একটি স্থাবর মুহূর্ত, পুরন্দর ইন্দ্র গোষ্ঠী-দেবতামাত্র, লোহা ও ঘোড়ার কোন ঐতিহসিক তাৎপর্য নেই, মুদ্রা বা যজমান-প্রথা বা বশিষ্ঠের জুয়াড়ী-সমস্যা ডাঙ্গের পক্ষে ওঠেই না, অনার্য-আর্য সমস্যা তিনি সরল করেন অনার্যের প্রমাণ নেই ব'লে বাদ দিয়েই।

আমাদের কাছে ব্যাপারটা জরুরি হ'য়ে দাঁড়ায় যখন এবংবিধ আরোপ রচয়িতা বা সৃষ্টিশীল সাহিত্যে জারি করা হয়। এই সাহিত্যিক আরোপের তলাতেও ঐ-সরলীকরণ, তা সে কি বঙ্কিম কি রবীন্দ্রনাথ আলোচনায়। কখন-বা এই সরলী-কারী টোটকা-প্রয়োগের সঙ্গে মেশে আপাতজ্ঞানী তোতাবুলিও। কিন্তু তাতে গালন্দাজ ইচ্ছা পূরণ ছাড়া সাহিত্যে প্রগতির কিছু সুরাহা হয় না। কোন বিশেষ লেখকের বিচারে কী দ্রষ্টব্য তাই এ-সমালোচকরা অহমিকার ও থিওরির মিশ্রণে ভুলে যান এবং সাহিত্যের প্রত্যক্ষ কর্মক্ষেত্রে নিমেষপাতই করেন না। অথচ যেমন ইতিহাসে, তেমনি স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্যবিচারেও জট আমাদের খুলতে হবে, সঙ্গত দৃষ্টির ও আপেক্ষিক উক্তির জটিল ও ধৈর্যশীল পথেই আমাদের ভবিষ্যৎ, যান্ত্রিক প্রয়োগের লোভে বা ভাববিলাসের আশু-তৃপ্তিতে দক্ষিণ থেকে বাম, বাম থেকে দক্ষিণাচারে যেন আমরা না-ভুলি।

তাঁর মূল্যবান্ 'মহাভারত' ভূমিকায় রাজশেখর বসু বলেছেন : তাঁরা শ্মশান-বৈরাগ্য প্রচার করেননি, বিষয়ভোগও ছাড়তে বলেননি, শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগতিক নিয়ম শান্ত চিত্তে মেনে নিতে বলেছেন।

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছায়াঃ।
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতম্॥

সকল সঞ্চয়ই পরিশেষে ক্ষয় পায়, উন্নতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে বিচ্ছেদ

হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে, আবার অদৃশ্য স্থানেই চ'লে যায়, তারা আপনার না, আপনিও তাদের নন।

এই শান্ত কর্মৈষণাতেই আমাদের ভারত-অন্বেষার আরম্ভ, আমাদের ইতিহাস-সন্ধানের সূত্রপাত, পরিবর্তনের, দ্বন্দ্বের, বৈপরীত্যের গ্রহণে। অবশ্যই অধ্যাত্ম-সান্ত্বনাতেও 'মহাভারত' জর্জর, তবু তাতে ধৃতরাষ্ট্রের টাইরেশিয়স্-শোভন বিলাপ আছে, গান্ধারীর কুরুক্ষেত্র-দর্শন আছে, যদুবংশ ধ্বংসের অপরূপ রূপক আছে। ট্রাজিক চরিত্রে ও নাট্যে 'মহাভারতে'র যে বিস্রস্ত ঐশ্বর্য, তা সৌতি ধৌমরাও চাপা দিতে পারেননি। একাত্মসাধনার সঙ্গে-সঙ্গে এই ভেদবিরোধ ও তার ফলে করুণ বিয়োগ আমরা 'মহাভারতে' পাই। ঐ প্রথমটির প্রভাবেই ত অর্জুন স্টেটাস্ ক্যো-র বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে কোন সার্থকতা খুঁজে পাননি, তাই সে-সংকটে আজগুবি উদ্ভব, একাত্ম সমাধির সঙ্গে অনেকাত্ম বাস্তবজীবনের বিরোধের, যুদ্ধের বর্ণসংকর দর্শনের মহাকাব্য। যুদ্ধ অবশ্য হ'ল, নির্বিত্ত পাণ্ডবের জয়ও, কিন্তু অর্জুন আবার ভুলে গেলেন 'গীতা'র উপদেশ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নির্বাহ তাহ'লে 'গীতা'র শুদ্ধ জ্ঞানে নয়, ক্ষাত্রস্বার্থের তাগিদেই 'গীতা'র সাময়িকতায়।

'মহাভারতে'র মতোই আমাদের ঐতিহ্যের অনেক কিছুই মিশ্র। অনড় ঐতিহ্য বাস্তব হ'য়ে ওঠে আমাদেরই বিশিষ্ট অন্বেষায়, বিশিষ্ট উত্তরাধিকার ব্যবহারের নির্দিষ্ট প্রয়োজনে, প্রস্তুতিতে, বিন্যাসে। এবং সে-বিন্যাসকে সরলীকরণের অঙ্গীকার জীবনের বাস্তবতায় নেই। এমনকি সাহিত্যিক সরলীকরণেও নয়। চণ্ডী বা আলাওল বা মঙ্গলকাব্যে যে দেশজ বাস্তবতা ধর্মের প্রলেপ এবং সংকেতিত মার্গ সত্ত্বেও পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পোৎকর্ষের সঙ্গে বা প্রকৃতিপ্রেম বা আন্তর্জাতিক সমপর্যায়ে তার তুলনা অর্থহীন, কিন্তু ঐতিহ্যের নির্মাণে তার সন্ধানও দরকার। এমনকি ঐ-ধর্ম ও সংকেতিত মার্গের মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায় লৌকিক মনের সৃষ্টিময় বিরোধের ইতিহাস, আপোষ কিন্তু সংঘাতের আততিরও আভাস। ঐ-বাস্তবতার মানসাধিকারই দীনবন্ধু মাইকেল কালীপ্রসন্নের রিয়ালিজমের শিক্ষিত ধারার নিহিত দেশজ ফল্গু—আর্নল্ডের সেই আরাল হ্রদের অন্বেষায় বালুচড়া আমুদরিয়ার মতো, আজ যার স্রোত কাশ্যপসাগরে—ইলিনের ভাষায়, মানুষ আর পাহাড়ের মিলনসংগঠনে। সে-সংগঠনে বীরবল-প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ মনন মূল্যবান্ সহায়, সে-কাজে মুক্তিবাদী পরশুরাম-রাজশেখর বসুর পরিমিত হাস্য ও পরিমিত জিজ্ঞাসাও আমাদের পথের খোরাক।

আমাদের এই সন্ধান দরকার, কারণ আমাদের দেশে য়ুরোপের পণ্যবিপ্লব

হয়নি, বুর্জোয়াসির বিকাশও হয়নি, আমাদের জাগৃতি অসম্পূর্ণ, মৌলিক নয়, বিকৃত প্রতিফলন মাত্র। তাই ত উপন্যাস আজও আমাদের সাহিত্যে ঠিক ভিৎ পাচ্ছে না, তাই আমাদের সঙ্গীত আজও একসুরাশ্রয়ী সরলরেখা, আমাদের চিত্রশিল্প দ্বিমাত্রিক, নগরস্থাপত্য অস্তিত্বহীন। রবীন্দ্রনাথ যে আমাদের মধ্যে কত বড়ো প্রতিভার ব্যতিক্রম, তা ত আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, সাংস্কৃতিক সামাজিক জীবনের দিকে তাকালেই, ব্যক্তিগত স্থূলতার কথা ভাবলেই স্পষ্ট হ'য়ে যায়—আমাদের লজ্জায় ও গ্লানিতে।

অথচ আমরা ঠিক আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষ নই। দীর্ঘ ও জটিল ঐতিহ্যের দায়ভাগ আমাদের লৌকিক শিল্পসংস্কৃতিতে আজও মেলে। সে-দায়ভাগের জোরে আমাদের জনপদনির্মাণ পশ্চিম য়ুরোপের অনুকারী না-হ'লেও চলে। সেখানকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন এখানে যথার্থ নয়, আমাদের লোক-জীবনের দায়ভাগে রিয়ালিজম্ নেচারেলিজম্ সিম্বলিজম্ প্রভৃতির লড়াই অলীক। বাস্তবতা এবং প্রতীকমার্গ বা অ্যাবস্ট্রাক্টরীতি আজও আমাদের সাধারণ মানুষ সহজেই মেলাতে পারে। সেইজন্যেই এলিক্ ওয়েস্টের মনে হয়েছে যে আমাদের সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতির পথ পশ্চিম য়ুরোপ থেকে ভিন্ন, এক হিসাবে আরও সহজে সার্থক, কারণ আমরা রেনেসাঁসের সম্পূর্ণ সুযোগ যেমন পাইনি, তেমনি লৌকিক শিকড় আমাদের একেবারে মরেনি। মরা-না-মরা অবশ্য আমাদেরই হাতে। কোন কাল্পনিক দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের নয়। কিন্তু জলের সন্ধান ছেড়েও নয়।

রাজায়-রাজায়

রাজায়-রাজায় লড়াইয়েমুশকিল হয়েছে সাধারণ সাহিত্যিক ও সাধারণ পাঠকের, জন-সাধারণের রুচিতে হয়েছে সমুদ্রমন্থন। সাহিত্য-সমালোচনায় বিশেষ-বিশেষ রাজনীতির স্বকপোলপ্রযুক্ত মতবাদের বা ব্যক্তিগত কোন নীতির মানদণ্ড পরিচালনা দেখে আমরা কম-বেশি বিমূঢ়। প্রথমত, মতবাদগুলিতে যথেষ্ট বিজ্ঞানমূলক স্বচ্ছতা নেই, দ্বিতীয়ত, না সমাজ না সাহিত্য-বিচারে বা উভয়তই এ-বর্জন-নীতি ও অশ্রদ্ধা কোন বিকাশের অনুকূলও নয়। এবং যে-সমালোচনায় সাহিত্য-রচনার ধারা বা পাঠকমনের কোন বিকাশে সাহায্য নেই, সে-সমালোচনার ধারাও পুনর্বিবেচ্য।

উদাহরণস্বরূপে এবং একটি উদাহরণস্বরূপে বুদ্ধদেব বসুর ইংরেজ পাঠকের জন্যে লেখা আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিষয়ে মূল্যবান্ বইটি ধরা যেতে পারে। বুদ্ধদেববাবুর দীর্ঘ সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও সাহিত্যসৃষ্টি আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু, তাঁকে অসম্মান করতে আমি অক্ষম। কিন্তু দলীয়তা ও রাজনীতির কল্পিত বিকারে ও প্রতিবিকারে তাঁর 'শুদ্ধ' সাহিত্যবাদও যে কীরকম ভারাক্রান্ত, তার লক্ষণাভাস দেওয়া যে সাহিত্যিক কর্তব্য, সেই বিষয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

রবীন্দ্রনাথেই বুদ্ধদেববাবুর 'এন একর অফ গ্রিন্ গ্রাস্' আরম্ভ। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার আশ্চর্য সম্পূর্ণতার যে তিনি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন, তাতে যেমনি খুশি হয়েছি বুদ্ধদেববাবুর সাবেক ও পীড়াকর রবীন্দ্র-বিরোধিতার প্রায়শ্চিত্তে, তেমনি খুশি হয়েছি স্বমতেরই সুষ্ঠু প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রতিভা ও বিরাট বিকাশের সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘটনা ছাড়া আর কিসের তুলনা করা যায়? কয়েক বছর আগে ভারতীয় প্রগতি লেখক সম্মেলনের জন্য আমিও তাই করেছিলুম। বুদ্ধদেব-বাবুর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও উন্নাসিক লেখকও সে-কথা বলায় আত্মপ্রসাদ স্বাভাবিক। ইংরেজ কবি চসরের তুলনাটিও রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মহত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করে। ঐ-প্রবন্ধে তার সঙ্গে আমি অবশ্য জর্মান্ গয়টের উপমাও পাঠকদের কাছে প্রস্তাবিত করি।

বুদ্ধদেববাবু ঠিকই বলেছেন যে বাংলার স্বল্পকায়—কিন্তু হয়ত গভীর—ঐতিহ্যের ধারায় ররীন্দ্রনাথের বিরাট আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এ প্রচণ্ড আবিষ্কারে আমরা যদি দিশাহারা হই ত সে মার্জনীয়। আমার এ সংক্ষিপ্ত

প্রস্তাবে এ-প্রতিভার পরিচয় দেওয়া অসাধ্য, যদিও সাত বছর কেটে গেল সে প্রচণ্ড গতি অবসান। অথচ তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায় না। একদিকে চসর্ অন্যদিকে গয়টে বা উগো মিলিয়ে হয়ত খানিকটা ঐতিহাসিক তুল্যাভাস দিতে পারেন। তাঁর কীর্তিতে বাংলা সংস্কৃতির অপরিসর কিন্তু তীব্র স্বরে এল অনেক বিন্যাস, তাঁর প্রতিটি বই টেক্‌নিকের পদক্ষেপে স্পষ্ট প্রগতি ও বিষয়বস্তুর সীমান্ত বিস্তার। তাছাড়া তিনি আমাদের শেখালেন শালীনতা। মার্জিত রুচির এ-উত্তরাধিকার অস্বীকার আর কোন গোঁড়ামিতেই সম্ভব নয়। বাংলার প্রাদেশিকতায় তিনি আনলেন প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে বিশ্বের মানদণ্ড। কবি-রোমান্টিকের পরিবর্তন-অভীপ্সা ও রোমান্টিক বিদ্রোহের তেজ ও পুনর্নিমাণের শক্তি, হৃদয়বৃত্তির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও পেলবতা তাঁরই দান। সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রথম পরীক্ষাতেই প্রয়োজন যে নিছক সৌন্দর্যের চেতনা, সেই প্রাথমিক অঙ্গীকারও রবীন্দ্রনাথেই হ'ল প্রথম প্রতিভাত। ভিক্টোরীয় চরিত্রের বলিষ্ঠ সততা, শিল্পকর্মের দায়িত্ববোধ, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধও, রবীন্দ্রনাথের রচনা। ব্যক্তির যে-স্বকীয়তা-বোধ, সেন্স অফ প্রাইভেসি, তা-ও রবীন্দ্রোত্তর সমাজেই বাংলার মানসে স্পষ্টতর। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই ছিল তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র, তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ ও কীর্তির তুলনা নদীর ক্ষেত-ভাসানো স্রোত নয়, সংহতসত্তা একক হিমালয়ের হ্রদেই তাঁর উপমা, যেখান থেকে অবশ্য খাল বয়ানো যায়, বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রণঘর গড়া যায়।

বুদ্ধদেববাবু চমৎকার বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তিহীন প্রাণময়তার অশীতি-বর্ষব্যাপী সমগ্রতা। এই প্রাণময় অগ্নিতেই টেক্‌নিকের নব-নব বিকাশে বিষয়ের দুর্বার প্রসার, এই দীপ্তগীতে একা-একা সে অগ্নিতে সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন—শেষটা তিনি চরম স্বচ্ছতায় তাঁর পটভূমি প্রায় পিছনে ফেলে আমাদের আধুনিক জীবনের মহত্তম কবি হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর নক্ষত্রবিহারী প্রতিভা বাংলার মাটিতে মানুষ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় আপন মহত্ত্বে বারবার বাহু নামালেও মূলত তা বহু উর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ—প্রায় যেন কোন প্রাকৃতিক মাহাত্ম্যের মতো।

রবীন্দ্রনাথের কীর্তি বিবেচনায় তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য স্বীকারে তাই আসলে তাঁকে শ্রদ্ধাই হয় সম্পূর্ণ। বাংলার ঐতিহ্য ও তাঁর প্রতিভা দুই-ই এ-সংজ্ঞা-সম্পূরণে অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য হয়। বুদ্ধদেববাবু যে কবিত্বশোভন বাক্যে বলেছেন যে, 'তিনি সৃষ্টি করলেন ভাষা, গদ্য ও পদ্য দুই-ই।' সেটা নিশ্চয়ই তাঁর পৌরাণিক

অসতর্কতা, যেমন তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের চসর্, সেক্সপিঅর, ড্রাইডেন, বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদকবৃন্দ, ওয়্যাট্, সারে, স্পেন্সর, মার্লো, শেলি, সুইনবর্ন থেকে তরুণ বয়সের এজ্‌রা পাউণ্ড অবধি। নিশ্চয়ই তিনি মার্লোর ও সেক্সপিঅরের দুর্ধর্ষ গ্লানি ও উল্লাসের ঝঞ্ঝামত্ত নাম অসাবধানেই জুড়ে দিয়েছেন? না-হ'লে স্কটের সঙ্গে তুলনায় ক্ষান্ত না-হ'য়ে তিনি কী ক'রে রবীন্দ্রনাথের 'মোর অ্যাবানডাণ্ট' 'শিশু' কাব্যে ব্লেকের ইনোসেন্স—শুধু ইনোসেন্স নয়, ব্লেকের ইনোসেন্স-মিশ্রিত পেলেন 'উইথ অ্যান অলমোস্ট সফিস্টিকেটেড হিউমর'-এ?

আসলে বুদ্ধদেববাবু সর্বদাই কাব্যরচনায় ন্যায্য অতিকথনের ভক্ত কিন্তু আজকাল ঐতিহাসিক তথ্য নিয়েও তিনি আকুল। তাই ত তিনি বঙ্কিমের নিজেরই গদ্যের ক্রমবিকাশের তথ্যটা চেপে গিয়ে বঙ্কিমের 'স্টিফ ফর্মালিজম্' ব'লে দুটি শব্দে তাঁর বিচার সারেন, রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কমেডিকে বলেন, 'আরলি সেক্সপিরিঅন ইন টেম্পার' অথচ মাইকেল দীনবন্ধুর যে প্রাক্-সেক্সপিঅরীয় মেজাজ কম-বেশি বাংলা নাটকে চলেছিল, সে-বিষয়ে একবারও ভাবেন না। শুধু রবীন্দ্র-রচনাবলিতেই তিনি পান এলিজাবিথান্ 'মাল্টিপ্লিসিটি'—ইরাস্‌মস্, মুর্, ড্রেক, রলে, বেকন, হুকর-মুখর, সেনেকা, মঁতেন, মাকিয়াভেলি, মিরাকল্, মরালিটি-আন্দোলিত; ব্যারন ব্যবসায়ী সমুদ্রযাত্রী এলিজাবিথান্‌দের বহুধাবৈচিত্র্য। কিন্তু সেই নব্য-য়ুরোপের বহুমুখিতাকে আবার তিনি দেখেন রবীন্দ্র-রচনাবলিতে 'ইউনিফায়েড' এবং কিসে একীকৃত? না ধর্মে। তাই কি তিনি পান রবীন্দ্রনাথে শুধু 'সুইট ওঅরম্‌থ'? অবশ্য বুদ্ধদেববাবু মিষ্টির ভক্ত, তিনি আর্নল্ডের গদ্যে পান 'সুইটনেস্ অফ স্টাইল' এবং মণীন্দ্রলাল বসুতে পান 'এ সুইট ল্যাঙ্গুইড অ্যাটমস্‌ফিয়র'।

কিন্তু এ-ভুল শুধু বুদ্ধদেববাবুর একার স্বেচ্ছাচার ভাবলে ভুল করা হবে; 'হিস্টরিক্যালি, হি ইস আওয়ার এলিজাবিথান্ রেনেসাঁস', বুদ্ধদেববাবুর এ-কথা তিনি যাদের সাহিত্যের কুলে প্রহ্লাদ মনে করেন, সেই বঙ্গীয় বামপন্থীরা অনেকে ব'লে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, কোন্ জাগরণের পুনরুত্থান? কোন্ ঐতিহ্যের রেনেসাঁস? ইংরেজি শিক্ষা কতখানি জাগালো আমাদের কোন্ অতীতটিকে? কতখানি কীভাবে জাগালো আমাদের সভ্যতার ছকের ঐতিহাসিক উপলব্ধি? আমাদের মুষ্টিমেয় খণ্ডিত ও ত্বরাগ্রস্ত জীবনযাত্রায় যে মুখ্যত চাকরি-ঘটিত পরিবর্তন এল তা কি য়ুরোপের সামুদ্রিক ব্যবসায় ও যন্ত্রশিল্পমূলক সভ্যতার তিন শতাব্দীব্যাপী বিকাশের সঙ্গে তুলনীয়?

এইসব প্রশ্নের সম্ভাবনাও যদি মনে না-আসে তাহ'লে অবশ্য উত্তর পাবার জন্যে চিন্তাও ওঠে না। এবং ফলে বাংলা বিচার ও ঐতিহাসিক তথ্যসন্ধান অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ফলে মনে হয় যে দশ-এগারো শতক থেকে অষ্টাদশ-উনিশের অর্ধেক অবধি বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যও ছিল না, বাংলা দেশও ছিল কি না সন্দেহ। তাই বুদ্ধদেববাবু রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর একক প্রতিভায় দোসর খোঁজেন এবং ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু, কিয়দংশ বঙ্কিমেরও লোকায়ত দান অস্বীকার করেন, শেষোক্ত তিনজনের সাহিত্যিক বিচার না-হয় ছেড়েই দিলুম।

শুধু চসরের সঙ্গে তুলনাটিই যদি তিনি আরও মনোযোগ দিয়ে চর্চা করতেন, তাহ'লে হয়ত ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটে অধিকতর সুলভ জ্ঞানে বাংলার পটেও তিনি কল্পিত আরোপ থেকে বিরত হতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চসরের মুক্তি যেমন ইংরেজি কাব্যে একান্ত সত্য, তেমনি সত্য সে-মুক্তির ফরাসি ইতালিয় আকাশ, তেমনি সত্য তার নির্বিরোধ গতানুগতিকের পরিগ্রহণ। আবার অন্তর্লীন ইংরেজি মেজাজের—'গাওয়েন অ্যাণ্ড দি গ্রিন্ নাইট্' ও পার্লের লেখক বা ল্যাংল্যাণ্ড যার ব্যর্থ অর্থাৎ আংশিক কিন্তু প্রকৃত উদাহরণ—পরিপাকও তখন পরিণতির পথে অর্থাৎ চসরের প্রতিভার পক্ষে অনুকূল ও অন্যোন্যসম্পূরক। বুদ্ধদেববাবু চসরের এই সার্থকতা ও সীমার উভয়মুখিতা বিষয়ে একচক্ষু। ফলে তিনি ভাষাতত্ত্বেরও পক্ষে হাস্যকর উক্তি ক'রে বসেন: 'Rabindranath is the most metaphorical writer in a highly metaphorical language.... Bengali is partial to this habit of thought, but English, in spite of Shelley and Swinburne (!) is different ; it is a level language, moving in logical sequences.'

অথচ তিনিই অন্যত্র বাংলায় ক্রিয়ার দুর্বলতা ও দারিদ্র্য আলোচনা করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে ইংরেজি ক্রিয়ার অফুরন্ত ঐশ্বর্যে ইংরেজিই উৎপ্রেক্ষাময় ভাষা, চসর্-পূর্ব ইংরেজিতে সন্ধির অভ্যাস, প্যারালেলিজম্ ইত্যাদির প্রাচুর্যের ধারাও ইংরেজির উৎপ্রেক্ষাময়তার একটা কারণ। সম্ভবত বুদ্ধদেববাবু উৎপ্রেক্ষা ও উপমায় প্রভেদ দেখেন না, তাছাড়া ইতিহাস তাঁর হাতে কলের পুতুল মাত্র। তাই বাংলা গদ্যের বিষয়ে যে-গদ্য প্রথম পৃষ্ঠায় দেখি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করলেন তার বিষয়ে তিনি কাল ও পাত্রের পূর্বাপরহীন এই মন্তব্য করেন: 'Midwifed by Rammohan Roy, nursed by Iswarchandra Vidyasagar, baptised

so to say, by the morning-memorable (as we say in Bengali) Serampore missionaries....'

সেইজন্যেই বোধহয় অবনীন্দ্রনাথের শিশুগল্প ও অন্যজাতীয় রচনার অসামান্য প্রতিভা যে বাংলা গদ্যে কী ঐশ্বর্য দিয়েছে, সে-বিষয়ে তিনি অতর্কিত। অথচ ঐতিহাসিক মনোভঙ্গি বুদ্ধদেববাবু প্রকাশ করেছেন বারবার। তিনি ইংলণ্ড ও বাংলার সম্বন্ধ নির্ণয়ে লেখেন : 'Bengal alone, not the whole of India, nor any other part of it.... The rest of India, in those early days of disorder, was hostile, cold, crustaceous, only Bengal absorbed Europe with a speed and thoroughness that should be marked as a record in human relations.'

তিনি সাম্রাজ্যপত্তনের এই দশের মধ্যে একের গভীর প্রেমের কারণও দেখিয়েছেন : 'The truth of the matter seems to be that the Bengali and the English, severe strangers in appearance have an inner *congenital affinity* ... the minds of the *two peoples*, the Bengali and the English, moved to the same rhythmic pattern.'

শেষের উক্তিটি বুদ্ধদেববাবু সজ্ঞানেই করেছেন নিশ্চয়ই ; হয়ত তাঁর মতবাদ তাঁকে এই ইঙ্গবঙ্গীয় বিলাপে, 'ইংলণ্ডস্ ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া'র এই বিলম্বিত নব-ভাষ্যে প্রেরণা দিয়েছে। মতবাদের বিপদই এই, সেইজন্যেই ত মার্ক্স-এঙ্গেল্‌স্ মতবাদের শূন্যচারিতা বা যান্ত্রিকতার প্রবণতার বিষয়ে ছিলেন অত তীক্ষ্ণদৃষ্টি। মতবাদ-ঘটিত এবংবিধ স্বপ্নপ্রয়াণ অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন কিছুকাল আগে অসামান্য কুশলী শিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দেন যে তাঁদের সঙ্ঘে যোগ না-দিলে নাকি প্রগতিশীল সাহিত্য রচনা অসম্ভব। মাণিকবাবুদের কথাতেও দেখি এই স্বপ্নাদ্য ধারণা, তফাৎ এই যে মাণিকবাবুরা ভাবেন যে বাঙালি ও সোভিয়েট মন আজই একই ছন্দে চলেছে। ইতিহাস নিশ্চয়ই অন্য কথা বলে, মাণিকবাবুও কি আর সজাগ মুহূর্তে জানেন না যে বাংলা দেশ ও সোভিয়েট ইউনিয়নে জীবন ঠিক এক নয় তথা সোভিয়েট সঙ্ঘ ও মাণিকবাবুর সঙ্ঘও তুল্য মূল্য নয় ?

মতবাদের উগ্রতায় অবশ্য সত্যমিথ্যা হ'য়ে যায় একাকার, এঙ্গেল্‌সের 'অ্যান্টি-ডুএরিঙে'র শেষ কথায় বাকি থাকে 'মেণ্ট্যাল ইন্‌কম্পিটেন্স ডিউ টু মেগালো-ম্যানিয়া'। এ আত্মসর্বস্ব উগ্রতায় সাহিত্যবিচার ত ব্যাহত হবেই, 'As for the

aesthetic side of education, Herr Dühring will have to fashion it all anew. The poetry of the past is worthless. ... Let him not tarry with it! The economic commune can achieve the conquest of the world only when it comes in at the double in Alexandrine rhythm, reconciled with reason.'

এবং এ-উগ্রতার তাল কখন ডাইনে কখন বামে। মিলটা এখানে কম নয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত হাকিমের কাজ করেন এ নিয়ে মাণিকবাবু যেমন তাঁর ভুএরিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যৌনবিকার বিষয়ে বহু অপ্রাসঙ্গিক ও অশোভন আলাপ করেছেন, তেমনি বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে, অচিন্ত্যবাবুর সাহিত্যবিচারে একটা ত্রুটি দ্রষ্টব্য : 'দি ওব্‌লিগেশন্স অফ এ গভর্নমেণ্ট অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট', যার জন্যে তাঁকে মফস্বলে থাকতে হয়। বুদ্ধদেববাবু মাণিকবাবুর বিষয়েও লিখেছেন—স্বল্পকায় বইয়ের পক্ষে সমধিক মাত্রায়, পুরো দু-পৃষ্ঠা ধ'রে : 'Like the great quantities of verse and fiction (if we must call them so) being written in Bengal at the moment merely to illustrate some particular political doctrine.'

মাণিকবাবুর গত কয়বছরের রচনাবলি নাকি ভীষণ বিকৃত। মাণিকবাবু নাকি আজকাল নিউরটিক ও সেক্‌সুয়াল পারভার্টস্‌ ছাড়া আর লেখেনই না। এ-ভাইরস্‌ মাণিকবাবু প্রতিভাবলে দূর করবেন, বুদ্ধদেববাবু নাকি এ-আশা করেছিলেন কিন্তু মাণিকবাবু বোধহয় 'প্রিডিসপোসড্‌ টু দি ডিজিজ' ইত্যাদি এবং উপসংহারে : 'Now it is a maniac instead of a moron, libertine instead of a lout, criminality instead of imbecility.'

যে-উগ্রতায় মাণিকবাবুর বিষয়ে এই নির্বিচার উষ্মা সেটা নিছক সাহিত্যিক ভাবতে বিশ্বাস হয় না। এই উগ্রতার জন্যেই বোধহয় বুদ্ধদেববাবুর নাতিহ্রস্ব কবিদের তালিকায় অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলা[চরণ] চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য বাতিল? যেমন গল্পের তালিকায় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমেশ[চন্দ্র] সেন, নরেন্দ্র[নাথ] মিত্র, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রভৃতি অপাংক্তেয় কিংবা নাটকে বিজন ভট্টাচার্যের নাম অনুচ্চার্য। সেইজন্যেই কি জ্যোতির্ময় রায়ের গল্পের বিষয়ে তিনি দুটি শব্দ 'ব্লাণ্ট ভিগার' পেলেন এবং তাঁর হাল্‌কা প্রবন্ধের বিশিষ্ট স্থান উল্লেখই করলেন না? তাই কি বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামাবলিতে স্থান পাননি?

এই যে দলীয় বা রাজনীতিগত রোষদুষ্ট জাতিবিচার এ বুদ্ধদেববাবু কী ক'রে তথাকথিত বামপন্থী সমালোচনার প্রতিবাদের সঙ্গে-সঙ্গে সমর্থন করেন? তবে তথ্যের উপরে অবজ্ঞা তার মধ্যে-মধ্যে মাণিকবাবুর মতোই প্রবল। মাণিকবাবুর পক্ষে লিখতে কোনই দ্বিধা হয়নি যে অচিন্ত্যকুমারের কলম নাকি রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল মধ্যে, তারপরে হাকিমীর আকস্মিকে পূর্ববঙ্গে গিয়েই নাকি তাঁর কলম গেল খুলে। বুদ্ধদেববাবুও অনুরূপ উদ্ভাবনীশক্তির নমুনা দিয়েছেন। মাণিকবাবু যেমন তাঁর কল্পিত প্রতিপক্ষের গোর্কি-বিষয়ক বুর্জোয়া বাক্য সম্পূর্ণভাবে, দুর্নীতিমূলকভাবে বিকৃত ক'রে তাকে উদ্ধৃতির চেহারা দিতে পারেন, বুদ্ধদেববাবুও প্রায় তেমনি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে আজকাল কবিতা লেখেন না, তার কারণ তাঁর বিশেষ রাজনীতি, এ-কথা অম্লানমুখে লিখতে পারেন—যদিও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কয় বছরের নীরবতার বিষয়ে তিনি শোভনভাবেই নীরব।

এই দুই উগ্র মতবাদই সাহিত্যের স্বাধীনতার প্রতিকূল। হয়ত এ-সব মতবাদ 'মতবাদ' মাত্র, ব্যক্তিগত রুচি-অভিরুচি বন্ধুত্ব বা দলাদলির ভাবকল্পলীলা বা পারলৌকিকতত্ত্ব। যে বৃহৎ অর্থে সমাজ সাহিত্যে বিবেচ্য, সে-সম্পূর্ণতা যেমন এ-সব লীলায় দুর্লভ, তেমনি ব্যক্তিগত খবরের চুটকি এখানে অহেতুক মূল্য পায়।

আশা করি, বুদ্ধদেববাবু উপরের বিনীত নিবেদনে ভুল বুঝবেন না। আমি জানি তাঁর শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা, তবু যে সামান্য বক্তব্য বলতে পারলুম, সে-সাহসের কারণ তিনি আর প্রেরণায় বিশ্বাস করেন না। আমার ভরসা তাঁরই কথা : 'nothing remains for us but hard work, the discipline of self-consciousness.'

বলাই বাহুল্য, এতদিন পরে বুদ্ধদেববাবুর এ-কথায় বাংলাসাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই আনন্দিতই হবেন, যেমন হবেন মাণিকবাবুর মতপরিবর্তনেও। মাণিকবাবুও সম্প্রতি মনে করেন না যে অন্যের বই পাঠে স্বকীয়তা নষ্ট হ'য়ে যায়। অবশ্য তাঁর এ-ধারণাও হয়েছে যে আমাদের এই শতকরা পাঁচজন সাহিত্যপাঠকের দেশে অসহায় জনগণ নামক অ্যাবস্ট্রাক্শন শুধু তাঁর ও তাঁর সঙ্ঘবদ্ধ বন্ধুদের সম্পত্তি।

বুদ্ধদেববাবু কিন্তু এই বইয়ে কঠিন পরিশ্রম বিশেষ করেছেন ব'লে মনে হয় না, এবং যে-আত্মসচেতনতায় তিনি অনন্যবোধে কাতর, সে-আত্মসচেতনতার কথা নিশ্চয়ই মারিতাঁ পিকাসোর বিষয়ে বা এলিঅট্ আধুনিক কাব্যের প্রসঙ্গে বলেননি। যে-বয়সে অমিত রায়কে মনে হয় আদর্শ, এ-আত্মসচেতনতা কি সেই বয়সেরই নয়? বুদ্ধদেববাবু তাই মনে হয় কৈশোরক কিন্তু অকপট উচ্ছ্বাসে অনেক সময়েই

কষ্ট ক'রে তথ্যসংগ্রহ না-ক'রে বা পাতা না-উল্টেই তাঁর নিজের স্মৃতিশক্তির উপরে নির্ভর করেছেন তথ্যোন্মোচনে। তাঁর বাক্যরচনা ও শব্দব্যবহারও সময়ে-সময়ে অসতর্ক ও অস্পষ্ট।

ইংরেজি ও বাংলা 'গীতাঞ্জলি'র তফাৎ দেখিয়ে বুদ্ধদেববাবুর আলোচনা উৎকৃষ্ট তুলনামূলক সমালোচনা হ'তে-হ'তেও তাই হ'ল না, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' ও বাংলার তফাৎ দেখাতে বুদ্ধদেববাবু নিজে আবার যথাযথ অনুবাদ দিয়েছেন। কিন্তু শ্রাবণ ঘন গহন-মোহে গানের 'নিলাজ নীল', কি ঠিক 'ইম্‌ডেস্ট ব্লু'? নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে—কি 'Have hope, O my heart, hope day and night, for it will be, it will be'?

কিংবা 'মাধুর্যের মালা' কি 'গার্ল্যাণ্ড অফ স্যুইটনেস্'? তিনি মিষ্টির অনুরাগী কিন্তু মাধুর্য কি বরঞ্চ 'গ্রেস্'-এর আত্মীয় নয় বা মাধুর্যের মালা 'এ টেণ্ডার গার্ল্যাণ্ড'? তাঁর মন্তব্যে বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের নিজের অনুবাদে 'স্বর্ণথালা' হয়েছে 'গোল্ডেন বাস্কেট' এবং এ-উন্নতির বুদ্ধদেব-দত্ত কারণটি অদ্ভুত: 'Basket is a better visual image than the garland on the plate.' —তাই কি? বাজারের বাস্কেট, টিফিন বাস্কেট, ফলের বাস্কেট, ফুলের বাস্কেট, কি সঠিক ইমেজ কিছু? তাছাড়া 'গার্ল্যাণ্ড অন দি প্লেট' এল কোথা থেকে? 'সেথা উষা ডান হাতে ধরি স্বর্ণথালা, নিয়ে আসে একখানি মাধুর্যের মালা'—ইমেজটিতে সোনার থালা উষার ডান হাতে। কিন্তু সবচেয়ে মজার বুদ্ধদেববাবুর ইংরেজি উৎকর্ষের বিষয়ে এই মন্তব্য: 'রাইট হ্যাণ্ড সাউণ্ডস্ বেটার দ্যান হ্যাণ্ড'—ইংরেজপ্রীতির এ-মাত্রা কি এলিঅট্-কথিত 'আইসোলেটেড সুপিরিঅরিটির'র এ-দেশি সাধনার অঙ্গ?

তাছাড়া কেন যে বুদ্ধদেববাবু ইংরেজি মেঘকে, আষাঢ় বা আশ্বিন নয়, শুধু বাংলা শ্রাবণের মেঘের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেন যে 'I wandered lonely as a cloud' বা 'I bring fresh showers for thirsting flowers' (the thirsting flowers নিশ্চয়ই?)—বাংলা বর্ষার কাব্য হ'তে পারে না, তা-ও বোঝা শক্ত। অনুবাদতত্ত্ব আলোচনায় তিনি ঠিকই বলেছেন যে মাইনর কবিতা অনুবাদ্য, দুঃখ করেছেন যে 'দি ইণ্ডিয়ান সেরিনেড' ও 'ল বেল দা সাঁ মেরসি'র বাংলা অনুবাদ বালাগোল মাত্র, কিন্তু তারপরেই যখন তিনি একনিশ্বাসে বলেন: 'We have, however, very good translations from Heine, Hugo, Stevenson, D. H. Lawrence, from Noguchi and Chinese Anthology.' (!) তখন

নামগুলির অসম্বন্ধ পারম্পর্য, মাইনর কবি পঙক্তিতে লরেন্স, হাইনে ও উগোর নামগুলি অবাক করে।

কিন্তু এ-সব কথায় বুদ্ধদেববাবুর প্রাদেশিকতা প্রমাণ নয়, শুধু সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য। এখানে বুদ্ধদেববাবুর বইটি আমি উপস্থিত করেছি আমাদের সাহিত্যিক সমস্যার একটি উদাহরণ, একটি জলে-কুমির হিসাবেই। বলা বাহুল্য, তাঁর সঙ্গে বহু বিষয়ে অন্যেও একমত হবেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও গদ্য বিষয়ে যে বুদ্ধদেববাবু এতকাল পরে যে কারণেই হোক্ তাঁর অনীহা ও অশ্রদ্ধা দূর করতে পেরেছেন, তাতে আমরা খুশি। বা ছকে ফেলে সাহিত্যরচনার মারাত্মক অভ্যাসের বিরুদ্ধে বা যান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদও আমাদের সশ্রদ্ধ বিবেচনার যোগ্য। কিন্তু তাঁরও মতবাদ আছে, প্রচ্ছন্ন রাজনীতি আছে—এবং সেইখানেই তাঁর সমালোচকদের ডাণ্ডায় বাঘেদের তিনি সমর্থন জোগান। আঁদ্রে জিদের ভাষায়, বুদ্ধদেববাবু জিদের কথায় ক্ষুব্ধ হ'তে পারেন না ব'লেই, বলা যায় : 'Leon Blum's thought has lost all interest for me, it has merely become a subtle instrument that he lends to the demands of his cause.' (*Journals*, I)

অথচ বুদ্ধদেববাবু তাঁর কজ্ বা এই সট্‌ল্ ইনস্ট্রুমেণ্ট ব্যবহারেও যথেষ্ট অবহিত নন। নাগরিক উচ্চশিক্ষার অভিমানে তিনি উচ্চকিত। অচিন্ত্যকুমার চাকরি ব্যপদেশে কলকাতায় থাকতে পারেন না এই ভেবে তাঁর করুণা অশ্রুময়, নজরুল ইস্‌লাম নাকি অপরিণত চিরকিশোর, এ-আলোচনায় তাঁর কণ্ঠস্বরের পরকীয় গাম্ভীর্য প্রায় এলিঅটের চেয়েও বেশি ইংরেজি প্রাপ্তবয়স্ক। এবং তারাশঙ্কর যে কী পরিমাণে প্রাদেশিকতাদুষ্ট, নাগরিক বৈদগ্ধ্যহীন—কারণ তিনি বুদ্ধদেববাবুর মতো হয়ত কলকাতায় এসে কলকাতাকে উপজীব্য করেন না তাঁর গল্পোপন্যাসে, যদিচ তাঁর একটি সাধারণ উপন্যাস 'মন্বন্তরে'ই কলকাতার পাড়ার যে প্রত্যক্ষ আবহাওয়া ফুটেছে, তা কলকাতামার্কা সাহিত্যে দুর্লভ—সে বিজয়ী আবিষ্কারে বুদ্ধদেববাবু হিরণ সান্যালের মতোই মাত্রা হারান। তারাশঙ্করের কোন সরল চরিত্র নাকি একবার কাসাবিয়াংকার মতো গ্রাম্যকবিতা আবৃত্তি ক'রে ফেলেছে! প্রথমত জীবনানুগতার দিক থেকে এটা খুবই যথাযথ, যে-দেশে হাইনে উগো ষ্টিভন্‌সন্ নোগুচি সমোচ্চার্য সেই দেশে বিশেষ ক'রে। তাছাড়া বুদ্ধদেববাবুর তুলনায় এ-মতানুসারে রবীন্দ্রনাথও ঘোর অশিক্ষিত, কারণ 'গোরা'য় তাঁর চরিত্র আবৃত্তি করেছে 'লাইফ ইজ রিয়্যাল' 'লাইফ ইজ আরনেস্ট' ইত্যাদি, এমনকি তার বাংলাও

দেওয়া আছে। তার উপরে বুদ্ধদেববাবুর মৌল আবিষ্কার হচ্ছে যে তারাশঙ্করের গল্পোপন্যাসে নাকি নরনারীর প্রেম একেবারে নেই। তারাশঙ্করের ত্রুটি নিশ্চয়ই তাঁর রচনাশৈথিল্য, শিল্পের চেয়ে জীবনের স্রোতেই গা ভাসানোয়, কিন্তু তাঁর জীবনের একটা নির্বিচার হ'লেও বৃহৎ বোধ অনস্বীকার্য। অন্য সাহিত্যিকসাধারণের সঙ্গে সামান্য একাত্মবোধ থাকলেও বুদ্ধদেববাবু সেটা মানতেন। কিন্তু বুদ্ধদেববাবু মূলত একেশ্বরবাদী, সেই সোহং-হেগেলের গল্পের মতো, যদিচ তিনি থেকে-থেকে দশাবতারকেও নামান – অন্তত নয়, সাড়ে নয়জনকে।

প্রত্যক্ষ জীবনের যে একাত্ম বিন্যাসে ও কিছুটা হয়ত রাশ্যান জীবনধারায় স্টালিনের কথা রাশ্যায় সার্থক, সেই আত্মপক্ষে সমালোচনার রীতি যে মুক্তিরই এক পরিবর্তনীয় সীমান্ত, সে-স্বাধীনতা বুদ্ধদেববাবুর আজ কল্পনাতীত, তাঁর সমালোচনা তাই বৈরী বিধর্মীকে ছায়াময় আক্রমণ মাত্র। সেইরকমই কয়েকবছর ধ'রে, 'পরিচয়' ও কয়েকজন প্রগতি লেখকদের মধ্যে মাঝে-মাঝে যে অসহিষ্ণু দলীয়তা দেখে এসেছি, তার যতই দার্শনিক সমর্থন তাঁরা ক'রে থাকুন সে-ও একটা লাসালী ভ্রম: তাঁরাই নাকি জনসাধারণ, তাঁরাই প্রগতি, আর সবাই এক বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল পিণ্ড। গটা-প্রোগ্রামের সমালোচনায় এ-ভ্রান্তি স্বচ্ছ হ'য়ে যায়। এঙ্গেল্‌স্‌ও লেখেন: 'The real weakness is the childish notion of the coming revolution which is supposed to begin by the whole world dividing itself into armies; we here, the 'one reactionary mass' there. That means that the revolution has to begin with the *fifth act* and not with the first.' লেনিনের কথায়: 'To imagine that means repudiating social revolution ... whoever expects a "pure" social revolution will never live to see it. Such a person pays lip-service to revolution.'

আমাদের কোন-কোন বামপন্থী সমালোচনা প'ড়েই তাই মনে হয় মার্ক্সের কথা: 'For a theatrically vain nature like Lasalle it was a most tempting thought: an act directly on behalf of the proletariat and executed by Ferdinand Lasalle.'

বিশেষ ক'রে এ-সতর্কবাণী প্রযোজ্য শিল্পসাহিত্যে, কারণ প্রথমত শিল্পসাহিত্যের নিজস্ব ইতিহাস একেবারে ভুলে বৃহত্তর ইতিহাসের নামে এক কল্পিত ছকে ফেলবার প্রবণতা আমাদের সহজ। আর দ্বিতীয়ত আমরা ভুলে যাই যে

সাহিত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যই হ'ল যে-স্তরে জীবনের রূপান্তর, সে-রূপান্তরের স্তরে অনেক সময়ে এসে যায় আপাতবৈপরীত্য। বালজাকের প্রতিক্রিয়াশীল মতামত এবং তাঁরই সাহিত্যসৃষ্টিতে তার গভীরতর খণ্ডন তাই মার্ক্সিজমের পুরোধাই দেখান। ছোটো ক্ষেত্রে নেমে এলেও আমরা এ-সত্যের প্রমাণ পাই, যেমন এলিঅটের জীবনবিতৃষ্ণ অস্পষ্ট মতামত প্রকাশ পায় যে নিহিত ছন্দে, তা একরকম জীবনেরই অঙ্গীকারের স্পষ্ট ছন্দ। সেক্সপিঅরের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব কী মহত্ব লাভ করেছিল, তার বিচার নানা দিক থেকে অনেক সমালোচক করেছেন; মধ্যযুগের দায়ভাগও তাঁর উপরে বড়ো কম ছিল না। চসরের কাব্যের প্রগতিও জীবনদর্শনের প্রথাগত সামান্যতা এবং ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্যের পশ্চাদ্‌গতি ও জীবনদর্শনের চাষীবিদ্রোহমূলক প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্বও এই রূপান্তরের স্তরপর্যায়েই বিবেচ্য। এইখানেই পরিশ্রমের, তথ্যানুসন্ধানের প্রশ্ন, এইজন্যেই শিল্পসাহিত্যের সমাজতান্ত্রিক বিচার জটিল। এ-বিচারে সরলীকরণের চেষ্টা স্বাভাবিক, কল্পনাবিলাসের আশ্রয়ও হয়ত তাই নিতে হয়। টমাস মানের সঙ্গে রম্যাঁ রলাঁর তুলনায় তাই বোধহয় বলতে ইচ্ছা করে রলাঁর (ব্যক্তিগতরুচিসাপেক্ষ) শ্রেয়োতরতার কথা, এমনকি রলাঁকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দেওয়া হয় তার প্রমাণ হিসাবে, যদিও রলাঁর বিষয়ে যে কথাটা সত্য নয়, তার সাক্ষ্য 'লা পঁসে'তে মর‍্যাঁ-র ঐ বিষয়ে প্রবন্ধটি। গোর্কির বিষয়েও এইরকম, তিনি কম্যুনিস্ট, এ-বিশ্বাসঘটিত ভ্রান্ত ধারণা যুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সাহিত্যের দিকে এ-রকম মতামতে ক্ষতিই হয়, রচনার ও পাঠের রুচির মান এতে নিচেই নামানো হয় কারণ এ-মনোভাব শুধু বিদেশি মহাজনেই আবদ্ধ থাকে না। সাহিত্য যে 'লেজিসলেটরস্ অফ ম্যানকাইণ্ড' এ-আদর্শবাদেরই জোরে এঁরা মনে করেন যে সমালোচকরা 'লেজিসলেটরস্ অফ লিটরেচর' এবং বাংলা সাহিত্যের ক্ষুদ্র কমলবনেও এঁরা হানা দিয়ে বেড়ান। এইদিক থেকেই সুকান্ত-কাব্য সম্বন্ধে সঙ্ঘবদ্ধ অতিকথন অনর্থ-দুষ্ট, প্রায় প্রতিপক্ষ বুদ্ধদেববাবুর অতিকথনেরই মতো: সুকান্ত কাব্যকে পাঁচ নম্বর না হয় ছয় নম্বর দেবেন সে-বিষয়ে 'কবিতা' পত্রে বুদ্ধদেববাবু ঘোর দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এবং সে ঐশ্বরিক চিন্তার শেষে তাঁর ইংরেজি বইটিতে তাই সুকান্তর উল্লেখই করেননি। তারাশঙ্করের 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'র সমালোচনায় তাই নীতিসম্পন্ন নাক কুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে 'রঙে'র ব্যাপার দেখে, তারপরে সমালোচককে জাতীয় জীবন নামক বস্তুর মনগড়া ছবিতে সংখ্যাতত্ত্বের খেয়ালি ব্যাখ্যায় বলতে হয় যে কাহার-রা যেহেতু সংখ্যায় কম, সেহেতু তাদের গল্প জাতীয় সাহিত্য হ'তে পারে না, যেমনটি হ'তে পারে 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (বলাই

বাহুল্য, মাণিকবাবুর চমৎকার সুলিখিত উপন্যাস)। কাহার-রা নাকি শুধু হ'তে পারে ভেরিঅর্ এল্‌উইনের নৃতত্ত্বের রসালো বিষয়। ভারতবর্ষে এই জাতীয়বাদী সমালোচনা! যেখানে কোটি-কোটি লোক ভদ্রলোক হ'তে পারেনি, ইংরেজি শিক্ষিতের সামাজিক বা ধর্ম আন্দোলনে অংশ পায়নি! নৃতত্ত্ব বিষয়ে ভ্রান্তিবিলাস না-হয় মার্জনীয়ই মানলুম।

কিন্তু ব্যাপারটা ঠাট্টার বিষয় নয়। সমালোচনার মানবিকার সাহিত্যের এবং কিছুটা জীবনের পরিধিতে ব্যাপ্ত। প্রেরণাবাদের অভ্যাসিকতা এই আলাদীনের ম্যাজিকযন্ত্র-চালিত প্রদীপোজ্জ্বল স্বপ্নময় স্বর্গরাজ্যবাদেও বর্তমান। শেষোক্ত ধর্মও 'সমাজের ভাবী গঠন বিষয়ে একরকমের কল্পনার খেলা'—কারণ: 'Naturally Utopianism, which before the time of materialist critical socialism concealed the germs of the latter within itself, coming now after the event can only be silly; *silly*, *stale* and basically reactionary.' (Engels)

অর্গ্যানিক প্রকৃতির প্রক্রিয়াবিশেষের উপরে যন্ত্রবিজ্ঞানের পদ্ধতির প্রয়োগে কি বিপদ, 'ফয়েরবাখে' তা সুস্পষ্ট দেখানো হয়েছে। অথচ আমাদের সমালোচকেরা প্রায়ই উদোর পিণ্ডি চাপান বুদোর ঘাড়ে, কবিতায় চান গল্প, গল্পে চান সংবাদ, রাজনীতির কর্মক্ষেত্রের বিবেচ্য করেন প্রাথমিক দাবি গল্পবিচারে, অর্থনীতির তত্ত্বের বর্ষফল খোঁজেন কাব্যের মিলে, আমাদের সমাজের জীবনে মনোলোল্যে খোঁজেন সোভিয়েট্‌ সমাজের প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। বলাই বাহুল্য, মার্ক্সবাদে এই সহজপথের সমর্থন নেই: 'because no philosophy recognises the emergence of levels of organisation better than dialectical materialism, and the individuals of which the human social collectivity is built up are themselves the most complicated organisms in the living world.'

শিল্পসাহিত্য রচনায় আজও তাই ব্যক্তিরচয়িতাই প্রাথমিক, এই অনেক মানুষের পথে তাই আজও ওয়ান-ওয়ে-ট্রাফিকের নিয়ম চলে না—কী দক্ষিণে, কী বামে। অধিকন্তু শিল্পসাহিত্যে—যেখানে মানসজীবন মূলত আর্থিক সামাজিক ও জৈব অবস্থানিচয়ের রূপান্তর হ'লেও খানিকটা আবার স্বতই নিয়ন্ত্রণ ও চালনাশক্তি পায় (গারোদি: সমাজতন্ত্রবাদ ও মানসনীতি: organisateur et moteur), সেখানে তাই স্তরগত সত্তাকে অস্বীকার শিল্পসৃষ্টি বা রচনার পরিপন্থী। মাণিকবাবু

যদি বলেন, তাঁর সজ্ঞের বাইরে এই নিয়ন্ত্রণের স্তর অগোচর, তাহ'লে তাঁর পুনর্বাদ হ'য়ে দাঁড়ায় বিজ্ঞানবহির্ভূত, মরমীয়া; 'of an obscurantist character, since it was supposed that the organising relations were themselves the anima and as such inscrutable to scientific analysis.'

বিশেষত বিজ্ঞান তথা সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঐ বিশেষ স্তরের প্রক্রিয়ায় যে বিশেষ ফর্ম, তাই পর্যবেক্ষণ করা। অবশ্যই ভিন্ন-ভিন্ন স্তরের মধ্যে আছে বৃহত্তর সম্বন্ধের ঐক্য কিন্তু তার প্রকাশ হয়: 'in qualitatively different forms of whose distinctive characters one should never lose sight of.'

এবং ফর্ম ও ম্যাটার সমতুল্য বা অভিন্ন (ডায়ালেক্‌টিক্স অফ নেচার), এই পর্যবেক্ষণে, এই অভিন্নতার বিচারে অবশ্যই ফর্ম বাধ্যত খানিকটা পরোক্ষ নিদান হ'য়ে দাঁড়ায়, কারণ ফর্মের পরিবর্তনের জ্ঞান সম্ভব ফর্মের প্রাথমিক জ্ঞানে এবং তার উৎসের জ্ঞানেই। এবং এ-পরিবর্তন ত নিত্য ও সর্বব্যাপী, পুরাতন ও নতুনের জীর্ণ ও নবজাতকের দোহারই বিবর্তনের প্রক্রিয়ার অন্তর্লীন আতত বিষয়বস্তু। এঙ্গেল্‌স্ তাই লেখেন: 'We all, that is to say, laid and were bound to lay the main emphasis at first on the derivation of political, juridical and other ideological notions from basic economic facts. But in so doing we neglected the formal side—*the way in which these notions come about*, for the sake of the content.' নন্দনতত্ত্বে বা শিল্পসাহিত্য বিচারে শেষোক্তটিই মুখ্য বিচার: 'It is the old story: form is always neglected at first for content. As I say, I have done that too, and the mistake has always struck me later.'

এই ন্যায়বিশ্বের আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন বা এই স্তরের ভিন্নতার উপরে নজর দেবার প্রয়োজন মার্ক্স তাই বিবৃত করেন 'ক্রিটিক্ অফ্ পলিটিক্যাল ইকনমি'র ভূমিকায়। আইডিওলজিক্যাল ফর্মগুলিকে উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন তিনি বলেননি, বলেন 'রূপান্তর'। তিনি বলেন যে আমাদের ভাবজগৎ, চিন্তাজগতের সূত্রপাত 'প্রথমে' বাস্তব কর্মপদ্ধতি ও মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে জড়িত ('জর্মান আইডিওলজি')। আবার: 'From the start the "spirit" is afflicted with the curse of being "burdened" with

matter which here makes its appearance in the form of agitated layers of air, sounds, in short, of language.'

কর্মের তাগিদে বা কর্মীর আত্মপ্রসাদে আমরা ভাষার এই উভয়মুখিতা ছাঁটাই করি, ভাষাকে সঙ্ঘবদ্ধ হাতুড়ি ভেবে ফেলি কিংবা ঐ 'আত্মা'কে বা মানসকে হুকুম দিই প্রত্যক্ষ বাস্তবতাকে মাটিতে ফেলে সাম্যবাদী সমাজের রিয়ালিজমের আকাশে উড্ডীন হ'তে। শিল্পসাহিত্যেরও যে একটা ইতিহাস আছে, একটা বেগতত্ত্বও আছে, তা আদর্শবাদীর আবেগে ভোলা স্বাভাবিক নিশ্চয়ই। কিন্তু স্রষ্টাশিল্পের কর্ম ঠিক সিস্টেম বা মেটাফিজিক্স ত নয়, প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্রও নয়—শিল্পীদের সঙ্ঘ অবশ্যই তা হ'তে পারে। নৈঃসঙ্গ্যের অসংলগ্ন চর্চাও সমানই অসহিষ্ণুতার লক্ষণ। কারণ তাতেও সরলীকরণ, তাতেও ব্যক্তিসমাজের প্রাণময় আততি অস্বীকৃত—অধিকন্তু অবশ্য তাতে আশুপ্রয়োজন সামাজিক উন্নতি অস্বীকৃত।

তাছাড়া শিল্পকর্ম যে এখনও কিছুটা আদিম, সে-কথা ভুললে চলে কী ক'রে, বিশেষ ক'রে প্রাথমিক শিল্পগুলি এবং বিশেষ ক'রে আমাদের সমাজজীবনে। সিনেমা, ব্যালে, নাট্যমঞ্চ ও পোস্টার ছাড়া যৌথশিল্প কৈ আর? অধিকাংশ আদিম শিল্প যথা সাহিত্য বা স্টুডিওচিত্র আজও ব্যক্তির হাতে গড়া : 'and therefore of necessity, small, dwarfish, circumscribed. But for this very reason, they belonged as a rule to the producer himself.'

তাই এখনও শিল্পকে, এই ইন্দ্রিয়-গত মানবিক কর্মপ্রক্রিয়াকে শুধুই যৌথ সামাজিক পণ্যদ্রব্য ভাবাটা মার্ক্সবাদের পরিপন্থী। সেইজন্যেই ফরাসি কম্যুনিস্ট নেতা এরভে ও গারোদি বলেন যে শিল্পবিচারে কোন পার্টিলাইন বা মার্ক্সিয় নিয়মকানুন প্রযোজ্য নয়। মার্ক্স কারুশিল্পী বিষয়ে যা লেখেন, তা-ও এ-প্রসঙ্গে তুলনায় চিন্তনীয় : 'There is found with mediaeval craftsmen an interest in their special work and in their proficiency in it which was capable of rising to a narrow artistic sense. For this very reason, however, every mediaeval craftsman was completely absorbed in his work ··· and to which he was subjected to a far greater extent than the modern worker, whose work is a matter of indfference to him.'

এই দৃষ্টিতে একদিকে বুদ্ধদেবের 'ইন্‌কোরাপ্টিব্‌ল্‌ রোল্‌ অফ দি পোয়েট্'-এর বিলাস অর্থহীন, অন্যদিকে স্বয়ম্ভুর তথাকথিত মার্ক্সবাদীর ফাঁকিও মারাত্মক হ'য়ে

ওঠে। তাঁরা কেউ-কেউ দ্রুত সমাধানের তাগিদে আরম্ভ করেন বর্জননীতি। সামাজিক সম্বন্ধপাতে এবং উৎপাদন শক্তিসমূহে বিরোধিতা লক্ষ করে তাঁরা আধুনিক শিল্পসাহিত্যকে বিসর্জন দিয়ে একবার কাঁদেন মানবসমাজের প্রথম সারল্যের দিকে ফিরে, একবার হাহুতাশ করেন ভাবীস্বপ্নের সুখময় কোলে: 'this antagonism between the productive forces and the social relations of our epoch is a fact. Some may wail over it; others may wish to get rid of modern arts, in order to get rid of modern conflicts.' (Engels)

মার্ক্স‌ও মন্তব্য করেন এই অসমতার বিষয়ে তাঁর 'ক্রিটিক্ অফ পলিটিক্যাল ইকনমি'র ভূমিকায়। অধিকন্তু, 'As to the realms of ideology which soar still higher in the air, religion, philosophy etc., these have a prehistoric stock.' সুতরাং, 'All one can reasonably do, however, is (1) to try to discover the method of division to be used *at the beginning* and (2) to try to find *the general tendency* in which the further development will proceed.' এবং তার জন্যে 'all history must be studied *afresh*, the conditions of existence of the different formations of society must be individually examined.' এবং সাহিত্যবিচারে তাই যেমন সাহিত্যবস্তুই প্রধান বিবেচ্য—কে হাকিম বা হাকিমপুত্র, কার চরিত্র কীরকম সে শুধু পরে এবং জীবনীর স্তরেই বিবেচ্য—তেমনি ঐ ব্যাপক ও গভীর সমাজেতিহাসের সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যেতিহাসও গ্রাহ্য—সাহিত্যবিচারে।

অবশ্য এ-সব কথার জবাবও তিনি সহজেই দিতে পারেন তথাকথিত মার্ক্সিজমের যাদুকাঠি যাঁর হাতে। চরম সত্য এবং একমাত্র নিখুঁত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তি তাঁদের মুঠিতে যাঁদের বিশ্বাস, তাঁদের পক্ষে অবজ্ঞা ও বর্জননীতি স্বাভাবিক—হের ডুএরিঙের মতোই। তাছাড়া 'as in economics it is assumed that every consumer is a real specialist on all the commodities he has occasion to buy for his maintenance—so similar assumptions are now to be made in science.'

এঙ্গেল্‌স্ এই মনোবৃত্তিকে বলেছেন শিশুরোগ। হাঁ-বা-না মার্কা ধর্মপরায়ণ এই ব্যক্তিদের কাছে স্বকীয় ইতি-ও-নেতির বাইরে সব-কিছুই মন্দ, পাপবিদ্ধ,

প্রতিক্রিয়াশীল, এমনকি 'ফ্যাসিবাদী'ও। তাঁরা ভুলে যান তাঁদের একেশ্বরাবেগে যে দ্বন্দ্ব ও স্তরের বিভেদগুলির মূল্য আপেক্ষিক, যে তাঁদের কল্পিত ভাগাভাগির কাঠিন্য এবং এক ও অদ্বিতীয় পুরুষার্থ তাঁদেরই মানসিক দান এবং এ-কথা ভুললে ডায়ালেক্‌টিক্স অচল।

এ-রকম বিস্মরণে বিপদ খুব বেশি, অন্তত আমাদের তাই বিবেচ্য, শিল্পসাহিত্যে। রীতিমতো ধর্মেতিহাসেও দেখা যায় যে ঈশ্বরকে আত্মা বা সর্বস্বদানের চরম পরিণতি হচ্ছে অবাঙ্‌মনসোগোচরের যে-অতীন্দ্রিয়তা, তাতে শিল্পসাহিত্যে যে গোচরেরই জয়গান তা বিধর্মের নামান্তর। যে-পরিমাণে গির্জা বা মন্দির-শিল্প ঐহিক, যে-পরিমাণে কৈবল্যে আত্মদান অসম্পূর্ণ, সেই পরিমাণেই সেই শিল্পের প্রাণৈশ্বর্য, সেই সাহিত্যের প্রত্যক্ষ জীবনের উৎসে বারংবার প্রাণসংগ্রহ। রবীন্দ্র-রচনাবলিতে আমরা এই দ্বৈতাদ্বৈতের আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ পাই।

পরোক্ষ মার্গে জীবনাভিজ্ঞতাঘটিত কোন ইস্‌থেটিক বা সংবেদ্য কর্মচর্চা ঐতিহাসিক বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়, এমনকি শিল্পবস্তু-বিশেষের উৎকর্ষও হয়ত তাতে তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত। তাই ত এঙ্গেল্‌স্‌ লেখেন যে যবের চারা ও আনন্তিক কলন দুই-ই নেতির নেতিকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ-জ্ঞান থাকলেও যবের চাষ বা অঙ্কের উত্তর সঠিক হয় না, তারের স্থূলতার পরিমাণে শব্দের ওজন কী তা জানলেও হয় না বেহালা বাজাবার ক্ষমতা। তাছাড়া চিরসত্য হয়ত অঙ্কে প্রযোজ্য, কিন্তু ইতিহাসে বা জীবনের অভিজ্ঞতায় সত্যকে হ'তে হয় বারবার আবিষ্কারে প্রত্যক্ষে প্রতিভাত। মানুষের ইতিহাসে যেমন কয়েকটা মোটা পুরুষার্থ প্রায় চরম মূল্য পেয়ে গেছে তেমনি আবার সে-পুরুষার্থের বিশেষ রূপ ও প্রয়োগ কালনির্ভর—যদিও মানবিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান জীববিদ্যার চেয়েও পিছিয়ে আছে। (এঙ্গেল্‌স্‌)

সাহিত্যের পক্ষে আরেকটা গৌণ বিপদ হচ্ছে এই জীবনে পুরুষার্থ-জড়িত ভাববিলাস। ভাববিলাস সর্বদাই বিপজ্জনক, অসংহত কল্পিত নৈঃসঙ্গ্যে বা শিল্প-রচনার প্রয়োজনীয় অবকাশ বা নৈঃসঙ্গ্যহীন সজ্ঞে যেখানেই হোক্‌, কিন্তু তার বিপদ আরও বেশি, যখন তার পিছনে বিজ্ঞানের ছাপমারা সমর্থনের রং চড়ে। উদাহরণত সাহিত্যের একটা বড়ো উপজীব্য প্রেমই ধরা যাক্‌। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী"র আলোচনা মনে পড়েছে। শ্রেণীহীন সমাজে শুনেছি সে-গৌরবশশীর জন্যে কাতর কবিকে প্রলাপ কইতে হবে না, যেন শ্রেণীর বন্ধন উন্মোচিত হ'লেই বিশেষ নরনারীর সম্বন্ধ-সমস্যা জলবৎ সহজ হ'য়ে যাবে, বা উঠবেই না। এই

ধারণারই পরিণতি সেই প্রমাদ, লেনিন যাকে বলেছিলেন জলের গ্লাসের মতবাদ। এই দৃষ্টিতেই বলা হয় যে ভবিষ্যৎ সমাজে বিবাহ বা বর্তমান বিপ্লবীর বিবাহ যৌন-বিবাহ নয়, বৈপ্লবিক বিবাহ। কারণ ডুএরিঙের নির্দেশে প্রেমিককে হ'তে হবে অমানুষিক : 'The first thing that he must do is to cast off brutality and stupidity now rife in the sphere of sexual union and selection.'

এই একই কারণে ত শিল্পসাহিত্যজগতে এঁদের বর্জননীতির এত দৌরাত্ম, ডুএরিঙের মতোই। এদিকে মনে-মনে ডুএরিঙের মতই আছে বাক্‌প্রধান কবি-গৌরব। অবশ্য মাণিকবাবুরা বলতে পারেন যে তিনি শ্রেণীমুক্ত মানবসমাজের কথাই ভাবেন ও বলেন, যেমন বুদ্ধদেববাবু শ্রেণীহীন ও সমাজহীন মানুষের কথা। কিন্তু শ্রেণীসমাজেও 'there has been on the whole progress in morality, as in all other branches of human knowledge ... we have not yet passed beyond class morality. A really human morality which transcends class antagonisms and their legacies in thought becomes possible only at a stage of society which has not only overcome class contradictions but has even forgotten them in practical life.'

তাছাড়া প্রগতিবিচারেও রুচির ব্যক্তিগত সমস্যা থেকেই যায়, মায়াকভস্কির সেই উটের আর ঘোড়ার মতো :

উটের দিকে তাকায় ঘোড়া,
চেঁচিয়ে বলে, এ কী বেয়াড়া বাপমাছাড়া ঘোড়ারে!
উট এদিকে জানায়, তুমি ত ঘোড়া নও হে
তুমি চিমসে বেঁটে উট বটে।

এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই
নক্ষত্রখচিত এই বিরাট ভুবনে জানে না
যে এরা দুটি
স্বতন্ত্র ধরনের দুটি জীব।

আরাগঁ

আরাগঁর বই মাত্রেই সাহিত্যজগতে ঘটনা। দ্রষ্টব্য হচ্ছে আরাগঁর বিশেষ বইয়ের উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কবিপরিণতির স্বাক্ষর। কারণ আরাগঁর কবিজীবন দাদা-বাদ থেকে সাম্যবাদের দীর্ঘ কিন্তু প্রাণবান্ এক বিস্ময়কর বিকাশের উদাহরণ। 'এক-নম্বর নরখাদক' নামক পুস্তিকায় তিনিই এই কবিতাটি লিখেছিলেন : "আত্মহত্যা"

A B C D E F
G H I J K L
M N O P Q R
S T U V W
X Y Z

দারুণ রসিকতা নিঃসন্দেহ, সাবেক ফরাসি অর্থে, বুর্জোয়াদের ক্ষেপাবার জন্যই। কিন্তু এই অক্ষরমালার মধ্যে তৃতীয়টি 'সে' নিয়ে তাঁর বিখ্যাত প্রতিরোধ-কাব্যের একটি জোরালো কবিতাও যে লিখিত, সেটা কি সম্পূর্ণই আকস্মিক প্রেরণা?

দাদাবাদের আরম্ভ ত্রিস্তাঁ ৎসারা, পল্ এলুয়ার, লুই আরাগঁ প্রভৃতি আজকের অনেক শ্রদ্ধেয় কবিদের তারুণ্যে; এর ভিত্তি হ'ল জুগুপ্সা বা বীভৎসায়, অস্পষ্ট লক্ষ্য এবং একটু চালিয়াৎও হয়ত, কিন্তু প্রকৃত বিরাগে। অবশ্য তাঁদের মুক্ত লিরিকবাদের তত্ত্বও কার্যকর ছিল না, তা সত্ত্বেও ফরাসি কাব্যের ইতিহাসে দাদার একটা স্থান আছে, অবশ্যব্যর্থ পরীক্ষা হিসেবে, বিদ্রোহের একটা প্রাথমিক খেয়াল হিসেবে। এঁদের মতে শতাধিক বছর ধ'রে লেখকরা সাহিত্যকে ভেবে এসেছেন নিজেদের একটা বহিঃরূপায়ণ ব'লে। এঁদের মতে ধ্রুপদী লেখকদের এ-ধারণা ছিল না। তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্তৃত্বের ব্যবহারে কল্পনার দ্বারা চেষ্টা করতেন যে-প্রত্যক্ষকে যে বাস্তবকে সবাই দেখে তাকেই প্রতিভাত করতে, রূপান্তরিত করতে। উনিশ শতক ব্যেপে এই বিষয়গত বা অবজেক্টিভ এষণ ক্ষীয়মাণ। রোমান্টিক-বাদের সময় থেকে লেখকদের ধারণা হ'ল যে তাঁদের সৃজনশক্তি তাঁদের বোধ বা গ্রহণশক্তির আগে। ঈশ্বর হলেন তাঁদের আদর্শ আর জেনেসিস তাঁদের লক্ষ্য।

তাই ফ্লোবেয়র তাঁর আপাতবিষয়ানুগত্য সত্বেও আসলে তাঁর কল্পনার ছায়ামূর্তি-দেরই মূর্তিকার। সিম্বলিস্ট বা প্রতীকবাদীরা উল্টে সব আদর্শ বা মডেল বিসর্জন দিলেন এবং নিজেদের ব্যক্তিস্বরূপের একটা ডেপুটি বা প্রতিনিধি করলেন তাঁদের কাব্যকে। একালের যুবকদের কাছে তাই র‍্যাঁবোর কীর্তি সূচিত হ'ল তিনি যে এই শিল্পরচনায় প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিকৃতির দাবিকে উড়িয়ে দেন, তাতেই। র‍্যাঁবোর দাম তিনি যে শান্ত আত্মপ্রত্যয়ে—আত্মচিত্রণে নয়, কাব্যের সত্তায় ঝাঁপ দিলেন, তাতেই। র‍্যাঁবোর রচনা তিনি নিজেকে যে একটা রূপ দিলেন তাতেই সম্পূর্ণ। তিনি, কথাটার চলিত অর্থে বলা যায়, লেখেননি, তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন। সাহিত্যিক কিউবিজম—আপলিনেয়র, মাক্স, জাকব, প্রতীকবাদেরই উত্তরপর্ব, অর্থাৎ আত্মবহিষ্করণই। দাদার ঐতিহাসিক মূল্য এইখানে—এঁরা দেখালেন যে আত্ম-উপলব্ধিতে কিছুই উপলব্ধ হয় না, নিজেকে শুদ্ধভাবে বহিঃ-রূপায়ণ মানেই লেখকের কাজ শূন্যে অবসিত করা।

দাদাবাদী যখন অতিবাস্তববাদী হ'য়ে উঠলেন, তখনও তাঁদের মুখ্যত একই চিন্তা, যদিচ তাঁরা বিরক্ত হ'য়ে এবারে স্বপ্নজগতের অবচেতনের প্রকৃত কিন্তু অনির্দিষ্ট জগতের মাহাত্ম্যে মাতলেন। আওয়াজ দেওয়া হ'ল: জীবনের বড়ো সমস্যাসমূহের সমাধানে স্বপ্নজগৎই সারথি। অতিবাস্তববাদ থমকে দাঁড়াল পরি-ণতির সেই প্রাণময় মোড়ে, যেখানে শিল্পসাহিত্যের জায়গায় এসে পড়ে বাস্তব-জীবন, যেখানে মানুষের কল্পনা শব্দ বা রং-রেখার চেয়ে আরও প্রত্যক্ষ বস্তুগত প্রকাশ চায়। অর্থাৎ অতিবাস্তবের আন্দোলন আর সাহিত্যিক গণ্ডিতে থাকে না, জীবনেরই রূপান্তরে তার পরিণতির সততা। লেখক-কংগ্রেসে তাই ব্রেতঁ বলে-ছিলেন: জগৎকে বদলে দাও, মার্ক্স বললেন; জীবনকে পাল্টাও, র‍্যাঁবোর কথা; আমাদের পক্ষে এ দুটি আদেশবাক্য একই নির্দেশ। এ-নির্দেশ আরাগঁই মানেন প্রথম, তিনিই এঁদের প্রথম কম্যুনিস্ট কবি।

তাই ৎসারা তাঁর নতুন বই 'অতিবাস্তববাদ ও যুদ্ধোত্তর যুগে' বলেছেন: 'কাব্য ত ইতিহাসে আকণ্ঠমগ্ন। তাই তাঁর "দেসন-এর মৃত্যুগাথা" বা "লরকাকে উদ্দিষ্ট কবিতা" কাব্যের জিজ্ঞাসাও, দেকুরের হত্যার উপরে এলুয়ারের কবিতার মতোই। সৎকাব্য মাত্রেই ত মৌলিক কাব্যজিজ্ঞাসাও বটে।'

ইতিহাসে আকণ্ঠমগ্ন কাব্য, ইতিহাসমগ্ন মানুষ—তার প্রতি আনুগত্যের ফলে স্থাবর স্বত্বরক্ষা অচল। বিস্তৃত আলোচনায় না-গিয়েও দ্রষ্টব্য, কিভাবে চালু স্বত্ব অস্বীকারে, চলতি রীতির বর্জনে এলুয়ার আরাগঁ এবং ৎসারা স্বপ্নকার্যের অপেক্ষা-

কৃত উর্বর জমিতে গিয়ে পড়লেন, কিভাবে উর্বর অবচেতন তাঁদের ডুবিয়ে দিলে জীবনে, প্রথমে কিছুটা অনির্দিষ্ট গতিতে হয়ত ; বেঁধে দিলে সবচেয়ে বড়ো মূলধন যে মানুষ তারই মাটিতে, সীজারকে তাঁর প্রাপ্য না-চুকিয়ে।

ৎসারার কবিতা তাই গায় : ফেলে দাও তোমার অহঙ্কার, কান মেলে রাখো শ্রবণ কোঠায়। কারণ সৎকবির শ্রেষ্ঠ পুঁজি কাব্য নয়, মানুষ ; না-হ'লে জোটে নিরক্ত দাসত্ব, ভবিষ্যৎহীন, আনন্দের দীপ্ত ভবিষ্যৎ। ৎসারা বলেন : আধুনিক কবিতা যা তা সে হ'ত না, যদি-না স্পানিশ যুদ্ধ তার উপর দিয়ে ছুরির মতো চ'লে যেত, যদি-না মিউনিক্ তাকে সেই লালে রাঙাত, যে-লাল সবচেয়ে গরীয়ান রং, যদি ভিশি ··· অতিবাস্তববাদের সীমানা বহুদূর চ'লে যায়। ৎসারা তাই আধুনিক কবিকুলকে ভাগ করেন ত্রিধা : কোন-কোন কবি বলেন ফিরে চলো অতীতের সত্যযুগে, ফলে দুঃখকষ্ট অত্যাচারের কথা ভুলে যাওয়া যায়। কেউ-কেউ ত্রিকালের এক নির্যাস বানিয়ে বর্তমানে গেঁথে বসেন, যাতে কিছু পরিবর্তন আর ভাবা যায় না ; আর আছেন তাঁরা যে-কবিরা অতীতোত্তর বর্তমানে দেখেন সেই ভবিষ্যতের প্রস্তুতি যেখানে মানুষোচিত, তাঁদের সম্ভ্রমসঙ্গত এক জগতের প্রত্যক্ষ প্রতিমাই মানুষের অবিশ্রাম জ্ঞানসাধনার লক্ষ্য।

অতিবাস্তববাদী অনেক কবিদের হ'ল এই তৃতীয় দলে বিকাশ। এই সাহিত্যিক পৌরবাদ পুষ্টতা পেতে লাগল অযৌক্তিকতা বা অচালিত চিন্তার মতবাদ বিসর্জনে ; নিয়ন্ত্রিত চিন্তা, দ্বন্দ্ব-সমাহিত যুক্তিবাদে অর্থাৎ মার্ক্সবাদে পরিণতি পেয়ে। প্রকৃত বা সৎকাব্য যার শিকড় চেতন ও অবচেতনের মাটি ও জলে, নিজের স্বকীয় যুক্তিতে সে নির্ভর। অবশ্য সে-যুক্তি কষ্ট ক'রে জানতে হয়, কাব্যের স্বকীয় ডায়া-লেক্‌টিক্ খুঁজতে হয় তার নিহিত থেকে প্রকাশিতের অভিযানের মধ্যে, রূপহীন থেকে রূপায়িতের প্রক্রিয়ায়। যথার্থ কাব্যের মজ্জাগত এই আততিই যে-কোন সত্তাবান্ কবিকে নিজের মধ্যে এবং যুধ্যমান জগতের সঙ্গে সম্বন্ধপাতে এনে ফেলে। সেইজন্যেই, ফরাসি সাম্যসুধীর ভাষায় কাব্য আজকে সামগ্রিক অর্থাৎ প্রগতিশীল মানবিকতার দিশারী।

ফরাসি কাব্যজিজ্ঞাসার এই পটেই আরাগঁর কাব্যের মহত্ব উপলব্ধ। গত যুদ্ধের অন্ধকারে তাঁর কবিতা স্বদেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের ব্যাপকভাবে উদ্বোধিত করেছিল। সে-কাব্যে, আঁদ্রে জিদকে বলতে হয়েছিল যে, এই বুঝি ফরাসি কাব্যের রেনে-সাঁসের সূত্রপাত, বায়ুবিহারী ইংরেজ মার্টিমার কনোলিদেরও জয়ধ্বনি করতে হয়েছিল প্রচুর—যদিচ রাজনীতি এবং সাম্যবাদের রাজনীতিই এই রেনেসাঁসের

বনিয়াদ, যা আরাগঁরই গদ্যরচনাতে স্পষ্ট। এইসব দেশপ্রেম তথা কলাকৌশলে সমধিক অবহিত কবিতাপাঠের তৃপ্তি ধ্রুপদী কাব্যপাঠের সমতুল্য, যদিচ সেগুলি তখন মুখে-মুখে আইন এড়িয়ে ফ্রান্সে ঘুরত।

এই একাধারে সাধারণ ও বিদগ্ধের কাছে আবেদনের সফলতা বোধহয় ফরাসি বিপ্লবোত্তর ফরাসি জীবন ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণেই সম্ভব। ইংলণ্ডের মতো ভদ্রলোক-মার্কা দেশে বা অন্যপক্ষে ভারতবর্ষের মতো বিক্ষিপ্ত ভঙ্গুর জীবনে এ বোধহয় সম্ভব নয়। এখানে ভাঙন এখনও জোড়া দেওয়া বাকি, শিক্ষাগত ভেদাভেদ এখনও বড়োই তীব্র, সংস্কৃতিগত ঝোঁক বড়োই একপেশে—কি এদিক কি ওদিকে। ফরাসি জীবন ও সংস্কৃতির সচল ধারাতেই আরাগঁর কবিত্বের সাবালক বিকাশ। যদিচ ভিক্টর উগো থেকে রম্যাঁ রলাঁর বিপ্লবী ঐতিহ্য তাঁর চোখে, যদিচ রাসীন্ থেকে বদলেয়রের ধ্রুপদী ছন্দরণনও তাঁর কাব্যে প্রসাদ আনে, তবু তাঁরই সাক্ষ্যে আমরা জানি যে ফরাসি কাব্যের মধ্যযুগের ধারা এবং দেশজরীতি তাঁর অন্বিষ্ট, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল চর্চা তাঁর শিক্ষার অঙ্গ, সিম্বলিস্ট, সুররেয়ালিস্ট তথা তাঁর মধ্যযুগের পথপ্রদর্শক আপলিনেয়র পর্যন্ত। ফরাসি কাব্যে যে-স্বদেশপ্রেমের স্রোত ব'য়ে গিয়েছে, তাতেও আরাগঁ মুক্তিস্নানে ভয় পাননি, অথচ পেগ্যী সাম্যবাদী নন, যেমন নন আপলিনেয়র বা জাকব, যদিচ শেষোক্ত কবি একাধিক নাৎসী-নিহত কাথলিক কবিদের একজন।

একে বিদগ্ধজনের বহু পল্লবগ্রাহিতা ভাবলে ভুল হবে, বরং মার্ক্সবাদের মানসেই এই গ্রহণ-বর্জন-সৃজনের সম্যক্ সমর্থন পাওয়া যায়—মতবাদ ও কর্মপক্রিয়ায় উভয়ত। বলাই বাহুল্য, এ-ক্ষেত্রে কর্মের উদ্দেশ্যটাই প্রধান বিবেচ্য এবং তার ক্ষেত্রনির্দেশ। আরাগঁ, বলাই বাহুল্য, মধ্যযুগে পলাতক নন, আপলিনেয়র বা পেগ্যীকে তিনি অবশ্যই তোরেস্ বা কাসানোভার সঙ্গে একাসনে বসান না। সাহিত্যের পুষ্টি তাঁর কাছে রাজনীতির থেকে, অঙ্গাঙ্গি হ'লেও, স্বতন্ত্র। হেগেলের দুরন্ত প্রতিক্রিয়া বর্জন ক'রে যেমন একদা তাঁর ডায়ালেক্‌টিক্ গ্রাহ্য হয়েছিল, রিকার্ডো বা স্যাঁ-সিমোঁর ঋণ গ্রহণের সঙ্গে-সঙ্গে; আরাগঁ তেমনি ফরাসি কাব্যের দেশজ ঐতিহ্য সন্ধান করেছেন তাঁর কাব্যের উৎসে জলসিঞ্চনে। ফরাসি মননজীবীদের কংগ্রেসে গোর্কির উপরে তাঁর ভাষণে আরাগঁ তাই বলেন: গোর্কির ছিল কাব্যে জাতীয় সত্তার একটা বোধ, সুদূর জাতীয় অতীত থেকে অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারের চেতনা। ··· যখন বোগাতিরদের আক্রমণ ক'রে রুশ রঙ্গমঞ্চে পরিহাস যোগানো হচ্ছিল, যে-পরিহাসে বোগাতিররা কিম্ভূত ও বর্বর ফিউডাল

যোদ্ধা ব'লে, প্রায় এস্ এস্-এর পূর্বাভাস ব'লে চিত্রিত, তখন গোর্কির কাছ থেকেই বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা তাঁদের সমালোচনার সূত্র পান ; ফলে সে-নাটক রাশিয়াকে অপমান হিসাবেই স্টেজ থেকে বিদায় নিলে। আরাগঁ ঐ-ভাষণে তারপরে বলেন, আমায় যাঁরা জানেন, তাঁদের জানা আছে ঐ-চিন্তাস্রোত আমার পক্ষে কী মূল্যবান্। গোর্কির এবং আরাগঁর এই মতেরই সমর্থন লেনিন করেন যখন তিনি ১৯২০ সালে লুনাচারস্কির প্রোলেটারীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের ভাষণের দ্রুত প্রতিবাদ লেখেন (১০নং 'নুভেল ক্রিতিক'-এ লেখাটির অনুবাদ প্রকাশিত): মার্ক্সবাদ বিশ্বেতিহাসে গুরুত্ব অর্জন করেছে যেহেতু বৈপ্লবিক প্রোলেটারিএটের এই মতবাদ বুর্জোয়া যুগের বহুমূল্য জয়মাল্যগুলি বর্জন ত করেইনি বরঞ্চ দু-হাজার বৎসর-ব্যাপী মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির দীর্ঘ বিকাশের সব-কটি বস্তুত পরিগ্রহণ করেছে রূপান্তরের মধ্যে। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের মার্ক্সবাদী আলোচনাতেও দেখা যাচ্ছে ঐ-নির্দেশের আভাস। আরও বেশি আলোচনায় ও অবহিত সাহিত্যপাঠে নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণতা কেটে যাবে। এতদিন মুখ্যত একপেশে শিক্ষার প্রভাবে, আমাদের ইংরেজি-শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ইংরেজি শাসনব্যবসার সৃষ্টি মধ্যবিত্ত বাঙালির সংস্কৃতির অপরিসর চলনবিলেই মার্ক্সবাদের সংস্কৃতিচিন্তা মোটামুটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ বোঝা যাচ্ছিল জলাশয় আরও আছে, স্রোতগ জলধারাও। কারণ ঐ-সংস্কৃতি যে শুধু মুষ্টিমেয়ের তা নয়, মাত্র উনিশ শতকের যে তা নয় : তার চেয়ে বড়ো কথা, ঐ-শিক্ষাসংস্কৃতির যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরে ভিৎ, সে-শ্রেণী বিদেশি শাসকের ব্যবসায়ীর ক্রীড়নক মাত্র, শাসকও নয়, উৎপাদক ব্যবসায়ীও নয়। বুর্জোয়া সমাজের উদারনীতিক অসম্পূর্ণ সভ্যতাও তাই ত আমরা সত্যই পাইনি। পশ্চিম য়ুরোপের রেনেসাঁস বা আধুনিকতার বিকাশ আমরা বাঁকা আয়নায় পেয়েছি বেঁকেচুরে। আমরা গ্রাম হয়ত ভেঙে এসেছি, কিন্তু গেঁয়ো থেকে গিয়েই।

সম্প্রতি এ-বিষয়ে শোনাযাচ্ছে দৃষ্টিপাতের আলোচনা। ফলে দেশজ সাহিত্যের দিকে মন যাচ্ছে, যেমন চেষ্টা হচ্ছে আমাদের কুটিল ইতিহাসের জট খুলতে। আঠারো বা উনিশ শতকের বহু বিদ্রোহমূলক আন্দোলন আজকাল তাই স্বদেশ-প্রেমের ও প্রগতিমূলক শ্রেণীবিন্যাসের চেষ্টার পর্যায়ে ফেলা হচ্ছে : সন্ন্যাসী-ফকির থেকে সিপাহী বিদ্রোহকে মনে হচ্ছে স্বাধীনতার প্রথম অসম্পূর্ণ চেষ্টা। অবশ্য এখনও হয়ত অনবহিত ভুলত্রুটি ঘটছে, অতিকথনের ঝোঁকও হয়ত প্রতিবাদের উৎসাহে কিছু বেশি হ'য়ে যাচ্ছে, হয়ত সব বিষয়ে সমান জ্ঞান বা বোধের

বিনয়হীন অভাব থেকে যাচ্ছে। হয়ত এখনও য়ুরোপের পুনরাবৃত্তি খোঁজবার সহজ ইচ্ছায় মনে হচ্ছে সাঁওতাল বিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ—সরাসরি কৃষক-বুর্জোয়া অভ্যুত্থান, অথচ কৃষক অভ্যুত্থান যে ভারতের ছিন্নভিন্ন সামন্তিক বহুবিভক্ত স্বার্থের শেষ কামড়ের সঙ্গেও ইতিহাসের অবস্থাচক্রে হাত মেলাতে পারে, মার্ক্স-বাদীর পক্ষেই এই জটিল বিচার সম্ভব, যেমন সম্ভব রামমোহন রবীন্দ্রনাথের জল-ধারাকে হ্রদ সংজ্ঞায় সীমানির্দিষ্ট করা অথচ তার নির্দিষ্ট খণ্ডবুর্জোয়া প্রগতিমূলক মূল্য নিরূপণ: একদিকে ভারতের বুর্জোয়া বিকাশ বিদেশি শাসনব্যবস্থার চাপে খণ্ডিত, তাই ভারতের আধুনিক পর্ব ও ঐক্যবন্ধন বিড়ম্বিত, অস্বাভাবিক নিষ্ঠুর; অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে প্রাচীন সামন্তিক প্রতিক্রিয়া এবং সেই বিচ্ছিন্ন স্বার্থের সঙ্গে-সঙ্গে জাগরুক জন-আন্দোলনের চেষ্টার দোটানা: 'In as much as this *process* was a reflection of a colossal development of productive forces, in as much as it helped to destroy national isolation and the contradiction between the interests of the various peoples, it was and is a progressive *process*, for it is creating the material conditions for a future world socialist economic system.'

আবার একই সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় বলতে হচ্ছে: 'In as much as the latter *tendency* implied a revolt of the oppressed masses against imperialist forms of amalgamation, in as much as it demanded the amalgamation of peoples on the basis of collaboration and voluntary union, it was and is a progressive *tendency*, for it is creating the psychological conditions for the future world socialist economic system. (Stalin)

এই ডায়ালেক্‌টিক্স ও তাৎকাল্য ভুলে পোক্রভস্কির মতো আমাদেরও ইতি-হাস-সন্ধানে বর্তমানের চোখে অতীতকে দেখতে গিয়ে ইতিহাস বিকৃত করার সম্ভাবনা বর্তমান, যার বিরুদ্ধে রাশিয়ায় স্টালিন, জদানভ ও কিরভ্‌কে লড়তে হয়েছিল।

মুশকিলটা আরও বেশি হ'য়ে পড়ে যখন এই একপেশে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ হয় সাহিত্যবিচারে। তখন পোক্রভস্কি-পেরভেরজেভের মতো মনে হয়: 'There is no individual in literature. To understand Byron we must take

a description of English aristocratic society, for the person of Byron does not exist. Neither does Pushkin.'

এ-বিচারে ব্যাপক ইতিহাসের সংক্ষেপ বিকার ছাড়াও বিশেষ শিল্পসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধানুরাগ, বোধ বা যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবও প্রায় দেখা যায়। ফলে রবীন্দ্র-নাথের বিরাট প্রতিভার বহুধাকীর্তির অনস্বীকার্য দান বাদ প'ড়ে যায়। গ্রীক সাহিত্য, দান্তে, সেক্সপিঅর, গয়টে, বালজাক থেকে প্লাটেন, বয়রনে, কাউট্স্কি, হারনেস্, ইব্‌সেন প্রভৃতির আলোচনায় মার্ক্স এঙ্গেল্‌স্ অসহিষ্ণু আলোচনার বিরুদ্ধে বহু প্রামাণ্য উদাহরণই দিয়ে গেছেন, যেমন লেনিন দিয়েছেন টলস্টয় বিষয়ে তাঁর আলোচনাগুলিতে। পিতৃস্বরূপ নির্দেশের অর্থ পিতৃত্ব অস্বীকার নয়, এমনকি মাতৃতন্ত্রেও।

গয়টে বা বয়রনের আলোচনা থেকে শিক্ষণীয় বিশেষ ক'রে সাহিত্যবিচারের পদ্ধতি। প্রথমত সামাজিক রাজনৈতিক পটবিচার না-ক'রে সাহিত্যের ব্যাপক বিচার অসম্পূর্ণ, আবার যদি পটবিচারের মূল্য নিরূপণের সঙ্গে সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ না-মেলে, তাহ'লে তা মেলাতে হয় সংক্ষেপে নয়, পুনর্জিজ্ঞাসায়, শিল্পসাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসের পটে মিলিয়ে এবং সাহিত্যশিল্পের প্রক্রিয়াগত রূপান্তরগত নিজস্ব সার্থকতা বা মানবিচারের মর্যাদা রেখে। অনেক সময়ে হয়ত ঐ শেষোক্ত অর্থাৎ সাহিত্যিক বিচারণা থেকেই সমাজ-রাজনীতিগত পুনর্বিচারের সূত্রপাত। কিন্তু মুখ্যত সমাজ-রাজনীতির দিক থেকে বিচারে এ-সংক্ষেপের বিপদও সম্ভব, যেমন অন্তপক্ষে সম্ভব সাহিত্যিক স্বত্বরক্ষার গণ্ডিতে ঘুরে-ঘুরে বিকাশের পথরোধ করা। রবীন্দ্রনাথকে বাংলা সংস্কৃতির আদি-অন্ত ভাবাও যেমন শেষের দলের বিলাস, তেমনি রবীন্দ্রনাথকে কালীপ্রসন্ন দীনবন্ধু থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা এবং অতঃপর বর্জনীয় বলাও সাহিত্যিক দিক থেকে অত্যুক্তি। ঈশ্বর গুপ্তের মানস ও লিখন-রীতি এবং সমাজোৎসারী কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত ব্যঙ্গের মেজাজ আমাদের দ্রষ্টব্য নিশ্চয়ই বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে, কিন্তু তাই ব'লে গুপ্তকবির রচনার সাহিত্যিক মূল্য মাইকেল বা অন্তপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় নয়। মার্ক্সবাদী এ-দিক থেকে এখনও অসতর্ক মনে হয় কারণ তিনি দীনবন্ধু বিচারে 'নীল-দর্পণ'ই মুখ্য নাটক ধরেন, 'সধবার একাদশী' বিচারেই আনেন না, যদিও শেষ নাটকটি দীনবন্ধুর ত বটেই, বাংলা ভাষায় বোধহয় শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক। সেই-জন্যই তাঁরা রবীন্দ্র-প্রতিভার পুতুল খেলা 'শেষের কবিতা' বা অন্তপক্ষে সম্প্রতি আবার 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র মহিমা কীর্তন করেন, 'গোরা' 'চতুরঙ্গ' বা 'গল্পগুচ্ছ'

অবজ্ঞেয় রেখে। ঈশ্বর গুপ্ত, টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু বা মাইকেলের বিচারেও সাহিত্যিক মান নমিত করার দরকার নেই, তাঁদের ঐতিহাসিক মর্যাদা, এমনকি বিশেষ সাহিত্যিক গুণাগুণ উপভোগে বা আলোচনায়। শিল্পসাহিত্যে একেশ্বর নেই, ইতিহাসেরই মতো।

এ-প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর একজন বিশিষ্ট দিক্‌পাল। তাঁর মানবিকতার মার্গে ইংরেজি শিক্ষার অপেক্ষাকৃত সার্থকতা, অথচ এবং তাঁর ফলেই তাঁর দেশজ জীবনের বোধ। নিরাপদ ধর্মনির্মাণে ঋষি মুনিদের দিকে সন্ধানও তাঁর নেই, আবার দেশছাড়া সাহেবিয়ানাও তিনি করেননি; তাঁর সমাজ-সংস্কারের পিছনে ছিল তাঁর যুক্তিসঙ্গত শুদ্ধ মানবিক হৃদয়বত্তাই—এ-সবই এ-প্রসঙ্গে বিবেচ্য এবং হয়ত বিবেচ্য তাঁর নিঃসঙ্গতা, তাঁর প্রবীণ বয়সের নৈরাশ, কলকাতা ছেড়ে কর্মাটাড়ে সাঁওতালদের মধ্যে ফেরার যাত্রা ঐতিহাসিক রূপক।

আশা করা যায়, মার্ক্সবাদীর আলোচনায় দেখা যাবে কিভাবে দেশজ রীতি, দেশজ বিন্যাস, বর্তমান বিশ্বব্যাপ্ত চেতনায় হাত মেলাবে, কিভাবে একই শ্রেণী সমাজের মোটামুটি একই শ্রেণী থেকে বিদ্যাসাগর, হুতোমও আসেন, শশধর, বিনয়কৃষ্ণও আসেন, বিরাট বহুধাভক্ত রবীন্দ্রনাথও আসেন—যিনি, মার্ক্সবাদীর হঠাৎ মনে হ'তে পারে সাভারকরের গুরু, যিনি আবার ব্যাপকভাবে কখনও-বা মার্ক্সবাদীরও ত গুরু। মার্ক্সবাদী এখনও সহিত্যনিষ্ঠার পরিচয় হয়ত দেননি, কবিতা তিনি অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেন, রূপকথার জগৎ তাঁর ছক থেকে বাদ দেন, এবং এক-এক কামানের গানের শ্লোকে জঙ্গীকর্মীকে না-পেয়ে হতাশ হন। নিকৃষ্ট মার্ক্সবাদীরা আবার আলোচনায় নেমে, কটুকাটব্য গালিগালাজকে ভাবেন ডায়ালেক্‌টিক্স, বাক্যের অপব্যাখ্যা করেন, প্রতিপক্ষকে অসম্পূর্ণভাবে বা মিথ্যাভাবেই উদ্ধৃত করেন, বোধের ও জ্ঞানের অভাবকে ঢাকেন অন্ধের আত্মম্ভরিতায়। তবু এই শিকড়ের অন্বেষার চর্চায় সাহিত্যিক লাভ হবে শেষ পর্যন্ত এ-আশা কি করা যায় না? তখন হয়ত আর রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য এবং তাঁর সমগ্র কবিস্বভাব বাদ দিয়ে তাঁর গদ্য মতামতের থেকে ইচ্ছামতো উদ্ধৃতি দিয়ে মার্ক্সবাদী প্রমাণ করতে যাবেন না তিনি কতখানি সাম্প্রদায়িক বা কতখানি ইংরেজভক্ত—বা অন্তপক্ষে, সাম্যবাদের প্রায় পুরোধা। রবীন্দ্রনাথের বিরাট রচনা বলি থেকে অবশ্য সবরকম মতবাদেরই সমর্থন কম বেশি বার করা যায়। কিন্তু সমগ্র কবিসত্তাই কবিবিচারে মূল বিবেচ্য, কবিজনোচিত স্বভাবগুণে কবিদের মত বাদ প্রায়ই অস্পষ্ট থাকে, আরও আমাদের উনিশ-বিশ শতকের সমাজের অস্পষ্ট

গোঁজামিল অবস্থার জন্যে। সে-হাওয়ায়-হাওয়ায় যে-কোন সতত কবি দোদুল্যমান বা গতিশীল হ'তে বাধ্য কবির স্বাভাবিক মতবাদোত্তর মানসের তালেতালে, খানিকটা গয়টের মতো 'ইন্ এ ডব্‌ল্ রিলেশন টু দি জর্মান সোসাইটি অফ হিজ টাইম'—যদিচ, বলা ভালো, রবীন্দ্রনাথ গয়টে নন, বাংলা জর্মানি নয়, এবং রবীন্দ্রনাথের-বাংলার দ্বিধা-সম্পর্ক গয়টে-জর্মানির দ্বিধা-সম্পর্ক নয়, তার তুলনামাত্র। এমনকি, দেখা যায় গদ্য ভাষণের স্পষ্ট মতবাদ থাকে একরকম এবং কবিক্রিয়ার রূপান্তর ঘটনে সৃষ্ট রচনার পুরুষার্থ হ'য়ে ওঠে আপাতবিপরীত। কাব্যে প্রগতিশীল সংসারী নিরাপদ চসর্ ও চাষী বিদ্রোহের প্রতিভূ সাত্ত্বিক কিন্তু মৃতপ্রায় কাব্যের উজ্জীবক ল্যাংল্যাণ্ডের মধ্যে এর একটি প্রকাশ দ্রষ্টব্য। অবশ্য দ্বিতীয় দফায় নিশ্চয়ই কোন সাহিত্যিকের বিচারে তাঁর মতামত, তাঁর প্রকাশ্য মতামত, এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের তথ্যও কাজে লাগে; কিন্তু প্রাথমিক আক্রমণ হওয়া চাই সাহিত্যগত। অবশ্য তার জন্যে প্রাথমিক দরকার সৌন্দর্যের বোধ ও জ্ঞান, যার কথা মার্ক্স বলেছিলেন, 'hence man also creates according to the laws of beauty.' এবং যার জন্যে প্রথম প্রয়োজন বোধশক্তি: 'as music awakens only man's musical sense, and as the finest music has no meaning for an unmusical ear.'

তারপরে আসে সমাজে প্রতিফলনের অন্বেষণ। এখানেও মার্ক্সবাদীর পক্ষে সংক্ষেপ নেই, তাছাড়া এখানেও আপাত-বৈপরীত্যের সম্ভাবনা আছে: 'It is well-known that certain periods of highest development of art stand have no direct connection with the general development of society, nor with the material basis and the skeleton structure of its organisation.'—"A Contribution to the Critique of Political Economy."

অধিকন্তু অনেক সময়ে আমরা ভুলে যাই যে এক সমাজের প্রতিফলন মূলত একই, বিশেষ ক'রে সমাজ-প্রভাব বিশ্লেষণের দিক থেকে, অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজের গোটা প্রতিফলনের ভুক্তভোগী শুধু লর্ড বাইরন বা শেলি নয়, গরিবের ছেলে কীটস্‌ও। বুর্জোয়া সমাজের শ্রমিক-কাব্যও শ্রেণীহীন সমাজের কাব্য নয়, বুর্জোয়া সমাজেরই একটা প্রতিবাদী প্রতিফলন। যার জন্যে এঙ্গেল্‌স্ বলেছিলেন: 'This poetry of past revolution seldom has a revolutionary

impact in later periods, because in order to affect the masses it must also give the mass prejudices of the period.'

একদা মার্ক্সবাদীর মনে হয় 'শেষের কবিতা'কে মূল্যবান্, কারণ তাতে শ্রেণীর দ্বন্দ্বে প্রেম ব্যর্থ অর্থাৎ অমিত রে ব্যারিস্টার উচ্চশ্রেণী এবং লাবণ্য অধ্যাপক-কন্যা নিম্নশ্রেণী, এমনিতর একটা সাহিত্য তথা শ্রেণী-ব্যাখ্যার ভ্রান্তিবিলাস, আবার মার্ক্সবাদীরই লেখায় মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হুতোম দীনবন্ধু মাইকেলের প্রভেদটা সাহিত্যগত নয়, শুধু শ্রেণীগত। দেশজ রীতির লৌকিক যে-চাল কিছুটা হুতোম দীনবন্ধু মাইকেল ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যস্থতায় পেয়েছিলেন, যেটা হয়ত মহর্ষির সংস্কৃত সংসারে রবীন্দ্রনাথ পাননি (৫ নম্বরে অবনীন্দ্রনাথ কিছু পেয়েছিলেন), সে সাহিত্যিক স্বাদশক্তি মার্ক্সবাদীরাও চর্চা করবেন। তখন রবীন্দ্রনাথকে, ধর্ম-বিশ্বাসী ইংরেজি যুগের রবীন্দ্রনাথকেই বাদ না-দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী-দের কনিষ্ঠ কীর্তিমান্ তরুণ সুকান্তর বিচার হবে—বিশেষ ক'রে সুকান্তর পরিণত কিন্তু রাবীন্দ্রিক কবিতাগুলি।

আরাগঁ সে-চর্চার বিফলগামিতার বিরুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন তাঁর কাব্যচর্চার উদাহরণে। তাঁর স্বদেশ-সংক্রান্ত অর্থাৎ কর্মজগৎ-সংলগ্ন কাব্যে আরাগঁ কখনও জনসাধারণ ব'লে কিছু কল্পনা ক'রে 'নেমে' লেখেননি, নিজের আবেগ থেকেই সোজা লিখেছেন, যে-লেখার ভিতে আছে তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর রাজনীতি, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক ধ্যানধারণার দীর্ঘ ও জটিল সাধনা। তাই তিনি সুররেয়ালিস্ট আভাসে-ইঙ্গিতে আইন উড়িয়ে ফ্রান্সের কথা বলেন, তাঁর প্রেমের কথাও। এল্সার কথা, মায়াকভস্কির আত্মীয়া বান্ধবী, নিজে যিনি লেখিকাও স্বামীর মতোই। তাঁর এই প্রেম এবং তাঁর কাব্যকলাকৌশলের ভাবনাচিন্তা যে আক্রান্ত হয়নি, তা নয়। তিনি নিজেই তার জবাব দেন: তার প্রেমের চেয়ে কবির পক্ষে আরও ভালো উপযুক্ত বিষয় আর কী আছে। তিনি বলেন: আশা করি সেদিন আসবে যখন লোকে এই আমাদের রাত্রির দিকে পিছু ফিরে দেখবে এই অগ্নিশিখা। আর কোন্ শিখা আমি জ্বেলে ধরতে পারি যদি-না ধরি আমার ভিতরের এই আলোই? তাই ভবিষ্যতের আর কী ভাবনা, যদি সবচেয়ে বেশি ঘৃণার সময়ে এই শোষিত দেশকে আমি একবারও দেখাতে পারি আমার প্রেমের ভাস্বর মুখখানি?

'ভগ্নহৃদয়' নামক বইতে প্রথম কবিতায় বলেন: হে আমার প্রেয়সী, প্রেয়সী আমার, তুমি শুধু আছ…। পরের বইতে এল্সার চোখের অনুপ্রেরণায় আসে

ক্রবাদুর-শোভন জটিল কুশলী গীতি। অথচ আরাগঁর জগৎ বিশ্বব্যাপ্ত, শুধু ত ফ্রান্স নয়, স্পেনও আরাগঁকে ডাকে, তিনি বিশ্বের রেডিও শোনেন কানে, ক্রুসেডে যান "ওদের" স্থলতান সালাদিনের বিরুদ্ধে। কেবল উপমা উৎপ্রেক্ষা নয়, ইতিহাসের ও সাহিত্যের নানান অনুরূপ অবস্থা ও আবেগের বিন্যাসও আরাগঁর কাব্যের ইমারৎ। রোমিও ফিরে আসে স্বদেশি ফরাসি কাব্যে, হ্যামলেটের পুনরুত্থান বিস্তৃত হয় তাঁর কবিতায়। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড-এর চার্লসের বিষয়ে শ্লেষার্থক একটি কবিতা আরাগঁর নিজেরই কাহিনী ১৯৪০-এ তাঁর তেতাল্লিশ বছরে চার্লসের দশায় ফ্রান্সের দুর্দশায় :

স্বদেশ আমার নৌকা নোঙরহীন
হালে আর তার মাল্লারা কেউ নেই
আমি যেন সেই রাজা অসহায় দীন
দুঃখের চেয়ে দুঃখী ছিল গো যেই
মহা দুঃখের সিংহাসনে আসীন।

কিন্তু তারপরে তাঁর মনে প'ড়ে যায় ভোকুল্যরে জাঁন দার্ককে, জাগে প্রতিরোধের আশা। 'স্বাধীন এলাকা'তে আছে সেই লাইনগুলি যা বহুলক্ষ মুখে হয়েছিল গুঞ্জিত এবং যা জিদকে গভীর নাড়া দিয়েছিল :

প্রেয়সী ছিলাম তোমার আলিঙ্গনে
বাইরে গাইল অস্ফুট গুঞ্জনে
কে এক পুরানো ফরাসি দেশের গান
যন্ত্রণা থেকে খসল ছদ্মবেশ
নগ্ন পদধ্বনির তড়িৎ রেশ
স্পন্দিত করে মৌন হরিতে প্রাণ।

এসে পড়ি আমরা আকিতেনের এলেওনোরের জগতে ক্রবাদুর অঁজুর রাজা গীওমরে মেয়ে, ক্রবাদুরদের কাব্যলক্ষ্মী, সেই রূপসী কবিপ্রেয়সী হ'য়ে ওঠেন জাতীয় গাথার প্রিয়া স্বাধীনতা। বই শেষ হয়—এল্‌সা, আমি তোমাকে ভালোবাসি—এই স্বীকারোক্তিতে।

দ্বিতীয় বইটির আরম্ভ এল্‌সার চোখ নিয়ে, যা কবির কাছে তাঁর পেরু, তাঁর গোলকুণ্ডা, তাঁর হিন্দুস্তান। এই বইতে আছে একান্ত মূল্যবান্ ভূমিকা যাতে আরাগঁ গভীরভাবে কলাকৌশলের আলোচনা করেছেন, আত্মসমর্থন করেছেন মতবাদের বিরুদ্ধে, অজ্ঞান ও বোধহীনতার বিরুদ্ধে। ভূমিকাটি থেকে বোঝা যায়

কেন তাঁর কাব্যের ডায়লেক্‌টিকে ঐতিহ্যের ক্রমাগত কিন্তু তাজা নবরূপায়ণ। ভাষার বিষয়ে তাঁর উক্তিও শ্রোতব্য : ভাষার গভীর পর্যালোচনা এবং প্রতিপদে ভাষার পুনরাবিষ্কার ছাড়া কাব্যচর্চা অচল। এবং তার জন্যে ভাষার স্থির গণ্ডি, ব্যাকরণের নিয়ম, কথনের কানুন ভাঙতে হয়। এইতেই কবিরা স্বাধীনতার পথে এত অগ্রসর হয়েছেন এবং এই স্বাধীনতাতেই সম্ভব হয়েছে আমার পক্ষে যথাযথ হবার চেষ্টা করা, এই খুবই বাস্তব স্বাধীনতায়।

আরাগঁর নতুন 'ভগ্নহৃদয়' নামক বইটির উল্লেখে কবিবিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ করি। পরিণতির প্রক্রিয়া এই শেষ বইটিতেও স্পষ্ট, হয়ত এতে টেক্‌নিক্‌ বা আবেগবস্তুর দিক থেকে চমকপ্রদ কিছু নেই, সেদিক থেকে হয়ত এ-বই চংক্রমণ খানিকটা। হয়ত বিদেশি ফাসিস্তকে প্রতিরোধের যে-আবেগ আরাগঁকে ও ফ্রান্সের বেশিরভাগ লোককে নাড়া দিয়েছিল, সে-আবেগের রূপ ও মাত্রা ফ্রান্সের বর্তমানে ঘরোয়া দৈনন্দিন চেষ্টার অবস্থায়, অন্তর্বিরোধের সাধারণ্যে সম্ভব নয়, কবি ও জনসাধারণ বোধহয় সে-ভাবে ও উন্মাদনায় আজকে একসূত্রে গ্রথিত নন। কিন্তু তাই ব'লে হুকুমজারি ক'রে লাভ নেই, লাভ নেই এক কবির কাছে আরেক কবির রচনারীতি দাবি করায়, কারণ কবিতা ব্যক্তির সত্তাসাপেক্ষ, যন্ত্র-পণ্য নয়, তাই ত মার্ক্সকে বলতে হয়েছিল : 'My property is form, it is my spiritual individuality. The style is the man.' প্রতিবাদ ক'রে বলতে হয়েছিল : 'You admire the delightful variety, the inexhaustible wealth of nature. You do not demand that a rose should have the same scent as a violet but the richest of all, the spirit, is to be allowed to exist in only one form ?'

বহুকর্মী আরাগঁর কাব্যপ্রশস্তি শেষ করি অন্যতম ফরাসি কবি এলুয়ারের ভাষণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি ক'রে। 'স-সোয়ার' নামক সান্ধ্যপত্রে ধর্মঘটী খনিকর্মীদের উপরে সেনেগালি শান্ত্রীদের অত্যাচারের প্রতিবাদের জন্যে পরিচালক আরাগঁ দণ্ডিত হন ব'লে তাঁর বন্ধুরা গত ৮ই অক্টোবর এই সভা ডাকেন, এলুয়ারের লেখাটি সেই সভার জন্যে লেখা : "সেই সব কবি যাঁদের আমি চিনি : আমার বন্ধু আরাগঁর মধ্যে মানুষ জানতে পেল আত্মপ্রকাশ" :

তাদের সীমার মধ্যে
এবং তাদের সীমার বাইরে
তাদের গণ্ডির মধ্যে

আর তাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে
গণ্ডি কথাটা একচোখো কথা
মানুষের ত দুই চোখ সারা বিশ্বে খোলা

যত কবি আমি জেনেছি সবার মধ্যে আরাগঁই সেই কবি যার আছে সবচেয়ে ন্যায়শক্তি—দানবের বিরুদ্ধে যাবার ন্যায়শক্তি—এবং একদা আমার বিপক্ষেও। তিনি আমার কাছে উদ্ঘাটিত করেছিলেন সত্যের পথ, আজ আবার তিনি উদ্ঘাটিত করলেন সবার কাছেই যারা বোঝে না যে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই নিজেদেরই জীবনের লড়াই, আশায় প্রস্ফুট জীবনের জন্যে, বিশ্বের প্রতি ভালোবাসার জন্যে।

পিকাসো

পল এলুয়ারের 'অ পাব্‌লো পিকাসো' বইটি বিস্ময় ও পরিতৃপ্ত দুই-ই জোগায়। "মহাশিল্পীদের উপরে তাঁদের বন্ধুদের লেখা" নামক গ্রন্থমালার প্রথম বই এটি, অজস্র ছবির সঙ্গে মিলেছে গদ্যসমালোচনা এবং অজস্র কবিতা। কবিতার কিছু সাক্ষাৎভাবে বা দূরত পিকাসোর চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিছু-বা পিকাসোরই উদ্দেশে। কবি হিসাবে এলুয়ারের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ভালেরি পর্যন্ত ফরাসি কাব্যের যে কঠিন প্রতীকী কৈলাস-সংহতি তা এঁরই কাব্যে হ'য়ে উঠেছে পাহাড়ের নদীর মুক্ত গান। পিকাসোর বিষয়ে এলুয়ারের শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শন অন্যত্রও মেলে। 'বিরামহীন কাব্য' নামক পুস্তকে একটি দীর্ঘ কবিতা পিকাসোর উপরে লেখা। সে-শ্রদ্ধার প্রকাশ: ডিমের শাদা ও হলদে পর্দার উপর স্বচ্ছ নীলের আভা, তারই উপরে ঋজু কালো রেখা—চিত্রের এই প্রত্যক্ষ থেকে কবিতাটির আরম্ভ। সে-স্বর ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে চতুর্থ ভাগে পৌঁছে—কল্পবিম্বে বা ইমেজেই ত সব শুরু, ইমেজেই ঐক্য; কত-না উষা মেলে তাই এক মহাদিনে যখন বাসনাসাধ সব পেলব, মধুর ও প্রবল, কোমল রক্তায়মান ঘাসে কান্তের মতো; তাই সাধ হয় আজ একযোগে খাওয়াদাওয়া করার কিংবা খেলার, হাসার, তাই সাধ হয় আজ ইউ-আর-এস-এস-এ যাবার কিংবা হৃদয় মেলে দিতে দয়িতার বুকে, কর্মের শক্তিতে আর প্রবল আশায় চুম্বনতলে বদ্ধমুষ্টির আঁটির মতো।

পিকাসোর উপরে এলুয়ারের গদ্য আলোচনা শিল্পবোধে এতই সাহায্য করে যে নিচে তা দেওয়া হ'ল:

"পিকাসোর রচনাবলি আমায় অন্তহীন আনন্দ দেয়, সেই শিল্পসৃষ্টির বেদী থেকে আহ্বান জানাই আমার আনন্দের অংশীদারদের, এই শিল্পের প্রত্যয় এবং রূপ থেকে দেখাতে চাই যে মানুষ মানুষকে কী আস্থা এনে দিয়েছে।

"আমায় যা বাঁচতে সাহায্য করেছে, যা সৎ তারই কথা বলছি, যারা নিজেদের হারাতে চায় ভুলতে চায় শূন্যের ভালোবাসায়, যারা তাদের জীবনের নানা প্রয়োজন রুচি-অভিরুচি বৈরাগ্যে বাদ দিয়েই চলে, যারা তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রা অর্থাৎ জীবনকেই নিয়ে চলে তাদের মৃত্যুর বীভৎস পরিণতিতে, তাদের একজনা আমি নই। আমি কখনও এই বিশ্বজগৎকে শুধু বুদ্ধির ছকে আয়ত্ত করতে

যাইনি ; আমার জীবনবেদে যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রকৃত, উপযোগী সবারই স্থান, কারণ ঐ-সব থেকেই আমার অস্তিত্বের মূল। মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব তার স্বকীয় সত্তাতেই। মানুষের এ-সত্য মনে রাখা দরকার। না-হ'লে, তার বেঁচে থাকা অন্যের পক্ষে হয় মৃতেরই সামিল, পাথরের মতো, গোবরের ঢিপির মতো।

"যে মহাপুরুষরা তাঁদের জীবনে চরম সার্থকতা এনেছেন, যাঁরা এই মর্ত্যলোক দিয়েই তাঁদের কাল কাটিয়ে যান হয়ত-বা তার স্পর্শ আপাতভাবে না-মেখেই, পাব্‌লো পিকাসো তাঁদেরই একজন। বিশ্বের কাছে আত্মদান ক'রে অসমসাহসী তিনি বিশ্বকে খাড়া করলেন নিজেরই বিরুদ্ধে, তিনি যে হারবেন না, নিজের বৃহত্তর বিকাশই যে এর ফল হবে তার নিশ্চিত জ্ঞানে। 'নীল যদি না-পাই তাহ'লে লালেই চালাই'—কথাটা তাঁরই। একটি সরল রেখা বা বঙ্কিমার জায়গায় তিনি উন্মোচিত করেছেন হাজার রেখা, যারা নিজেদের সংহতিতে ফিরে পায় তাদের একতা, তাদের সত্য। বস্তুসত্তা বা বিষয়ের সত্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা উড়িয়ে দিয়ে তিনি আবার যোগ স্থাপন করেছেন বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে, বস্তু ও দ্রষ্টার মধ্যে অর্থাৎ বস্তুদর্শনের ফলে যে চিন্তা বা মনন করে তারই মধ্যে। তিনি আমাদের ফিরিয়ে দিলেন (চূড়ান্ত দুঃসাহসে, বিরাট মহত্ত্বে) মানুষ ও বিশ্বের অভিন্ন অস্তিত্বের প্রমাণ।

"যাঁরা পিকাসোর প্রগতির এ চরম মাত্রা বোঝেন না, তাঁদের কাছে আমরা নিবেদন জানাই এই :

"সাধারণত, চিন্তা বা ন্যায়-জগতে বস্তু বা বিষয় ও তাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা হয়; বস্তু থেকে আহরিত হয় প্রত্যক্ষ আইডিয়া ভাব বা অভিজ্ঞা, এবং সম্বন্ধনির্ণয়ে আসে পরোক্ষ আইডিয়া আর তজ্জন্য যেতে হয় বিষয়ী থেকে বিষয়ে। এই বিষয়ী থেকে বিষয়, কর্তা থেকে বস্তুতে যাবার পথে পাথেয় হচ্ছে খানিকটা সহানুভূতি বা অনুরাগ কিংবা বিরূপতা বা বিরাগ, অর্থাৎ পুরুষার্থঘটিত ধ্যান-ধারণা। এরই জন্য জন্তু, শিশু, বন্য পশু, পাগল, কবিরা ভুল ক'রে বসেন অর্থাৎ অতিসরল প্রমাণ বা অনুরোধে আটকা পড়েন। তখন কাঁচের টুকরো প্রতীয়মাণ হয় ঘূর্ণাবর্ত কিংবা ফাঁদ, আগুন মনে হয় মাণিক্য, চাঁদ নারী, বোতল অস্ত্র, ছবি জানালা। এ-ভুল প্রায়ই হয় যখন তাঁরা সম্বন্ধপাত করেন বিরাগ বা দ্বেষে, সমরাগে সম্বন্ধক্ষেপে প্রায়ই সম্বন্ধের সত্যারোপে সাহায্য হয়। তখন এঁরা, একই সঙ্গে বলা যায়, এই তুলনাবৃত্তির কর্তা ও ক্রীতদাস, জীবন তখন পরিণত হয় প্রেয় ও অপ্রেয়, হাঁ বা না-য়, তাঁদের নিজেদের পক্ষে আর বন্ধুবান্ধবের পক্ষেও। এ পঙ্কল অবস্থা

থেকে কেউ আত্ম-উদ্ধার করেন আরেক পল্বলে : ঘরপোষা জন্তু, বয়ঃসন্ধির শিশুরা, সভ্যতার প্রান্তগত আদিবাসী আরণ্যক, আরোগ্যের মুখে উন্মাদ, আত্মভোলা কবিরা। কেবল কয়েকটি কবিই এই করুণ দ্বৈত অতিক্রম করতে পারেন, তাঁদের স্বকীয়তা প্রসারে সক্ষম হন, মানবহৃদয়কে রূপান্তরিত করতে পারেন সম্পূর্ণ নগ্ন প্রকাশের মধ্যেই—কবিপ্রজ্ঞায় কাব্যন্যায়ে।

"চিত্রশিল্পীদেরও কপালদোষে শিল্পোপায়ের দাসত্ব করতে হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশই নিজেদের হাত-পা বেঁধে শুধু বিশ্বজগতের নকল করেন। নিজেদের ছবি আঁকতে হ'লেও তাঁরা আয়নায় ছায়া দেখতে-দেখতে আঁকেন, ভুলে যান যে দর্পণ তাঁদেরই মধ্যে। কিন্তু বহির্বিশ্বকে বাহ্যবস্তু ভেবে তাঁরা ভুল করেন। আপেল নকল করতে গিয়ে ইন্দ্রিয়সংবেদ্য বস্তুসত্তাকে দারুণ দুর্বল ক'রে তোলেন। কে একজন একবার আপেলের ভালো নকল দেখে বলেছিল, 'ওটা খাওয়া যায়'। কিন্তু এ-ধারণা আসলে পরীক্ষা কেউই করে না। যত বেচারা স্টিল লাইফ্, যত বেচারা ল্যাণ্ডস্কেপ, ব্যর্থ রূপমূর্তি সব ভিড় করেছে এই বিশ্বে যেখানে সব কিছুই বাঁধন খোঁজে মানুষের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, তার মানসে, চিত্তে। প্রকৃতপক্ষে যা আবশ্যিক তা হ'ল সাযুজ্যকরণ, আন্দোলন, বোধনা। পিকাসো পার হ'য়ে গেলেন সর্ব রসধারা, কি অনুরাগ, কি বিরাগ—দুই প্রায় এক, দুই-ই গতির প্রতিকূল, প্রগতির পরিপন্থী ; পিকাসো সম্পূর্ণভাবে চেষ্টা করলেন—এবং সার্থকতা লাভ করলেন—প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সম্বন্ধের হাজার জট মোচনে। তিনি সেই সত্তাকে করেছেন আক্রান্ত, যাকে সচরাচর বলা হয় অগোচর অথবা, যদিচ যে শুধু-মাত্র অনির্দিষ্ট। তিনি একে চেপে বসেননি, কারণ এ-সত্তা ত তাঁরই, যেমন তাঁর ঘাড়ে ভর করেছে এই সত্তা। এ এক উপস্থিতি, উভয়ত এর আবির্ভাব অবিচ্ছেদ্য।

"আঁধার কোটরে দীপ্ত কামরায় শতাব্দী-শতাব্দী ভুলের পরে অযৌক্তিকতা এবার পিকাসোর কিউবিক্ নামে অপখ্যাত চিত্রাবলিতে প্রথম যুক্তিসহ পদক্ষেপ করল এবং এই পদক্ষেপেই তার চরম ইতিমূলক যুক্তি।

"পিকাসো ফেটিশ্ (দ্রব্যগুণারোপিত বস্তু) সৃষ্টি করেছেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু এই ফেটিশ্গুলি নিজস্ব জীবনে প্রাণময়। তারা শুধুমাত্র মধ্যবর্তী রক্ষাকবচের ইঙ্গিত নয়, তারা গতির লয়চিহ্নও বটে। এই গতিতেই তারা পায় প্রত্যক্ষতা। এই সমস্ত চিত্রের মানুষগুলি থেকে, জ্যামিতিক প্রতিমা, তন্ত্রমন্ত্রের সঙ্কেত থেকে নির্বিশেষ মানুষ, নারী, মূর্তি, টেবিল গীটার হ'য়ে ওঠে আগের চেয়ে বেশি চেনাশোনা, কারণ তারা হ'য়ে উঠেছে বেশি বোধ্য, মানসে তথা ইন্দ্রিয়ে বেশি সংবেদ্য। যাকে বলা

হয় ডিজাইনের বা পরিকল্পনার যাদু বা ম্যাজিক, এই রঙের ইন্দ্রজাল আমাদের পারিপার্শিক জগৎকে এবং আমাদেরও আবার পুষ্টিদান করতে থাকে।

"কে যেন বলেছিল যে বস্তু ও তাদের সম্বন্ধ নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্ববীক্ষণ করার ভার আমাদের উপর ন্যস্ত নয়। বলা দরকার যে এ-ভার জীবনেরই ভার, যারা এরই মধ্যে মৃত্যুর বীজ নিজেদের মধ্যে বহন করছে, যারা এরই মধ্যে দেয়ালে বা শূন্যে মুখ ঢেকেছে তাদের ধরনে নয়, কিন্তু বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতায়, চলিষ্ণু বিশ্বের সঙ্গে, সম্ভবের প্রতিক্রিয়াতে। চিন্তা বা যুক্তি যেহেতু শুধু সন্ধানী এজেন্ট বা প্রতিফলক মাত্র হ'তে চায় না, বরঞ্চ উদ্দেশক শক্তি বা পরিচালকেই, কৈলাসপতি রূপেই, বিশ্বজনীন কার্যকারণে তার সংজ্ঞা, সেহেতু বস্তুদের সম্বন্ধগুলি হ'য়ে ওঠে অন্তহীন।

"পিকাসোর অন্বিষ্ট সত্যই। তবে যে অপরা যাথার্থ্য গালাটেয়া-কে প্রাণহীন মূর্তিতে পরিণত করে, তা নয়, সেই অখণ্ড সত্য যাতে কল্পনা মিলিত হয় প্রাকৃত বিশ্বে, যার বিবেচনায় সব-কিছুই বাস্তব এবং যা বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, নির্বিশেষ থেকে বিশেষে অবিশ্রাম যাতায়াতে অস্তিত্বের, পরিবর্তনের সবরকমের অঙ্গীকার পায়—যদি তারা নতুন হয়, বীজবন্ত হয়।

"জটিলতাতেই বস্তু তার অবর্ণনীয়তা অতিক্রম করে। পিকাসো জানেন যে কি-ভাবে সরলতম বস্তু আঁকলে সে-ছবির সামনে যে-কোন লোকেই বর্ণনে সক্ষম, শুধু সক্ষম নয় ইচ্ছুক হ'য়ে ওঠে। শিল্পীর পক্ষে, তথা একেবারে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ ফর্ম বা রূপ বা পরোক্ষ রূপ ব'লে কিছু নেই। শুধু আছে দ্রষ্টা আর দৃশ্যের মধ্যে সংযোগ, বোধের প্রয়াস, সম্বন্ধপাতের চেষ্টা, মাঝে-মাঝে-বা নির্বন্ধ, সৃষ্টি। দেখা মানেই বোঝা, বিচার করা, রূপান্তর করা, কল্পনা করা বা বর্জিত হওয়া, ইতি বা নেতিতে নিঃশেষ হওয়া।

"পিকাসোর বিখ্যাত ছবি 'লা ফাম্ আঁ শেমিস্' মনে আসছে। কুড়ি বছরের চেনা কবি, সব সময়েই একাধারে এত প্রারম্ভিক অথচ এত অসাধারণ। তার আর্ম চেয়ারের মধ্যে মেয়েটির প্রকাণ্ড ভাস্কর্যময় ভার, স্ফিংকসের মতো ঝাঁকালো মাথাটা, বক্ষদেশে পেরেক আটকানো স্তনদুটি, সবই বিচিত্র বৈলক্ষণ্যে সমাহিত—এবং এ বিবাদী সাম্য মিশরী বা গ্রীক বা কোন পিকাসো-পূর্ব শিল্পীরই সৃষ্টি করা সাধ্য ছিল না—তনুলক্ষণময় মুখখানিতে, চুলের তরঙ্গে, চারু বাহুমূলে, বিসৃত হাতে শেমিজের কুয়াশায়, মসৃণ আরাম কেদারায় দৈনিক সংবাদপত্রে।

" 'মা জলি'—ছবিটি ভাবছি, লেওনার্দো দা ভিঞ্চির উক্তি যাতে সব প্রথমে

জলজলে প্রমাণ পেয়েছে : ভাস্বর শরীরে সব দিকে ছড়ানো প্রদীপ্ত দক্ষিণ বেয়ে স্পেস্ বা শূন্যসন্ততি উঠেছে পিরামিডে এবং উঠেছে এমনই তীব্র কোণের আকারে-আকারে যে তাদের আরম্ভবিন্দুর থেকেও তাদের সুদূরতর মনে হয়।

" 'মা জলি'র কথা ভাবি। সচরাচর যা দৃশ্য, যা জানা তার চেয়ে কত সহজ রং। রংগুলি শূন্যের আকাশে আছড়ে পড়ে না, রংই হ'য়ে ওঠে স্পেস্, ছবির সীমান্তে আবদ্ধ, যেন, ধোঁয়ার স্তম্ভ পাকে-পাকে সারা ঘর ছেয়ে দিলে ; অসীম এবং বৈশেষিক। কিছুই আমাকে আটকায় না, না ছবির সীমারেখা, না ঘরের সীমানা, সারা বিশ্বই ত এই যা রচনা করে নিজেকে, গলিয়ে দেয় নিজেকে, আবার করে রচনা। হে অস্পষ্ট কিন্তু আবশ্যিক স্মৃতি, আমি জানি যে, বাইরে, ঐ রাত্রি ছড়ায়, ঐ অদৃশ্য এক দল, কি কি রূপাকার সে ঢেকে ফেলে, এ-সবই আমার মধ্যে যতই তুচ্ছ হোক্, যতই এলোমেলো। আমি দেখেছি, পিকাসো তাঁর পাললিক গিরিখাত (গাং) থেকে এনে দিয়েছেন কেলাসিত শিলা (ক্রস্টাল)।

"আঁদ্রে ব্রেতঁ 'সুররেয়ালিজম ও চিত্রকলা' পুস্তকে বলেছিলেন, পিকাসোর চিত্রে সঙ্কল্পশক্তির শ্রান্তিতেই বুঝি আনন্দ আসে বিলম্বিতে, যদি আসে। নিশ্চয়ই, কারণ পিকাসোর হাতে যে-বস্তুসত্তার ঘরে চরম প্রশ্নের অতি সুকুমার চাবি। তাঁর সমস্যা হ'ল দ্রষ্টাকেই দেখা, দৃষ্টিকে মুক্তিদান, দিব্যদৃষ্টি অর্জন করা। অর্জন তিনি করেছেন।

"ভাষা একটি সামাজিক ব্যাপার। এ কি আশা করা যায় না যে একদিন ডিজাইন বা রূপায়ণও ভাষার মতো, অক্ষরলিপির মতো সামাজিক সত্য হ'য়ে উঠবে, নির্বিশেষ হ'য়ে উঠবে ? সব মানুষই ত পরস্পরকে জ্ঞাপন করে বস্তুর আলোকন দ্বারা এবং এই বস্তু-দর্শনে সেই চরম কথা বলা যায় যে তাদের সবার মধ্যে বিস্তৃত, যা বস্তুতে সাধারণ্য পায়, যা বস্তুতে তাঁদের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত। সেইদিনই বাস্তব সৎ দৃষ্টি বিশ্বকে অখণ্ডতা দেবে মানুষের যোগে, অর্থাৎ মানুষকে বিশ্বের।"

ক্যালকাটা গ্রুপ

আমাদের ক্ষীণ শিল্পসংস্কৃতির জগতে এবারের, ১৩৫৫ সালের শীতকালের, এই শিল্প-প্রদর্শনটি একটি প্রাণময় ঘটনা। কলকাতা গোষ্ঠির শিল্পোৎকর্ষ বিষয়ে নতুন ক'রে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই, সম্যক্ আলোচনার জায়গাও এখানে হবে না। যামিনী রায়ের কীর্তির পরে এঁরা এবং এঁদের সহকর্মীরা ভারতশিল্পের আশা। সম্প্রতি শীলা অডেনের প্রদর্শনী দেখেও এই আশা সবল হোক্। বোম্বাইয়ের চিত্তপ্রসাদের কাজও আশা করি আমরা দেখতে পাব। কলকাতা গোষ্ঠিরই এ-বিষয়ে সংগঠনে অগ্রণী হওয়া চাই। কারণ প্রদর্শনী সংগঠন করতে হ'লে যে-রুচি ও কর্মক্ষমতা প্রয়োজন, তা যে এঁদের আছে, এবারে তাঁরা তার প্রমাণ দিয়েছেন।

বস্তুত, কলকাতা গোষ্ঠির প্রদর্শনী আমাদের পক্ষে একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। এ-রকম আলো ও দেয়ালের ব্যবহার, এ-রকম ছবি টাঙানোর বিন্যাস—সেই একটা রুচির শিক্ষা ও আনন্দের উৎস।

তাছাড়া, ব্যক্তিগত শিল্পী হিসাবে তাঁদের যে সজীব প্রতিরোধতীব্র টেক্‌নিকের বিস্তার ও জীবনাভিজ্ঞতা আমাদের পূর্বপরিচিত সে-সব গুণাবলি এবারেও দ্রষ্টব্য। গোপাল ঘোষের রঙের ছবির আকার-বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিতোষ সেন মনে হয় তাঁর দ্রুতরেখার চাপল্য এবং উজ্জ্বল রঙের আপতিক দীপ্তির দ্বিধা প্রায় কাটিয়ে উঠলেন স্বকীয় রূপায়ণের মর্যাদায়। প্রাণকৃষ্ণ পাল তাঁর মাডোনায়, স্টিল লাইফে, ঘোড়দৌড়ে, সর্বোপরি তাঁর তৈলচিত্র চুম্বনে তাঁর সুকুমার ও শমিত প্রতিভার বিকাশ দেখিয়েছেন গভীরতর পারম্পর্য অন্বেষণে। অবনী সেনের ছবিগুলিতে রুচির অনিশ্চয়তা থাকলেও তাঁর রঙের জৌলস ও মোটা ফর্মের সন্ধান সম্ভাবনাময়। রথীন্দ্র মৈত্র হয়ত গত বছরের তুলনায় বিস্ময়কর কিছু দেননি, কিন্তু তাঁর বিন্যাসের বৈচিত্র্য এবারেও স্পষ্ট: কাশ্মীরের দুঃখ ও নমাজ থেকে রাস্তার কাক, আর লৌকিক শিল্পের বর্তুলে-বর্তুলে চটকদার মুরগী-পরিবারে অবধি। প্রদোষ দাশগুপ্তের পাকা ভাস্করের হাত ও মনন অল্প যে ক'টি কাজ তিনি দিয়েছেন, তাতেই স্বপ্রমাণিত। কমলা দাশগুপ্তের সমাহিত নৈপুণ্যে মুগ্ধ দর্শক তাঁর হাতের কাজ আরও দেখবার দাবি করে। নীরোদ মজুমদারের কাজ প্রবাস-

জনিত কারণে এবারে অনুপস্থিত। তাঁর সবল ছবির অভাব স্পষ্টই বোধ করলুম।

এই ক'জন শিল্পী যে আমাদের গলিত ভদ্রলোকসমাজের এবং তার জীর্ণ শিল্প-ধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আভিযান চালিয়েছেন, সে-স্বীকৃতি আমাদের প্রগতি-বাদীরা নিশ্চয়ই তাঁদের দেবেন, কারণ প্রতিরোধের দ্বন্দ্বাত্মক আন্দোলনেই এ-শিল্পশুদ্ধির উৎস ও বিকাশ। অন্ধ ও কুরুচিজীর্ণ, দুর্বল রং ও রেখা ব্যবহারে বা মডেলিঙে যে প্রত্যক্ষের সংঘাত বা যন্ত্রণা থেকে পলায়ন, সে শিক্ষাবিরোধী এবং নিশ্চেষ্ট গতানুগতিকতা বা অ্যাবস্ট্রাকৃশন বা পরোক্ষতা এবং অন্যপক্ষে সজাগ সংবেদ্য চোখের মনের দ্বন্দ্বময় আততিতে যে তথাকথিত অ্যাবস্ট্রাক্ট বা কৈলাস রূপায়ণ এ-দুইকে একমূল্য দেওয়া পেতি বুর্জোয়া মনেরই প্রগতিছদ্মবেশ। সেদিক থেকে প্রগতি বা এমনকি মার্ক্সবাদের নামাবলি পরিহিত সমালোচকেরও কটু সমালোচনা শিল্পীদের গায়ে মাখার দরকার নেই। এই প্রসঙ্গে প্রবীণ মার্ক্সবাদী শিল্পী ও সমালোচক জুর্দ্যার কথা স্মরণীয়। কমরেড জুর্দ্যা বলছেন:

"এটা সেই ছোটো সমস্যাটারই সঙ্গে জড়িত, যেটা মঁ ব্লাঁ (দার্শনিক, সমালোচক এবং 'লা পঁসে'র সম্পাদক) ও আমি ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছি। আমরা অনেক বিষয়ে, বিশেষ ক'রে শিল্পের সামাজিক উৎসের বিষয়ে জ্ঞানসন্ধানের স্বল্পতা সম্বন্ধে একমত। যে-রিসার্চে শিল্পী ও তার পারিপার্শ্বিক, শিল্পরচনাটি এবং তার ধারণা ও উপলব্ধির কার্যকারণাবলি, সিম্ফনি বা কবিতা বা মূর্তি বা ছবিটি এবং তাদের অবস্থানিচয়ের মধ্যে সম্বন্ধপাত অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায়, সে-বিষয়ে রিসার্চ অল্পই হয়েছে। কার্যকারণের বা হেতু ও ফলের সম্বন্ধ, বিশেষ কোন এক ক্ষেত্রে নির্ণয় করা আমার মতে বড়োই সূক্ষ্ম জটিল ব্যাপার। হেতুগুলি প্রায়ই এত মধ্যস্থতাসূচক (মেডিয়েট্স্) এবং কার্যফল এত বেশি অপ্রত্যাশিত হয় যে সততাসম্পন্ন কোন পরীক্ষকের পক্ষে সরলতাবাদী এবং অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যায় সন্তোষ প্রচার করা সম্ভব নয়। ঐ-রকম ব্যাখ্যা মিষ্টিক্ বা অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসের পক্ষে যথেষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমালোচনার তা অন্তরায়, ভিত্তির অখণ্ডতার বিষয়ে এ-মত নিজেই অনিশ্চিত, কাজেই তা বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় অকাট্য প্রমাণ হিসাবে অব্যবহার্য। এই দুর্বলতা থেকেই থীসিস্ আসে: সেজান্ বুর্জোয়া, অতএব তাঁর শিল্প একান্তই বুর্জোয়া, তাঁর শিল্পরচনা বুর্জোয়াসির লালা-ক্ষরণ, বুর্জোয়া মানসের একটি প্রত্যঙ্গের প্রতিবিম্বমাত্র। আমার মনে হয় এই থীসিস্ কোন বিবেকসম্পন্ন বিশ্লেষণে আসছে না, আসছে বরং কিঞ্চিৎ মতবাদ-লাগানো এক এপ্রায়োরিজম থেকেই, যার আশ্চর্য মিল অদৃষ্টবাদ গ্রহণের সঙ্গে

(ফাতালিতে)। এ-মত থেকে কি ন্যায়সঙ্গত তত্ত্ব দাঁড়ায় না এই যে মানুষ ইতিহাস করে না, শুধু ইতিহাস তৈরি ক'রে দেয় মানুষ? যদি কেউ বলে সেজান্ যেহেতু বুর্জোয়া সেইহেতু বুর্জোয়াশ্রেণী প্রত্যাশিত শিল্প থেকে চূড়ান্তরকম ভিন্ন শিল্পসৃষ্টিতে অপারগ, তাহ'লে সে একই ঘায়ে মার্ক্স যে বুর্জোয়া চিন্তার লৌহবন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করতে পারতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রচার ক'রে বসে। মার্ক্সের চিন্তা কোনমতেই বুর্জোয়া নয়। সেজানের ছবি নয়।' ('লা পঁসে', ২১ সংখ্যা।)

তাই ত সেজানের ঘরোয়া ছবি, আপেলগুলি অনেক বেশি প্রগতির বাহক, সমসাময়িক অনেক তথাকথিত রিয়ালিস্টিক ও জনপ্রিয় শিল্পীর চেয়ে, যাদের জুর্দ্যাঁ বলেছেন কেক্‌বানানোওয়ালা।

কলকাতা গোষ্ঠির কাছে এবারে যে-আবেদন আমরা জানাতে পারি সে হচ্ছে যে তাঁরা সন্ধানের যে-স্তরে পৌঁছেছেন সেখানে তাঁরা যেন এখন ব্যক্তিস্বরূপের গভীরতায় জারিত কালঘন গভীরতার দিকে আরও বেশি মন দেন। সেটা সম্ভব হবে যখন তাঁরা চিত্রের উপরস্বকের সমস্যা থেকে সমগ্রতর সমস্যায় মন দেবেন, যখন প্রত্যক্ষ বহির্বিশ্ব, বস্তুজগৎ বা সমাজ তাঁদের চোখ থেকে মানস অবধি আক্রান্ত করবে এবং সেই দ্বন্দ্বকেই যখন তাঁরা আহ্বান ক'রে স্বকীয় চৈতন্যের ও রূপায়ণের গভীরতায় জারিত করবেন। দর্শকের চাই ধৈর্য, বৈপ্লবিক ধৈর্য, কিন্তু শিল্পীরাও যেন সাধনার ধৈর্যভঙ্গ ক'রে শুধু প্রদর্শনীর চমকে আমাদের দৈন্য দূর করার কাজে স্ববিকাশ রোধ ক'রে থমকে না-থাকেন।

সোভিয়েট শিল্পপ্রদর্শনী

আমাদের বিড়ম্বিত শিল্পচর্চার জীবনে এই বিরাট প্রদর্শনী এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ছবি যখন টাঙানো হচ্ছে – এবং সে-প্রস্তুতির ব্যাপারটাও যে বীরত্বপূর্ণ সে-কথা প্রবীণ জামশকিন ও রুশ শিল্পীদের কাজ যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই জানেন— তখন যামিনী রায় বলেছিলেন যে, রাজা ইংরেজ দুশো বছর রাজত্ব করল, ব্যবসা করল, আর্ট স্কুল করল, প্রথমে ইংরিজি ছবি আঁকা শেখালো, তারপরে নিরাপত্তা বিবেচনা ক'রে ওরিয়েন্টাল আর্ট শেখালো, কিন্তু কোনদিন নিজের দেশের শিল্পসম্ভার একবার এনে দেখালো না, বরঞ্চ এ-দেশ থেকে ও-দেশে নিয়ে গেল। আর, সোভিয়েট লোকেরা রাজত্ব করে না, কিন্তু গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের সবাইকে শিল্পের ঐশ্বর্য ব'য়ে এনে দেখালো, আমরা নিজের চোখে দেখলুম পশ্চিম দেশের রিয়ালিজম কী ব্যাপার। বুঝলুম কী রীতিতে, কী সাধনায়, কী ঐতিহ্যে ও সামাজিক জীবনের বাস্তবপটে রিয়ালিস্টিক বা প্রত্যক্ষবাদী শিল্পের প্রাণ।

সোভিয়েট শিল্পপ্রদর্শনী যে আমাদের প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে, তার প্রমাণ দর্শকদের সংখ্যাগৌরবে, সাধারণ নিরহংকার মানুষের স্বতোৎসারী প্রশংসায়, তথাকথিত বিশেষজ্ঞের ও অর্ধবিশেষজ্ঞের উল্টোপাল্টা নানা কথায়, আলংকারিক শিল্পীদের নানান হতচকিত মন্তব্যে, যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও অতুল বসুর মতো অকাডেমিক শিল্পীদের তারিফে। তার উপরে প্রমাণ হ'ল আরেকটি ব্যাপারে: যামিনী রায়ের মতো শুদ্ধ শিল্পীর নামে রুশবিদ্বেষী এক কল্পিত বিবৃতি এক দৈনিক পত্রে শিল্পজগতের কোন-কোন মুরুব্বি মার্কিনি কায়দায় ছেপে দিলেন, যার সংশোধন যামিনী রায় পাঠালেও ছাপা হ'ল না।

বলাই বাহুল্য, প্রদর্শনীটি এত বড়ো হ'লেও সোভিয়েট মহাদেশের মতো মহান্ ও মুক্তদেশের পক্ষে এ একটা বাছাই করা সংক্ষিপ্ত প্রদর্শনীমাত্র। মোটামুটিভাবে যা আনা সুবিধা হয়েছে সেই প্রথাসিদ্ধ ও আপাতবোধ্য ছবি ও মূর্তিরই এটি একটি পরিচয়। উদাহরণত, বলা যায় যে আইকন চিত্র এতে ছিল না, কারণ গির্জা তুলে আনা অঘটন-ঘটনপটীয়সী সোভিয়েট শক্তিতেও সম্ভব হয়নি, যদিচ সে-বিষয়ে আমাদের এক আইকনগ্রাফমতি সমালোচক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন!

অনেক শিল্পীরই কাজই আনা সম্ভব হয়নি, কারণ শিল্পীরা সে জীবন্ত সমাজে

সার্থক ও সম্মানিত এবং সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে বহু। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে নিকিটিন, আন্ট্রাপভ, লোসেঙ্কো, বোকোটভ, লেভিট্‌স্কি থেকে একালের নব্য শিল্পী অবধি শিল্পকার্য কিছু দেখা যায় নবপ্রকাশিত ট্রেটিয়াকভ গ্যালারির প্রকাণ্ড চিত্রপুস্তকটিতে। তাতে বোঝা যায়, বুর্জোয়া রিয়ালিজমের কী বিকাশ রুশ শিল্পে ঘটেছিল এবং বিপ্লবোত্তর কী রূপান্তর ঘটল সেই প্রবল বাস্তব ঐতিহ্যে। ইতালিতে বুর্জোয়া রেনেসাঁসে, ওলন্দাজ বুর্জোয়া জাগরণে, জর্মান মধ্যবিত্ত উত্থানে এমনকি ফ্রান্সের বুর্জোয়া নবজীবনে—দাভিদ্ দলাক্রোয়া এমনকি বার্বিজঁ অবধি—রিয়ালিজমের যে-শোভা তারই একটা দিক সাবেক রুশ শিল্পে উজ্জ্বল। অবশ্য সাহিত্যে যেমন রুশ গোগোল, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, টলস্টয়, চেখভ বা গোর্কির রিয়ালিজম, ফরাসি বালজাক, স্তঁদাল, ফ্লোবেয়র, দ'মোপাসাঁ প্রভৃতির সমতুল্য কিন্তু স্বকীয় তীব্রতায় ও ব্যাপ্তিতে স্বতন্ত্র, চিত্রেও রুশ বুর্জোয়া বাস্তবিকতা আপন বৈশিষ্ট্যে বলিষ্ঠ। আজ সে-বাস্তবতা কিউবিজম ফিউচারিজম প্রভৃতি খণ্ডচৈতন্যের প্রয়াস পার হ'য়ে জীবনের রূপান্তরের চৈতন্যের সঙ্গে নতুন এক ব্যাপ্ত অকাডেমিক মানে পৌঁছচ্ছে।

ইতালিয় ওস্তাদদের কাজ যাঁদের ভালো লাগে, ডুয়েরর, রেমব্রাণ্ট, রুবেন্স, ব্রয়গেল, ভেরমীর, গোইয়া যাঁদের আনন্দ দেয়, তাঁদের চোখে তাই এই প্রদর্শনীও নয়নাভিরাম লাগবে, জীবনমানসে ও বিষয়বৈচিত্র্যে তা যুগান্তকারী হ'লেও। ধরা যাক্ চিঠি পড়ার ছবিটি। তার আলোর আশ্চর্য দীপ্তি নিশ্চয়ই ওলন্দাজদের ভাস্বর আলো মনে পড়িয়ে দেবে। কিন্তু তফাৎও আছে; ওলন্দাজ ছবিতে আলো অপেক্ষাকৃত মধ্যবিত্ত অন্তঃপুরিণ এবং স্থিত, এই ছবিটিতে আলো ভাস্বর বহিঃপ্রকৃতিতে সমুত্তীর্ণ। শুধু তাই নয়, শরীর-রূপ এখানে আলোক-বর্ণের স্পন্দমান বাস্তবতায় প্রাণময়, আকার এবং রং অর্থাৎ সাকার বস্তুতে, আলোর বর্ণাঢ্য রশ্মিসঞ্চার এখানে আরও অভিন্ন।

বস্তুত, রঙের এই ঐশ্বর্য সোভিয়েট চিত্রের এক আশুবোধ্য বৈশিষ্ট্য। হয়ত, রঙের এই উল্লাসে রূপ সময়ে-সময়ে নিরাকার হ'য়ে গেছে—যেমন দেখা যায় কখন-কখন ভেনিসীয় চিত্রে, কঠিনতর রূপস্বচ্ছ ফ্লরেন্সিয় চিত্রের তুলনায়। তাই হয়ত অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকার নামক ছবিটি রঙের বাহারে ও বাস্তবতার অনুকারে, এমনকি ফুলের রক্তিমার প্রতিফলনেও আমাদের মুগ্ধ করে। তারপরে মনে হয় অখণ্ড সংযোজনে বা গোটা ছবির রূপবিন্যাসে শিল্পী হয়ত ঈষৎ কম মনোযোগ দিয়েছেন, যেটা রুশ ডকুমেন্টরি ফিল্মে মাধ্যমের গুণে স্বতই সংশোধিত হ'য়ে যায়।

তাই স্বনামধন্য নেতাদের মধ্যে রঙে-রঙে উদ্‌ভ্রান্ত চোখ পথ হারায়, রূপায়ণের গতিতে সমগ্র জটিল চিত্রটি স্বকীয় বিন্যাসে স্পষ্ট হয় না। এদিকে নেতারা আমাদের পরিচিত ইতিহাসবরেণ্য মানুষ, তাঁদের শুধু পটভূমির ভিড় ব'লে ভাবতে আমাদের, তথা শিল্পীরও দোমনা লাগে। তাই কি ক্যাটালগের বা ট্রেটিয়াকভ গ্যালারির একরঙা প্রতিচিত্রটি অনেক বেশি স্পষ্ট লাগে, রঙের বাহ্য ঐশ্বর্য বাদ দিয়ে চলমান ছবিটি নিজস্ব এবং স্বচ্ছতর জঙ্গম মর্যাদা পেয়েছে ব'লেই? আবার, তাই কি ফিল্মে স্টালিনকে দেখে অত ঘনিষ্ঠভাবে ভালো লাগে?

সত্যিই, এই সোভিয়েট প্রদর্শনী আমাদের শিল্পজগতে মৌলিক আলোড়ন এনেছে। আমাদের শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত অনেকেরই ধারণা, অবশ্যই মিথ্যা ধারণা যে, শিল্প শুধু তথাকথিত পশ্চিমা আধুনিক শিল্পে নিঃশেষ, ভাঙনের অপরিহার্য চৈতন্যসংগ্রহেই জীবনের গতি ক্ষান্ত। বলা বাহুল্য, পশ্চিমের বুর্জোয়া শিল্পমঞ্চে যে নানা জঞ্জাল কালক্রমে জমেছিল, পিকাসো মাতিস্ ব্রাক্ রুয়ো বিকাশের অমর তাগিদে তা কম-বেশি ঝেঁটিয়েছেন। শুদ্ধিদাতা তাঁরা নমস্য। তবু তাঁদের এই শুদ্ধি মুক্তির প্রাথমিক পদক্ষেপমাত্র, যেন বিপ্লবের নেতিমূলক প্রথম দশদিন। শিল্পের ভবিষ্যৎ ট্রট্স্কি-চালে এখানেই থামে না। তারপরে থাকে ধৈর্যের আস্তিক নির্মাণ, অনেক যন্ত্রণা অনেক প্রত্যয়ের মধ্যে দিয়ে। তাই শিল্পের শেষ পিকাসোর মতো ভাঙাগড়ার লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারীতেও নয়, কারণ জীবনের দাবি আরও প্রবল, আমাদের মানবিকতার মধ্যেই যে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ বিশ্বের উপরে রূপকর্তৃত্বের সানন্দ অঙ্গীকার। অবশ্য এ-দাবির পিছনে এবং এ মেটাবার ক্ষমতা অর্জনের পিছনে শুধু শিল্পবিপ্লব নয়, সমাজ অর্থাৎ জীবনের সমাধানও জড়িত। আমাদের দেশে বিড়ম্বনা সেইখানেই—আমাদের কোন বুর্জোয়া রিয়ালিজমের বর্তমান ঐতিহ্য নেই, আছে ভারতীয়ম্মন্য প্রাচ্যবাদ বা শূন্যজীবী পশ্চিমা অকাডেমিক শিল্পের প্রতিধ্বনি, কিংবা হঠাৎ-হাওয়ায়-উড়ে-আসা আধুনিকতা, অস্পষ্ট থেকে গেছে দেশের লোকমানসের নানা শিল্পসাধনা, এবং শুধু দূর থেকে এসেছে নবীন শুদ্ধতার চৈতন্যের বিশ্বব্যাপী রেশ। এরই মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ-দেশে যামিনী রায়ের মতো শিল্পীর সাধনা ও সিদ্ধির সীমা।

সমতুল্য সমস্যাই মাতিস্ বা ব্রাক্ বা রুয়োর কর্মক্ষেত্রে। এ-সাধনায় শুদ্ধের অভিযানে প্রত্যক্ষের বোধ, চৈতন্যের তলে বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে থাকলেও সাক্ষাৎ প্রেরণা কম-বেশি বা কখন-কখন পরোক্ষ মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। একেই সোভিয়েট ভাষায় বলা যায় 'অ্যাবস্ট্রাক্ট', বলা যায় যে শিল্পীর প্রেরণা দৃশ্য ও

জীবনগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বিশ্বের রূপদানে ততটা নয়, যতটা পরোক্ষ বা কলাকৌশল-চিন্তায় অর্থাৎ এ-চিত্রে খণ্ডচৈতন্যে অস্থির বিদ্রোহী শিল্পীর মননশীল ভাবনা জাগে রং রেখা রূপের নব-নব বিন্যাসের প্রায় বৈজ্ঞানিক কৌতূহলে। মানুষের জ্ঞানের দিক থেকে এ-কৌতূহল ও তার ফলাফল মূল্যবান, কিন্তু এ-ঝোঁককে অগ্রগামী জীবন ও গতিশীল শিল্পেষণার একাকার সমগ্র প্রেরণা ভাবাও ভুল। এ একরকম পচা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শুদ্ধির এক প্রতিক্রিয়া। প্রয়োজনীয় কিন্তু প্রাথমিক মাত্র।

বলাই বাহুল্য, এই প্রেরণার সমগ্রতার যে-শিল্পসিদ্ধি তা অনেক সোভিয়েট চিত্রে এখনও স্পষ্ট হয়নি। সেদিক থেকে সোভিয়েট নৃত্য, নাট্য ও ফিল্মই বোধ-হয় সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ। আইসেনস্টাইন পুডোভকিনের ছবি থেকে এ-কালের মহা-কাব্য বেরলিনের পতন অবধি দেখে সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সোভিয়েট চিত্রে ভাস্কর্যে এখনও হয়ত মৃত্যুর আশেপাশের প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মরক্ষাতেই মৃত্যুঞ্জয় শিল্পীরা প্রতিমিতি ও জ্যামিতিক বিন্যাস, যথাযথতা ও সামগ্রিক সংযোজন দুটিকে একটু বেশিই ভিন্ন ক'রে দেখেছেন—যদিচ ট্রেটিয়াকভ শিল্পাগারে লেনিনের একাধিক মূর্তি, স্টালিনের খোলা জায়গায় রাখা মূর্তিটি, গোর্কির তির্যক মুখখানি এবং অনেক মূর্তিতে ও চিত্রে এই প্রত্যক্ষ ও সংযোজন ইতিমধ্যেই সমগ্রতার আভাস পেয়েছে। এমনকি যাকে ভূতপূর্ব ক্যালকাটা গ্রুপেরও মনে হবে 'অ্যাব-স্ট্রাক্ট' বা জ্যামিতিক, এমন কাজেরও অভাব নেই নবীন সোভিয়েট শিল্পীদের মধ্যে, যথা—ভিলেনস্কির চাইকভস্কি, মানিজেরের ভি. আই. লেনিন, কুক্রিনিক্সির চেকভের গল্পের চিত্রণ, শেরভুদের সৈনিক, নিকোলাদ্জের গ্রুজেনস্কি, মুখিনের রুটি, মেরখুরভের গ্রানিট পোর্ট্রেট এবং সর্বোপরি পিনঝুচ্ছিয়ার স্টাখানোভ মহিলার গ্রানিট মনুমেণ্টাল মূর্তিটি। তেমনি মানুষের চেষ্টার ও যন্ত্রণার, মূল মানবিক দ্বন্দ্বের ট্রাজিক গভীরতার আভাসও এঁদের কাজে থেকে-থেকে পাওয়া যায়, যদিও হয়ত নির্মাণের ব্যাপ্তির দিকে, প্রত্যয়ের প্রসারের দিকে আজও বাধ্য হ'য়েই ঝোঁক।

আরেকটি প্রশ্ন উল্লেখ ক'রে এ-প্রসঙ্গ শেষ করি। সমাজতন্ত্রী আধেয় বা বিষয় ও জাতীয় শিল্পরূপ বা আধার—এ-তত্ত্বটি আমরা সোভিয়েট নৃত্য-কলায়-নাট্যে-সঙ্গীতে-কাব্যে যেমনটি পাই তেমনটি কেন ফিল্মে বা চিত্রভাস্কর্যে পেলুম না? প্রথমত, কিছু বৈশিষ্ট্যের আভাস দেখা যায় বৈকি, কিউবান কসাক্সে, পরদেশী দুলহিনে, এশিয়ার ঝড়ে, সাইবিরিয়ার কাহিনীতে; কিংবা চুইকভের কিরঘিজ

মেয়ের ছবিতে এবং উজবেক পোর্ট্রেটে।—অবশ্য পাথরে ব্রঞ্জে বা তৈলচিত্রে ভিন্ন-ভিন্ন দেশি শিল্পরীতির ভিন্নতা কিছুটা লুপ্ত হ'তে বাধ্য, যেমন এঞ্জিন বা মোটরযন্ত্র জাতি বা দেশ মানে না। দ্বিতীয়ত আজকের দিনে এবং সোভিয়েট মহাদেশের মতো বিপ্লবোত্তর গোটা জীবনের রূপান্তরের মধ্যে আর আমাদের কলকাতা বা দিল্লিওয়ালে এবং অনুন্নত আদিবাসীর রক্ষণশীল ভেদাভেদ থাকে না। তাই ত পামীরের উপরে—সবচেয়ে উঁচু মিনার নয়—সুসজ্জিত গবেষণাগার বসে। তাই কিরঘিজ্ শিল্পী যখন তীনৃসান পর্বত আঁকেন, সে-পর্বতের ছবি স্বভাবতই, উন্নত নব্য-ইউরোপের পর্বতের ছবির মতোই লাগে, বুনিয়ে সাহেবের বহুপৃষ্ঠ-পোষিত অনুন্নত নেপালি চাকরের ছবির সঙ্গে তার ভিত্তিগত অমিল। অবশ্য সেখানেও বৈশিষ্ট্য লক্ষ করবার বিষয়। বুর্জোয়া ইউরোপের যন্ত্র কৃষিবিপ্লবের আগে নিসর্গদৃশ্যচিত্রে প্রায় অনুপস্থিত, তারপরে প্রকৃতি প্রথম হ'ল জাঁকালো পটভূমি, ধনিক জীবনের প্রাকৃতিক অলঙ্করণ, তারপরে তা হ'ল রেলপথে গম্য সপ্তাহান্তের চিত্তবিনোদন, অর্থসর্বস্ব যান্ত্রিক জীবনের কোলাহল এবং নোংরা থেকে সাময়িক বিশ্রাম। মানুষ তখনও প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বোত্তর একাত্ম নয়। শ্রেণীহীন সমাজের সঙ্কল্পেই দুই হ'য়ে ওঠে একাত্ম। এই একাত্মতার ইঙ্গিত সোভিয়েট নিসর্গচিত্রে এরই মধ্যে দেখা যাচ্ছে, উন্মুক্ত নিসর্গপটে ভোরবেলার মাঠে আকাশের পটে স্টালিনের ছবিতে যার আভাস, কিংবা কোরিন্-এর প্রকৃতির পটে দীর্ঘকায় রোগমুক্ত গোর্কির ছবিতে। ফিল্মে ত তা স্পষ্টই তাই চুইকভের তীনৃসান পুস্যাঁর খেয়ালি দুর্গমতায় জাঁকালো নয়, টর্নারের বর্ণকুহেলিতে তাঁর ঠুংরি আত্মদান নেই, সে সংহত, প্রায় মানুষের আয়ত্তে, ঘোড়ায় বা খচ্চরের পিঠে তা গম্য, তাই সারা ছবিতে নীলের আভা, যে-নীল আমাদের টেনে নেয়, দূরে ঠেলে না। সোভিয়েট শিল্পের ভবিষ্যৎ মুক্তবুদ্ধির ন্যায়সঙ্গত ধ্রুপদের সংহতিতে—যেখানে উৎকট স্বকীয়তা নয়, সমবেত উৎকর্ষই মান। এই ভবিষ্যতেই মানুষের শিল্পের সেই বৃত্তের সম্পূর্ণতার ইসারা, যে-বৃত্তের আরম্ভ আদিম প্রস্তর যুগে, পরিপ্রেক্ষিত-হীন স্থানরহিত শিকার-জন্তুর স্তম্ভিত কিন্তু বাস্তব, অ্যাবস্ট্রাক্ট কিন্তু রিয়ালিস্টিক প্রতিলিপিতে এবং সেই সঙ্গেই জ্যামিতিক কিন্তু প্রচণ্ডভাবে গতিশীল জীবন্ত শিকার-শিকারীর সম্বন্ধপাতের সচল চিত্রে। এবারে আমরা কৃতজ্ঞ মিউজিয়মের, গ্যালারির হলের ছবি দেখে; আগামী প্রদর্শনীতে নিশ্চয়ই দেখে কৃতার্থ হব, তারই সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ছবি, বাসাবাড়ির অন্তরঙ্গ ছবিও, মানবিক আনন্দে ও যন্ত্রণায় ঘনিষ্ঠ ও অখণ্ড।

লোকসঙ্গীত

ভেরিয়র এল্‌উইনের সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব আজ বিশেষজ্ঞের জঙ্গল থেকে মানবজীবনের ব্যাপ্ত মাঠে-হাটে মুক্তি পেয়েছে। আমরা, যাদের মুখ্য উৎসাহ প্রত্যক্ষ মানুষে, তাই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ আমাদের মতো সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে নৃতত্ত্বের নানা কাল্পনিক জাতিবিচারের বা মাথার খুলির নানান চেহারার কূটালোচনার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান্‌ মানুষের প্রত্যক্ষ জীবন, তার সুখদুঃখ। বিশেষ ক'রেই কৃতজ্ঞ বোধ করি এলউইন্‌ ও আর্চরের কাছে, কারণ তাঁরা নিজেদের কাজে এবং 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রের মারফৎ ভারতীয় জীবনের একটা বিরাট দিকে আলোকপাত করেছেন। সংস্কৃতিগত সংগঠনের বা ছকের দিকে তাঁদের সার্থক ঝোঁক মূল্যবান্‌, কারণ তা না-হ'লে সমাজ-জীবনের ছকও দুর্বোধ্য থেকে যায়। এইদিক থেকেই প্রথমত আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই, ভারতীয় হিসাবে, শরৎচন্দ্র রায়ের উত্তরাধিকারী হিসাবেই।

তাছাড়া কবিতার দিক থেকেও বটে। কারণ কবিতারও নিজস্ব টেক্‌নিক্‌গত সমস্যা আছে—বিজ্ঞানের মতোই, যদিচ তার মূল্য গৌণ, এবং লোকসাহিত্য এ-সমস্যা নির্দেশে আমাকে অন্তত সাহায্য করে। মুশকিল হচ্ছে যে আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী। আর 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া'র বিষয় আমরা হ'লেও দামের বহরটা সাহেব-শোভন। যা-হোক্‌ আমার মনে আছে আমার উত্তেজনাটা যখন আর্চরের সৌজন্যে ছত্তিশগড়ি গানের প্রুফকপি প্রথম দেখি। এল্‌উইনের ছত্তিশগড়ি বা আর্চরের উরাওঁ বা সাঁওতাল কবিতা যে নিছক আনন্দই দেয় তাই নয়, আমাদেরই সাহিত্যিক প্রশ্নাবলি তোলে এবং কথঞ্চিৎ সমাধানও করে এবং সে-সমাধানও প্রায় আমাদেরই।

তাই বইটি পেয়ে বন্ধুত্বেরই উজ্জীবন পেলুম। নতুন পেলুম এল্‌উইনের প্রচুর টীকাটিপ্পনীর অংশ এবং আর্চরের ভূমিকা। আর্চর তুলেছেন যে-কোন সাহিত্য-ভাবুক লেখকের পক্ষে আজ গুরুতর সেই প্রশ্নটি, যার জবাব যে-কোন প্রকৃত ও বিকাশমান সাহিত্যিককে পেতেই হবে; সামাজিক ঐক্য বা সমষ্টিবোধ কতখানি এবং কিভাবে কবিতা বা সংলাপের পদ্ধতি ও ফলকে নির্দিষ্ট করে। যে-কোন

শিল্পেই এ-প্রশ্ন বিবেচ্য। চিত্রে বা ভাস্কর্যের ইতিহাসে দেখা যায় কিভাবে সামাজিক জীবনের একসূত্রে সংকেতিতমার্গের (কন্‌ভেন্‌শন্স) সীমার মধ্যেই নামহীন শিল্পসৃষ্টির লোকোত্তর মহিমা প্রকাশ পায়। লোকশিল্পের বাস্তববিরোধী নয়, বাস্তবপরিপক্ক পরোক্ষতা (অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম) আসলে তার লোকায়তিক মুক্তিই। তাই আজ মাতিস্‌, পিকাসোর চোখ যায় স্পেনের অ্যাবস্ট্রাক্ট লোকশিল্পে, মরক্কোয় নিগ্রোদেশে, মধ্যযুগের নামহীন ফরাসি কাচ বা পুঁথিচিত্রে। যামিনী রায় তাঁর উগ্র সমাজচৈতন্যের প্রকাশ পান বাংলার অসামান্য লোকশিল্পের নিদর্শনের সংকেতেই তাঁর বলিষ্ঠ স্বকীয়তায় ('দি আর্ট অফ যামিনী রায়' দ্রষ্টব্য)। সংগীতেও এই যে মুক্তির পথ তা বার্টক্‌ ও ওঅল্টন, ব্রিটেনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত। সাহিত্যেও যে তাই, আরাগঁর ক্ষেত্রে তা দেখি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে সোভিয়েট দেশে এই লোকশিল্পের চর্চা ব্যাপকভাবেই চলেছে এবং অচিরে যে এই স্রোত, বিপ্লব-পূর্ব তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিক ঝোঁকের জেরকে মার্জিত করবে, জ্যাক্‌ চেন্‌ সে-কথা বলেছেন।

আর্চরের এই সমস্যানির্ণয়ে নানা কথার মধ্যে একটা দিক হচ্ছে ফরাসি প্রতীকী কবিদের বিচার এবং সেই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ সেকেলে ইংলণ্ডের আধুনিক কবিদের। কবিতায় প্রতীক (সিম্বল) অথবা প্রতিমা (ইমেজ) সম্পূর্ণ সার্থকতা পায়, যখন পুরুষার্থ (ভ্যালুস) বিষয়ে মোটামুটি খানিকটা সামাজিক মতৈক্য থাকে। এবং তা সম্ভব হয় সমাজ শ্রেণীবিভাগহীন বা অতিরিক্ত কোন-একটা ছকে গ্রথিত থাকলে —খানিকটা যেমন হয় মধ্যযুগীয় হায়ারার্কিক্যাল বা বৃত্তিজীবী সমাজে, আরও হয় আমাদের অনার্য প্রতিবেশী-পূর্বপুরুষদের সমাজের মতো একে, বা সম্যক্‌ হয় সোভিয়েট দেশে। অবশ্য আর্চরের এ-কথা সত্য যে সাম্যবাদের এখনও প্রত্যক্ষ ঐতিহ্য গ'ড়ে ওঠেনি। সে-কথা কেউ দাবিও করে না। কিন্তু ঐ সামাজিক জীবনের ঐতিহ্যের যে- —শিল্পসংস্কৃতির দিক থেকে একান্ত প্রয়োজনীয় ও উর্বর—সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, সে-কথা সাম্প্রতিক রুশ কবিতা বিচারে বাউরার মতো অসাম্যবাদীকেও মানতে হয়েছে। তাছাড়া, এই আনকোরা কড়া মাটিতেই ত মায়াকভস্কির মতো কুশলী প্রতীকী প্রচার-ছড়া লিখেছেন, এবং পাস্টেরনাকেরও জীবনযাত্রা অচল হয়নি। সিমোনভের নামও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর্চর আলোচনায় এলুয়ার ও আরাগঁর সাম্যবাদী বিবর্তন বাদ দিয়েছেন। লুমানিতে, আকৃসিঁও, লেৎর ফ্রাঁসেস্‌ ইত্যাদির সাক্ষাৎ প্রচার কী ক'রে যে বিলাতি ছুঁৎমার্গে সাহিত্যিকদের কাব্য-বিলাস চরিতার্থ করে, সে-রহস্য তাই স্পষ্ট হ'ল না। আসলে অবশ্য কবিতার দুই

হাতই সমান চলে, কদ্রিংউড সাহেব যেমন বলেছিলেন, এবং উচ্ কপালে কবিতাও তা সে আদিবাসী সমাজেই হোক্, সোভিয়েট সমাজেই হোক্। এবং দু-হাত থেকে-থেকে একতালেই চলতে পারে, যদি কবির বহুধা মানসে থাকে সমগ্রতার কম-বেশি আভাস।

এল্‌উইন্ 'ফোক্ সঙ্‌স্ অফ ছত্তিশগড়' বইয়ে সারা জীবনটাই গ্রহণ করেছেন, তাঁর অনূদিত কবিতা, ভাষ্য ও পাদটীকায় গভীর জ্ঞান ও দুর্লভ সংবেদ্যতায় জীবনের একতাই প্রকাশ। তাই অপূর্ব সুকুমার প্রেমের গানের সঙ্গে সচরাচর নিষিদ্ধালাপ বিষয় গর্ভাধানও স্থান পায়, চরম রোমান্টিক বেদনার সঙ্গে থাকে রাজনৈতিক গান আর মাছমার্কা দারোগাবাবুকে নিয়ে ব্যঙ্গ :

দারোগা সাহেব
এ কী সুখবর ! বদলি হলেন
এক পয়সায়
তিনি কিনতেন মুরগী ও ডিম
দারোগা সাহেব ছাড়া আর কেবা এক পয়সায়
বাজারে কিনত কাপড় ?

বইটিতে এত বেশি ভালো গান বা কবিতার প্রাচুর্য যে, দু-একটি উদ্ধৃতি অনুবাদ অর্থহীন। কিন্তু এখানে বলা দরকার যে এ-সব কবিতার প্রতীক আমার কাছেই প্রতীক, তার গোষ্ঠি-প্রচলিত কৃতার্থ আমি জানি না ব'লে, এল্‌উইনের সাহায্যে তার ছত্তিশগড়ি মানে জানার পরে সেগুলি হয় শুধু অলঙ্কার বা রূপকী প্রতিমামাত্র। রূপকপ্রতিমা যেন বাজারে-কেনা প্রতীক, তৈরি মাল, অঙ্কের প্রতীকের বা চিহ্নের মতো। অথচ সার্থক প্রতীকী কবিতা প্রতীকী রূপ পায় সমগ্র কবিতার বা কবিতার স্তবকের মধ্যে দিয়েই, আদ্যন্ত রূপায়ণেই। এ-দুয়ের তফাৎ প্রায় মালার্মে, ভালেরি, রিল্‌কের সঙ্গে আর্চর উল্লিখিত ডিলান্ টমাসের তফাৎ। বা বৃহত্তরভাবে বলা যায় যে এদের তফাৎ কোলরিজ-বর্ণিত সংকল্পনা ও বিকল্পনার বিভেদ। কিংবা উপমা ও উৎক্ষেপের মধ্যে যে-তফাৎ। ছত্তিশগড়ের এইসব চমৎকার গানগুলির অধিকাংশই তৈরি প্রতিমায় বাঁধা, তাই সঙ্গীতে যে একক প্রতীক বা চিহ্ন ভিন্ন-ভিন্ন রাগবিন্যাসে, বিন্যাসেরই মধ্যে দিয়ে বিশিষ্ট অর্থ পায়, সে-অর্থের উদ্ভাসন এখানে দুর্লভ।

আদিম লোককাব্যে কেন এই তফাৎ বাস্তব, তার কারণ আপাতবোধ্য। খানিকটা এটা নির্ভর করে আত্মসচেতনতার পর্যায়ের উপরে, তার গভীরতা ও

স্থিতিকালের, এবং তার শুদ্ধতার উপরেও। এইখানেই ইয়েট্‌স্ ও এলিঅটের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য। এলিঅটের অনেক কবিতার অনেক জায়গায় মস্থিত প্রতিমাটি স্বকীয় সত্তা পায় তার রেফারেন্স ভ্যালু অভিধার্থের অপেক্ষা না-রেখেই—যদিও অনেক-সময়ে আবার দুটি ধারা মিশ্র হ'য়ে যায়। সেইজন্যেই এলিঅটের মতো কবিতা লিখতে রাজতান্ত্রিক ধর্মতান্ত্রিক না-হ'লেও চলে। কিন্তু ইয়েট্‌সের আলঙ্কারিক মানসের জন্যে তাঁর যোগ, ভূত ও আইরিশ রূপকথায় ভারাক্রান্ত প্রতীকগুলি চিত্ত-শুদ্ধি বা বিবিক্তির অভাবে যথেষ্ট পরোক্ষ নয়। এবং বলাই বাহুল্য, আদিম সরল সমাজের লোকসাহিত্যে এটা আশাই করা যায় না। লেনিন-রূপকথায় আর রুরিক-রূপকথায় বা সোনা খাঁর কাহিনীতে এই তফাৎ। কিন্তু ডক্টর এল্‌উইনের অনুপম এ-অনুবাদ অনেকগুলিতে অবশ্য অনেক প্রতীকেরই নিজস্ব কাব্যসত্তা আছে :

কী ক'রে ভাঙলে সোনার কলসখানি
বলো ত কোথায় হারালে তোমার জলজলে যৌবন ?

বা,

ও রূপসী মেয়ে ফুল ফোটে রাতারাতি
আমরাই যারা একদা ছিলাম ছোটো
আজ প্রেমে প্রস্তুত।

বা,

হে শ্বেতকরবী তোমার তুলনা নেই
চয়নিকা তুমি হাজার মুখের ভিড়ে।

অন্তত আমার তাই মনে হ'ল। হয়ত তার কারণ বাংলার অনার্য ধারার প্রবলতাই যার জন্যে আদিবাসীর প্রত্যক্ষধর্মী মানসের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক মিল এত গভীর, বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও। অবশ্য ভারতরক্ষক নৃতাত্ত্বিকরা এখনও বাংলাকে বাদই দেন। কিন্তু জীবনের নানা ব্যাপারে বাঙালি এবং সাঁওতাল বা গোণ্ডির যে-সব বিস্ময়কর মিল, তার ব্যাখ্যা এখানেই, বাহ্য প্রভাববিস্তার সন্ধানে নয়। তাই আমার মনে হয় যে এল্‌উইন্ ও আর্চর হিন্দু মহাজনব্যবসায়ী ও বাংলাকে কাক-তালীয়ে এক না-ভেবে (যে-ভাবার পিছনে ইংরেজের রক্ষণাবেক্ষণের সমর্থন) যদি এ-বিষয়ে আরেকটু মন দিতেন তাহ'লে আসাম-সীমান্তে মন্ত্রচালিত পার্বত্যস্থানের আন্দোলন জোর পেত না। (কিংডন-ওয়ার্ডের প্রবন্ধ, 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া', এড-মিনিস্ট্রেশন নাম্বার।) অধিকন্তু অনেক সংস্কৃতি বা মানসমূলক এবং সাহিত্যিক মার্গ বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরও তাঁরা পেতেন যেমন পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর

যুগান্তকারী বই 'বাংলার ব্রত'তে। নরনারীর দেহ সম্বন্ধে মাতৃত্ব, খাওয়া এ-সবের প্রতি যে-মনোভাব আদিবাসীদের, তাই কি আমরা পাই না বাংলার প্রাকৃত মনে ও জীবনে তথা মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণব পদাবলিতে? দেবর-ভাউজি সম্পর্কের কন্‌ভেন্‌শন, এমনকি রসালু কাউরের সাহিত্যিক কন্‌ভেন্‌শনেও সেই আত্মীয়তা প্রমাণিত। আর বট্‌কিনের পরেও কি লোকসাহিত্যাদি ফোকলোর ও কাল্‌চার শুধু আদিম অর্থনীতিতে নন্‌-রেগুলেটেড এরিয়াতেও খুঁজে বেড়াতে হবে? তাতে হয়ত স্টালিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণ মানার হাত থেকে আপাতত পালানো যায়, কিন্তু নিছক নৃতত্ত্বের দিকেও তাতে বাদ পড়ে অনেক কিছুই।

এ-সমালোচনায় এল্‌উইনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা কমে না, যেমন কমে না এই বিজ্ঞানীর অসামান্য কবিপ্রতিভা। এ-কথা যথার্থই বলেছেন আর্চর তাঁর ভূমিকায় এবং তাঁর নিজেরও বিশেষ কবিপ্রতিভা। 'গোল্ড খান্‌'-এ আর্থার ওয়েলি তাঁর মুখবন্ধে এ-দুইজনকে মানপত্র দিয়েছেন। এবং বলেছেন, 'It is to their category that Norman Cohn belongs, with his power to make us feel that nothing interposes between the reader of these songs and the primordial splendour of Siberian demigods.'

ছটি দীর্ঘ কবিতা আছে আল্টাই বা সোনা খাঁ জড়িত বিষয়ে। দীর্ঘ কবিতা, প্রচণ্ড তার আবেগ, ভিন্ন তার বিন্যাস; চাকাস্‌ লোকসাহিত্য মোটেই সাঁওতাল বা গোণ্ডি নয়। সাইবেরিয়ার নিসর্গ দৃশ্যে এর পটভূমি। কিন্তু প্রায় এই অনুলিখিত কবিতার মতোই চমকপ্রদ এই চাকাস্‌দের সাম্প্রতিক ইতিহাস। সাইবেরিয়ার এই অঞ্চল আজ অদ্ভুতরকম কৃষিসমৃদ্ধ। তিনটি জাত নিয়ে এই চাকাস্‌ স্বায়ত্তশাসিত দেশ। ক-বছরে এই অশ্বারোহী যাযাবর জাত বৈজ্ঞানিক কৃষক হয়েছে, চালায় লেবরেটরি, ট্রাক্টর, কোঅপ্স, বর্ণমালা স্থির হয়েছে, পাঠশালা হয়েছে এবং লোকসংখ্যা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। এখন তারা শুধু নাকী সুরে টেনেটেনে গান করে না সোনা খাঁর, লেখেও, এবং লেনিনের কথাও লেখে।

যেমন বলে বা গায় সত্যার্থীর দেশের লোকেরা, ভোজপুরি, আহির, অন্ধ্রদেশি, পাঠান, রাজপুত বা ব্রহ্মদেশি। এবং অনুবাদের হাতও সত্যার্থীর ভালো, যেমন আশ্চর্য তাঁর ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণু তাঁর ভ্রমণ এবং সতত তাঁর মৈত্রী। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে এবং ফটোতে আমাদের দেশের চেহারা স্পষ্ট:

তুমি ত দেখেছ কত দেবদেবী, ইরাবতী
তাঁরা কিবা কন্?
তাঁরা কি করেন কিছু আমাদের স্বাধীনতার তরে
তাঁরা কি দেবেন সত্য সুখ সচ্ছলতা, ইরাবতী বলো।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেন বাংলায় এ-কাজ করেন না, সুনীল জানার ক্যামেরা ত ভর্তি।

নব সাহিত্যতত্ত্ব

নব সাহিত্যতত্ত্ব

আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টির সহিত রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যরূপ' রচনা করেন। সাহিত্যের কষ্টি-পাথর কি হওয়া উচিত, তাহা এই রচনা পাঠে অতি স্থূলবুদ্ধিও জানিতে পারে।

(শ্রাবণের প্রগতি'তে) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এ রচনা পড়িয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বা ইচ্ছা করিয়া না বুঝিয়া অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়া স্থানকালপাত্র ভুলিয়া খুব জোরালো ভাষা ব্যবহার করিয়া বসিয়াছেন। দেখিবার ভঙ্গী, শব্দ বিন্যাস, বাক্যরচনা, লিখনভঙ্গী, বিষয় নির্বাচন ও তাহার ব্যবহার ইত্যাদি বহুকথা ব্যবহার করিয়া 'redundant' না হইয়া যে শুধু একটি কথায় রবীন্দ্রনাথ সব বলিয়াছেন তাহা একমাত্র তাঁহারই সুবিপুল বিরাট 'imagination' এরই কার্য।

কিন্তু তাহাতেই হইয়াছে বিপদ। 'সাহিত্যরূপ' কই একথা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে পাই নাই। খামকা ব্যবহার করিলেই হইল! আর তাও যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাও অধ্যাপকের বক্তৃতার মতো গোছানো, চাঁচাছোলা ভাষায় হইলেও বুঝিতাম। অথবা, চমৎকার কবিত্বে, খাঁটী বাংলায়, সরস ভাষায় এমন করিয়া বলিলেন যে তাহা লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারা যায় না বা সুবিধামতো স্বপক্ষে বা বিপক্ষে উদ্ধৃতও করা যায় না। সত্যই এ রবীন্দ্রনাথের অন্যায়! 'আল্‌বৎ' অন্যায়।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'রূপ'-এর অন্বয়াদি না করিয়া দিলেও তাহার সম্বন্ধে অস্পষ্টতা রাখেন নাই। ফরাসী সাহিত্যিকের কাছে রূপই ছিল রচনার সর্বস্ব—তাহার সকল বিশেষত্বসহ রূপই ছিল—শুধু চরম নয়—একমাত্র লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ absolute রূপবাদী নন, তিনি রূপের উপর অত জোর দেন নাই। তিনি বলেন নাই যে রূপই রস সাহিত্য, তিনি বলিয়াছেন 'রূপের গৌরব রস সাহিত্যে'। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের জন্ম বিচার করেন নাই, তিনি করিয়াছেন সাহিত্যের মূল্য বিচার সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, 'সাহিত্যে যখন কোনো জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে-ভাবকে অবলম্বন ক'রে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ, সেই ভাবটি যে বিশেষরূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলিন্য।' একথা হইতে লেখক যে বলিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ বলিতে চান, সাহিত্যে বিষয়ের কোন মূল্য নাই, রূপের মূল্যই সাহিত্যের মূল্য, 'রূপ' অর্থ যাহাই হউক; আধুনিকদের সাহিত্যে বিষয় লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি হইতেছে কিন্তু তাহা রূপবান হইয়া উঠে নাই। সুতরাং এ সাহিত্যের কোন মূল্যই নাই।'—এ অর্থ কতদূর নীচ মনোভাব হইতে

করা সম্ভব তাহা একটা অতি 'গাধা'ও স্পষ্ট দেখিতে পায়। তাই যদি রবীন্দ্রনাথ বলিতেন ত Keats এর কবিতার কয়টি লাইন সম্বন্ধে, 'একে intensity বলা চলে না, এ রুগ্ন চিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে তৎসত্ত্বেও মোটের উপর সমস্তটা নিয়ে কবিতাটি রূপবান কবিতা। যে ভাবটিকে নিয়ে কবি কাব্য সৃষ্টি করলেন সেটি কবিতাকে আকার দেবার উপাদান'।—কথা কয়টী বলিতেন না। ঐ 'তৎসত্ত্বেও' ও 'উপাদান' কথা দুইটিই যে রবীন্দ্রনাথ যে বিষয়ের মূল্য দেন তাহার পরিচয়।

তারপর লেখক সমস্যায় পড়িয়াছেন, 'রূপ বলিতে বোঝায় কি ?' ভাবিয়া। 'সাহিত্যে কি দেখিব ? Technical form ? কাব্যসাহিত্যে metrical form ? ...কাব্যেও কি আমরা বিষয়ের নবত্ব বাদ দিয়া চাহিব শুধু নূতন metrical form ? এবং সেই হিসাবে কি আমরা টম্‌সন্‌ আকেনসাইড্‌কে পোপ হইতে উচ্চাসন দিব ? যেহেতু ইংরাজী সাহিত্যে Romantic revival-এর সূচনাতে তাঁহারা পোপের চল্‌তি একঘেঁয়ে Heroic couplet বাদ দিয়া চিরনূতন Spenserian stanzaর অবতারণা করেন ?' দেখিবেন ? চোখে যাহা পড়িবে তাহাই দেখিবেন। সকলের দেখিবার শক্তি সমান হয় না। বৈচিত্র্যই দুনিয়ার চাটনী—মন্মথবাবুর দৃষ্টিদোষ আমাদের উপভোগ্য। জার্মান ভাবুক বলিয়াছেন—বিষয়ের নবত্ব নাই—সাহিত্যে চিরপুরাতন বিষয় নূতন রূপে বলা হয়, এই মাত্র। আর 'একঘেয়ে—ও বস্তুটি কি ? পোপের Heroic coupletএর 'একঘেয়ে'ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু, পুরাতন কবিSpenserএর form টমসনের সময়েও 'নূতন metrical form' হইল কি করিয়া ? গোড়ায় যে না বুঝিতে পারা এখানেও সেই না বুঝিতে পারাই লেখকের এত উচ্ছ্বাসের কারণ। পরেও তিনি আবার 'নাটুকেপনা' করিয়াছেন, 'কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং ধ্বনিবান শব্দের উপরেই যদি মাইকেলের কাব্যরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে...তবে হেম বাঁড়ুয্যে ও নবীন সেন বাদ পড়িলেন কেন ? তাঁহারাও ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছেন, এবং বড় শব্দেরও ত তাঁহাদের অভাব নাই। অবশ্য মাইকেল অপেক্ষা তাঁহাদের শব্দসম্পদ কম ; কিন্তু ধ্বনিবান শব্দের উপরেই যদি কাব্যের যথার্থ রূপ নির্ভর করে, 'শনিবারের চিঠি'তে 'রোমদগমক' নামে যে কবিতাটি লেখা হইয়াছে তাহাই কেন রূপশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে না ?' হইলেই হইল। বাড়ীতে বসিয়া মন্মথবাবু যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যে 'রূপ' বলিতে রচনার সমগ্র সবিশেষত্ব formটি বোঝাইতেছেন সেটুকু বুঝিলে মন্মথবাবু একথা বলিতেন না এবং এ বুদ্ধিহীন রসিকতাও করিতেন না,—'দেশী ও বিদেশী যে কোন লেখক সাহিত্যে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি রূপস্রষ্টা বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এদিকে খেয়াল করেন নাই যে রূপ শব্দের যদি বিশিষ্ট কোন অর্থ না থাকে, তাহা হইলে বটতলার লেখকরাও রূপস্রষ্টা, কারণ তাহাদের লেখাও কোন বিশেষ রূপে রূপবান।' রবীন্দ্রনাথের 'খেয়াল' করিবার ক্ষমতা যে

কাহারও কাহারও বিরাট কল্পনাশক্তিরও অতীত, তাহা আমরা জানি, সাহিত্যে এমন 'কষ্টিপাথর' তিনি করেন নাই, যাহার দ্বারা বঙ্কিম, মাইকেল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, হইতে বটতলার লেখকরাও, আধুনিকেরাও একই সঙ্গে পার হইয়া যান। মন্মথ-বাবুই স্থানান্তরে বলিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে শুধু রূপ দিয়া যদি সাহিত্য যাচাই করা হয় তবে আধুনিক অনেক কথাসাহিত্যই সে পরীক্ষা পার হইয়া যায়।' অম্‌নি মন্মথনাথের দ্বারা exposed রবীন্দ্রনাথ অন্যকথা পাড়িয়া ফাঁকি দিয়া গেলেন। —তাই যদি হয় অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এমন ব্যবস্থা করিয়াই 'রূপ' 'রূপ' করিয়াছেন, যে ব্যবস্থায় বটতলা ও বস্তীর লেখকরাও 'রূপবান' হইয়া উঠেন না। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, কাব্যের বিচার 'রূপের সম্পূর্ণতা বিচারেই…চলবে।' ও দেখিতে হইবে তাঁহাদের মহাকাব্যও 'রূপের বিশিষ্টতার দ্বারা উপযুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কিনা'। এই কথার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' বিচারে সকলেই যে রূপস্রষ্টা বা creative artist নন তাহা সুস্পষ্ট। এবং তিনি 'দুঃখ করো অবধান' ইত্যাদি আধুনিক-আদর্শ তিনটি লাইন সম্বন্ধে যে বলিয়াছেন 'কথাটা রিপোর্ট করা হ'ল মাত্র, তা রূপ ধরল না।' ইহা হইতেও সবকিছুই যে ছাপায় থাকিলেই সাহিত্য-হয় না —'সাহিত্যরূপ' ধরিয়া রূপবান হইয়া উঠে না, তাহাও ত দেখিতেছি।

বটতলার বই সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না, লেখক বলিতেছেন 'তাহাদের লেখাও…রূপবান'। মানিয়া লইলাম—বটতলার লেখকদেরও রসসাহিত্যের বিষয়কে রূপবান করিবার দুর্লভ ক্ষমতা আছে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি নিছক রূপসৃষ্টিরই তাগিদে? রবীন্দ্রনাথ, বলিতেছেন 'খাঁটি সাহিত্যিক যখন একটা সাহিত্য রচনা করতে বসেন, তখন তাঁর নিজের মধ্যে একটা একান্ত তাগিদ আছে ব'লেই করেন, সেটা সৃষ্টি করবার তাগিদ'। মন্মথবাবু যদি ইহাতে বলেন যে বটতলার লেখকরাও সৃষ্টির তাগিদেই বটতলার সাহিত্য রচনা করেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার অজ্ঞতার জন্য মন্মথবাবুর একথাও মানিয়া লইব। কিন্তু তাহাতে যে 'রূপের সম্পূর্ণতা' আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশও করিব। বটতলার বই সম্বন্ধে যে 'অস্ফুট কানাঘুষা শোনা যায়', তাহাতে বুঝিয়াছি যে সাহিত্যের রূপ ফোটানোর চেয়ে বিষয়ের রস ফোটানোই (হয়ত সে রসের সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে, তথা কোন অলঙ্কার শাস্ত্রেই উল্লেখ নাই, তবে এক সাহিত্যরসিক তাহার নাম দিয়াছেন 'শৃঙ্গার বিলাস'।) বটতলার লেখকদের উদ্দেশ্য। এবং রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনি প্রকাশ পায় যখনি দেখি বিষয়টা অত্যন্ত বেশী প্রবল হয়ে উঠেছে।' এবং পাগলামীর মতো অপূর্ব আর কিছুই নেই …সেটা নূতন কিন্তু কখনোই চিরন্তন নয়—যা চিরন্তন নয় তাকে সাহিত্যের জিনিষ বলা যায় না।' ইহার দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে মত বেশ বোঝা যায়।

তারপর লেখক বলিতেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া রবীন্দ্রনাথ আরও বিপদে

পড়িয়াছেন।' বিপদে যদি কেহ পড়িয়া থাকেন তিনি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ। তিনি অবজ্ঞার সহিত বলিতেছেন, '…রবীন্দ্রনাথ আগে সাহিত্যে শুধু রূপ দেখিলেই পাস্‌পোর্ট দিতেন। এখন কিন্তু শুধু রূপে চলিবে না। সেই রূপের পিছনে সত্য থাকা চাই। এবং তাহা যে সে সত্য হইলে চলিবে না, তাহা আনন্দের সত্য হইতে হইবে। এবং শুধু আনন্দে চলিবে না, তারা সার্বজনীন (?) হইতে হইবে।…' ইত্যাদি।

রূপেরও যে প্রকারভেদ আছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নাই। ফরাসী সাহিত্যিকের মতো সাহিত্যের প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌' বাদী নন। সে কথা তিনি বলেন নাই। এবং 'সার্বজনীন আনন্দের সত্য' কথাটি রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক সাহিত্যের ভয়ে, বিপদ হইতে পালাইবার জন্য বলিয়াছেন, মন্মথবাবুর এ কল্পনা ঠিক নাও হইতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যে রূপ পাওয়া যায় সে রূপ মূলে বিদেশী ছিল। অথচ বঙ্কিমের রচনায় বাঙালি আনন্দ পায়। সে কেন? সর্ব দেশের সর্ব জাতির বাধা এড়াইয়াও যে আনন্দ দীপ্তি পায় তাহাকেই বলে সর্বজনীন আনন্দ। সেই আনন্দের সত্য—বা সেই সত্যটি যে সত্যের ইংরেজকেও ও বাঙালীকেও-সর্বজনকে আনন্দ দেবার দুর্লভ শক্তি আছে-বঙ্কিমের মধ্যে তাহা ছিল। এই ত রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহাতে মন্মথবাবুর না বুঝিবার কি আছে? কথাটি যে কত সত্য তাহা মন্মথবাবুও বোঝেন কারণ গণ্ডীবদ্ধ নিরানন্দ সত্যের যে রূপ, কোনো কোনো আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকের বা বা বটতলার লেখায় তাহা আছে এবং মন্মথবাবু গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিলেও তাহা সাহিত্যের অমরলোকে স্থান পাইবে না।

এমন কয়েকটি বস্তু আছে সেগুলি সাময়িক প্রয়োজনে খাটে; তাহাদের সময় গেলে তাহাদের লুপ্তি হইতে কেহ জোর করিয়া টানিয়া রাখে না। তাঁবু বস্তুটি সময় বিশেষে খুবই প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু স্থাপত্যশিল্পে তাঁবু পদ্ধতি বলিয়া কিছু নাই। প্রয়োজনের তাগিদে শিল্প দেশ ছাড়ে; পুরা না ছাড়িলেও পুরা থাকে না—অর্থাৎ মৃতপ্রায় হইয়া যায়। প্রয়োজনটা চিরন্তন নয়, অথচ তাহার তাগিদে সৃষ্ট বস্তু চিরন্তন—অস্বাভাবিক ঘটনা। সাময়িক বস্তুতে সার্থকতা থাকিতে পারে—কিন্তু সম্পূর্ণতা থাকে না। সম্পূর্ণতার দাম্পত্য সম্পর্ক চিরকালের সহিত—অবশ্য আমি বলিতেছি শিল্প সাহিত্যের কথা।

সাময়িক প্রয়োজন বা বিক্ষোভ সাহিত্যের প্রতিকূল, একথা সবাই জানে। রেষ্টোরেশান্‌ যুগে ইংরেজি সাহিত্যে তাহার প্রমাণ মেলে। কিন্তু সে কথা থাক। এইখানে মন্মথবাবু নিতান্তই অবান্তর কথা পাড়িয়া নিতান্তই গায়ে পড়িয়া ঔদ্ধত্য ও বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়াছেন। 'ইব্‌সেন, টুর্গেনিভ্‌, হামসুন, গর্কীর রূপ নাই'—একথা রবীন্দ্রনাথ 'উদাহরণে' বা 'ইঙ্গিতে'ও বলেন নাই। তারপর মন্মথবাবু প্রশ্ন করিয়াছেন যে আধুনিকরা যদি ইঁহাদের নিকট হইতে 'সাহিত্যরূপ' পাইয়া বাংলা লেখেন, তাহা তাঁহারা উক্ত বিদেশীদের রচনা ভাল না লাগিলে

করিয়াছেন কি না ? প্রথমত কথাটি 'ঠাকুর ঘরে কে ?'র জবাবের মতো অনেকটা। দ্বিতীয়ত ইহা হাস্যকর : কারণ রবীন্দ্রনাথ এসব কথা মোটেই বলেন নাই। আধুনিকদের সাহিত্য সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে সামাজিক ও পানওয়ালী ছাড়া তিনি কিছুই বলেন নাই। ইব্‌সেন, টুর্গেনিভ্‌, হামসুন, গর্কী পানওয়ালী সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন কিনা মন্মথবাবু জানেন, কিন্তু 'লোকে' তাহা জানে না। আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে কিছু বলিলে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অভিভাষণ প্রবন্ধটাই গৃহীত সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ একটি ধারণা ও মতামত বলিবার জন্য ও আধুনিকদের রচনারীতি ও নীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা শুনিবার জন্যই শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের এ উচ্ছ্বাস নিতান্তই হাস্যকর ও ঈষৎ সন্দেহকরও বটে।

আর মন্মথবাবু ঐ চারজন বিদেশী রূপস্রষ্টার নাম এমন এক নিশ্বাসে বলিয়া গিয়াছেন যে মনে হয় যেন উহারা সকলেই একই বস্তু লইয়া একই ছন্দে লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন ; এবং যেন বাংলা আধুনিক সাহিত্যে পাশাপাশি ইব্‌সেন, টুর্গেনিভ, হামসুন, গর্কির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সত্যিই ! তাঁহার 'অদ্ভুত কল্পনাশক্তি !' কিন্তু তিনি কি দেখেন নাই রবীন্দ্রনাথের 'খেয়াল' করিবার ক্ষমতার প্রমাণটি 'অবশ্য ঋণ করা ধনে ব্যাবসা করিবার প্রতিভা সকলের নেই।' (?) এবং তিনি হয়ত চটিবেন কিন্তু আমায় এক এম্‌,-এ, পাশ্‌ অধ্যাপক বন্ধু বলেন যে 'ভালো লাগিলে'ও 'ভালো বোঝা' নাও যাইতে পারে। আর 'আমরা'-র মোহে আবেগের 'intensity'তে লেখক যে আরেকটি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা কি সত্য? বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সমান তালে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বাজারে চলিতেছে' ? এই সেদিন 'প্রগতি'র 'মাসিকী'তে দেখিলাম 'প্রগতি'-র প্রাক্তন সম্পাদক লিখিয়াছেন যে আধুনিকদের প্রকাশক জুটে না। সে কি বাজারে বেশি কাটতির জন্য ?

কিন্তু সে যাক্‌। বঙ্কিমচন্দ্র ও Romanticism লইয়া মন্মথবাবু এইবার খুব পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। 'হিং টিং ছট্‌' মনে পড়ে। বিচারকের মতো মন্মথবাবু রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিতেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের রূপ বলিতে কি রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস Form এর কথা বলেন ? তাই যদি হয় তবে ইংরেজি সাহিত্যের পুরানো একটা কাঠামো বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই কোন একটা সাংঘাতিক রকমের কৃতিত্ব প্রকাশ করেন নাই।' বঙ্কিম নূতন একটি Form ত আনেনই, অধিকন্তু আরো অনেক কিছুই আনেন এবং তাহার মধ্যে শিল্পচাতুর্য্যও আনেন তবে সেটা ধার করিয়া নয়—সেটা বিধাতার নিকট হইতে আনেন। স্কট অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র শিল্পচাতুর্যের ও 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী' 'সীতারামের' ভাব মাহাত্ম্যের কাছে দ্বিতীয় স্তরের। আর, একটি ভাষায় একটি নবরূপ প্রবর্তিত করায় সাংঘাতিক কৃতিত্বই আছে—তাহা করিতে সকলে পারে না। তায় আবার বঙ্কিম প্রবর্তিত করিলেন কি সাফল্যে ! বঙ্কিমের কৃতিত্ব আছে, আলবৎ আছে, মন্মথবাবুর 'পাসপোর্ট'

বিনাও আছে ও থাকিবে। রিচার্ডসনের যদি থাকে ত বঙ্কিমেরও আছে; কারণ রিচার্ডসন ও পুরানো কাঠামোতেই মূর্তি গড়েন—উপন্যাসের কাঠামোটি রিচার্ডসনের বহু পূর্বেই য়ুরোপে ছিল এবং বঙ্কিমের কৃতিত্ব আরো বেশিই বলিতে হইবে, কারণ শিল্পী হিসাবে তিনি বাক্যবহুল রিচার্ডসনের উর্দ্ধে। তাঁহার সময়ের তাঁহার চেয়েও বড়ো ঔপন্যাসিক কেহ তাঁহার উপন্যাস parody করিতে যান নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম কে 'কাঠামো রচয়িতা' বলেন নাই। পূর্বোদ্ধৃত তাঁহার বঙ্কিম সম্বন্ধে বক্তব্য ছাড়া তিনি বঙ্কিমের সাহিত্যরূপ সম্বন্ধে বলিতেছেন, সেই 'ব্যক্তিরূপটি' প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষার ভঙ্গীতে, আভাষা, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে।' বঙ্কিমকে তিনি বলিয়াছেন 'কারিগর', তাঁহার 'সৃষ্টির কাজ' হইতেছে 'রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল'। ইহা হইতে যে কাঠামোই রূপ বা বঙ্কিম-কাঠামোরচয়িতা-অর্থ হইতে পারে, সে শুধু মন্মথবাবু কল্পনা ও আবেগের জমাট প্রায় প্রগাঢ়তার উন্যই। কাঠামোটাই যদি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কষ্টিপাথর করিতেন ত সুবিধা হইত অবশ্য। শক্তিসাপেক্ষ ভেদাভেদ থাকিত না।

মন্মথবাবু এবার আর একটি সাংঘাতিক প্রশ্ন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'বোকা বানাইতে' গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, পানপাত্র তৈরীর বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উদাহরণরূপে নেওয়া হয়েছে, পণ্যের দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতর বিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় তার রূপটাই দেখি'। শিল্পরসিকের সঙ্গে যাঁহারা এক দিনও কথা কহিয়াছেন, শিল্পের সঙ্গে যাঁহাদের কিছুমাত্র আলাপ আছে তাঁহারাও একথার সত্যতা জানেন। কিন্তু মন্মথবাবু খুব বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করিয়াছেন 'স্বর্ণপাতের বর্ণছটা কি তার রূপেরই গৌরব নয়?' 'স্বর্ণ' কিছুরই শিল্পের কাছে স্বর্ণ বলিয়া মূল্য নাই—তাহার বর্ণছটার জন্যও নয়, তাহার ওজনের গুরুত্বের জন্যও নয়। যেহেতু রসসৃষ্টিতে (বা রূপসৃষ্টিতে) বিশেষ করিয়া বিষয়েরই গৌরব বলিয়া কিছুই নাই। মন্মথবাবুর এ প্রশ্ন অজ্ঞাতপ্রসূত। তারপর তিনি বলিতেছেন, শুধু শিল্পের দিক হইতে যে সাহিত্য-বিচার চলে না তাহা পোপের দিকে তাকালেই বুঝা যায়। তাঁহার মতো নিপুণ শিল্পী ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে কয়টি আছে? কিন্তু তবু লোকে তাঁহাকে কবি বলিতে চায় না কেন?' তার কারণ মন্মথবাবু জানেন না দেখিতেছি। তার কারণ সত্যকার শিল্প রচনায় থাকিলে তাহা সাহিত্যই হয়। তবে craftsmanship যদি মন্মথবাবু শিল্প বলেন ত সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু 'লোকে বলিতে চায়', রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও ইংরেজী অল্পস্বল্প 'বুঝেন' এবং তিনি 'শিল্প' কথার ইংরেজী—craftsmanship করেন না, করেন art। এবং মন্মথবাবু যে বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ ও মন্মথবাবুর সঙ্গে 'পোপকে 'কবি' বলেন না, তাহা মিথ্যা কথা। রবীন্দ্রনাথ সে কথা মোটেই বলেন নাই।

এইখানে পুনর্বার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের উপর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ

প্রকাশ করিতে গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ পোপের সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাঁহার 'রসধারার প্রবাহ ছিল না।' বলিলেন কেন? তিনি তাহা বলিবার পূর্বে মন্মথবাবুর মতটা জানিয়া 'emotion' ছিলনা বলেই নাই কেন?' '...রসসাহিত্যে যে রসটাই চরম, সেকথা একটা গাধাও মানিয়া লইত। কিন্তু তাহা না বলিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম।' তারপর পোপে আসিয়া যখন দেখিলেন 'রূপে' আর কুলায় না, তখন রূপ ছাড়িয়া রস ধরিলেন।' খাসা বিনীত ভাষা সন্দেহ নাই কিন্তু প্রলাপ মাত্র। পোপে আসিয়া 'রূপে' না কুলানোর কথাই ওঠে না যে ছাই! হিং টিং ছট' মনে পড়ে। ...রবীন্দ্রনাথ পূর্বে বলিয়াছেন, 'রস সাহিত্যে বিষয়টা উপাদন, রূপটাই চরম।' অর্থাৎ 'কি লেখা হইল' অপেক্ষা 'কেমন করিয়া লিখিত'—রসসাহিত্যের রসজ্ঞের ইহাই দ্রষ্টব্য। এবং 'রূপের গৌরব রসসাহিত্যে'। আগে 'রসসাহিত্য' হওয়া চাই তারপর তাহার 'রূপ'। আগে পিতা তারপর তাহার পিতৃত্ব। যদি রসসাহিত্যেই না হইল, যদি তাহাতে 'রসধারার প্রবাহ'ই না রহিল ও 'রূপটুপ' ছাইমাথা মুণ্ডুর কোন কথা' আসে কোথা হইতে? আপন কল্পনাও প্রগাঢ়ভাবে বোধশক্তিহীন মন্মথবাবু নিজেই খেয়াল না করিয়া (বা খেয়াল করিয়াই?) পোপে রূপ আনিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আনেন নাই। এবং মন্মথবাবু ও তাঁহার চেলারা মানিবেন কিনা জানি না কিন্তু 'লোকে বলিতে চায়' যে কোনো কিছু ব্যবহার না করিয়াই তাহাতে 'না কুলানোর কথা পারা'র কথা।

মন্মথবাবুর পরের বুদ্ধিসূচক প্রশ্ন হইতেছে, 'বিষয়কেও কি আমরা রূপ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না?' স্বচ্ছন্দে করিতে পারেন। তবে ঘরের ভিতর বসিয়া। আর শুধু তাই কেন! ইব্‌সেনকে হামসুনের চেলা, টুর্গেনিভ্‌কে গর্কীর চেলা এবং সর্বোপরি নিজেকে রবীন্দ্রনাথের মাষ্টারও 'কল্পনা করিতে' পারেন। মন্মথবাবুর বিশ্বব্যাপী (!) চেলার দল তাঁহার এইসব কথায় হয়ত হাততালি দিয়াছেন —কি গভীর প্রশ্ন! কি sincere emotion! কি intensity! কি imagination! কি অদ্ভুত কল্পনাশক্তি! কিন্তু 'আসল কথা হইতেছে' রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যাহা হউক কিছু বলিলেই তাহা যুক্তি হইয়া উঠে না এবং তাহাতে বক্তার বড়োত্ব মোটেই বৃদ্ধি পায় না।

এইরূপ অর্থহীন ও petulant শিশুর মতো কথা হইয়াছে, 'পোপের কাব্যসমস্যায় রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিক কিছুই বলেন নাই।' ইত্যাদি। প্রমথবাবু বলিয়াছেন যে আমাদের কালচার য়ুরোপের ছাড়া কাপড় নিয়ে। মন্মথবাবু তাহার একটি প্রমাণ। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসকার বলিতেছেন, 'The greater jars of the conflict over the question "Was Pope a poet?" have mostly ceased.' লেখকের কি দূরদৃষ্টি! 'mostly ceased'! পোপের দেশে থামিয়াছে, কিন্তু বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে থামে নাই। কিন্তু 'পোপের কাব্যসমস্যা'র সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। কাজেই তাহার সমাধান করাও রবীন্দ্রনাথের কথা

নয়। সাহিত্যে নবরূপ কেমন করিয়া আসে, তাহাই বলিতে গিয়া তিনি পোপের নাম করেন। 'পোপের কাব্যসমস্যা' আনিয়াছেন মন্মথবাবুই। বাস্তবিক কিছু বলিবার কথা তাঁহারই। তিনি অবশ্য তাহা বলিতে পারেন নাই তবে দেশপূজ্য রবীন্দ্রনাথকে অর্থহীন ঠাট্টা করিতে গিয়াছেন বটে! এবং 'রস বলিতে নির্দিষ্ট কিছুই বুঝেন নাই' বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাহা বুঝাইয়াও দিয়াছেন। ('হায় রবীন্দ্রনাথ! থার্ডক্লাসে বিদ্যা শেষ করিয়া শেষটা এই বয়সে বাংলা ও ইংরেজীর মাষ্টার রাখিতে হইবে! আর তাও—সে কথা যাক্।) তারপর মন্মথবাবু দোষ ধরিয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে একটা জিনিষ বিশেষ চোখে পড়ে; তাহা এই যে কাব্যবিচারে তিনি imagination, emotion ইহাদের কোন উল্লেখ করেন নাই।' মহা অপরাধ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের তাহার জন্য মন্মথবাবুর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। Paterও ত তাঁহার 'সাহিত্যরূপ' প্রবন্ধে imagination, emotion ইহাদের কোন 'উল্লেখ করেন নাই'। সেও কি 'চাপা' দিবার জন্য নাকি? Pater এর কবিতায়ও! 'imagination emotion ইহারা' ছিল না বলিয়া নাকি? Pater ও 'চাপা' দেন সেই কারণেই? কিন্তু শ্রদ্ধা ও সংযম এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ইহাকেই বলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কবিতায় মন্মথবাবুর নিজস্ব সম্পত্তি imgination ও intensity নাই বলিয়াই সে কথাচাপা দেন, একথা উচ্চারণ করিতে যে অশিক্ষিত ভদ্রতায়ও বাধে। তাও যখন 'চাপা' দেওয়ার কথা উঠেই না; কারণ রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ববাবুর কথার উত্তরে emotion লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করেন। এবং imaginationএর কথা তিনি বলেন নাই যেহেতু তাঁহার বলিবার দরকার হয় নাই যেহেতু তিনি কাব্য সম্বন্ধে পাঠ্যপুস্তকের নোট লিখিতে বসেন নাই। তিনি তাহা লেখেন সাহিত্য সভায় আলোচনার সূত্রপাত হিসাবে। শুধু 'imagination' নয়, বা 'emotion' নয়, রবীন্দ্রনাথ; ছন্দ, মিল, শব্দ, বাক্য ইত্যাদিও 'চাপা দেন'। সেও কি ওসব বস্তু তাঁহার রচনায় নাই বলিয়া নাকি? এ সম্বন্ধে বাজারে কোনো 'অস্ফুট কাণাঘুষা শোনা যায়' নাকি?

রবীন্দ্রনাথের পিঠ চাপড়াইয়া শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ বলেন, 'Imaginationএর কথা ছাড়িয়া দিলাম; দুই একটি মহাকবি ছাড়া খুব কম কবিরই সত্যিকার imagination আছে।' সেই ভালো কথা। মন্মথবাবু imaginationএর কথা ছাড়িয়াই দিন। ও বস্তুতে তাঁহার সুবিধা হইবে না। আর ঐ 'দুই একটি মহাকবি' ও যখন সকলের কাছে সহজবোধ্য নন। 'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও কেহ কোনোদিন imaginationএর লড়াই করে না।' করে না? 'আলবৎ' করে। মহাকবিরই imagination থাকে—তাহা হইলে Romain Rolland, Maeterlinck, Yeats হইতে আরম্ভ করিয়া আমি পর্যন্ত সে বড়াই করি। এবং মন্মথবাবু 'আলবৎ' না বলিয়া ধমক দিলেও করিব। কিন্তু মন্মথবাবু ঐ দুটি মহাকবি কে? একটি ত দেখিতেছি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যিনি সেদিন 'শনিবারের চিঠি'তে আধুনিক 'তরুণের লজ্জা' লিখিলেন। আর একটি কে?

কিন্তু মস্তিষ্কের চৈতন্য থাকিলে 'Pure poetic pleasure' এর জন্য যে 'মরীচিকার' খোঁজে যাইতে হয় না তাহা 'মরীচিকা'র কবি ও তাঁহার 'মিতা ও বন্ধু' ও মন্মথবাবুকে বলিয়া দিতে পারেন। 'মরীচিকা'র আমি ভক্ত। যতীন্দ্রনাথ বিশেষ উঁচুদরের না হইলেও যে বিশেষ রূপটি বাংলাসাহিত্যে আনিয়াছেন তাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। তাই প্রথমটা 'থ' হইয়া গিয়াছিলাম। Pure poetic pleasure যতীন্দ্রনাথের কবিতায়। সোনার পাথর বাটি।

আজও তাই ভাবিতেছি। সামনের বাড়ীতে গ্রামোফোনে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' চলিতেছে। মৃদুস্বর—তাহাই শুনিতেছি আর ভাবিতেছি কিসের অভাবে মানুষ রবীন্দ্রনাথের ছাড়িয়া কবিতা যতীন্দ্রনাথের কবিতায় 'Pure poetic pleasure' খুঁজিতে যায়। বর্ষার এই মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকাইয়া 'সোনার তরী' গুঞ্জন করিতেছি। হাতের পাশে বিপুল 'কাব্যগ্রন্থাবলী' রহিয়াছে, ভাবিতেছি সে কি নিদারুণ imagination ও emotionএর intensity যাহাতে মানুষ প্রলাপ বকে ?

চেরাপুঞ্জি, মেঘ, ধার দেওয়া ও গোবিসাহারা—এই লইয়া তিনটি লাইন তুলিয়া রবীন্দ্রনাথের বিচারক বলিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তি কোনদিনই এমন তিনটি বিরাট সুদূর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে একটি ভাবের অভিব্যক্তিতে একত্রিত করিতে পারে নাই।' পারে নাইই ত ! ওসব ধারের ভাব রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-শক্তিতে নাইই ত ! আর রবীন্দ্রনাথের কল্পনা যে সত্যকার imagination, সে ত fancifulness নয় ! বা সে ভূগোলবৃত্তান্তের লেখকের 'অদ্ভুত কল্পনাশক্তি'ও নয়। কিন্তু দিব্য চলিতেছিল 'imagination ও emotion' লইয়া। তাহা ছাড়িয়া মন্মথবাবু 'হঠাৎ এখানে' ভাবের অভিব্যক্তি 'প্রয়োগ করিয়া বসিলেন কেন ?' আর ঐ 'Pure poetic pleasure'ই বা খামকা আসিল কেন ? কল্পনাতে 'যখন দেখিলেন আর কুলায় না তখন' কল্পনা 'ছাড়িয়া' Pure poetic pleasure ও 'ভাবের অভিব্যক্তি'ত 'ধরিলেন'। কিন্তু ও বস্তুটি কি ? শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাবের অভিব্যক্তি' ত ? তাহা হইলে অবশ্য মানিয়া লইতেছি এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ হারিয়া গিয়াছেন।

—তারপর ঐ 'divine inspiration' ! ও কথা আবার কেন ? ও কথা লইয়া একবার অনেক কিছুই হইয়া গিয়াছে ! আবার মন্মথবাবুর সে কথা কেন ! তবে ঈষৎ আশ্চর্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর মতো গুণী সাহিত্যিক ও সাহিত্যজ্ঞও বলিয়াছেন যে কালের বিচারে কেহই টি`কিবেন না—শুধু মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ, বা বুদ্ধদেব বসুও নন—শুধু—নিতান্তই শুধু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত। মন্মথবাবু ত জানেন সুচিন্তিত 'প্রগতি'র পাতায় প্রমথবাবুকে খুবই সুখ্যাতি করা হয়। সেই পিতৃতুল্য প্রমথবাবুর কথা নিশ্চয়ই শ্রোতব্য। কাজেই রবীন্দ্রনাথ অমর কবি একথা মানিতেই হইবে। না মানিলে 'আমরা'র পিতৃতুল্য প্রমথবাবুকে ও 'প্রগতি'কে না মানা হয়। এবং একথা না মানিলে, প্রমথবাবু

সবচেয়ে রাগ করেন, রবীন্দ্রনাথ নাকি আবার তাঁহারও পিতৃতুল্য! মন্মথবাবু তাহাতে বলিবেন যে তাহাতে তাঁহার বা 'আমরা' সম্পর্কে বাধে না। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে তাহাতে প্রমথবাবুকে অপমানিত করার চেষ্টা হয় এবং সে চেষ্টা 'শনিবারের চিঠি'ই করেন। এখন, যে কবি চিরকালের কবি তিনি কেমন করিয়া নামমাত্র ভাবরস লইয়া ও কল্পনা বিনাই (বিধাতার আশীর্বাদ ত নাইই) চিরকালের কবি হইতে পারেন তাহাই বিচার্য। কিন্তু এ বিচার আধুনিক 'হিং টিং ছট্'। কাজেই এ বিচার, প্রথমতঃ রবীন্দ্রভক্ত, দ্বিতীয়ত সাধারণ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির করা ঠিক হইবে না। মন্মথবাবুই এ বিচার করিবেন।

যাহা হউক, মন্মথবাবু আমাদের যে সান্ত্বনা দিয়াছেন তাহাতে সত্য আছে। তিনি বলিতেছেন, যাহা হউক এরকম divine লাইন রবীন্দ্রনাথে নাই বলিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। খুব কম কবিরই আছে। যতীন্দ্রনাথও এই রকম লাইন ঝুড়ি ঝুড়ি লেখেন নাই।' কথাটি সত্য কিন্তু সান্ত্বনা নয়। কারণ আমরা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের তথা সাহিত্যের ভক্তেরা এ বিষয়ে শোক বা দুঃখ করিয়া কাঁদি নাই। এই ত আমাদের গর্ব, আমাদের আনন্দ যে এইরকম 'divine লাইন রবীন্দ্রনাথে নাই।' রবীন্দ্রনাথ যে সত্যকার কবি, তিনি ত divine দেবী চন্দ্রমার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কবিতা লেখেন নাই আর যতীন্দ্রনাথেও যে এই divine বস্তু 'ঝুড়ি ঝুড়ি' নাই তাহাও সত্য এবং তাহাও আমাদের গর্ব। যতীন্দ্রনাথ যদি ঐরকম লাইন 'ঝুড়ি ঝুড়ি' লিখিতেন তাহা হইলে সে ঝুড়ি বহিতে আমরা রাজি হইতাম না। কারণ ও ঝুড়ির বেতের ফাঁক দিয়া জল গড়াইয়া জামা ভিজাইয়া দেয়। এবং সে জল sentimentalismএর অশ্রুজল ও সে তো imagination নয়—fancy. কিন্তু ভাগ্যিস ঐ বেয়াড়া বস্তুটা—ঐ 'divine inspiration'এ মর্ত্যলোকে বেশী আসে না! আসিলে আরো অনেক কিছুইত হইত, কিন্তু খবরের কাগজ যে খোলা যাইত না! কাহার স্কন্ধে স্বর্গ হইতে অপ্সরা নামিয়াছে ও তিনি কি করিয়াছেন শুধু এই দেখিতাম। আর একটা ভয়ানক কিছুও হইত—divine প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত প্রতিযোগিতায় আধুনিক সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হইত।

আর একটা মহাসত্য মন্মথবাবু বলিয়াছেন, 'যারা কাব্য পড়ে, তারা জানে সত্যিকার imagination কত দুর্লভ। তাই তারা তাহাকে কাব্যচর্চার শ্রেষ্ঠফল জানিয়াও তাহার জন্য হাহুতাশ করে না'। কথাটি সত্য। আমরা—রবি ভক্তেরা তাই সব কবির মধ্যে imagination খুঁজি না। যতীন্দ্রনাথের কবিতায় তাই আমরা খাঁটি fancyর চমৎকার খেলাতেই মুগ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ Keatsএর কবিতার emotional স্থানটুকু তুলিয়া দিয়া বলিয়াছেন, 'একে ইন্‌টেন্সিটি বলা চলেনা। এ, রুগ্নচিত্তের অত্যুক্তি, এতে অস্বাস্থ্যের দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে।' শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ ইহাতে বলিতেছেন, 'কেন চলেনা? আলবৎ বলা চলে।' কিন্তু মন্মথবাবুর অবগতির জন্য বলিতেছি যে 'আলবৎ'ত সামান্ত কথা, আস্তিন গুটাইলেও রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য।

Keatsএর রচনায় যে decadenceএর পূর্বাভাস আছে, তাহা যাহারা কাব্য পড়ে ও বোঝে, তাহারা জানে। এবং decadence যে রুগ্নচিত্ততা তাহাও তাহারা জানে। 'ইন্‌টেন্‌সলি feel' করিতে গেলে যে চিত্তবৃত্তির স্বাস্থ্য ও সতেজতা চাই, তাহা রুগ্নচিত্ততার বিরোধী। ধানের ক্ষেত থেকে বর্গা করিবার কাঠ চাওয়াও ইহার চেয়ে কম হাস্যকর। Sentiment ও setementalism যে একান্ত নয় তাহা কি মন্মথবাবু জানেন না? রুগ্নচিত্তের intensely feel করিবার ক্ষমতা নাই, এ ত একটা গাধাও মানিয়া লয়।

অতঃপর লেখক প্রশ্ন করিতেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ মরামানুষের দেহ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে রাজি আছেন কিনা? Intensity ও Imagination এর কাব্যে স্থান বিচারে 'দেহ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি'র কথা মন্মথবাবু কেন বলেন, তাহা যাহারা 'দেহ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি' করেন ও মনস্তত্ত্বও বোঝেন, তাঁহারাই স্থির করিবেন। কিন্তু মন্মথবাবু বলিতে পারিবেন নিশ্চয়ই 'দেহ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি বস্তুটি কি? রবীন্দ্রনাথ রাজি আছেন কিনা, তাহা তিনিই বুঝিবেন। তবে রবীন্দ্রনাথ 'মরা মানুষের দেহ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে রাজি আছেন কিনা' তাহাই 'আসল কথা' নয়। আসল কথা হইতেছে ইন্‌টেন্সিটি সাহিত্যের একটি অঙ্গ কি তাহাই সাহিত্য? সে আলোচনা পরে করিতেছি। উপস্থিত মন্মথবাবুর জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বলিতেছি, মরা মানুষের রূপও শিল্পে যথেষ্ট আদর পায়। লেখক হয়ত জানেন না যে ক্রুশ-বিদ্ধ একটি মরামানুষের দেহ যুগে যুগে য়ুরোপ নামক মহাদেশে অনেক কবি ও বহু বহু মহাশিল্পীকে রূপসৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে। Poe ও Baudelaire এর রচনায় ঐ তথাকথিত 'প্রাণের তেজ ও বেগ' না থাকায় কি তাঁহারা মোহিতলাল বা বুদ্ধদেব বসুর পাশে স্থানই পান না, নাকি? 'Salome' ও 'প্রাণের তেজ ও বেগ'-বিহীন রচনা, তাহা কি সাহিত্য নয়? Wilde এর 'Sphinx' কবিতাও 'প্রাণের তেজ ও বেগ' শূন্য ত, তাহাও কি সাহিত্যে স্থান পায় না? Swinburne এর 'Poems and Ballads' কবিতাগ্রন্থও ত 'প্রাণের তেজ ও বেগ'-বিহীন, তাহা ত তাহা সত্ত্বেও সাহিত্য। মন্মথবাবু পূর্বে বলিয়াছেন, 'সুন্দর রমণীর প্রাণহীন দেহ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া কে কবে তৃপ্তি পাইয়াছে?' 'সুন্দরী রমণীর প্রাণহীন দেহ লইয়া নাড়াচাড়া' করা যে আইন থাকিতে বিশেষ সুবিধার নয়, মন্মথবাবু তাহা জানেন না, বা emotionএর intensityতে মানেন না হয়ত। কিন্তু ঐ 'তৃপ্তি'টির সংজ্ঞা কি? এবং তাহার সহিত সাহিত্যের সম্পর্ক কি? মন্মথবাবু কি জানেন না, সত্যকার আর্টিষ্ট যিনি, তা তিনি সাহিত্যিক বা চিত্রকর যাহাই হউক না কেন, তাঁহার কাছে 'সুন্দরী রমণী', 'প্রাণহীন দেহ', 'নাড়াচাড়া' ও 'তৃপ্তি' বলিয়া কোনো কথাই নাই? মোনালিসাকে দেখিতে ভাল নয়। Wattsএর শ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট সব কয়টি 'অরমণী' পুরুষের। শতশিল্পীর চিত্র 'Pieta' ও 'Crucifixion'ত 'প্রাণহীন দেহে'র ছবি। 'ডোরিয়ান গ্রে' 'রমণী' হীন রসসাহিত্য। 'In Memoriam' 'Adonais' 'Lysidas' মৃত পুরুষ লইয়া কাব্য। শিল্পের শ্রেষ্ঠ দুইটি বিকাশমূর্তি

বুদ্ধমূর্তি ও প্রজ্ঞাপারমিতামূর্তিওত 'প্রাণের তেজ ও বেগ'-বিহীন। 'সুন্দরী রমণীর প্রাণহীন দেহ লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া' 'তৃপ্তি' বাস্তবজীবনে পাওয়া যায় না, ইহাই যদি মন্মথবাবু 'ইঙ্গিতে' বলিয়া থাকেন, ত তাহার আলোচনা তিনিই করিবেন। তবে আসল কথা হইতেছে জীবনে intensity থাকিলেই তাহা সাহিত্যের মধ্যে আসন পায় না। কাব্যে দেহ লইয়া—তা সে প্রাণবন্ত বা প্রাণহীন রমণী বা পুরুষ, যাহারই হউক না কেন—নাড়াচাড়া করিবার কোন দরকার নাই। কাব্যটা শুধুই ত intensity নয়। শুধুই ত তাহা 'শৃঙ্গারবিলাস' নয়।

মন্মথবাবু তারপর নিজের পাণ্ডিত্যে নিজেই তলাইয়া গিয়াছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'bald Style তাঁর রূপ নয়, সে রূপে আমরা মুগ্ধ হইনা। কিন্তু তাঁর সাদা কথায় যে simple, sincere, intense emotion প্রকাশ পায়। তাহাই আমাদের হৃদয়ে তোলপাড় তোলে।' Bald Style বলিতে বুঝায় সাদাসিধা স্টাইল—অর্থাৎ যে রচনায় সাদা কথায় সরলভাবে রসটা প্রকাশ হয়। মন্মথবাবু বলিতেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই সাদা রূপ তাঁহাকে (বা তাঁহাদের) মুগ্ধ করে না। তারপরই বলিতেছেন তাহা তাঁহার (বা তাঁহাদের) হৃদয়ে তোলপাড় তোলে'। মুগ্ধ করে না অথচ তোলপাড় তোলে। ইহা যে স্ববিরোধী হইয়া পড়িল! আর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি Shelly যে 'হৃদয়ে তোলপাড়' তোলেন?

'দুঃখ করো অবধান দুঃখ করো অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।'

—এই তিন লাইন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'কথাটা রিপোর্ট করা হল মাত্র, তার রূপ ধরল না।' মন্মথবাবু বলিতেছেন, 'ইহার সম্বন্ধে একথা বলা চলে না যে রূপ ধরে নাই বলিয়া ইহা কাব্য হয় নাই। ইহারও একটা রূপ আছে বই কি!' থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা 'সাহিত্যরূপ' নয় একথাও বলিতে হইবে বই কি। পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, রূপের সম্পূর্ণতা বিচারেই কাব্যবিচার চলিবে। ইহাতে রূপ সম্পূর্ণ নয় তাই বলিয়াছেন 'রূপ ধরল না।' কেন ধরিল না সেকথা তিনি বলেন নাই, কবিতাটির analysis তাঁহার উদ্দেশ্য নয়, কথাপ্রসঙ্গে একটা উদাহরণ মাত্র দিলেন। 'emotional exitement' থাকা সত্ত্বেও 'রূপ ধরল না' একথা তিনি বলেন নাই—যদিও সেকথা বলিলেও কিছু অন্যায় হইত না। 'ফাজলামী' যদি 'রূপ' পাইতে পারে, ত ফাজলামীতে ইমোশনই বা থাকিবে না কেন? এমনকি অতিমাত্রায় 'emotional exitement' হইলেই অনেক সময়ে ফাজলামী করিতে হয়—যুক্তি বলিয়া বস্তুটা ত তখন থাকে না। ইহার প্রমাণস্বরূপ উদাহরণও মন্মথবাবুকে এখনই দেখাইতে পারি। ফাজলামীতে ইমোশন নাই কেন, তাহার যুক্তি মন্মথবাবু দেন নাই, শুধু বলিয়াছেন, 'ফাজলামীকে আমরা ইমোশন বলি না, তাই ইহা কাব্য হয় নাই।' 'তাঁহারা' না বলিলেই যে তাহা দুনিয়ার সকলকেই মানিতে হইবে, ইহা যুক্তি নয়।

এই সূত্রে পোপের সম্বন্ধে আবার মন্মথবাবু বলিতেছেন 'উঁচুদরের ত দূরের কথা, তাঁহার কবিতাকে সত্যিকার কাব্য বলিয়া স্বীকার করিব না।' স্বীকার করিবেন না ? নাই করিলেন। তাঁহার স্বীকার বা অস্বীকারে কিই বা আসিয়া যায় ! রোমান্টিক মতবাদ একটা মতবাদই, তাহাই সাহিত্য নয়। পোপ সম্বন্ধে মন্মথবাবুর উক্তি অনেক সাহিত্যিক একেবারেই মানেন না। অনেকে উহা মতবাদ মাত্র বলেন। সাহিত্য, বিশেষ ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও রসবোধশালী সমালোচক ত পোপের সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন, 'The best plan is to admit that it is poetry—' মন্মথবাবু ইব্‌সেনকে কিছু খাতির করেন দেখিতেছি উক্ত বিখ্যাত সমালোচক বলিতেছেন, 'to admire Ibsen and Tolstoi...is to come back a long way towards the position held by Pope and Swift, towadrs the supposition that the poet is not dazzled by lovely illusions and the mirage of the world, but a grown up person to whom the limits of experience are patent, who desires, above all things, to see mankind steadily and perspicuously.'

আর emotional excitement বিনা লেখক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন না, তাহারই বা স্থিরতা কি ? জনৈক বিখ্যাত সাহিত্যিক তো বলেন, মানুষ লেখে দুটি mood-এ—একটি চাঞ্চল্য ও আর একটি অবসাদের। 'Emotional exitement', 'emotional exitement' করিয়া মন্মথবাবু পাগল হইলেন। 'এদিকে খেয়াল করেন নাই' যে 'emotional excitement' থাকিলেই যদি সাহিত্য হয়, তাহা হইলে দেশবিদেশের নিষিদ্ধ লেখকেরাও সাহিত্যিক, কারণ তাঁহাদের লেখাও কোনো বিশেষ ইমোনাল এক্‌সাইটমেণ্টে ইন্‌টেন্স্‌। আর শুধু intensity নয়, imagination ও তাঁহাদের প্রচুর। 'বিদ্যাসুন্দর'ই ধরা যাক্‌ —কোথায় কর্ণাট্‌ দেশ, কোথায় বর্ধমান আর কোথায় সুড়ঙ্গ—তিনটি দৃশ্যের একত্র সমাবেশে ভাবের অভিব্যক্তি কি ! কি কল্পনা ! আর বিহারদৃশ্যে intensity কি ! কিন্তু ভারতচন্দ্রের গুণমুগ্ধ প্রমথবাবুও ইহাকে সাহিত্য বলেন না ! আশ্চর্য ! এমন 'emotional exitement' এমন 'অদ্ভুত কল্পনাশক্তি' ! তবু ইহা খারাপ। সত্যই বিচক্ষণ ব্যক্তিদের খাতির করা 'ঝকমারী'।

মন্মথবাবু বলিতেছেন, 'আসল কথা হইতেছে রূপসৃষ্টি রসসৃষ্টি নয়, কারণ ফাজলামীকেও রূপ দেওয়া যাইতে পারে, শুধু সত্য কথাকেও রূপ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কাব্যে ইহাদের স্থান নাই।' কেন নাই ? আলবৎ আছে। ফাজলামীর রসটিকে সাহিত্যরূপে ফুটাইতে পারিলেই তাহা কাব্য বা সাহিত্যে স্থান পাইবে। প্যারডির স্থান সাহিত্যে বরাবর আছে। এবং প্যারডি ফাজলামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কবি হইতে গেলে মন্মথবাবুর মতো 'বন্দী' বা 'পাপী' হইয়া দেহতত্ত্বের সমস্যায় মাথা গরম করিয়া (আধুনিক সমালোচক ত আধুনিক বাংলাসাহিত্য দেহাত্মবাদের সাহিত্য বলেন !) বা দুঃখবাদের 'মরুশিখা'য় চোখ

রাঙাইয়া লিখিতে হইতে পারে। কিন্তু এ নবসাহিত্যতত্ত্ব শুধু মন্মথবাবু ও তাঁহার চেলাদেরই জন্য। 'আসলকথা' হইতেছে intensity সাহিত্য নয়, তাহা—রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহাই—অর্থাৎ সাহিত্যের একটি গুণমাত্র। সুন্দরী রমণীর প্রাণবন্ত দেহের রূপ শিল্পে বা সাহিত্যে ফুটাইতে হইলে শুধু intense feeling এর স্থান বক্ষস্থল আঁকিলেই বা তাহার বর্ণনা করিলেই শিল্প বা সাহিত্য হয় না—আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অবশ্য কিছু বলিতেছি না। ইন্‌টেন্সিটি সাহিত্যরূপের একটা অঙ্গ একথা রবীন্দ্রনাথ বলার পরেও মন্মথবাবুর কাব্যের ভবিষ্যৎ ইমোশান বিনা কি হইবে বলিয়া নাটকীয় উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বাসমাত্র। সে সম্বন্ধে বলিবার বা করিবার কিছুই নাই—বিস্ময় প্রকাশ ও হাস্যছাড়া। কিন্তু মন্মথবাবু কি জানেন না যে তাঁহার নাটকীয় উচ্ছ্বাসে 'ভবিষ্যৎ' কিছুমাত্র বিচলিত হইবে না?

লেখকের নবসাহিত্যতত্ত্বের যুক্তিহীনতার একটি দিক ত আলোচিত হইল। সেদিক ছাড়িয়া দিলাম। ধরিয়া লইলাম intensityই সাহিত্য বিচারের দাড়ি-পাল্লা। তাহা হইলে কথাটা হইতেছে যে যাহাতে intensity আছে, তাহাই সাহিত্য—তা সে নিষিদ্ধ পুস্তক হইলেও। তা না হয় হউক, কিন্তু তাহা হইলে পরস্পরের পার্থক্য কোথায়? মোহিতলাল প্রভৃতির intensity আছে, দান্তে, সেক্‌স্‌পিয়ার, ভিক্টর হ্যুগো, টুর্গেনিভ—সংখ্যাতীত লেখকেরও আছে, সুতরাং তাহারা সবাই একগোত্রে পড়েন। অর্থাৎ মোহিতলাল প্রভৃতি দান্তে, সেক্‌স্‌পিয়র, হ্যুগো প্রভৃতির গলা জড়াইয়া গল্প করেন!

কোন বিশেষ 'emotional excitement' হইতেই 'শনিবারের চিঠি'র 'কচি ও কাঁচা' রচিত হয়, তাহা নিশ্চয়ই সাহিত্যের প্রথম স্তরে পড়ে—কারণ ও রচনায় 'emotional excitement' একেবারে 'intensity'র জমাট অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। আর একটি কথা মন্মথবাবু কে জিজ্ঞাসা করি, 'কবির হৃদয়ে যদি সত্যি কোন emotional Sentiment ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা আপনা হইতেই একটি বিশেষ প্রকাশরূপ পাইবে।' এ কথার সার্থকতা কি? 'বিষয়টি রূপে মূর্তিমান যদি হয়ে' থাকে, তাহ'লেই কাব্যের অমরলোকে সে থেকে গেল।'—রবীন্দ্রনাথের একথা কি এতই কঠিন যে মন্মথবাবু আবার নবতত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন? আর কি নূতন কথা! 'ক্ষুধায়ই মানুষ ভাত খায়'! আর 'কবির হৃদয়ে'—কথাটির অর্থ কি? 'Emotional excitement-এ কুলাইল না শেষটা আবার 'কবির হৃদয়ে' ধরিত হইল! কিন্তু কবিরাও ইমোশনের আঠা বিনা কাব্যরচনা করিয়াছেন; Eschylus এ 'Prometheus Bound' বা Swinburn এর Atalanta in Calydon' তাহার প্রমাণ। Goethe'র 'Faust' তাহার প্রমাণ। Browning এর 'Paracelsus' 'Sordello' তাহার প্রমাণ। এবং 'কবির হৃদয়ে' ও যে 'emotional exceitement ঘটিয়া থাকে, 'তাহা যে আপনা হইতেই একটি বিশেষ প্রকাশরূপ' পায় না তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ Verlaine। জীবনে তাঁহার এমন অনেক emotion এ চটচটে দিন গিয়াছে যাহাতে অন্তত intensityর অভাব ছিল না—কিন্তু সাহিত্যে

তাহার প্রকাশ একেবারেই হয় নাই। Shakespeare এর বহু আলোচিত সনেটগুলি কোন্ emotion হইতে রচিত সে সম্বন্ধে ও সে emotion সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'Dorian Gray' লিখিতে তাঁহাকে স্ববর্ণিত emotion এ excited হইতে হইয়াছিল কিনা সে প্রশ্ন প্রকাশ্য আদালতে উঠে এবং বিচারক তাহাকে অর্থহীনই বলেন। Dostoievsky Raskolnikff চরিত্র বর্ণনা করিতে নিজেও Sincerely ও intersaty খুনের emotion feel করিয়াছেন কি না সে প্রশ্ন বুদ্ধিমান কেহ করে না। Arnold Bennett এর একটি বইয়ে মানুষের মৃত্যুকালে সে যে emotion feel করে sincerely, ও intensely, তাহার intense ও sincere প্রকাশ ও বর্ণনা আছে। Bennett কিন্তু এখনও মরেন নাই বা মরিতে বসেন নাই এবং সে বই প্লাঞ্চেটের সাহায্যে লেখা নয়।

আর ইহা শুধু উপন্যাসেই নয়, কাব্যেও ইহা দেখা যায়। এবং মূলত কাব্যও গদ্য সাহিত্যে বিশেষ বিভিন্নও নয়। অনেক সাহিত্যজ্ঞ কাব্যকেও Subjective-এর চেয়ে objectiveই বলিতে চান। Swinburn 'Laus Veneris', 'Dolores', 'Les Noyades' ইত্যাদি লিখিতে এসব কবিতার intense emotion sincerety feel করিয়াই লেখেন, তাহা নাও হইতে পারে। 'Laus Veneris' এর emotion, 'Les Noyades' এর emotion ঊনবিংশ শতাব্দীতে feel করা অসম্ভবই ছিল। Swinburne নিজেই বলিতেছেন যে তাঁহার এই সব কবিতার কাব্যগ্রন্থে 'there are sketches from imagination,' ও তাঁহার মানসীদের বলিয়াছেন daghters of dreams and of stories.' Browning 'Ring and the Book' লিখিতে যে count Guidoo বা 'Fiftine at the Fair' লিখিতে Don Juan-এর emotion এ নিজেও excited হইয়াছিলেন, তাহা Browning এর জীবন যারা জানে, তারা বিশ্বাস করিবে না। Sophocles যে তাঁহার Oedipus নাট্যকাব্য এর লিখিতে Jocasta প্রতি Oedipus এর emotion এ excited হন তাহাও ত কেহ বলে না। এবং এই রকম উদাহরণ অজস্র আছে।

বুদ্ধদেব বসু হয়ত intensity feel করিয়াই 'বন্দীর বন্দনা' বা 'পাপী' লেখেন কিন্তু তিনিই ত সকল কবির প্রতিনিধি নন। হৃদয়কেই বল্লভ সকল কবিই করেন না। মনের প্রাধান্য সাহিত্যে আজও পর্যন্ত চলিতেছে।

তারপর যে আলোচনা মন্মথবাবু করিয়াছেন তাহার জবাব ভদ্রলোকে সবিস্তারে দিতে পারে না। প্রথমত তাহা একেবারেই অর্থহীন ও অবান্তর। দ্বিতীয়ত তাহা রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোহিতলাল ও বুদ্ধদেব বসুর 'তুলনায় সমালোচনা' রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' (বৈশাখের 'প্রবাসী') রচনার সহিত তাহার বিন্দুমাত্র যোগ নাই ও রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যরূপ' নামধারী প্রবন্ধে ইহার সার্থকতাও নাই যখন, তখন তাহার আলোচনাও অনাবশ্যক। এবং মোহিতলালের ও বুদ্ধদেব বাবুর আমি ভক্ত পাঠক।

শুধু এইটুকু বলিয়া মন্মথবাবুর নিকট হইতে বিদায় লই—রবীন্দ্রনাথের কবিতা না বুঝিয়া নিকৃষ্ট বলিলেই তাহা নিকৃষ্ট হয় না এবং তাহাতে অপর কেহ বড়ো হয় না। সাদা কথাও intensity থাকে ও dramatic tone বা nervous force যে intensity of emotion নয়, তাহা যিনি বোঝেন না তাঁহার ত রবীন্দ্রনাথের তথা বিশ্বের মহাকবির কাব্যপাঠ ফলহীন হইবেই। মন্মথবাবু হয়ত পড়েন নাই কিন্তু ইহা সত্য যে অতি আবেগে মোহিতলালের সুবিশাল নাটকীয় কবিতার মতো কবিতা অনেক সময়ে আলেখ্য। আবেগের গভীরতায় প্রকৃত কবি প্রশান্তচিত্ত কবির রস রবীন্দ্রনাথের মতোই সোজাসুজি সাদাকথায় প্রকাশ পায় এবং তাহা একেবারে হৃদয়ে গিয়া লাগে। কিন্তু মন্মথবাবু কি পড়েন নাই—Our personal affinities, linkings, and circumstances have great power to sway our estimate of this or that poet's work, and to make us attach more importance to it as poetry than in itself if posselles, because to us it is, or has been of high importance' ?

লেখক যদি এখন বলেন Melozzo da Forli Raphael এর চেয়ে শিল্পী হিসাবে শ্রেষ্ঠ যেহেতু Raphael এ intensity নাই য়ুরোপের কালাশালি সমূহের ভবিষ্যৎ কি হইবে ভাবিয়া কান্নাকাটি করেন, ত তাহাতে এখন আর কেহই আশ্চর্য হইবে না। কিন্তু চাঞ্চল্য বা বিক্ষোভই সাহিত্য নয়। তাহা emotion হইতে পারে কিন্তু তাহাই intensity নয়। যে তত্ত্বে Michael Angelo ও Rodinই সর্বস্ব, যাহাতে phidias ও praxitels এর স্থান নাই, যাহাতে কালিদাসের স্থানে ভবভুতি বসেন, যাহাতে অবনীন্দ্রনাথকে ঢাকিয়া রবিবর্মা শিল্পী শ্রেষ্ঠ গণ্য হন, তাহা কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি মানিতে পারে না—মন্মথবাবু মানিলেও।

সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি একটি আলোচনার সূত্রহিসাবে-'সাহিত্য কিনা ?' তাহা নয়, 'সাহিত্যে কি বিচার্য ?' তাহাই লইয়া লিখিত ও পঠিত হয়। এবং এ প্রবন্ধের সময়াতীত মূল্য তাহার স্বাতন্ত্র্যে হইলেও, প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা স্থানকালপাত্র নিরপেক্ষ নয়।

রবীন্দ্রনাথ আলোচনার গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ প্রবন্ধটি পড়েন এবং তাহাতে এমন কথা বলেন নাই যে রূপই রসসাহিত্য, তিনি বলিয়াছেন 'রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।' ইহা সে বুঝিতে পারিয়া কেহ যদি আস্ফালন করিয়া থাকেন, ত দুর্ভাগ্য তাঁহারই। কিন্তু মণ্মথবাবু তাঁহার প্রলাপ প্রবন্ধের শেষে যে বলিয়াছেন যে এই আধুনিকদের শৃঙ্গাররসটা 'রবীন্দ্রনাথ বা আর কাহারও কাছ হইতে ধার করা নয়।' কথাটা ভারী সত্য কথা। সত্যই এ আধুনিক শৃঙ্গাররস উল্লেখযোগ্য অনিষিদ্ধ কোনো কবির কাছ হইতে ধার করা নয়—এমন কি এ আধুনিক চারইয়ার 'ইব্‌সেন, টুর্গেনিভ, হামসুন, গর্কীর কাছ হইতেও নয়।

সর্বশেষে বিশ্বপূজ্য মহাকবির নিকট মার্জনা চাহিতেছি। অজানিত কোনো দুর্বিনয় যদি প্রকাশ করিয়া থাকি ত তিনি যেন ক্ষমা করেন। তাহা স্বেচ্ছাকৃত নয়।

এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

কলকাতার এক থিয়েটারে কথাটা উঠেছিল। প্রবীণ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সস্ত্রীক 'রক্তকরবী' দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা বললেন, 'রক্তকরবী' পাঠের চেয়ে অভিনয় দেখতে আরো ভালোলাগে। ঐ ভালো লাগার কৃতিত্ব শম্ভু মিত্র ও বহুরূপী সম্প্রদায়ের। সুন্দর ভাব ও ভাষা সত্ত্বেও নাটকটিতে যে নাট্যগুণের অভাব বিদেশি পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়েছিল, সে-অভাব পূরণ করেছেন প্রযোজক ও নটনটীরা, তাঁদের নিজেদের প্রাণময়তা দিয়ে, তাঁদের আবেগবান্ বাস্তবনির্ভর রূপায়ণের আধুনিকতা দিয়ে। ফলে অধ্যাপক-দম্পতি হল্‌ডেন্‌-রা, তাঁদের নিমন্ত্রণ-কর্তা অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও শ্রীমতী মহলানবিশের মতোই খুশি হয়েছিলেন, বাংলাতেই অভিনয় দেখেশুনে। পরে হল্‌ডেন্ বলেছিলেন যে তিনি অবশ্য বাংলায় রবীন্দ্রনাথের কীর্তি বিষয়ে আমরা কী ভাবি তা জানেন। ইংরেজি অনুবাদে রবীন্দ্র-রচনাবলি তিনি মন দিয়েই পড়েছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে মহাকবি সেটা তাঁর পক্ষে বোঝা শক্ত হ'ত, যদি-না তিনি রবীন্দ্রনাথের চিত্রাবলি দেখবার সুযোগ পেতেন। রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখবার পরে তিনি কল্পনা করতে পারেন যে নিজভাষায় এই মহাপুরুষ, যাঁর হাত থেকে এইসব ছবি বেরিয়েছে, মহৎ কবি ব'লে বিবেচিত হ'তে পারেন।

সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের রচনাবলির অনুবাদ-ভাগ্য ভালো হয়নি। এবং যাঁরা বাংলার ভূমিতে রবীন্দ্র-কীর্তির মাহাত্ম্য জানেন না, তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্র-চিত্রাবলি রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রথম ও প্রত্যক্ষ পরিচায়ক হিসাবে তাই সার্থক। রবীন্দ্রনাথের চিত্রসাধনা তাঁর শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপে এবং তাঁর বহুধা প্রকাশে সম্পূর্ণতা এনেছিল। এই ব্যক্তিস্বরূপ স্বকীয় কর্মক্ষেত্রে বিরাট এবং কীর্তিতে বীরগৌরবান্বিত, যদিচ তার প্রকৃতি বোঝা শক্ত তাঁর স্বদেশে ও স্বজাতির পৌর্বাপর্য বিচার ছাড়া। অবশ্য তাঁর বিস্তারের মহাসাগরকে রূপ-নির্ণয়ে বলতে হয় প্রশান্তই। এ-কথা স্বাজাত্যা-ভিমানেও না-মেনে লাভ নেই যে রবীন্দ্র-রচনাবলিতে একটি সবল মার্জিত মনের পরিচয়টাই মুখ্য, সে-মনে ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির মর্যাদাই বেশি। কিন্তু এই ঝঞ্ঝার চেয়ে শান্তির টান, তাঁর পরবর্তীদের যাই হোক্ তাঁর কাছে মোটেই একটা অগভীর অভ্যাস ছিল না। এই অমৃতের বিশ্বাস ছিল তাঁর সমগ্র স্বভাবের গভীরে, এই বিশ্বাস তাঁর কাছে একান্ত সত্য ছিল, এতেই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের আর মানসের মহিমা।

তাঁর বিশ্বাস বা ধ্যানধারণার, বা যা তিনি তাঁর জীবনের ভিত্তিতে নিজেই গড়েছিলেন তাঁর সেই ব্যক্তিস্বরূপের বিশ্লেষণ ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন নেই। তাঁর

সরকারী জীবনীকার আমাদের দু-চার কথা যা বলেছেন তাতেই তাঁর পটভূমি খানিকটা আলোকিত : যেমন আমরা প্রভাতবাবুর জীবনীতে জানতে পারি যে তরুণ কবি ইউরোপে মানবমনের স্বাধীন উল্লাসে যখন সমধিক মুগ্ধ হলেন, তাঁর ঋষি-প্রতিম পিতৃদেব তখন তাঁকে বাড়ি ফিরে আসতে বলেন। রবীন্দ্রনাথকে যে হঠাৎ বিবাহে বদ্ধ হ'তে হয়, সে-ও প্রভাতবাবু বলেন, তাঁর গুরুজনের উদ্বিগ্ন নির্বন্ধে। কী চিরজাগ্রত মর্যাদায় এবং সম্পূর্ণ কর্তব্যবোধের আবেগে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধ'রে জীবনের সব দাবিদাওয়া পালন ক'রে যান, তা-ও আমাদের সবার জানা। কনিষ্ঠপুত্রের উপরে মহর্ষির প্রভাব খুবই গভীর ছিল, এই আধ্যাত্মিক সৌকুমার্যে এবং শালীনতায় বা নীতিনিষ্ঠায়।

অবশ্য যে-কোন ভালো জিনিসের মতোই এই সৌকুমার্য ও শালীনতারও একটা সীমাবদ্ধ দিক ছিল। রম্যা রলাঁর পাঠকদের একটি গল্প এ-প্রসঙ্গে মনে থাকতে পারে : একদা মহর্ষি দর্শনেচ্ছু রামকৃষ্ণকে বাড়ির উৎসবে নিমন্ত্রণ করেন এবং তারপরে মনে করেন যে সুসজ্জিত বাবু-সাহেব অতিথিদের মধ্যে সেই গ্রাম্যবেশ সরল ধর্মসাধককে হংসমধ্যে বকের মতো লাগবে এবং নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন।

রলাঁর এই গল্পটিতে আভিজাত্যের যে-বাধাবিপত্তি দেখা যায়, তা থেকে রবীন্দ্রনাথও মুক্তি পাননি। ভিলিএর দ্যলিল আদাঁর মতো রবীন্দ্রনাথকে কখনও অত্যুক্তি করতে হয়নি যে : জীবনযাত্রা, ওটা আমাদের চাকরবাকররাই করবে। কিন্তু আভিজাত্য যে-দেশে দুর্লভ ও প্রায়ই পঙ্গু, সে-দেশে প্রকৃত অভিজাত হওয়ার সঙ্কোচবাধা তাঁকেও ভুগতে হয়েছিল। এই বাধার মধ্যে দিয়ে তিনি অনেক-কিছু লাভ করেছিলেন, মহৎ শিল্পীমাত্রেই যেমন স্বকীয় সীমার বা নির্দিষ্টতার সদ্ব্যবহার ক'রে থাকেন! সম্ভবত তাঁর সৃষ্টিময় কল্পনার চিরবিশ্রামহীন প্রাণশক্তিও এই স্থূল ভাঙাচোরা আমাদের জীবনের সাধারণ্য থেকে আত্মসম্বরণেই তার বিরোধী জোর পেয়েছিল। অবশ্য, তিনি সারাজীবনে ধ'রে বারবার সীমানার বাইরে যাবার চেষ্টা করেছেন। এবার ফিরাও মোরে, এই আবেদন বসুন্ধরাকে তিনি বারবার বলেছেন কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে নানাভাবে এবং তাঁর বিশাল কর্মক্ষেত্রের অন্তত দুটি বিভাগে তিনি তাঁর মহৎ কিন্তু নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারের গণ্ডি থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেন। যখন জীবনাভিজ্ঞতায় তিনি নিজে সম্পূর্ণতা পেলেন পরিণত বয়সের প্রশান্তিতে এবং দীর্ঘ কৃতিত্বের সাবলীলতায়, তখনই তাঁর অসামান্য গীতিপ্রতিভায় এল দৃশ্য স্পৃশ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বহির্বিশ্বের আর মানবিক প্রেমের সৌন্দর্যের মধ্যে সহজ আত্মদানের বিহ্বল সৌন্দর্যবোধ।

তাঁর গানের এই পরিণতি বা রূপান্তরের রহস্য ঠিক প্রশান্তির মধ্যে স্মৃতিধৃত আবেগের ব্যাপারে নয়, এখানে আমরা যেন পাই এই স্থূল মর্ত্যলোকে আমাদের

বিপদসঙ্কুল জীবনযাত্রার দুঃখ-সুখ আনন্দ-বেদনাই, স্মৃতির নির্বিকার পূজার মধ্যে দিয়ে গ্রহণীয়রূপে। তাই কি চেহারায় চিরসুশ্রী রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সেই হ'য়ে উঠলেন আশ্চর্য সুন্দর পুরুষ? সে-সৌন্দর্য ত এক অসামান্য কবিমনের অসামান্য বিকাশের ঐশ্বর্যরূপই।

২

বহুকাল আগে এক আর্ট স্কুল-অধ্যক্ষ বলেন যে রবীন্দ্রনাথ ত একটা দেশলাইবাক্স আঁকতে পারেন না, তাঁকে কী ক'রে চিত্রকর বলা যায়? কথাটা হয়ত অ্যাকাডেমিক দিক দিয়ে একেবারে উদ্ভট নয়; বিশেষত যখন এ-দেশে বহু নবীন শিল্পী, যাকে বলে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট, তার স্বাধীন বিন্যাসে মেতে যান, যদিও ঐ অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট য়ুরোপের বুর্জোয়া রেনেসাঁসেরই আবশ্যিক প্রতিক্রিয়া বা পরবর্তী ধাপ। সেজানের বিষয়েও এবংবিধ কথা শোনা যেত, কারণ ধ্রুপদী ইতালিয় বা ওলন্দাজ ওস্তাদের মতো তুলি ব্যবহার এবং রঙের মসৃণ প্রয়োগ সেজানের কাজে দুষ্প্রাপ্য। গগ্যাঁ ও দুওনিএর রুসোকেও শখের চিত্রকর বলা যায়। কাব্য বা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কেন জানি না আমরা দেশলাইবাক্স বর্ণনার ক্ষমতা দাবি করি না—একেবারে করি না বললে ঠিক হবে না, অন্তত ঠিক ছবি-আঁকার মতো করি না।

সে যাই হোক্, আরেকজন আর্ট স্কুল-অধ্যক্ষ এ-আপত্তির জবাব দেন। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগেই ড্রইং অভ্যাস করতেন। কেউ-কেউ রবীন্দ্রনাথের চিত্রলোকে আবির্ভাবের ব্যাখ্যায় বলেন যে তাঁর চিত্রের জন্ম রচনাখসড়ার কাটাকুটিতে তাঁর লিপি-রেখার প্রতি সার্থকতার বা শ্রী-র সন্ধানে মনোযোগে। সম্ভবত এ-ও বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের শতাব্দী সাবালক হওয়ার আগে ছবি আঁকেননি কারণ ততদিন এ-কালের আবহাওয়ার অপেক্ষা ছিল। তিনি এ-কালের শিল্পী, তাই তাঁকে ষাট বছর অবধি এ-কালের অপেক্ষা করতে হ'ল এবং তারপরে তাঁর ছবি আঁকা চলল আবিষ্কারের আনন্দিত প্রাবল্যে। রবীন্দ্র-চিত্রাবলি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কীর্তির এবং আমাদের শিল্পের ইতিহাসে উভয়তই গভীর মনোযোগের দাবি রাখে।

লেওনার্দো বোধহয় কাব্যের তুলনায় চিত্র যে আরও সন্তোষজনক শিল্প সে-কথা ঠিকই বলেছিলেন, কারণ, "প্রকৃতির অফুরন্ত রচনাবলি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণভাবে ও প্রচুরভাবে বুঝতে গেলে মানবমনের বাতায়ন অর্থাৎ চোখের মাধ্যমই প্রধান এবং কান হচ্ছে দ্বিতীয়, যার মর্যাদা আসে চোখে যা দৃশ্য তারই ধ্বনি শুনতে পেরে।" রবীন্দ্রনাথ মনে হয় ধ্বনি আগেই শুনতে পেয়েছিলেন, তিনি যে গায়ক ও সঙ্গীতকার ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন, সেই সাধনাই তাঁর শ্রবণের সহায় হয়েছিল। প্রকৃতির রচনা তিনি দেখেন শোনেন ভালোবাসেন, সঙ্গীতের

প্রতিধ্বনি এল তাঁর কথায় ও সুরে একান্ত হাজার গানে। গানের এই সম্ভ্রান্ত অভ্যাস ছন্দের সাধনায় ও কর্তৃত্ব অর্জনে তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল। বর্তমান লেখকের মনে আছে, এ-কথায় তিনি খুশি হ'য়ে সায় দিয়েছিলেন। তাছাড়া, দাভিঞ্চির মত সত্ত্বেও বলতেই হবে তাঁর দীর্ঘ এবং বিচিত্র কাব্যের অভিজ্ঞতায়, পদ্যে ও গদ্যে তাঁর সেই শক্তি আয়ত্তে এসেছিল, যাতে মানুষ তার নিজের বোধ্য বিশ্বকে কাব্যে নির্বিশেষ নবসৃষ্টিতে, নব ধারণায় পুনঃসংগঠিত করতে পারে। এমনকি তাঁর কাব্যের বীজবপনে এই ধারণামূলক বা বুদ্ধিমূলক অভ্যাসের জন্যই বোধহয় রবীন্দ্র-কাব্যের জগতে একদিকে সীমায়িত হয়েছিল, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়াধিক সাহায্য পেলেও; শুধু তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক ইতিহাসের প্রভাবে নয়।

লেওনার্দো কাব্যের কথা সঠিক মনে না-রেখেই বলেছিলেন: মানবদেহের প্রতিপ্রকাশের ব্যাপারে কবির কর্ম এবং চিত্রকরের কর্মে সেই তফাৎ, যে-প্রভেদ খণ্ডিত এবং অখণ্ড শরীরের মধ্যে।—তিনি কবিকে সঙ্গীতকারের সঙ্গে তুলনা করেন: কিন্তু কবি বহুস্বরের সুরবদ্ধ বিন্যাসে অক্ষম কারণ বহু কথা একসঙ্গে বলার ক্ষমতা তাঁর নেই, চিত্রকর যা করতে পারে তার ষড়ঙ্গ সুষমায়, যাতে সমগ্রের অংশগুলি একই সঙ্গে সক্রিয় এবং একই সময়ে সমগ্রে ও অংশে দৃশ্য হ'য়ে ওঠে। ইত্যাকার কারণে কবির স্থান চিত্রকরণের অনেক নিচে, গোচর বস্তুর প্রতিপ্রকাশে এবং সঙ্গীতকারের অনেক নিচে, অগোচর বস্তুর ক্ষেত্রে।

প্রক্রিয়াগুলি যে ভিন্ন তাতে সন্দহ নেই। কারণ প্রতিটি শিল্পেই তার বিশিষ্ট কর্মকাণ্ডবশত বিশিষ্ট সুবিধা ও অসুবিধা আছে। যা চোখের শিল্প তাতে যেমন কানের কাজ হয় না, তেমনি যা মনের শিল্প তাতে যদি কেউ চোখের শিল্পের কাজ করতে যায় বা দাবি করে, তাহ'লে তা ত ব্যর্থ হবেই। মানুষের অভিজ্ঞতার অনেক-কিছু তাই চিত্রের আয়ত্তে নেই তার কর্মপ্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যের জন্যই। 'দিভিনা কম্মেদিয়া', 'কিং লিআর' বা 'অডিসি' কাব্যেই সম্ভব, লেওনার্দোর হাতে নয়। এবং কাব্যেও মালার্মের পর থেকে বস্তুর এক সংহত রূপের দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। লেওনার্দোর পরের জ্ঞানে এ-ও জানা কথা যে চিত্রকরের চোখ মানব-দেহের খণ্ডিত রূপই একবারে দেখতে পায়, চোখের নিয়মই তাই; সমগ্রের অংশগুলি শিল্পীর সংযোজনা, একরকম গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। এমনকি দুই চোখ এক দেখে না। তবু লেওনার্দোর বক্তব্যে একটা অর্ধসত্য আছে এবং রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু কবি হতেন, তাহ'লে তাঁর গান ও ছবির ঐশ্বর্য থেকে আমরা বঞ্চিত হতুম এবং তাঁর শিল্পীসত্তাও তুলনায় অসম্পূর্ণ থাকত। গান ও ছবির মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ, তাঁর কাব্যের কীর্তি ও সীমা মুক্তি পেয়েছিল।

পৃথিবীতে আরো দু-চারজন মহাকবি ছবি এঁকেছেন, যেমন গয়টে বা উগো এবং চিত্রশাস্ত্রে আলোক ও বর্ণতত্ত্বে গরটের দান স্মরণীয়। পিকাসোর কবিতাও

এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ইংরেজিতে ব্লেক্ আছেন একাধারে কবি ও চিত্রকর। কুমারস্বামী রবীন্দ্র-ব্লেক্ তুলনা করেছিলেন কিন্তু ঠিক মর্মে প্রবেশ করেননি, ব্লেকের ছবি ও কবিতা একে অন্যের রূপান্তর মাত্র, রবীন্দ্রনাথের ছবি কবিতার সম্পূরক।

আবার, যদিও রবীন্দ্রনাথ চিত্রকলায় এমেচ্যর বা শখের কর্মী (কবিতাতেও কি তিনি তাই নন ? কোন কবিতার স্কুলে ত তিনি পাশ করেননি !) তবু তিনি এলফ্রেড ওআলিস্ বা রামজোড়ের সঙ্গে তুলনীয় নন কারণ তাঁর চিত্রকলার ভিতে ছিল এক বিদগ্ধ সভ্যতার সজ্ঞান উত্তরাধিকারী বিশ্বজ্ঞ ভারতীয়ের ষাট বছরব্যাপী শিল্পসংস্কৃতির একনিষ্ঠ চর্চা। তবে এই দৃশ্য বিশ্বের আক্রম এবং সে-বিশ্বকে রূপ দেবার নবাবিষ্কৃত ক্ষমতায় তাঁর উল্লাস প্রচণ্ড এবং ছবি আঁকা ব্যাপারটা পরিণত-বয়স আমাদের শুভ্রকেশ কবিকর্তার কাছে শিশুর মতোই একটা উত্তেজনার অভি-যান হ'য়ে উঠেছিল। শ্রীযুক্তা যামিনী রায় যখন তাঁর ছবির প্রশংসা করেন তাই তখন তিনি অত খুশি হন :

"আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের এই স্বীকৃতি লাভ ক'রে যেতে পারলুম। এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর-কিছু হ'তে পারে না।"

আরেক চিঠিতে তিনি লেখেন : "ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এইজন্যে তার একটি অহেতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি—সে যে কেবল সুন্দর দেখি ব'লে খুশি হই তা নয়। দৃষ্টির ওপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক ক'রে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হ'য়ে থাকতুম—কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়ত, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখত।

"এই হ'ল ছবির জগৎ। যে-দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নেই, তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হ'য়ে থাকে। সে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝব। দেখবার জিনিস সে আমাদের দেয়—না-দেখে থাকতে পারিনে ; তাতে খুশি হই। মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে—নানারকম ছাপ পড়েছে মনে। যে-রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার ক'রে নেয় কোন একটা বিশেষত্ববশত—তা সুন্দর হোক্ বা না-হোক্ মানুষ তাকে আদর ক'রে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই, দেখতে ভালোবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিষ জেগে উঠছে। সে কোন তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালো-মন্দ বিচারের কোন উদ্যোগ নেই। আমি আছি—আমি নিশ্চিত আছি এই কথাটা সে

আমাদের কাছে বহন ক'রে আনে। তাতে আমি আছি—এই অনুভূতিকেও কোন একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কী—এ-প্রশ্নের উত্তর এই যে—সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, ততই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালো। তার ভালো-মন্দের আর কোনরকম যাচাই হ'তে পারে না। আর যা-কিছু সে অবান্তর—অর্থাৎ যদি সে কোন নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান। তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মন টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছপালা জীবজন্তু সকলই আপন-আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হ'য়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখবার আনন্দ এর মর্ম-কথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট ক'রে কানে তুলেছিলেন ব'লে আমার বোধ হয়নি। সেইজন্য ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম—তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো ক'রে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হ'য়ে আপনার নানা কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না; চিত্রকরের চিত্র বলে "অয়ম্ অহম্ ভো"—এই যে আমি এই।"

যখন তিনি আগের পঁচাত্তর বছরকে পিছনে ফেলে আবার এক নতুন আরোগ্যের যাত্রায় চলেছেন, ভাঙা ছন্দে অনিশ্চিত নতুন ভাষায়, সেই শেষ বয়সের কবিতার একটিতে দেখি:

"এই মোর জীবনের মহাদেশে
কত প্রান্তরের শেষে,
কত প্লাবনের স্রোতে
এলেম ভ্রমণ করি শিশুকাল হতে—
কোথাও রহস্যঘন অরণ্যের ছায়াময় ভাষা,
কোথাও পাণ্ডুর শুষ্ক মরুর নৈরাশ্য,
কোথাও বা যৌবনের কুসুমপ্রগল্ভ বনপথ,
কোথাও বা ধ্যানমগ্ন প্রাচীন পর্বত

মেঘপুঞ্জে স্তব্ধ যার দুর্বোধ কী বাণী,
কাব্যের ভাণ্ডারে আনি
স্মৃতিলেখা ছন্দে রাখিয়াছি ঢাকি,
আজ দেখি অনেক রয়েছে বাকি।
সুকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করে নিঃসঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে ;
তার সঙ্গীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই।
সংকোচে সে কেন বোঝে নাই।
সৃষ্টিরঙ্গভূমিতলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতালঘাতে
উদ্দাম চরণপাতে
সুন্দরের ভঙ্গী যত অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহবন্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।
তাই আজ বেদমন্ত্রে, হে বজ্রী, তোমার করি স্তব—
তব মন্ত্ররব
করুক ঐশ্বর্যদান,
রৌদ্রী রাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষগান,
আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
রূঢ় পৌরুষের ছন্দে
জাগুক হুংকার
বাণীবিলাসীর কানে ব্যাপ্ত হোক ভর্ৎসনা তোমার॥”

অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর ছন্দ অনেক ভালো আত্ম-উপলব্ধি করেছিল, কথা বা কাব্য-সাহিত্যের অভ্যস্ত শুচিবায়ু তাঁকে 'চণ্ডালিকা'য় ব্যাহত করতে পারেনি, চিত্রকলায় প্রাচীরসীমা টানতে পারেনি। ১৯৩০-এ তিনি লণ্ডনে বলেছিলেন : “আমার মনে হ'ল যে সমস্ত বিশ্বই জীবনের ও সৃষ্টির ঐক্যের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। কবির বা শিল্পীর সেইসব সৃষ্টিরই স্থায়িত্বের অধিকার আছে, যা সামঞ্জস্যে সঙ্গত, কারণ পারস্পরিক সম্বন্ধ-যোজনই সৃষ্টির নিয়ম। আমি মাঝে-মাঝে ভাবি জিরাফের লম্বা গলাটার কী সার্থকতা। যখন ঐ-গলাটার জন্যে অতিরিক্ত দাবিটা উঠল, নিশ্চয়ই সারা শরীর বিড়ম্বিত হ'ল, এবং যতদিন-না প্রক্রিয়াটা শেষ হ'ল ততদিন নিশ্চয়ই সেটা খাপ খায়নি, তাই সমস্ত শরীরটাকে সচেষ্ট হতে হ'ল

আগন্তুককে যথোপযুক্তভাবে বরণ করবার প্রস্তুতিতে। এরকম ব্যাপার বিশ্ব ব্যেপে চলেছে।”

চিত্রে রবীন্দ্রনাথ সব বস্তুর চরম ঈস্‌থেটিক্ বা সংবেদন-উপযোগ উপলব্ধি করেছিলেন, যদিও সে-তুলনায় কাব্যে তাঁর সৌন্দর্যের মান ছিল গোঁড়া ধরনের। সাহিত্যে বারবার চেষ্টা করলেও সমগ্র বিচারে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্বে ও প্রয়োগে সুন্দরকে চিনেছিলেন তনু, পেলব, মার্জিত, আধ্যাত্মিক, একটু অভিজাতময়, একটু টেনিসনীয় ভাবে। সজনে ডাঁটার আপত্তি তিনি কাব্যে তুলেছিলেন, কিন্তু চিত্রে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, “উট কিম্ভূত জানোয়ার, কিন্তু মরুভূমিতে নিজ পারিপার্শ্বিকে, উটও সম্পূর্ণতা পায়।” কবিতার চেয়ে ছবিতে বস্তুর নিজ পারিপার্শ্বিক দেখা ও রচনা করা আরও সহজ; যদিও অবশ্য রিল্‌কে বা পাস্তেরনাকের মতো আধুনিকদের কবিতাতেও সে-চেষ্টা দেখা যায়।

৩

রবীন্দ্রনাথের দু-হাজার না-হোক বেশ-কিছু ছবি যে-ই দেখেছে সে-ই অভিভূত হয়েছে এক মহাকবির এই বিশ্বরূপদর্শনের স্বকীয়তায় ও বৈচিত্র্যে। এ এক আশ্চর্য নির্ভীক বিশ্ব, এক প্রবল ব্যক্তিস্বরূপের নিবিড় ঐশ্বর্যে বিস্ময়কর জগৎ। এ-জগতে বস্তুর প্রকাশ বহুরূপে অন্তহীন, কখন-বা বস্তুর সুকুমার পেলব প্রায় মেয়েলি লালিত্য, কখন-বা সরল বস্তু, সন্ত্রাসের বা দুঃস্বপ্নের বিশ্বের বস্তু বা সূক্ষ্ম কল্পলীল বস্তু। মনের এ-চিত্রলোকে নানা মেজাজ, গতির ও স্তব্ধতার আনন্দের ভাব, তীব্র অভীপ্সা, কঠিন উপহাস, তীক্ষ্ণ ঠাট্টা, স্নিগ্ধ মমতা। এবং প্রায় সর্বদা হাত অভ্রান্ত টানে নিশ্চিত। বেগবান্ রেখার সৌন্দর্য যেমন দুঃসাহসিক তেমনি অনিবার্য, যদিচ প্রেরণা অনেক সময়েই পরীক্ষামূলক; এমনকি স্থির পাহাড়ের বা শান্ত মুনিমূর্তির ছবিতেও মনে হয় প্রচণ্ড বেগ যেন তলে-তলে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এবং অধিকাংশ ছবিতে রঙের ব্যবহার যেমন ব্যঞ্জনাঢ্য তেমনি নব-নব-উন্মেষশালী। রবীন্দ্রনাথ কলম তুলি বা আঙুল প্রয়োগ করতেন সমান ও পূর্ণ স্বাধীনতায়, নানা কালিতে এবং নানা জাতের রঙে। মনে আছে একদিন তিনি গল্প করতে-করতে ছবি আঁকছিলেন, চেয়ারটিতে তিনি এবং বাইরের লোকটি সিল্ক-ঢাকা বিছানায় সঙ্কুচিতভাবে ব'সে। রং ফুরিয়ে গেল, কিন্তু ছবির তাগিদ নয়; চামড়ার কাজের একশিশি রং এনে ছবি শেষ করলেন, দরকার হ'লে ফুলও চট্‌কে তিনি ছবির রঙে ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আঁকার পদ্ধতিও নানা, কখন তিনি সরাসরি আঁকতেন একেবারে চূড়ান্তভাবে, কখন-বা অন্বেষী রেখাপাতে-পাতে। তাঁর ছবি দেখলেই এবং বিশেষ ক'রে, আঁকতে দেখলে বোঝা যেত যে সাহিত্য ও সঙ্গীতের দীর্ঘ অভ্যাসে

ও সিদ্ধিতে ছন্দের ও রূপের বোধ তাঁর কাছে প্রাথমিক হ'য়ে গিয়েছিল, স্নায়ুর মধ্যে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছিল।

বলা বাহুল্য, অভ্রান্ত চোখ ও হাতেরও দুর্বল মুহূর্তে আসে, মাঝে-মাঝে ধ্যানের আর নির্মাণের মধ্যে অভিন্নতা কেটে যায়। তখন বিন্যাসরীতিতে বা ছবির মেজাজে খণ্ডিতভাব আসে। কিন্তু সে-রকম কাজ গৌণ ও সংখ্যায় নগণ্য। ভালো ছবিগুলিতে, এবং সংখ্যায় তা বহু, দর্শকের চোখ খুশিতে ঘুরে বেড়ায় রেখার সঙ্গে-সঙ্গে বা মুগ্ধ হ'য়ে খুঁজে বেড়ায় রঙের বর্ণালি বা নানা দীপ্তি। এ-সব ছবিতে বোঝা যায় কীভাবে রবীন্দ্রনাথ পাশ কাটিয়ে গেছেন একপক্ষে মৃত অ্যাকাডেমিক বাস্তববাদের, যাতে প্রকৃতির পুনঃরূপায়ণ নেই, আছে শুধু প্রতিরূপ; এবং অন্যপক্ষে প্রাচ্যবাদী অধ্যাত্মবিলাসীদের নীরক্ত তনুতার। অবশ্য ভারত-শিল্পের তথাকথিত প্রাচ্যধর্মী রেনেসাঁসে রবীন্দ্রনাথেরও দান ছিল, অন্তত পরোক্ষে। এই ধারাই ছড়াল কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে, লক্ষ্ণৌ প্রয়াগ লাহোর মাদ্রাজ, সারা ভারতে। কিন্তু ফলেন পরিচীয়তে, পরে এই জীবনবিমুখ ভারতবাদী শিল্পের শিল্পমন্যতা এবং চিত্রগত দুর্বলতার বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ তাঁর নিজেরই চিত্রাবলি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চিত্রলোক ভারতীয় মানুষের ও শিল্পীরই জগৎ—যদিও রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তায় সেই জীবনবিরোধী পরোক্ষতত্ত্বের চর্চা নেই, যে-চর্চা আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর মতো পণ্ডিত ব্যক্তি প্রচলিত করেন, বিশেষত তাঁর মরমীয়া বস্টনবাসী যুগে। পেশাদার ভারততাত্ত্বিকরা আজকাল এই ভারত-ব্যাখ্যা জনপ্রিয় ক'রে তুলেছেন। কিন্তু স্টেলা ক্রামরিশ্ বা অর্ধেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিপত্তি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সত্তায় এই অলৌকিকতা নেই, তাঁর শিল্পদৃষ্টি এই রৌদ্রদীপ্ত গরমদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্প, ভারতীয় ভাস্কর্যের দৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম। এ-দৃষ্টি প্রত্যক্ষ বিশ্বের সব বস্তুই গ্রাহ্যই মনে করে, এমনকি বস্তুর সম্ভাব্য রূপও এই শিল্প বাদ দেয়নি তা সে মানবিক, জান্তব, উদ্ভিদ্ যে-কোন জগতের বস্তু হোক্-না কেন, সবই শিল্পরূপে প্রকাশ দিয়েছে এবং এই রূপায়ণ একটা সভ্য জীবনের প্রতি মুক্তকল্প অথচ নিয়মানুগ মনোভাবে স্বচ্ছ।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিক মানুষ ছিলেন, ভারতীয় কিন্তু আধুনিক জগতের ভারতীয়। যে-মিথ্ বা পুরাণে সেকালের ভাস্করের কাজ করবার সহজ সুবিধা ছিল, সে-মিথ্ আজ মৃত বা মুমূর্ষু এবং রবীন্দ্রনাথ চিত্রলোকে জীবনধর্মী বর্তমান ছেড়ে পুণ্য অতীতে যাবার কথা ভাবেননি। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের যে-সুবিধা তিনি পান, য়ুরোপের বুর্জোয়া ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আধুনিক শিল্পীরা তা পাননি। ভারতবর্ষে রিয়ালিজম্ সুররেয়ালিজম্ প্রভৃতির সমস্যা অবান্তর। আমাদের কৈলাসভাবনায় বাস্তব কখনও রীতির বিন্যাসে আসতে ভয় পায়নি, আমাদের রিয়ালিজম্ ও অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ অঙ্গাঙ্গী। প্রতীক আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের

নিত্যসঙ্গী এবং সাক্ষাৎ জীবনের প্রেম হাতে হাত দিয়ে চলেছে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সঙ্গে বিস্তৃত আততিতে ও শিথিল বন্ধনে।

এই ভারতীয় ভূমিতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক শিল্পীর মানস আনলেন। মোদিগ্লিআনি বা এমিল্ নল্ডে বা মাক্স এর্নশ্ট্ রবীন্দ্র-মানসে আত্মীয় পেতেন যদিও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে টিউটনি উদ্দামতা বা উত্তরে রাত্রির দুঃস্বপ্নের বিলাস কিছুমাত্র নেই। ক্লে-র চারু অথচ ভয়াল কল্পক্রীড়ার খামখেয়ালিপনাও রবীন্দ্রনাথের চিত্রে অনুপস্থিত। প্রসঙ্গত, ক্লে-র জর্নাল পড়লে হয়ত রবীন্দ্র-চিত্রের স্বরূপ বুঝতে সুবিধা হবে। রবীন্দ্রনাথও ক্লে-র মতো রেখার অভিযানে উৎসুক হ'য়ে থাকতেন: একটা ভৌগোলিক প্ল্যানের ভিত্তিতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির দেশে একটা অভিযান প্রস্তুত করা যাক্। মৃত বিন্দুটিকে নাড়া দিতে হবে গতির প্রথম ক্রিয়া দ্বারা (রেখা)। একটু পরে নিশ্বাস নেবার জন্য থামো (ভাঙা রেখা, বারবার ছেদ দিয়ে স্পষ্টবাক্)। আরেকবার ফিরে তাকাও ইতিমধ্যে কতটা এলে (প্রতি-গতি)। মনে-মনে বিবেচনা করো এখান থেকে ওখান পর্যন্ত ঐ-রাস্তাটা (রেখার একটা গোছা)। একটা নদী আমাদের বাধা হ'ল; আমরা নৌকা নিলুম (তরঙ্গান্বিত গতি)। একটু দূরে একটা সাঁকো রয়েছে (বঙ্কিম রেখার সমষ্টি)।

'চিত্রলিপি' ২-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: 'Desultory lines obstruct the freedom of our vision with the inertia of their irrelevance.' রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিতে দেখা যায় কেমন ক'রে তিনি উদ্দেশ্যহীন রেখার অপ্রাসঙ্গিক জাড্য দূর ক'রে দৃষ্টিকে মুক্তি দেন। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই কীভাবে রেখাগুলি মুক্ত হ'ল এবং তার পরে তাদের সচ্ছল জীবনযাত্রা করতে লাগল; রঙের বিন্যাস তন্ময় হ'য়ে দেখি, অনচ্ছ গাঢ় বা ভাস্বর আলোকময়, তুলিতে আহত বা কলমে টানা বা আঙুলে ঘষা; কখন তুলির আঘাত সরল কখন-বা ক্রমিক আক্রমণ। রেখার মুক্তি রবীন্দ্রনাথের ছবিতে জর্মানদের মতোই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু জর্মানদের যা নেই রবীন্দ্রনাথের বহু ছবিতে বর্ণপরম্পরায় স্থানবোধের গভীরতা ও টোন বা রঙের আভার বিন্যাস স্পষ্ট দেখা যায়।

ছাপাছবিতে এই বর্ণচ্ছটার স্বরবিন্যাস বোঝা শক্ত, তবুও পৃথ্বীশ নিয়োগী ও পুলিন সেনের যত্নে 'চিত্রলিপি'তে খানিকটা রঙের আভাস এসেছে। অবশ্য খুব ভালো ছাপাতেও রঙের অতিসূক্ষ্ম আভার খেলা আনা শক্ত, যেমন রবীন্দ্রনাথের মস্কোতে আঁকা ছবিটিতে নীল ও কালো এবং বেগনির যে-বর্ণিকাভঙ্গ আছে (ইন্দো-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের উদ্যোগ সত্ত্বেও) তা ছাপাতে ঠিক আসেনি। রবীন্দ্রনাথের কোন-কোন ছবিতে, যেমন এই সোভিয়েট-বিষয়ক চিত্রটিতে রঙের খোল বা জমি ছাপায় সবটা না-খুললেও ছবির গঠনটি ছাপাতেও গৌণ হয় না। আবার কোন ছবিতে রং-ই মুখ্য। সেটা নির্ভর করে বৃদ্ধ কবির জলজলে দৃষ্টিতে।

ভিন্ন-ভিন্ন বস্তু যেভাবে ভিন্ন-ভিন্ন মেজাজ নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে তার উপরে, কখন একক, কখন একাধিকের সংযোজনায়, সবসময়েই ছন্দের অমোঘ কিন্তু স্বাধীন ন্যায়নিষ্ঠায়, রেখানির্ভর বা বর্ণময় বা দুই-ই একত্রে।

রবীন্দ্র-চিত্রাবলির বৈচিত্র্যের জন্যেই তার সরাসরি ভাগ করা শক্ত। ক্রম-বিকাশের দিক থেকে হয়ত একটা ভাগ সম্ভব: বিশ দশকের ছবিগুলি প্রায় লিপির বিপদ-আপদের ভিত্তিতে রচিত নক্সা বা প্যাটার্ন, কাটাকুটি থেকে সেগুলির আরম্ভ, পরিণতি নিছক শিল্পরচনার মজায়। পরের ছবিগুলি শুদ্ধ চিত্রময়। তার কিছু সাক্ষাৎ জীবনানুগ, কিছু আলেখ্য, নানান লোকের, নিজের এবং ঐতিহাসিক মানুষেরও, যেমন দান্তের। আরেক ভাগে দেখা যায়, ফুল পাখি জীবজন্তু সব চলন্ত বা স্থির প্রাকৃত রূপের সঙ্গে-সঙ্গে স্বপ্নের রূপের দিকে ঝোঁক, কিছুতে পাওয়া যায় রূপের অপ্রাকৃত বিন্যাসের দিকে মনোযোগ।

নানা দেশের নানা যুগের শিল্পের স্মৃতি জেগে ওঠে এইসব ছবি দেখে। আবার কিছু ছবিতে সে-সব আকার বা রূপ দেখা যায়, তা জলেস্থলে কেউ দেখেনি, সে-সব রূপ কবির অফুরন্ত কল্পনার স্বয়ম্বশ সৃষ্টি। রঙের সাহসী লেপে বা রেখায় বিস্তৃত বা রঙের পর্দায় আভার বিন্যাসে জহরতের মতো বা মোজেকের মতো জলজলে, দেয়ালির মতো প্রদীপ্ত অনেক সময়েই এ-সব ছবিতে নীল বা কালোর ভিত্তিবর্ণে বা পশ্চাদ্‌পটে উজ্জ্বল রংগুলির প্রাণময়তা আজও অম্লান হ'য়ে আছে। রেখাবলিষ্ঠ এক বা বহুবর্ণ রবীন্দ্র-চিত্রাবলি দেখে মনে হয় বাখের ফ্যুগের গভীর বৈচিত্র্যের প্রায় অতিমানবীয় সুষম গৌরবের কথা।

লোকশিল্প ও বাবুসমাজ

যাকে সাহেবরা বলতেন বাবু ভদ্রলোক, সেই উচ্চশিক্ষিত সমাজে একদা আমাদের গ্রামের মানুষের তৈরি সুন্দর জিনিষের কদর ছিল না। ছবির ত কথাই নেই, ইংরেজেতর সাহিত্যেরও সম্মান ছিল কম। পুতুল বা পুজাপার্বণ মেলায় সংসারে কাজে লাগে এমন-সব সুন্দর জিনিষ অবহেলার বস্তু ছিল। অবশ্য সৌখীন বাবুরা, যাঁরা ঠিক সাহেব সাজতে পারতেন না, তাঁরা শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গার কাপড় পরতেন, শাল জামেয়ারও গায়ে দিতেন। কিন্তু দেশের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে শিক্ষিতের রুচির বিচ্ছেদটা ঘটে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির পাঠকমাত্রেই এ-খবর জানেন। বরঞ্চ দু-চারজন ইংরেজের নজর পড়েছিল এদিকে এবং তারপরে কিছু পুরোধা বাঙালিদের। তাই এ গরম দেশের ধনীর বৈঠকখানায় ভিড় ক'রে থাকত ইংলণ্ডের নকল আসবাবপত্র, ভিক্টোরীয় ইংরেজের কুরুচিকে দেশিভাবে অতিরঞ্জিত ক'রে। দেশজ গান বা গ্রাম্য নাচ ত শুধু রুচিতে নয় নীতিতেও বাধিত। তবু গান কিছু প্রতিপত্তি পেয়েছিল, ভক্তির নিরাপদ আকর্ষণে। এবং এই ভক্তির আবেদনটা আবার আমাদের জাতীয়তাবোধের প্রথম যুগে প্রবল সমর্থন পেয়েছিল।

নাচ কিন্তু খুবই নিন্দিত ছিল, নাচ ব্যাপারটাই এত শারীরিক, এত ভিক্টোরীয়-বিরোধী। ভিক্টোরীয় ইংরেজের মোটা গলার প্রভাবে শরীরের ও তার গতির সৌন্দর্যের বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত অগ্রজেরা ছিলেন সন্ত্রস্ত, বিশেষ ক'রে যেহেতু তার বিপরীতে ছিল বাবুবিলাস।

আজকের দিনে আমরা খানিকটা বুঝতে পারছি এই মানসিক শীর্ণতার বড়ো কারণটা। আমাদের পিতৃপিতামহেরা ছিলেন ভারতের বলিদান ইতিহাসের বেদীতে। রামা মণ্ডল আর হাশিম শেখ শুধু নয়, তাঁরাও হয়েছিলেন চাকুরি পেয়েও বিদেশি শাসন-শোষণের শহীদ্, বিদেশির অস্বাভাবিক প্রভাবে তাঁদের চৈতন্যে এসেছিল আত্মবিচ্ছেদ, নিজ বাসভূমে পরবাস। এর প্রতিবাদে যে শিক্ষিত জাতীয়তা জাগল, সে-প্রতিবাদ, প্রতিক্রিয়ামাত্রেরই প্রকৃতিগত কারণে ছিল আতিশয্যে এলোমেলো। ইতিহাসের যে স্বাভাবিক বেগে লিবারল্ সভ্যতা স্বাধীন ইংলণ্ডে নানান্ ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল, সেই স্বাভাবিক বেগ না-থাকায় আমাদের ভাঙন আমরা বাঁধতে পারিনি। পরস্বলোভীর নির্মম প্রতাপের ও

প্রভাবের কাছে আমাদের ক্ষমতা একান্ত কণ্ঠগত ছিল। দেশের জীবনযাত্রার চাবি ছিল দেশের বাইরে, তাই দেশ র'য়ে গেল যাকে বলে ব্যাকওআর্ড দুর্গত। শহর গড়ল অনুপাতে কম; যা হ'ল তা-ও হ'ল অপ্রকৃতিস্থভাবে, জাতীয় জীবনের বিকাশের তালে নয়; ফলে শহর-গ্রাম জোড় বাঁধা চলল না, গ্রামও হ'ল অসুস্থ।

আজও দেশে এমন লোক আছেন যাঁরা সত্যিই এই দুর্গত দেশের সাধারণ মানুষের সংস্কৃতির বিষয়ে মনঃস্থির করতে পারেন না, কেউ-বা দূর-থেকে-দেখার উপর-থেকে-শোনার বদান্য কৌতূহল নিয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক-আধ সন্ধ্যা কাটিয়ে যান। তার চেয়ে বেশি কাটানও শক্ত, কারণ দুয়ের মধ্যে ঘরদোর খাওয়াপরা জীবনযাত্রার সব-কিছুতেই ফারাকটা দুস্তর। আবার কেউ-কেউ গ্রাম্যশিল্পীর পৃষ্ঠপোষণ ক'রে থাকেন, যেমন ফ্যাশনেবল্‌ সমাজের মহিলা সমাজকর্ম ব'লে হৃদয়-হীনতার চরম প্রকাশ দেন তাঁদের মহিলা রক্ষা সঙ্ঘে বা নারী সেবা সমিতিতে। তাতে না-থাকে শ্রদ্ধা, না-থাকে মমতা, ফলে উভয় পক্ষে কারোই লাভ হয় না—এক ব্যবসার দিক থেকে ছাড়া, এবং শিল্পের মুরুব্বি হওয়া ছাড়া। শোনা যায়, সমুদ্রপারের উদ্যোগী পুরুষরা এই লোকশিল্প ব্যবসায় সম্প্রতি সমধিক মন দিয়েছেন এদেশি সহকর্মী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে।

এতে লোকশিল্পের ভবিষ্যৎ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে। অন্যথাও থাকতে বাধ্য, কারণ বর্তমান সমাজ-জীবনে সেই সাবেক বিন্যাস নেই বা থাকতে পারে না, যাতে লৌকিক সংস্কৃতি সাবেকি রীতিতে বিকাশ পেতে পারে। পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং সে-পরিবর্তনের স্বরূপ মৌলিক। তবু, আপাতত এই পৃষ্ঠপোষকদের কল্যাণে যদি শাড়ি বা জামার নক্সা সুন্দর হয়, বা অন্যান্য সুন্দর জিনিষ ড্রয়িংরুমের শোভা বৃদ্ধি করে সে-ও ভালো। কারুশিল্পীদের কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্যও এতে হয়—যদিও রুচির ও হাতের অবনতির দিকটা নগণ্য নয়। যাই হোক্‌, আজ যদি বৈঠকখানায় আত্মীয়স্বজন বা সিনেমা স্টারের ফটোর মধ্যে দু-চারখানা মাটি বা কাঠ বা কাপড় বা বেতের কাজের সুন্দর নিদর্শন দেখা যায়, তাহ'লে অবজ্ঞা বা রাগ না-ক'রে অচিরে রুচির সম্পূর্ণতাই আশা করা যাক্‌।

সত্যিই ত এই রুচির সমস্যা বিরাট সমস্যা। ভঙ্গুর সমাজে তথাকথিত মার্কিন বা বোম্বাই ফিল্মের প্রভাবেই হোক্‌ বা কিছুটা রেডিওর মাহাত্ম্যেই হোক্‌, রুচির অধঃপতন আমাদের দেশে ভয়াবহ। মাইকের জ্বালায় বর্তমানের যন্ত্রণার কথা ছেড়ে দিলেও, ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। এই কুশ্রী গান ও বীভৎস অঙ্গসঞ্চালনের প্রভাব শুধু নয়, এই যে শব্দের প্রাবল্য বা গোলমালের নেশা এতে মনের অভ্যাস

বদ্‌লে যায়, স্নায়ুতে এমন জট পাকায়, যে সূক্ষ্ম সুকুমার কিছু আর মনকে স্পর্শ করে না, স্তব্ধতার যে-সমুদ্রে শিল্পকার্যের তরঙ্গভঙ্গ সম্ভব, মনের সে-সমুদ্র আজকের ছেলে-মেয়েরা আর চিনতে পারবে না ব'লেই ভয় হয়। অন্যপক্ষে আবার ন্যাকামিকেই মনে হয় সংস্কৃতির আত্মরক্ষার পথ। ফলে ন্যাকামির মাধ্যমে নানা রীতির দোআঁশলা খিচুড়ি বানিয়ে সংস্কৃতি ব্যবসাও জ'মে উঠেছে। শুধু বয়স্ক-জগতে নয়, শিশুদের নিয়েও। তাই ত রবীন্দ্রনাথ হ'য়ে যান নাটকের রবুদাদা, অবনীন্দ্রনাথ হ'য়ে যান অবন পটুয়া। তাই ত কার্পেটের পাশে আজকাল মার্বেল মেজেতে আল্পনা আঁকা হয়। সঙ্গতের একতান বাজনা হ'য়ে ওঠে মার্কিন কায়দার দেশি ভাষ্যে বীভৎস।

আশার কথা, ক্রমে-ক্রমে অনেকে এ-বিষয়ে সজাগ হচ্ছেন। সুরুচির অভিযান অবশ্য মন্থর, কারণ স্বকীয় স্বাভাবিক রুচির বিকাশ অনুকূল অবস্থাতেও সময়সাপেক্ষ। এই রুচির বিকাশে আমাদের লোকশিল্পের ভূমিকা গৌণ নয়। তার মজ্জাগত রূপবোধের দ্বারা, তার বিন্যাসবুদ্ধি, তার নিহিত সামঞ্জস্যের দ্বারা আমাদের লোকশিল্প এই রুচির অভিযানে আজও নেতৃত্ব নিতে পারে। এই রূপবোধ বা বিন্যাসশক্তি সম্ভব হয়েছে দীর্ঘকাল ধ'রে পুরুষানুক্রমে ফাংকশনাল বা বাস্তব প্রয়োগের বা উপলক্ষ্যমূলক কাজের প্রেরণায় ও অভ্যাসে। এর পিছনে ছিল একটি সমাজ-জীবনের সংহতি, শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও। এই সমাজ-জীবন ইংরেজ শাসনের বিরাট চাপেও একেবারে মরেনি, কারণ সাম্রাজ্যের ও ব্যবসার স্বার্থেই আমাদের গ্রামে-গ্রামে ইংরেজ শহরের স্বল্প সুখসুবিধাও আনতে যায়নি।

অবশ্য এই সমাজ-জীবনও আক্রান্ত এবং সে নিয়ে হাহুতাশ ক'রে লাভ নেই। কারণ বর্তমান জগতে যন্ত্রসভ্যতার সুযোগ-সুবিধা সকলেরই প্রাথমিক দাবি। সমাজ-জীবনের প্রাচীন গ্রাম্য বিন্যাস আজ অনিবার্যভাবে বদলাতে চাইছে, নতুন জীবনের নতুন বিন্যাসে। কিন্তু সংস্কৃতির দান সমাজজাত হ'লেও শিল্পকর্ম ব'লেই কিছুটা উদ্বৃত্ত থেকে যায় এবং আমাদের সংস্কৃতি একেবারে মৃত নয় ব'লেই তার সাহায্যে আমাদের অনেক অপচয় থেকে বাঁচাতে পারে। তখন এই নতুন জীবনের রসায়নে পুরানো অভ্যাস প্রাণ পাবে সচেতন নির্বাচনে, আমরা মুষ্টিমেয় উচ্চ বা অর্ধ-শিক্ষিতেরা বেঁচে যাব দেশের অধিকাংশের শিল্পসংস্কৃতির বৃহৎ ধারায়। এখনও চেষ্টা করলে এই ফাটল সারানো যায়—জীবনের বা মনের দিক থেকে কম খরচে।

কিন্তু লোকসংস্কৃতির মূল্য আমরা যেন দিই নিজের গরজে, প্রাণের দায়ে; পৃষ্ঠপোষক বা সংগ্রাহক বা নৃতাত্ত্বিক সেজে বা দেশ-বিদেশে ব্যবসার তাগিদে নয়।

একই মহাদেশের মানবসমাজের অপরিহার্য অঙ্গ আমরাও, শহুরে বুদ্ধিজীবী চাকুরিয়া লোকেরাও। সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মবোধের মধ্যে দিয়ে আমরা যেতে পারি সম্পূর্ণতার পথে, নতুন জীবনের স্বাস্থ্যের পথে পেতে পারি মুক্তি। আর আমাদের সাধারণ মানুষেরা? তাদের ক্ষমা ত আমরা সবাই জানি, তাদের অসন্দিগ্ধ মহত্ত্বেই ত আমাদের ইতিহাসের ভিত্তি।

লোকসংস্কৃতির চিন্তায় যেন আমরা না-ভাবি যে আমাদের অন্তরীণ দেশবাসীরা—আদিম বা অন্ত্যজ মানুষেরা আমাদের হাতে তৈরি রক্ষাকবচের মুখাপেক্ষী। যে-সুযোগ-সুবিধা আমরা ভোগ করি, তার থেকে আর কাউকে বঞ্চিত করার অধিকার আমাদের নেই। অধিকারের প্রশ্নও ওঠে না, কারণ খাওয়া-পরা চিকিৎসা শিক্ষা ইত্যাদির সুযোগ আজ নির্বিশেষে সবার কাছেই সম্ভাবনায় কাম্য। লৌকিক সংস্কৃতির আকর্ষণ যেন জীবন্ত মানুষকে আমাদের যাদুঘরের সামগ্রী না-ক'রে তোলে।

সব শিল্পকর্মের মধ্যে যেটা সবচেয়ে স্থাণু, কারণ সবচেয়ে অভ্যাসিক, সেই লোকশিল্পও অমোঘভাবে পরিবর্তমান। পরিবর্তমান বিশ্বের হালচাল আমাদের শহুরে জীবনকে যেমন প্রভাবিত করছে, তেমনিই করছে লোকশিল্পের সামাজিক আবহাওয়াও। এই যুগান্তরের একটি সাক্ষাৎ ফল হচ্ছে স্বভাবতই শিল্পোৎকর্ষের মানে অবনতি, রেখা হ'য়ে যাচ্ছে দুর্বল, রং হ'য়ে যাচ্ছে বিসদৃশ, বিন্যাস অসতর্ক। এ-অবনতির সাক্ষাৎ কারণ অবশ্য শিল্পীদের জীবিকার দুর্দশা। বড়ো কারণ হচ্ছে, লোকসংস্কৃতির সামাজিক সার্থকতা অর্থাৎ এর কারুশিল্পত্বই ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। এখন লোকশিল্পের ব্যবহারিক সার্থকতা থাকছে ব্যবসায়িক এবং কোথাও-কোথাও সরকারপুষ্ট শিল্প বা বিলাসী খেয়ালের পণ্যসামগ্রী হিসাবে।

কিন্তু আমাদের বৃহত্তর আরেক বঙ্গ-ভঙ্গের দিক থেকে এখনও সময় হয়ত আছে। একদিকে হতভাগ্য আমরা যেমন বুর্জোয়া লিবারল্ পণ্যবিপ্লবের ইংলণ্ডের মতো বড়ো রাস্তায় যেতে পাইনি, তেমনি আমাদের সাম্রাজ্যের অলিগলিতে আনাগোনাই ভবিষ্যতের সহায় হ'তে পারে। হয়ত আমরা এরই জন্য আরেক বিশৃঙ্খলার ও পরের যন্ত্রণার দু-এক ধাপ ডিঙিয়ে যেতে পারি। উদাহরণত, আমাদের অতিকায় শহর এবং জীর্ণ গ্রামের সম্বন্ধের সমস্যাটা কিঞ্চিৎ সহজে সমাধান হ'তে পারে। সেইরকম য়ুরোপের শিল্পে আরেক যে-সমস্যা কাঁটার মতো বিঁধেছিল ও আজও বেঁধে, আমরা হয়ত সে-রকম প্রশ্ন এড়াতে পারি আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সাহায্যে। দৃষ্টান্ত ধরা যায়, রিয়ালিজম্ বা

অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের তর্ক। বাস্তববাদ বা পরোক্ষ শিল্পনীতির পশ্চিমা সমস্যা ভারতীয় জীবনে ও শিল্পসাহিত্যে লালিত যে কোন সুস্থ ভারতীয়ের কাছে একটু অবাস্তব লাগে। কারণ আমাদের লৌকিক শিল্পসাহিত্যে বাস্তবের বোধ এবং রীতিবিন্যস্ত প্রকাশ একই সঙ্গে চলেছে। আমাদের শিল্পের কন্‌ভেন্‌শন্স বা রীতিনীতি পশ্চিম, য়ুরোপের পুনরাবৃত্তি নয়, জীবনের ও মানসের ভিন্ন অভ্যাসে তার ভিত্তি।

নবযুগ নির্মাণে তাই আমাদের দেশজ সংস্কৃতি বৃহত্তর অর্থেই আমাদের সহায়। তার মানবিকতা আমাদের একটা বড়ো সম্পদ, কারণ এই লৌকিক জগতেই আমরা দেবদেবীর দৌরাত্ম্য থেকে নিজেদের কিছুটা বাঁচিয়েছি। তাছাড়া এই লৌকিক শিল্পের প্রাত্যহিক প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে নক্সার বা বিন্যাসের সৌন্দর্য খেলায় বা সামাজিক কাজে-কর্মে আমাদের চোখ-কান হাত-মনের অভ্যাসে রুচিকে বাঁচিয়েছে। এর সাহায্যে আমাদের কাজ অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন হ'তে পারে : যে-লোকশিল্পে আর সামাজিক সার্থকতা নেই, তার সাবেক প্রাণশক্তি থাকবে কিনা! দেখতেই পাচ্ছি, বছরে-বছরে কীরকম রুচি ও কলাকৌশলের অবনতি হচ্ছে। যখন মনের মাটিই জীর্ণ, তখন সে-জীবনের মাটিতে যার শিকড়, সেই কারুশিল্প কী ক'রে ফুলে ফলে ঐশ্বর্য বিস্তার করবে? এর বিধান সাবেককালে নয়, সাবেকি সমাধানেও নয়, অন্যত্র। এবং এই অবনতির জন্য শুধু লোকশিল্পবিলাসীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। বরং এই বিলাসীদের কল্যাণে যদি শিল্পীদের কিঞ্চিৎ সুরাহা হয় এবং বিলাসী বাবুদের আর তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের রুচির কিছু উপকার হয়, সে-ও মন্দের ভালো।

তাছাড়া এই পুরানো কারুকাজের রীতির মধ্যেই নতুন প্রাণসঞ্চার হ'তে পারে শিল্পীর মনে ও হাতে নবজীবনের তাগিদে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যায় শ্রীযুক্ত বলাই পালের লক্ষ্মীর সরা। লক্ষ্মীর সরার সাবেক রূপ এই শিল্পীর হাতে শুধু নতুন বিষয়ের মর্যাদা পায়নি, শিল্পীর মনের আততি তাঁর নতুন বিষয়ের রেখা ও রঙের প্রাণময়তাতেও প্রকাশিত।

অবশ্য কথা উঠতে পারে যে, কাঠের বা মাটির বা সোনার পুতুল, লক্ষ্মীর সরা বা কলস বা সুজনী বা কাপড়ে মৌলিক উপলক্ষের সার্থকতা আর না-থাকলেও খেলনা বা গৃহস্থের শোভা হিসাবে ব্যবহার্য বটে, কিন্তু নৃত্যের কি হবে? এ-কথা সত্য যে লোকনৃত্যের প্রেরণা ও প্রয়োগ অনেকখানি নির্ভর করে তার সামাজিক উপলক্ষে। শহুরে মঞ্চের উপরে অনেক নৃত্যই মানায় না, অধিকন্তু দর্শকরা তার

প্রেরণায় অংশ নিতে অক্ষম। তবু নৃত্যের সৌন্দর্য এই সৌখীন আবেদনেও কিছুটা থেকে যায়। অবশ্য কষ্ট ক'রে গ্রামে গিয়ে নাচ দেখা তার চেয়ে বেশি সার্থক। কিন্তু শুধু সাময়িক আনন্দ ছাড়া আরেক দিক থেকে লোকনৃত্যের সার্থকতা স্পষ্টতর; সেটা হচ্ছে নৃত্যের রূপশিক্ষার দিক, নতুন নৃত্য প্রেরণায় যার প্রভাব কার্যকর হবে। বিশেষ ক'রে আজ যখন আমরা জানি যে শিক্ষায় শরীরের ছন্দোশিক্ষার মূল্য প্রাথমিক। এই ছন্দোশিক্ষায় আমরা যত বেশি লোকনৃত্য পারি এবং স্থান-কালপাত্র ভেদে এবং ক্ষমতানুসারে তার থেকে পাঠ নিতে পারি, ততই লাভ। তাছাড়া, আমরা এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা কেন নিছক সৌন্দর্য দর্শনের সুযোগ পাব না?

কিন্তু এই লোকনৃত্যেও বাইরের স্পর্শ লেগেছে, আর এখানেও যাদুঘরে একে রক্ষা করার চেষ্টা নিরর্থক। আমার মনে আছে এক আদিবাসী গ্রামে নাচ দেখতে গিয়ে আমার এক বিশেষজ্ঞ বন্ধু মর্মাহত বোধ করেছিলেন, কারণ ছেলেরা সব শার্ট পরে বেরিয়ে এল এবং মেয়েরা জামা। বলাই বাহুল্য, তাতে নাচের অনেক-খানি পেশীসৌন্দর্য কমল। কিন্তু আমরাই যখন শরীর বিষয়ে লজ্জিত, তখন কী ক'রে এরাই বা শরীর বিষয়ে সুস্থ গর্ববোধ করবে? একই হাওয়া ত শহরে ও গ্রামে বয়। বিদেশি বিশেষজ্ঞকে চিন্তিত দেখেছি, সর্বত্র বিজলী বাতি হ'লে, আধুনিক চানের ঘর নালানর্দমা হ'লে, লোকসংস্কৃতি কী হবে? তখনও লোকে নাচবে গাইবে গড়বে আঁকবে, বরং তখনই আরও স্বাধীনভাবে লোকের জীবনের আনন্দ প্রকাশ হবে—এ-আশা আমাদের আছে। কারণ এই দেশেরই মানুষ ত আমরা, দেশের লোকের জীবনীশক্তির অমরতায় আমাদের আস্থা। আমি ত দেখেছি কী অত্যাচারে দুঃখকষ্টে জর্জর জীবনের মধ্যেও অক্লান্ত এই সাধারণ মানুষের নাচগান শিল্পের আনন্দ।

কয়েক শতাব্দীর বিশৃঙ্খলা ও শোষণের দুর্ভাগা উত্তরাধিকারী আমরা, শহরে তথাকথিত শিক্ষিতেরা এখনও নিজেদের বাঁচাতে পারি আমাদের দেশের লোকের নবজাগরণে যোগ দিয়ে। লোকসংস্কৃতি নবজীবন পাবে জনসাধারণের সংস্কৃতিতে। তাতে যোগ দিয়ে সঙ্গগুণে মুক্তি আমাদেরও ভরসা।

যামিনী রায় ও শিল্পবিচার

শ্রীমান অশোক মিত্র আমার একান্ত স্নেহভাজন ও দীর্ঘকালের বন্ধু, তাঁর পশ্চিমবঙ্গ স্মারিন্নর বিপুল কীর্তিতে আমিও অনেকের মতো মুগ্ধ এবং গর্বিত। শিল্পকলা সম্বন্ধে শ্রীমানের নানা রচনাও আমাকে বিস্মিত করেছে তাঁর অনলস উৎসাহ ও পাণ্ডিত্যের আরেক প্রমাণে। তাই শ্রীযুক্ত যামিনী রায় মহাশয়ের বিষয়ে 'পরিচয়' পত্রে অশোকের দীর্ঘ আলোচনা প'ড়ে আমার মনে যে-সব প্রশ্ন উঠেছে, সেগুলি তাঁর কাছে বিনা সঙ্কোচে উপস্থিত করতে পারছি এবং যেহেতু আমার প্রশ্ন একজন সাধারণ বাঙালি মানুষের প্রশ্ন, যে-মানুষ যামিনী রায়ের ছবি ভালোবাসে এবং বহুকাল ধ'রে নিয়মিত আনন্দে দেখে আসছে, তাই এই প্রশ্নগুলির সার্থকতা ব্যক্তিগত সমাধানের ব্যাপারের বাইরেও গণ্য অর্থাৎ প্রকাশ্য হ'তে পারে।

যামিনী রায় প্রবন্ধের সুর অশোকবাবু তাঁর প্রথম দুই প্যারাগ্রাফেই বেঁধে দিয়েছেন ; বলেছেন : সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতোই, যামিনী রায় গ'ড়ে দিয়েছেন আমাদের চিত্রশিল্পের ধ্যানধারণা। যার ফলে তিনি 'স্বদেশে স্বীকৃত' এবং সবদেশের শিল্পী ও সমঝদারের মনোযোগের পাত্র। তারপরে পাই তৃতীয় প্যারাগ্রাফে যামিনী রায়ের বিশেষত্বের বেশ সহজ ব্যাখ্যা। চতুর্থ প্যারায় অশোকবাবু বলেন, এই সবকটি বিশেষত্বই বাঙালি ঐতিহ্য, আবার এ-সবকটিই ভারতীয় ঐতিহ্য, আবার এ-সবকটিই বর্তমান পৃথিবীর, বিশেষ ক'রে পশ্চিমের অন্বিষ্টের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তার ফলে অত্যন্ত আধুনিক। ব্যাপারটা কঠিন, তবে চেষ্টা ক'রে শেষ পর্যন্ত হয়ত কিছু একটা বোঝা যায়।

কিন্তু তারপরে মাঝে-মাঝে এমনসব উক্তি আসে যাতে যামিনী রায়ের চিত্রকলার স্বরূপ বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয়। ছাত্র যামিনী রায় বোর্ডকাটা ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে ছবির পরিধি বা সংস্থান দেখে ছবির দৃশ্যবিষয় নির্দিষ্ট করছিলেন। এবং মাস্টার ব্রাউন সাহেব তাঁকে তারিফ করলেন—এর মধ্যে যে একটা বড়ো সত্য লুকিয়ে আছে, এর কাহিনীটি লিখতে ভুল করলেও সেটা অশোকবাবু ঠিক ধরেছেন। কিন্তু সেটি শিল্পদৃষ্টির বড়ো সত্য। অশোকবাবু যে বলেছেন এর ফলে "যামিনী রায় কলকাত্তাই হবার লোভে সেই যে বাগবাজারের গলির বাড়ীতে ঢুকলেন"—এ-কথায় সে-সত্যটি নেই। কারণ ছবিমাত্রেই দৃশ্যবস্তুর

পুনর্নিয়ন্ত্রণ বা পুনঃসংগঠন এবং নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ দৃষ্টির নির্দেশে, দৃশ্যবস্তুর সীমায়নে, পরিধিকে ফ্রেমে ফেলায়, বাছাই করায়। 'কলকাত্তাই' হবার সঙ্গে এর সত্যতার সম্বন্ধ নেই, যদিও মানতে হবে ছাত্র যামিনী রায় সেই সেকালেই শিল্পের এই সত্য বুঝেছিলেন নিজেরই শিল্পজিজ্ঞাসায়। এবং মানতে হবে যে যামিনী রায়ের কলকাতায় আসা আর নানারকম কাজ ক'রে কষ্টে ছাত্রজীবনযাত্রার মধ্যে দৈনিক বীরত্বের স্বাক্ষর স্পষ্ট।

এই হাল্‌কা অত্যুক্তির ঝোঁকে বা পরিহাসপ্রবণতাতেই বোধহয় লেখকের ভুল হ'য়ে গেছে যামিনী রায়ের ল্যাণ্ডস্কেপের হিসাবনিকাশে, তিনি লিখেছেন : "তাই তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপে ঝড়জল নেই, নেই অগ্নিদগ্ধ দিন, এমনকি দিগন্তবিস্তৃত মাঠও নেই।" এ-কথা সত্য যে যামিনী রায় নিজে তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপগুলির সমধিক চিত্রমূল্য দেন না, কিন্তু সেখানেও তাঁর চোখের দেখা-চেনা, স্মৃতিজাত, কাল্পনিক বা বিদেশি কাজের পরীক্ষামূলক নানান্‌ ল্যাণ্ডস্কেপের বৈচিত্র্যেও অসামান্য দক্ষতায় অবাক হ'তে হয়। আমি অন্তত কিছুতেই ভুলতে পারি না সংখ্যায় শতাধিক সেই সব বহির্দৃশ্যচিত্র—বাঁকুড়ার দিগন্তবিস্তৃত ঊষর মাঠ, সাঁওতাল দেশের পাথর-মাটির ঢেউ, ধানখেতে লাঙলচাষী, থৈ-থৈ বাদল-জলে মেয়েদের বীজরোপণ, রৌদ্রে ঝকঝকে বৃক্ষছায়াঘন মাঠপথবাড়ি, আলোছায়ায় প্রতীক্ষারত বস্তির ছবি, একাধিক অসুস্থ কলকাতার বিষণ্ণ বাড়িতে-বাড়িতে ঘেঁষাঘেঁষি গলি; বাগ-বাজারের গঙ্গায় বোঝাই নৌকা, টিনের শেড আর মেঘবিদ্যুতের ঘনঘটা বা আলোর দীপ্তি, টলোমলো জলধারা, নৌকায় পার্থিব কিন্তু অসীমে উধাও রহস্যময় জলরাশি, কাশিপুরের দোতলা বাড়ি, বেলেতোড়ের বা যে-কোন মফস্বলের বাংলো বা কুঠি, পাহাড় রেল লাইনে স্টেশনের দুরন্ত বাঁক, দক্ষিণেশ্বরের বটগাছ, সুস্থ শহরের আদর্শ বীথি ও বাসাবাড়ি—কত বলা যায়। ছবিমাত্রেই ত একটুকরো রঙিন কাপড়, বা কাঠ বা বোর্ড, এবং যামিনী রায়ের ছবিও অবশ্য তাই। কিন্তু যামিনী রায়ের বহুবিচিত্র এই ছবিগুলি অশোকবাবু যথোচিত মনোযোগ দিয়ে দেখেননি ব'লে তাঁর জন্য আমি দুঃখিত। না-হ'লে ঐ রঙিন কাপড়ের টুকরোর কথা ব'লে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন না।

তিনি বোধহয় যামিনী রায়ের প্রথাসিদ্ধ তৈলরীতির পোর্ট্রেটগুলির কিছুও মন দিয়ে দেখেননি, তাহ'লে তিনি অবনীন্দ্রনাথের জলরঙিন প্রতিভার আলো-আঁধারি লীলার সঙ্গে সেগুলিকে ফেলতেন না। বাস্তবিক পক্ষে, এই তৈলাঙ্কিত পোর্ট্রেটগুলির মধ্যে অনেক ছবিই আছে, যার নৈপুণ্য ভারতে তুলনাহীন এবং

যামিনী রায় নিজে সেগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীর কাজ বললেও অন্যের মুখে সে-কথার পুনরুক্তি ভ্রান্তিকর। তারপরে তিনি অবশ্য আবার চমৎকার শ্রদ্ধার সঙ্গেই লিখেছেন যামিনী রায়ের পরিণত যৌবনের শিল্প-সমস্যার ও সমাধানের অনেক কথা।

কিন্তু এগারো প্যারাগ্রাফে অশোকবাবু আবার বিমূঢ় ক'রে দেন য়ুরোপীয় চিত্রের সংজ্ঞানির্দেশে ভিনিসীয় শিল্পী, এল্ গ্রেকো, রেম্‌ব্রাণ্ট, কুর্বে ও দেলাক্রোয়ার নাম একনিশ্বাসে গেঁথে। ভিনিসীয় শিল্পীরা কি সব এক? এঁরা কী হিসাবে সবাই একধরনের শিল্পী, এক শিল্প-সমস্যায় ভাবিত এবং জিজ্ঞাসায় পরীক্ষারত? সে কি লেখক যাকে বলেছেন প্ল্যাস্টিক প্রতিমা, তারই পরীক্ষা? তাহ'লে ঐ কটি বিশেষ নামের পরম্পরার তাৎপর্য কি? আর ঐ প্ল্যাস্টিক প্রতিমা জিনিসটি ঠিক কী? সে কি, লেখকেরই ভাষায়, রঙের সবকিছু গুণ নিংড়ে বার করা, যার চূড়ান্ত সমাধান হয়েছে প্রাচ্য অলঙ্কারাত্মক ডেকরেটিভ্ চিত্রে? অলঙ্কারাত্মক ডেকরেটিভ্ চিত্রের ঝোঁক কী ক'রে প্লাস্টিক বা স্পৃশ্যপেশলতাময় প্রতিমার ঝোঁক হবে? এইটিই কি আমরা পাই বারো প্যারার সেজানের সাধনায়, এক নতুন শিল্প-রীতিতে যিনি প্রথম প্রিমিটিভ? কিন্তু তাহ'লে এই রং নিংড়ে প্রতিমারূপায়ণের সাধনাকে আবার দু-ধারায় লেখক ভাগ করেন কেন? পিকাসো বা ব্রাক্ এবং তারই সঙ্গে দের‍্যাঁর চিত্রকে কোন মতেই কি বর্ণগৌণ বা বিবর্ণরূপ-প্রধান বলা যায়? তেমনি মাতিস্ বা দুফি-কে সেজানের ধারার বর্ণসঙ্কর সন্তান না-ব'লে বরং সেজান্-পূর্ব ইম্প্রেশনিস্টদের এবং প্রাচীন ও আদিম মানুষের এবং এশিয়া আফ্রিকার বর্ণরেখারূপের শিল্পরীতির সার্থক উত্তরাধিকারী বললে আরও সঙ্গত হ'ত না? অশোকবাবু নিজেই প্রায় তা বলেছেন, কিন্তু সেটা ১৫ প্যারাগ্রাফে।

অশোকবাবু যদি এক সেজান বিষয়েই আরও ধৈর্য ধ'রে আরও নিষ্ঠার সঙ্গে আরো বেশি সময় ধ্যানধারণায় ব্যয় করতেন, তাহ'লে তিনি শিল্পের প্রেরণা কী জাতের হয়, আধুনিক শিল্পীর কী সাধ ও সাধ্য, কী তার গৌরব ও তার প্রায় অসম্ভবের অন্বিষ্ট কী, সে-বিষয়ে আমাদেরও আরও স্বচ্ছ কিন্তু দায়িত্বসম্পন্নভাবে বোঝাতে পারতেন। তাহ'লে তাঁর মনে থাকত যে যামিনী রায় বা যে-কোন সৎ শিল্পী তাঁর নিজের মানসের তাগিদে, স্বভাবের অখণ্ড প্রেরণাতেই কাজ করেন, কিছু ছাড়েন, কিছু গ্রহণ করেন—পরীক্ষা ক'রে চলেন। তাই ত সৎ শিল্পী লঘু মুহূর্তে খেলায় বা বিনোদনেও যা করেন তা একটা বৃহত্তর ঐক্যের প্রবাহে নিজের স্থান ক'রে নেয়। এ-মন তথাকথিত রম্যরচনার বিচ্ছিন্ন মন নয়, এবং এতে শিল্পীকে

জনসাধারণ বা বালক বা কিশোর ইত্যাদি মনগড়া পাঠকশ্রেণী বা দর্শকশ্রেণী খাড়া ক'রে নিজেকে এবং দর্শককে বিড়ম্বিত করতেও হয় না। শিল্পীর যন্ত্রণাময় আকুতি এবং কৃচ্ছ্রসাধনের এই বড়ো সত্যটা মনে রাখলে শিল্পকর্ম গ্রহণ করা সহজ হয়, তাহ'লে আর লেখক ১৬ প্যারায় যামিনী রায়কে "স্বদেশের দরজায় ধরনা দিয়ে" বসাতেন না। বস্তুত কোন শিল্পী কারও দরজাতেই ধরনা দেন না, নিজের চোখ-মাথা হাত ছাড়া। যামিনী রায়ের বিষয়ে ভাবতে গেলে ভ্যান্‌গখের কথাটা তাই স্মরণীয়: আমাদের জীবনযাত্রা প্রায় মঠের ব্রহ্মচারী বা গুহাবাসী তপস্বীর মতো, আমাদের যন্ত্র শুধু কাজ, সব সুখ আরাম ত্যাগ করে। এ-রকম শিল্পীকে কখন-কখন পরিব্রজব্রতও নিতে হয় নিজের শিল্প-প্রেরণারই তাগিদে, নিজের সাধনার ও সিদ্ধির অসম্পূর্ণতার ও অতৃপ্তিকরতার ক্রমিক উত্তরণের বোধ থেকেই। কাজেই য়ুরোপের খবর যামিনী রায়ের কাছে কবে এল বা এল কিনা সে-প্রশ্ন অবান্তর। যে-কোন শিল্পীর বিচারে বাইরের লোককে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়, পাছে অবান্তর অবজ্ঞার লেশমাত্র এসে পৃষ্ঠপোষণের আভাসে বিচারটাকে গৌণ ক'রে দেয়।

আসলে বোধহয় অশোকবাবু একটা বিশেষ য়ুরোপকে মান স্থির ক'রেই এই বিভ্রমের পাকে থেকে-থেকে পা দিয়ে ফেলেন। কারণ য়ুরোপ মূলে আমাদের তুল্যমাত্র, সমান নয়। তাছাড়া য়ুরোপ বলতে শুধু কয়েকশো বছরের পোশাকী পশ্চিম য়ুরোপ ভাবাও মূলের সন্ধানে ভ্রান্তিকর। অথচ গির্জা ও ও দরবারের বাইরেও শিল্পের উৎস খুঁজে যেতে হবে এবং দ্বিতীয় বা পূর্ণ রেনেসাঁসের আগে অর্থাৎ বুর্জোয়া বিকাশের আগে আর আবার তার পরে; না-হ'লে য়ুরোপের সস্তা টুরিস্টের য়ুরোপেই নিঃশেষ, না-হ'লে আধুনিক শিল্পের শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও, বোঝা যাবে না সেজানের মতো শিল্পীর কী অন্বিষ্ট, কী তাঁর সাধ্যের সীমা, সাধনার স্বরূপ ও তাঁর সিদ্ধি।

প্রকৃতির বিশেষ বস্তুরূপ ও শিল্পীর বিশেষ মানসের ছাপে মৌলরূপের যে-পুনঃসৃষ্টি আকারে ও বর্ণের শুদ্ধ একাগ্রতায়, তার ইতিহাস বুঝতে গেলে যেতে হয় ইতিহাসের প্রাচীন কাল অবধি, হাতে নিয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা। সেজানের মেজাজ বরং একদিক থেকে বলা যায় দ্বিতীয় রেনেসাঁসের আগের মেজাজে দোসর খোঁজে, যে-মেজাজে ত্রুবাদুর কাব্য, ডান্স স্কোটুস্ ও রজর বেকনের জিজ্ঞাসা, বাইজান্টিয় ও সর্ব য়ুরোপীয় আলোকময় শিল্প, শুদ্ধ মোডের সঙ্গীত। যে-মেজাজে অ্যাকোআইনাস চেয়েছিলেন রঙের স্পষ্ট সাকার ঔজ্জ্বল্য, যে-মেজাজে

বুর্জোয়াদুস্থ সেজানের মনে হয়েছিল যে তাঁর কাজ প্রকৃতিকে পুনর্জাত করা নয়, প্রকৃতিকে পুনঃপ্রতিভাত করা, এবং তা রূপসত্তায় এতই ভালোভাবে করা, যে সেজানের সংহতরূপ আপেল আর খাদ্যই থাকে না। তিনি বস্তুর সন্নিহিত রূপ চান, যে-রূপ শিল্পীর মানসের চাপে যেন হাতের আঘাতে-আঘাতে বেরিয়ে আসে, যা তৈরি করা নয়, জোড়া নয়। অবশ্যই তিনি চিত্রশিল্পী, তিনি তা করেছেন চিত্রের মাধ্যমে, আকার ও বর্ণের অখণ্ড ভাস্বরতায় ঘনতার সম্বন্ধপাতে। নিছক প্লাস্টিক বা সংযোজক গঠনের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না, তাই ত আলোক বিকীরণে মানুষ বা আপেল, জলাধার বা পাহাড় বা গাছের সবকিছুর স্বকীয় দেহবিচ্ছুরিত ভাস্বরতার ও স্পষ্টতার মধ্যে তাঁর আকার ও রং হয় বস্তুর সব মৌলরূপে, প্রায় জ্যামিতিকরূপে ধৃত। সেজান প্রকৃতির বস্তুরূপে একটা অতিস্পষ্টতা আরোপিত করেন বস্তুর সমতল-গুলিকে অতিরঞ্জিত ক'রে তুলে। তিনি অবশ্য ধ্রুপদী কণ্টুর বা দেহরেখাকে প্রাধান্য দিলেও তাঁর কালধর্মের প্রয়োজন অনুসারেই ঠুংরির স্থানীয় রং একেবারে ছাড়তে চাননি, যা ছাড়লেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা। ঐ একই কারণে সেজান টোনের ক্রমিকতাও প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি। কারণ তাঁর কালে, তাঁর সমাজে অগ্রগণ্য শিল্পচিন্তাতেও সেটা স্বাভাবিক ছিল, তখনও তাঁকে ভাবতে হয়নি বহিঃপ্রকৃতির রূপে দ্রষ্টা মানুষের কর্তৃত্ব কতখানি। প্রকৃতির সামনে সেজানের মনে স্বচ্ছতা আসত, কিন্তু প্রকৃতি তখনও, ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের ইঙ্গিত সত্ত্বেও, উনিশ শতকের বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক প্রকৃতি। অথচ সেজান বুঝেছিলেন এই প্রকৃতির অস্থিরতা ও বিচ্ছিন্নতা। তাই তিনি চেয়েছিলেন প্রকৃতিতে স্থায়িত্বের রোমাঞ্চ দিতে, কিন্তু তার চঞ্চল মায়াও তিনি একেবারে ছাড়ার কথা ভাবতে পারেননি। পরের শিল্পীদের, পিকাসোদের পক্ষেই সম্ভব হ'ল, প্রকৃতির ব্যাখ্যা বা প্রতিকৃতি আঁকা নয়, প্রকৃতিকে বদলে দেওয়া। কিন্তু সেজান বস্তুরূপগুলির প্রান্তসীমায় সবল গণ্ডিরেখা বা পরিণাহ এনে তাঁর বর্ণসম্বন্ধের ঘরে ঐশ্বর্য আনলেন কারণ রঙিনরূপে গাঢ়তর রেখার বা পাড়ের বাঁধনে রং আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, রূপ আরও স্পষ্ট।

অবশ্য নিছক রঙের রূপের এই অর্ধনারীশ্বর শিল্পের অধরা আততি কিছুতেই শেষ হয় না, সৎ নিরাসক্ত শিল্পীর যন্ত্রণাও তাই অশেষ। এর ফলে সমান কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাগগুলিকে ঘনতায় নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, যেন প্রায় মোজেইক কাজের মতো। আগে বারোক্ চিত্রকলাতেও এ-রকম সমস্যা দেখা গেছে। সেখানে কিন্তু কোণাকুণি টানে এর সমাধান চেষ্টা। এর আরেক সমাধান দেখি পিকাসোর মতো আধুনিক শিল্পীর ছবিতে, যেখানে সবকটি চড়া রং সমান ও একসময়ে গেয়ে

ওঠে, কেউ ভিন্ন বা কেউ আগে পরে নয়। যামিনী রায়ের স্বকীয় রীতিবিন্যস্ত ছবিতেও দেখি এই বর্ণপরম্পরার সমতলিক ঐক্য। এই যে সাকার রঙের পারস্পরিক যোগবিয়োগের ঐক্য, এ অতি প্রাচীন শিল্পরীতিতেও পাওয়া যায়, এমনকি আদিম গুহাচিত্রেও। আবার পাওয়া যায় সমস্ত অভিজ্ঞতার ইতিহাসে সজ্ঞান আধুনিক শিল্পীর আতত কাজে এবং এইসব চিত্ররচনায় সংহতির উৎস সা-তেও নয় রে-তেও নয়; সমগ্র স্বরলহরীতে অর্থাৎ সমগ্র চিত্রায়ণেই, রেখা ও রঙের অখণ্ডতায়। এই সমগ্রতাকে উপযুক্ত কথার অভাবে আমরা কখনও বলি কম্পোজিশন কখনও-বা ডিজাইন বা প্যাটার্ন। চোখ কিন্তু ভাষার চেয়েও ক্ষিপ্র এবং নিমেষে ধরতে পারে। আমাদের অনেকের আজ এই সংহতিতে এই শুদ্ধ সমগ্রতাতেই আনন্দ, তাই আধুনিক চিত্রকলা আমাদের বিচলিত করে সাক্ষাৎ আবেদনে, তাই ত দ্বিতীয় রেনেসাঁসের চেয়ে প্রথম রেনেসাঁসের অখ্যাত শিল্পীর কাজ বেশি মর্মে লাগে, তাই ত আধুনিক শিল্পের অন্বেষায় অজন্তার কৃতিত্ব গৌণ মনে হয়, পারসিক রাজপুত মুঘল দরবারীর চেয়ে বাংলা ওড়িয়া গুজরাটি পটপাটার ছবি বেশি তৃপ্তি দেয়।

অশোকবাবু চিত্রকলার মান নিয়েছেন ১৬ থেকে ১৯ শতকের য়ুরোপের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপ্রধান যথাযথবাদী পোশাকী শিল্পরীতির চল্‌তি ধারণা থেকে। তাতে স্থানকালপাত্র বিবেচনা গৌণ হ'য়ে পড়ে এবং এই তুলনার প্রচ্ছন্ন অভ্যাস আমাদের মতো সাধারণ চিত্রোৎসাহী মানুষকে বিপথে ঘোরায়। তাই ত অশোকবাবুও যামিনী রায়ের ছবিতে কাংড়ার মেজাজ খুঁজে পেয়ে হয়রান হন। আবার তিনি ভিনিসীয়দের স্বরগ্রামযুক্ত বর্ণাঢ্যতা না-পেয়ে যামিনী রায়ের এক যুগের ছবিতে রঙের ডিসোনান্স বা বিরোধ খোঁজেন অথচ ছবিতে রঙের পিগমেণ্টের বর্ণাভাসে কমপ্লিমেণ্টরির চড়া বিবাদী সঙ্গতি বা প্রায়-কমপ্লিমেণ্টরির বিস্মিতসুষমাই শিল্পীর সন্ধান। কারণ অধুনিক শিল্পী লোকাল বা স্থানীয় রং-মাহাত্ম্য মানতেই পারেন না, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ণরেখায় বস্তুর অখণ্ডতার রূপ দেওয়া তাঁর ছবিতে। তা ছাড়া সত্যই ত প্রকৃতিতে স্বয়ং স্বাধীন স্থানিক রং ব'লে কিছু নেই, ওটা ব্যবসায়ী সাম্রাজ্যনির্মাতা য়ুরোপের ভেদবুদ্ধিগত দেখার একটা মালিকানা অভ্যাস মাত্র। প্রকৃতির সংজ্ঞা আজ উনিশ শতকের আধিদৈবিক বা অমানুষিক দর্শনের তত্ত্ব নয়, আজ দ্রষ্টা ও দৃশ্য আপন নির্দিষ্ট সীমায় আরও সজীব ও কর্মিষ্ঠ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ। তাই ত পিকাসো বলতে পারেন: অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ব'লে কিছু নেই। বস্তু থেকেই সব আরম্ভ।" বা বলেন: "আমি যা দেখি তাই আঁকি।"

বস্তুর গাত্র বা স্থানীয় বর্ণ বস্তুতে আলোকসম্পাতেরই স্থানবিশিষ্ট প্রকাশ, যা দেখা যায় শুধু কাছের খণ্ডিত দৃষ্টিতে। তাই মাতিস বলেন : আমার কাছে শিল্প-রূপ একটি মুখের বিচ্ছুরিত বা একটি প্রবল ভঙ্গিতে প্রকাশিত ভাবাবেগে নেই, আমার শিল্পাবেগ আসে আমার ছবিটির সমগ্র বিন্যাসে—এতে মূর্তিগুলির সংস্থান, তাদের আশেপাশের খালি স্থান, পরস্পরের সামঞ্জস্য—সবকিছুই যে যার কাজ ক'রে যায়। আধুনিক শিল্পী তাই এই স্থানীয় রঙের জের বাদ দেন বা রূপান্তরিত ক'রে দেন পরিপূরক বা প্রায়-পরিপূরক বর্ণমালার সমগ্রতায়। আবহবর্ণের ব্যবহারেও তাই হয়, যে-বর্ণাভাসে দূরের পাহাড় আকাশের রঙে বাঁধা প'ড়ে হ'য়ে ওঠে ঘননীল বা লঘুনীল বা সবুজনীল। আলোকদ্যুতি বা প্রতিফলিত বর্ণ, যার আভাসে সান্ধ্য আলোয় শুভ্রশৃঙ্গ হ'য়ে যায় কষিতলাল, সে-ও তাই আধুনিক চিত্রকরের বর্ণপ্রয়োগে সমগ্রতার প্রতিক্রিয়ায় নতুন বৈশিষ্ট্য পায়। গেগ্যাঁর কথা মনে পড়ে : সর্বদা স্মৃতি থেকে এঁকো। রঙের প্রতিসাম্য নয়, সমস্বর খুঁজো। শুধু বিশ্রামের রূপ আঁকবে। সর্বদা গণ্ডিরেখা দেবে। খণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ অংশ নিয়ে ভাবিত হ'য়ো না। কখনও বিচ্ছিন্ন রং ব্যবহার ক'রো না।

প্রসঙ্গত, মনে রাখা ভালো যে তত্ত্বের বর্ণ এবং শিল্পীর ব্যবহার্য দ্রব্যবর্ণ সর্বদা সমমূল্য নয়। সিঞাকের কথা ভাবুন : লাল ও সবুজে হল্‌দে হয়, কিন্তু ছবির আকাশে যদি লাল ও সবুজ বিন্দু সমষ্টি দেওয়া হয়, তাহ'লে ফলে দাঁড়ায় একটা বর্ণহীন ক্লৈব্য। কারণ হল্‌দে ব্যবহার্য রং হিসাবে শুদ্ধ বা প্রাথমিক, যদিও আলো-কের দিক থেকে মিশ্র, অর্থাৎ ছবিতে সাক্ষাৎ হল্‌দে প্রলেপেই আকাশের আলোর উজ্জ্বলতা সম্ভব। তাছাড়া, শিল্পীর বর্ণবস্তুর কোন স্বকীয় সার্থকতা বা দ্রব্যগুণ নেই, তার প্রাণ আসে শুধু সম্বন্ধপাতে, অন্য রঙের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বাদপ্রতিবাদে এবং সবটার আর প্রত্যেকের প্রভা নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক আলোকস্পন্দনের স্বরগ্রামের উপরে। সেকালে অনেকের ধারণা ছিল যে নীলের বিবাদী কমলা, হল্‌দের বেগনি। আজকাল শিল্পীরা জানেন যে চোখের নেতিবাচক প্রতিচ্ছবির নিয়মানুসারে নীলের পরিপূরক হচ্ছে হল্‌দে, বেগনির পাল্টা সবুজ, লালের সমুদ্রশ্যাম, কমলার আকাশনীল বা ফিরোজা।

কিন্তু এইসব মূলবর্ণের নানান্ আভাস, এক হল্‌দেই কতরকম হয়, তাছাড়া এ-রঙে ও-রঙে মেলে, শাদার প্রভাবও আশ্চর্য। শিল্পীরা জৌলষও পাল্টান, কখনও মেরে দেন বা কখনও চড়া করেন বা কখনও গণ্ডিরেখার সাহায্যে রঙের পর্দা ওঠান বা নামান। যামিনী রায়ের হাতে তাঁর পরীক্ষা-যুগের সব ছবিতেই টোন বা

বস্তুর অ্যাকাডেমিক প্রথার খণ্ডবর্ণের রেশ গৌণ, কারণ ছবির ও তন্নিহিত বস্তুর বা বিষয়ের স্পষ্টতা ও সেই সঙ্গে বর্ণসমগ্রতাই তাঁর লক্ষ্য। অবাক হ'তে হয় তাঁর বৈচিত্র্যে, একদিকে বর্ণসমগ্রতার বিন্যাসের অফুরন্ত নব-নব উদ্ভাবন আর অন্যদিকে চিত্রবস্তুর নিত্যনব ভিন্ন-ভিন্ন রূপ বা থীম্। তাই ত সেজান বলেছিলেন: যখন বর্ণিকাভঙ্গে বা রঙে আসে ঐশ্বর্য তখন রূপভেদে আসে সাকার পূর্ণতা।

এই বৈচিত্র্যের ইতিহাস বিষয়ে অশোকবাবু যথেষ্ট অবহিত নন, ফলে যামিনী রায়ের কাজের যে-ইতিহাসটি তিনি দিয়েছেন তাতে শিল্পীর বিকাশের বা সন্ধানের তাৎপর্য ও পরম্পরাটি স্পষ্ট হয়নি। যামিনী রায়ের তৈলচিত্রপর্বটি তিনি প্রায় বাদই দিয়েছেন। পুরোপুরি প্রথাসিদ্ধ তৈলপ্রতিকৃতি যামিনী রায় অনেক এঁকেছিলেন, তার বাস্তবতা ও নৈপুণ্য আজও ভারতে বিস্ময়ের বস্তু। এই প্রতিকৃতির অভিজ্ঞতা বেড়ে গেল তাঁর কয়েকশত ফটোগ্রাফিক চিত্রণে, নানা টাইপের মুখের জ্ঞান তাই তাঁর স্মৃতির মজ্জায়-মজ্জায়। যামিনী রায়ের ক্ষেত্রে সব অভিজ্ঞতাই কাজে লাগে। জীবিকার জন্য গরানহাটার এনগ্রেভিংয়ে রং দেওয়া কাজ, লিথোছাপা, ব্লক প্রোসেস রঙের ছাপাখানার কাজ, ইহুদী ভদ্রলোকের কাজে পোস্টকার্ডে তিন আনায় শ হিসাবে রং দেওয়ার দু-বছরব্যাপী অভিজ্ঞতা—সবই তাঁর চোখের হাতের জ্ঞানে পরে সার্থক হ'য়ে উঠেছে। বিশ বছর ধ'রে বাংলা থিয়েটারের অভিজ্ঞতাও তাঁকে দূর থেকে মানুষের চেহারার গোটা রূপ ধরতে সাহায্য করছে, এমনকি কাপড়ের দোকানের অভিজ্ঞতায় তিনি নিশ্চিন্ত হন ভিন্ন-ভিন্ন ডিজাইন ও রঙের চাহিদার বিষয়ে।

তাই তাঁর প্রথম যুগের কাজ তাঁর পরের চিত্রবিচারে নগণ্য নয়—তার নিজের উৎকর্ষ ছাড়াও। কিছু শরীরচিত্রও এই যুগে তিনি আঁকেন, ভাণ্ডারকর বা আব্দুল আলির মতো দরদী শৌখীন ব্যক্তিদের জন্য। তারপর তিনি আঁকতে শুরু করেন তাঁর স্পষ্টতই পরীক্ষামূলক ছবি: সান্ধ্য আলোয় মৃতদেহ, তুলসীতলায় বাঙালি নারী, নমাজ-নিবিষ্ট পুরুষ, বংশীবাদক ইত্যাদি। এগুলিতে, যাকে অশোক মিত্র বলেছেন, মডেলিং বা প্লাস্টিক গুণ তা বর্তমান এবং রঙের আমেজও এগুলিতে বর্তমান, কারণ এতে রঙে টোন বা তানের বিলীয়মান রেশ আছে। তারপরে দেখি এই নিবাত নিষ্কম্প সান্ধ্য আলোর দ্বিধাহীন সুষমাই প্রাধান্য পায়, অর্থাৎ রঙের টোন বা আমেজ গৌণ হ'য়ে যায়, রঙের বৃহত্তর রূপায়ণ আসে এক জাতের ছবিতে: সাঁওতাল মেয়ে চুল বাঁধছে বা চুলে ফুল সাজাচ্ছে বা নদীতে দাঁড়িয়ে জলে রেখে মা ছেলেকে চাঁদ দেখাচ্ছে, মা ও ছেলে নত হ'য়ে প্রণাম করছে

ইত্যাদি অনেক ছবি। এরই আরো শুদ্ধ বর্ণরূপায়ণ দেখি বিধবা কৃশ মার হাতে ছেলে কিংবা বৃদ্ধ ষাঁড়,—এ-সব ছবিতে বর্ণবিলাস যাঁর স্বভাবে গভীর, তিনি রূপের তপস্বী মৌলিকতা খুঁজেছেন। তারপরে রঙিন রেখার টানে রঙিন জমির সমলেপ ছবিগুলি। এইসব ছবিতে প্লাস্টিক বা গড়ে গ'ড়ে-তোলা বর্ণযোজনার চেয়ে প্রধান্য পাচ্ছে সাকার রঙের সমতা এবং যেন খোদাই বা রূপনিষ্কাশিত মূর্তির বর্ণাভাস।

কিন্তু তবু রঙের ভাবাবেশ কেন যায় না? তোতাপুরীর নির্দেশে রামকৃষ্ণের সেই দেবীর সাকার ধ্যান বর্জন করার সঙ্গে তুলনীয়, সেজানের মতো, পিকাসোর মতো, যামিনী রায়ের মতো শিল্পীদের পূর্ণতার পথের এই প্রগতির যন্ত্রণা। যামিনী রায়ের একলব্য সাধনা তাঁকে নিয়ে গেল উপবাসীর তনু সৌন্দর্যে, সর্ববর্ণে সার নীলকণ্ঠ শুভ্রতার আভাস ও কৃষ্ণধূসরিমার বিন্যাসে, তিনি আঁকলেন রেখার বলিষ্ঠ রূপবর্ণে চোখের ভিতরের নীলধূসরের আর বাইরের আকাশের ধূসরনীলিমার শত বস্তুর প্রতিমা। কিন্তু শুদ্ধির এ তাপসী রূপ তাঁকে বাঁধল না, প্রশ্ন এল এই শুদ্ধি কি বর্ণকে উহ্য করার জন্যই? রঙের মর্ত্যসংসারেও কি শুদ্ধি থাকবে না? তাই তারপরে তাঁর ছবিতে ফেটে পড়ল মৌলিক বর্ণের প্রখরছটা।

আধুনিক কবিতায় যেমন, সঙ্গীতে যেমন, আধুনিক ছবিতেও শিল্পকর্মের সার্থকতা আবেশের রেশে নয়, গল্পের জেরে নয়; তার লক্ষ্য বস্তুর জড়িত গলাগলি রূপ নয়, স্পষ্ট বর্ণায়নেই শিল্পবস্তুতে রূপের স্পষ্টতা। আধুনিক বর্ণব্যবহারে তাই প্রথাসিদ্ধ মেটের প্রাধান্য নেই; স্থানীয় বা অঙ্গনিবন্ধ বর্ণফলের মিশ্রণ। যামিনী রায়ের এইসব ছবির রঙের ব্যাখ্যায় রংগুলিকে ডিসোনাণ্ট বা বিবাদী বলায় কিছু বোঝা যায় না, কারণ এইসব স্পষ্ট রংপ্রয়োগের পারস্পরিক বিন্যাসের অখণ্ডতাতেই গোটা ছবির সম্পূর্ণ ছবিত্ব। কম্প্লিমেণ্টরি বা পরিপূরণাপেক্ষী রঙের ব্যবহারেও তাই। এই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে আপাতবিবাদী বা সম্বাদী বর্ণব্যবহারে চিত্রে আসে স্পষ্টরূপ বা স্বাধীন একটা রূপ যা দক্ষ শিল্পীর হাতে পায় অনিবার্য একটা সামগ্রিক বর্ণসুষমা বা সঙ্গত রঙের আমেজ; সে-আমেজ সারা ছবিটি জুড়ে, জীবন্ত মানুষের রূপের মতো বা বলব, ব্যক্তিত্বের মতো বিশেষ।

অবশ্যই এ-আমেজ তথাকথিত রেনেসাঁস থেকে গত শতকের প্রথাসিদ্ধ য়ুরোপীয় চিত্রে যে জড়িত টোনের বা স্বরভাঙা অনুবাদী মিশ্রণের লোভী আমেজ, তা নয়। তাই ত সেজানের আপেলে এতই বিশিষ্ট আপেলেরই প্রত্যক্ষ সত্তা, যে সে-আপেলে আর লুব্ধ খাদ্যতা অবশিষ্ট নেই। এ-কালের ধারণায় বস্তু বা ব্যক্তির

সত্তা রং বা আলো বা খেয়ালের একতরফা আকস্মিকের উপরে নয়, নির্ভর করে সংহতির উপরে। এ-কালের শিল্পী যেন প্রায় রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সেই পাখি, যে দেখত আর যার সঙ্গী খেত আর এই দেখনপাখির আনন্দই বেশি। ভাবা যায় আজ এমন দৃষ্টিও, যে-দৃষ্টি ভালোওবাসে আবার দেখেও এবং যে দুয়ের বিরোধ সমন্বয় ক'রে বস্তুকে বা অন্যকে সম্পূর্ণ সত্তার মর্যাদা দিয়েই, উভয়ত সচল স্বাধীন সম্বন্ধপাতের মধ্যে দিয়ে। এ-কালের মানসে, এর সনদ মেলে মানবিক কারিটাসে প্রেমে, যেটা সোভিএট মানুষে ইতিমধ্যেই অনেকে লক্ষ করেছেন।

এ-বিষয়ে অশোকবাবু নিশ্চিন্ত না-হওয়ায় এবং যামিনী রায়ের বিরাট চিত্র-রাশির পরম্পরা বিষয়ে অন্যমনস্ক থাকায় তাঁর আলোচনাটি তাঁর চিন্তার গোলক-ধাঁধায় আমাদেরও ঘুরিয়েছে। শিল্পবিচারে বোধহয় নিজের এবং নিজের কালের রুচির কী প্রয়োজন সে-বিষয়ে মনঃস্থির করাটা তাই প্রাথমিক। তাই ত পিকাসো বলেছিলেন যে অতীত শিল্প ব'লে কিছু নেই, বর্তমানের প্রয়োজনেই অতীত প্রাণ যায়।

এদিকে যামিনী রায়ের বৈষ্ণব-বিষয়াশ্রিত ছবি, রামায়ণের ছবির দুটি পালা, সঙ্গে-সঙ্গে রেখাপ্রধান ছবির বিবর্তন চলল। তাঁর নিজের দেশি ঘরানায় বিদেশি পুরাণের রূপদানের সমস্যায় এল বাইবেল-বিষয়ক ছবিগুলি, যেখানে পাপপুণ্যের লোকোত্তর বিশ্বাসের রূপ দিতে হবে ছবির চিরলোকায়ত মাধ্যমে, অতীন্দ্রিয় রূপকের ঘটনাকে রূপ দিতে হবে চাক্ষুষের গ্রাহ্যতায়। কিন্তু এ গম্ভীর স্নিগ্ধ ঘরোয়া কিন্তু অমর্ত্যের রূপায়ণের সাফল্যেই ত শেষ নয়। যামিনী রায়ের শিল্পে যন্ত্রণা আসে থেকে-থেকে, পিকাসোর মতো তাঁরও শিল্পজীবন ফাঁড়ায়-ফাঁড়ায় অস্থির অশান্ত। তাই বিশ্রামহীন দৈনন্দিন শিল্পকর্মে রত এই শান্ত বাঙালি শিল্পীকে দেখি তাঁর হাতের রেখার কৃতিত্বে ক্লান্ত হ'য়ে রেখার টানের ছবিতে এবারে পাথুরে জমির শারীরিকতার সন্ধানে ব্যস্ত। ভুসোর শাদার বিন্যাসে জমি আঁকার কঠিন রহস্যের দ্রুত আকস্মিকতায় ফুটে ওঠে এইসব মৃত্তিকাধৃত স্থির কিন্তু প্রাণময় মূর্তিগুলি। বা ফুটে ওঠে অধরা আবেগের সৌন্দর্যে গেরিমাটির তীব্র জমি আঁকার বিন্যাসে একক বা বহু মানুষের রূপের শুদ্ধস্বর। এদিকে আবার নিছক আল্পনা-বিন্যাসে যামিনী রায় উত্তরোত্তর মন দেন, ফলে শুদ্ধ বা বিষয়ত্যাগী নক্সার ছবিতে আসে রহস্যময় গভীর রূপাভাস।

খবরের কাগজে, চটে, ছেঁড়া কাপড়ে ছবি ত আগেই হয়েছে। এবারে যামিনী রায় তালপাতা নারকেলপাতা হাতের কাছে পেয়ে একদিকে সরু কালিতে আঁকেন অতি সূক্ষ্ম ছবি, আবার বিচ্ছিন্ন চাটাই জমিতে আঁকেন মোটা পোঁচের

ছবি। এঁকে নিজেই বিস্মিত হ'য়ে যান এর সম্ভাবনায়। কেটে-ফেলা বোর্ডের টুকরোর বুনন জমিতে আঁকা শুরু হ'য়ে যায়, রং পড়ে মোটা ঔজ্জ্বল্যে কিন্তু এক স্নায়বিক শক্তির সংহতিতে।

অশোকবাবু লিখেছেন যামিনী রায়ের গত কয় বছরের ছবির ভাস্বরতার প্রসঙ্গে যে যামিনী রায় 'অধুনা নানা দেশের চিত্রপদ্ধতি ঝালিয়ে' নিচ্ছেন। কথাটা সম্পূর্ণ নয় এবং অসম্পূর্ণ কথার অর্ধসত্যের বাঁকা আলোয় সত্যটুকুও বোঝা যায় না। অন্য দেশের বা অন্যের ছবির বিষয়ে যামিনী রায় বরাবরই শ্রদ্ধাবান্ উৎসুক জিজ্ঞাসু। কিন্তু সে-জিজ্ঞাসার ঘাট মেলে তাঁর নিজের কর্মধারা থেকে উত্থিত স্রোতে। পুরানো ছবি সংস্কার করতে গিয়ে রঙের পোঁচ বা তেলের ছোঁয়াচ দিতে গিয়ে, বুননছবি এঁকে, তাঁর রং ব্যবহার পেয়ে গেল নতুন দ্যোতনা, তাছাড়া রঙের প্রস্তুতি মিশ্রণ, আঠার তারতম্য এ-সব ত আছেই। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে-সঙ্গে ছিল স্বভাবের গভীর তাগিদ—আমাদের ক্ষয়িষ্ণু জীবন একটা সাম্প্রতিক ভারতীয় আত্মতৃপ্তিতে যতই মেটে ময়লা হ'য়ে যাচ্ছে, রঙের ভাস্বরতার প্রতিবাদী প্রয়োজন স্নায়ুর গভীরে ততই কি তীব্র হ'য়ে ওঠে? যামিনী রায়ের কাজে দেখা যায় শিল্পীর নিজের সিদ্ধিকে বারংবার নব-নব পর্যায়ে উত্তরণ; অথচ এ-সব অভিযানেই একটি যোদ্ধার শিল্পস্বভাবের ব্যাকুলতার শক্তি স্পষ্ট। তাই ত তার রেখা আবার ভাঙল, এক দুর্মর স্নায়ুশক্তির টানে-টানে রঙের আন্তর ভাস্বরতায়, যেখানে বস্তুরূপ যেন প্রাণ পায় রেখার গতিতে ততটা নয়, যতটা রূপের অন্তর্নিহিত বর্ণাভাসের দ্যুতিতে, রেখার স্পন্দনে। এই থেকেই তিনি এলেন সাহেবি ভাষায়, মোজেইকের খচিত ভাস্বরতার এক ফ্যুগাল বিস্তারে, যাতে লোকসঙ্গীত কাউণ্টরপয়েণ্ট্ থেকে সোনাটা সিম্ফনির সমস্যা নতুন হ'য়ে আসে গ্রোস্ফ্যুগে, বা বুঝি বার্টকের কোয়ার্ট্রেটে।

আমার মনে আছে ঠিক সেইসময়ে যামিনী রায়ের কাছে এল বাইজাণ্টিয় মোজেইকের বই, এবং তাঁর কী তৃপ্তি এই সমর্থন দেখে। তাঁর জীবনে এরকম ব্যাপার বারবার ঘটেছে। আজ মনে হচ্ছে সেই সে-যুগের সান্ধ্য আলোর ভাস্বর সুষমার সন্ধান আজ যেন বৃত্ত পূর্ণ ক'রে আসছে সবকটি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিমিতি ও প্রাচুর্যের মধ্যে রূপের বলিষ্ঠ রেখার আলোকময় স্পন্দনে। এতে মিশরী চিত্র থেকে বাইজাণ্টিয়, দুচ্চ্যো, সিমোনে মার্তিনি, জ্যোত্তোর অগ্রজ মোজেইকশিল্পী যিনি স্থাপত্য থেকে ছবিকে মুক্তি দিলেন সেই কাভালিনির গির্জার রঙিন কাচচিত্র, রুশ আইকনচিত্র সবাই উদাহরণ জুগিয়েছে, সমর্থন দিয়েছে। অবাক লাগে ভাবতে এই বিচিত্র সম্পূর্ণতা, এর পরে বিকাশের কী স্তর

দেখতে পাব কী জানি, এবার কী শিল্পীজীবনের কুরূপকে দেবেন শিল্পের কুরূপ-বিজয়ী আরেক রূপ ?

যামিনী রায়ের শিল্পপ্রেরণার বিষয়ে একটা দোমনা বা লঘুভাবের জন্যই লেখকের মনে হয়েছে, 'তাঁর থীমের বৈচিত্র খুব কম।' না-হ'লে চোখ মেলে এবং ধৈর্যসহকারে কিছুকাল ধ'রে যামিনী রায়ের কয়েক হাজার ছবি ও কয়েক হাজার ড্রয়িং—চল্লিশ বছর, প্রায় অর্ধশতাব্দী ব্যেপে প্রতিদিনের কাজ দেখলে কেউ এ-কথা বলতে পারতেন না, এমনকি নিছক বিষয়ী-থীমের দিক্ থেকেও না। বস্তুত, এক পাব্‌লো পিকাসো ছাড়া থীমের এত বৈচিত্র্য বোধহয় পৃথিবীতে আর কোন শিল্পীর কাজে নেই।

অবশ্য অশোকবাবুও প্রায় সেই কথা বলেছেন দু-লাইন পরে ছত্রিশ প্যারা-গ্রাফে : 'এই বিরাট শিল্পীর সারাজীবনের কাজ এত বিচিত্র যে···' আশা করি যামিনী রায়ের বৈষ্ণব মনোভাব ও বীজমন্ত্র বিষয়ে পঁয়ত্রিশ প্যারাগ্রাফের মজা-ক'রে-বলা কথাটা এই উক্তিতে শাক্ত বা নাস্তিক হাওয়ায় উড়ে গেছে। আসলে তিনি যামিনী রায়ের ছবিকে শুধু অবজ্ঞেয় প্যাটার্ন বা ডিজাইন ভেবে মুশকিলে পড়েছেন। অবশ্যই যামিনী রায়ের ছবিতে ডিজাইন বা পরিকল্পনা মূল লক্ষ্য, অনেক প্রাচীন চিত্রকলা বহু দেশের লোকশিল্প ও অনেক আধুনিক চিত্রশিল্পীর কাজের মতোই। কিন্তু এ-ডিজাইন মাতিসের মতো যামিনী রায়ের ছবিতেও চিত্রগত পরিকল্পনা, চিত্রগত বিন্যাস, দেয়ালে সাজিয়ে আনন্দ দেবার জন্য। যার ফলে এই ডিজাইনের মাছিমারা সংক্ষিপ্তসার শাড়িতে বা পুতুলে, ধাতুর থালা বা ট্রেতে নকল অত বেমানান লাগে। সেইজন্যই ত যামিনী রায় যখন মাটির জালা বা থালা বা বাটিতে নিজেই ডিজাইন আঁকেন, তখন তার প্রকৃতি পাত্রটির প্রকৃতির মতোই করেন, ছবির ডিজাইনে নয়। তাই এই ডিজাইন উল্লেখ ক'রে অশ্রদ্ধার রহস্যচ্ছলে বৈষ্ণব বীজমন্ত্র ছড়িয়ে যামিনী রায়ের কোন-কোন ছবির একাধিক সংস্করণ ব্যাখ্যা করতে যাওয়া অর্থহীন। তাঁর একজাতের অনেক ছবিতে পরিকল্পনা বা আলেখ্যবিন্যাস বহু সাধনায় অর্জিত সরলতাও নিশ্চয়তা পায় এবং তখন সেই ছবি একাধিক ব্যক্তির ভালো লাগলে একই ছবির লিপি একাধিক ব্যক্তির আয়ত্তে তিনি এনে দেন, দামী সংস্করণের প্রায় সমান দামে—এই ত হ'ত সোজা ব্যাখ্যা।

একটি বেগনি-নীল ঘোমটা-পরা গোরোচনা মেয়ের মুখ দেখে ভ্‌সেভোলদ পুদভ্‌কিন যখন তন্ময়, তখন ভয়ঙ্কর ইভানের, মায়াকভ্‌স্কির অভিনেতা

চেরাকসভ্ সেই ছবিটির জন্মই সরবে কাতর ; প্রবল রুশ ইংরেজি সংলাপের মধ্যে তাঁকে বহু ছবি দেখানো হ'ল কিন্তু অভিনেতা ডেপুটির মন আর ভরল না। বিরাট মানুষটি স্পষ্টই ছোটো হ'য়ে যেতে লাগলেন, এমনকি তাঁর মাথা মুখ পর্যন্ত শুকিয়ে ছোট হ'য়ে গেল ; এদিকে পুডভ্কিন তখন আনন্দে বিহ্বল : বাঙালি বধূটি মস্কোতে যাবে, তিনিই কি ওটি প্রথমে বাছেননি ? শেষটায় ঐ-ছবিরই আরেক অনুলিপি চেরকাসভ্কে শান্ত করল, উল্লসিত নাট্যশিল্পী চৌকি ছেড়ে উঠে লম্বা অতিকায় হ'য়ে উঠলেন, তাঁর মুখ স্বাভাবিক বড়ো হ'য়ে উঠল : ঐ-ছবি লেনিনগ্রাদেও যাবে, রাশিয়ার ঐ দুই মহানগরী, প্রায় রাজধানী, দুই বোন যেন ; একটি যাবে দিরেকতরের সঙ্গে, আরেকটি আকতরের সঙ্গে।

দ্বিতীয়ত, যামিনী রায় তাঁর সুলভ্য বা দুর্লভ সব ছবিই সাধারণ মানুষকে নন্দিত করতে হাতে দিতে চান ; জীবিকার প্রথামতো বাধ্য হ'য়ে তাঁকে একটা দাম নিতে হয়, যার জন্ম তাঁর অস্বস্তিবোধ সবাই লক্ষ্য করেছেন। যত বেশি মানুষ ঘরে ছবি রাখবে, ততই জীবন ও শিল্পে রুচিবিস্তার ও আনন্দের প্রসার। তাই ত পিকাসো বলেছিলেন যে তাঁর ইচ্ছা হয় অনেক শস্তার এনগ্রেভিং ক'রে অনেক কপি ক'রে তাঁর ছবি জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দিতে।

কিন্তু যামিনী রায়ের বিরাট চিত্রসম্ভারের মধ্যে টাইপমুখের প্রাচুর্য অশোকবাবু কেন দেখতে পাননি জানি না, বিশেষ ক'রে তাঁর মতো সতর্কমন্য সমালোচক যিনি যামিনী রায়ের কয়েক হাজার বিশিষ্ট ছবির মধ্যে একটি পসারিনী (?) এবং একটি ছোটো নাচের ছবিও উল্লেখ করতে ভোলেন না ! এ-কালের পোর্ট্রেটের বিষয়েও তাঁর কথা মানা শক্ত। গান্ধিজীর পাঁচ-ছয়টি পোর্ট্রেটে, রবীন্দ্রনাথের চার-পাঁচটিতে এবং সুধীন্দ্রবাবুর পোর্ট্রেটে যামিনী রায় বিষয়ব্যক্তির একটি চারিত্র্য খুবই স্পষ্ট ধরেছেন, অবশ্যই শিল্পীর দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে।

আমার শেষ প্রশ্ন হচ্ছে অশোকবাবুর শেষ উক্তিতে : ভারত অশান্তি চায়, কাজেই যামিনীবাবুর শিল্পরচনা ভারত বা তাঁর স্বদেশ গ্রহণ করবে না, কারণ তাঁর ছবি শান্তির ছবি ! শান্তির সাধনা ত মানুষ অশান্তির জন্মই করে ; আর মানুষ শান্তি চায়, ভারতও চায়, বর্তমান পৃথিবীই চায়। দ্বিতীয়ত, যামিনী রায়ের চিত্রাবলিতে রূপের সন্ধান জীবনের, আমাদের জীবনের প্রতিবাদ অশান্তির বিরুদ্ধে শান্তির জন্ম, কুৎসিত অসম্পূর্ণ অসুস্থ অন্যায় থেকে ন্যায়সঙ্গত সম্পূর্ণ সুস্থ, সুন্দর জীবনের নির্মাণের প্রেরণায়। কোন শিল্পীর প্রতিভার সীমা নিরূপণ প্রচেষ্টায় এ-রকম কথা চমকপ্রদ হ'লেও অসার।

মস্‌কভা-পিকাসো সংবাদ

'এই কথাকটি পিকাসোর বন্ধুত্বকে বহন ক'রে নিয়ে যাক্‌। বহুকাল আগে আমি বলেছিলুম যে লোকে যেমন নির্ঝরের মুখে গিয়ে পৌঁছায় আমিও তেমনি কম্যুনিজমে এসেছিলুম এবং আমার সমগ্র কাজই আমায় এই গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল।

'মস্কোতে সাধারণ লোকের জন্য এক পিকাসো প্রদর্শনী হচ্ছে আর তাতে কিছু সম্প্রতিকার কাজও থাকছে জেনে আমি আনন্দবোধ করছি।'

উপরের সামান্য কটি কথা পিকাসোর সংক্ষিপ্ত বাণীর আরম্ভ। মস্কোতে কিছুকাল আগে পিকাসোর ছবির প্রদর্শনী আনন্দের সংবাদই বটে। অবশ্য মস্কো-লেনিনগ্রাদের মানুষের কাছে পিকাসোর কাজ নতুন নয়, সোভিয়েট দেশে পিকাসোর প্রথমদিকের কাজের নমুনা নগণ্য নয়, এবং বড়ো ছাপা ছবিও চিত্রানু-রাগী ব্যক্তিরা পেতেন সহজে। সেই কবে ১৯২২ সালে মায়াকভস্কি এ-যুগের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ব'লে পিকাসোকে অর্ঘ্যদান করেছিলেন। তবু এ-কথা মানতে হবে যে সোভিয়েট দেশে যে বিরাট সামাজিক রূপান্তর, যে বৈপ্লবিক নির্মাণ তিন-চার দশক ধ'রে চলেছিল, তার আশু প্রেরণার চাপে, সাক্ষাৎ ফলাফলের প্রাথমিক উৎসাহে শিল্পের অনেক মৌলিক চিন্তা সংখ্যা-গরিষ্ঠ চিন্তাজগতে গৌণ হ'য়ে পড়েছিল। ফলে পৃথিবীর বৃহত্তম সাহসিকতম সমাজ-পরীক্ষার দেশে শিল্পের পরীক্ষামূলক কাজ রুদ্ধ না-হ'লেও কিছুটা অবহেলা পেয়েছিল, কিছুটা নিন্দাও। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট দেশে প্রগতিশীল কবিরা, প্রগতিশীল শিল্পীরা তাঁদের কাজ ক'রে গেছেন, তর্কাতর্কির মধ্যেই কাজ ক'রে গেছেন।

রুদিন, বাজারফ্‌, রাস্‌কল্‌নিকফ্‌, কারামজফ্‌, লেভিনের দেশে আজও মানুষরা কথা বলতে ভালোবাসে, আরাম পায় তর্ক করতে, বাক্‌যুদ্ধ করতে। তার উপরে সাম্যবাদ আবার এই প্রবণতার পোষক বটে। কিন্তু এ-কালের ইংলণ্ডের লোকেরা ভুল বুঝলেও আমরা কেন ভুল বুঝব? সেকালের ইংলণ্ডের মতো আজও আমাদের দেশে ত তর্কাতর্কি, হাতাহাতি, চুল ছেঁড়াছেঁড়ির পরেও দেখা যায়, বন্ধুরা গলাগলি করে, মেয়ে-পুরুষ সংসার করতে যায়। পাস্তেরনাককে তাই স্তালিন টেলিফোন করেন, কেন তিনি 'প্রাভদা'য় লেখেন না প্রশ্ন ক'রে।

অন্য দেশ হ'লে এই পরীক্ষামূলক শিল্পের প্রগতি চলতে গিয়ে সমাজবিচ্ছিন্ন কৌলিকমন্য হ'য়ে পড়ত এবং বিরোধীকে সমাজের হর্তাকর্তারা কোনদিনই মানতে পারত না। প্যারিসে কিছুকাল আগেও পিকাসোর প্রদর্শনীতে তাই পুলিশ ডেকে ছবি বাঁচাতে হয়, ইংলণ্ডে সর উইনস্টন চর্চিল বলেন যে পিকাসোর মতো শিল্পীর পশ্চাতে পদাঘাত করা উচিত। অবশ্যই পিকাসো জন বুল্-কে জবাব দেবার দরকার মনে করেননি। কিন্তু মস্কো প্রসঙ্গে জঁা-পি-এর সালতাঁ-কে তিনি বলেন: আমি খুব খুশি। জানোই ত, অনেক-কিছুই বলা হয়েছিল, আমার আর আমার ছবির সম্বন্ধে। তাতে কষ্ট পেয়েছি। কষ্ট পেয়েছি বটে···প্রতিবাদ করিনি। এখন এই মস্কোর প্রদর্শনী খুব পরিতৃপ্তির ব্যাপার।

প্রত্যেক দেশেই বিশেষ ক'রে গত কয়েক শো বছর ধ'রে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে মতানৈক্য থাকে; মোটাভাবে বলা যায় যে একটা ধারায় থাকে সহজগ্রাহ্য চালু রচনার আর সহজে গ্রহণের মন, আরেকটা ধারা হচ্ছে চৈতন্যের নতুন বিস্তারের ও শিল্পকলার নতুন বিন্যাসের প্রয়াস। খামকা সোভিয়েট শিল্পসাহিত্যে তার ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। ব্যতিক্রম শুধু বোধহয় এইটুকু যে অন্যদেশে কর্তা-ব্যক্তিরা থাকেন শিল্প-সাহিত্যের বিষয়ে বস্তুত সম্পূর্ণ উদাসীন, এমনকি সৃষ্টিকর্মের পরিপন্থী, সোভিয়েট সমাজব্যবস্থায় কর্তাব্যক্তিরা হ'য়ে পড়েন সংস্কৃতি-ঘটিত ব্যাপারে সমধিক উৎসাহী, দায়িত্বভারে সমধিক ব্যস্ত।

কথা উঠতে পারে যে এই সমাজব্যবস্থায় কী ক'রে চর্চিল-মার্কা সমাজের নির্বোধ-স্থূল মানস জের টেনে চলে? এই ইউটোপীয় বা কুইক্‌সোটিক প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নের মধ্যেই মেলে। সোভিয়েট সমাজ প্রায় এখন পর্যন্ত চর্চিল-মার্কা ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসি সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদিত্বে বাধ্য, বিকাশের বর্তমান স্তরের তাগিদেই; কাজেই প্রতিবাদ্য জগতের মানস এ-জগতকেও স্পর্শ করে। অধিকন্তু, জীবনযাত্রার উন্নয়নে যে-যন্ত্র, যে-কৌশল, যে-টেক্‌নিক্ সোভিয়েট সমাজকে অবলম্বন করতে হয়, সেই যন্ত্রমানসের আদিম অবস্থার জের স্বভাবতই সোভিয়েট দেশকেও সইতে হয়েছে। ইওরোপে আমরা দেখেছি যে রেনেসাঁস বা পণ্যশিল্পের উৎপাদন ও মুনাফার বিপ্লবের যুগ থেকে নবসমাজের প্রয়োজনে এক বিশেষ শিল্পমানস বিকাশ পায়। এই মানসের কীর্তির দীর্ঘ ও বিচিত্র ঐশ্বর্যে আমরা স্বভাবতই ভুলে যাই যে এই মানসটি চিরন্তন বা মানবমনের একমাত্র বৃত্তি বা ধর্ম নয়। মানুষের দীর্ঘ ও বহুবিচিত্র ইতিহাসে এই তিন-চারশ বছরের কীর্তি একটি গৌরবময় ও শিক্ষাপ্রদ পর্বমাত্র। এ যুগোপযোগী ঝোঁক হচ্ছে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যকেই

ফলাও ক'রে দেখা ও দেখানো; ব্যক্তির নিজের খুঁটিনাটি এবং ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যে-মিল যে-একতা তা নয়, যেটা ভেদ সেই ভেদকেই বড়ো করা ছিল এ-সভ্যতার মানসিক প্রয়োজন। তথাকথিত বাস্তববাদের জন্ম এই মানসিক প্রয়োজনেই, এই উপকরণবাদেই।

অথচ কি সাহিত্যে কি চিত্রশিল্পে মহান শিল্পীরা বরাবরই এই ব্যক্তির আণবিক দৌরাত্ম্য কাটিয়ে ওঠেন এবং তাঁদের সৃষ্টিকার্যে ব্যক্তি হ'য়ে ওঠে মানবিক, নির্বিশেষ, প্রতিভূ, প্রতীক। এবং সমালোচনাতেও এ-সত্য দীর্ঘকাল ধ'রে স্পষ্ট, কোল্‌রিজের বিকল্পনা ও সংকল্পনার বিচার কি এই সত্যেরই উপলব্ধি নয়? চিত্রশিল্প জগতেও এ-উপলব্ধি দীর্ঘকাল ধ'রে চলেছে। ব্লেকের কথা ছেড়ে দিই, প্রথাসিদ্ধ বাস্তববাদের ওস্তাদেরাও এ-সত্য বুঝতেন। তাইত অ্যাঁগ্‌র বলেছিলেন যে, মডেল থেকে আঁকলে দাস হ'তে হয়, আঁকতে হয় প্রকৃতি-দর্শন থেকে নিজের অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে। কিংবা গোইআর কথা ভাবা যাক্‌, যিনি বলতেন যে প্রকৃতি থেকে যে-শিল্পী নিজেকে সরিয়ে নেন এবং যে-সব রূপ ও গতির আন্দোলন তখন পর্যন্ত শুধু কল্পনার জগৎ ছিল তাদের রূপের জগতে প্রকাশ করতে পারেন, তিনিই প্রশংসনীয়। কারণ সত্যই প্রকৃতিতে রংও নেই, রেখাও নেই। অথবা উনবিংশ শতাব্দীর কথাই ধরি, দেগা-র কথা ধরা যাক্‌: নর্তকী শুধু ত নকৃশার একটা অছিলা বা উপলক্ষমাত্র। সব শিল্পকর্মের ক্ষেত্রেই এই কথা খাটে। এমনকি উপন্যাসের মতো প্রত্যক্ষজীবী কর্মেও, চরিত্র, কাহিনী, ঘটনা, বাস্তবতা সবই শুধু উপলক্ষ্য, মূল হচ্ছে লেখকের প্রাণময়তা, যে দুর্বার ছন্দে চরিত্র জীবন্ত হয়, বাস্তব মনে হয়, ঘটনা বা কাহিনী অনিবার্য বেগে চলতে থাকে। বরঞ্চ বলা যায়, এই উপলক্ষের মাহাত্ম্যে লেখকের অসুবিধাই, যার জন্য হেন্‌রি জেম্‌সের মতো সমাজবিলাসীও দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন রূপকথার মুক্তির জন্য।

মুশকিল হয় ঐ উপলক্ষের রহস্যটুকুতেই। কেন নকৃশার কাজের জন্য লাগে নর্তকীর দেহাভাস? কেন কবিতা লিখতে হয় কথা দিয়ে, শব্দ দিয়ে, এবং সেই শব্দে, সেই কথায় আসে অর্থের দায়ভাগ এবং সে-দায়ভাগে জীবনেরই দাবি-দাওয়া। একদিকে জীবন, প্রত্যক্ষ, বাস্তব, পরোক্ষ, ঐতিহ্যগত জীবনের দাবি, জীবনের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব, যার স্বরূপ ও সীমার কোন সিদ্ধান্ত নেই শেষ নেই। তার উপরে রচয়িতার মন, আয়ত্ত করার ক্ষমতা, প্রকাশ করার ক্ষমতা। তাছাড়া, জলবায়ুতে যে-ভাষার বা শিল্প-প্রকাশরীতির ধারা, সে-ধারা সাহায্যও করে আবার টেনেও রাখে। এই বহুধা রহস্যের জন্যই সাধারণ পাঠকের বা দর্শকের সন্দেহ

জাগে আধুনিক শিল্পীর বিষয়ে, তার প্রেরণার যাথার্থ্যে, উদ্দেশ্যের সততায়। মনে হয় শুধু বুর্জোআকে চমক দেবার জন্যই বুঝি আধুনিক শিল্পী অভিনব কিছু করবার চেষ্টা করে। এ-কথা ঠিক যে আধুনিক শিল্পী শুদ্ধতার পথে অগ্রগামী, অর্থাৎ আধুনিক শিল্পীর লক্ষ্য হচ্ছে সেইটুকুই প্রকাশ করা যা সে মনশ্চক্ষে দেখে, কানের মরমে শোনে, বোঝে, ভাবে ; তাতে যদি পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের অভ্যাসে আঘাত লাগে তবে সে নাচার। তাই আধুনিক কবিতায় বর্ণনা বা গল্পের আপাত-বোধ্যতা থাকে না, ছবিতে মডেলের যথাযথ চেহারা মেলে না, প্রকাশের সততার তাগিদে সংক্ষেপ এসে যায়, মধ্যপদ লোপ পেয়ে যায়, ফিল্মের মতো সংযোজনায় টেলিস্কোপিং হয়।

অভ্যস্ত ও অনভ্যস্ত এই দুয়ের মধ্যে নির্ভয় যোগাযোগে আধুনিক শিল্পীর প্রেরণা অর্জন করে একাধারে তার আন্তরিকতা ও তার বিশিষ্ট আততি। তার প্রেরণার সততাই আধুনিক শিল্পের দুঃসাহসী অভিযানে মূল শক্তি। অনেকে ভাবেন, এ-কালের শিল্পীরা, লেখকেরা জোর ক'রে যেন চালাকি ক'রে তাঁদের ধাক্কা দেন। আমার এক বন্ধুর উদাহরণ দিয়ে কথাটা স্পষ্ট করি। তিনি মনে করেন, ধরা যাক্, 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এই যোজনা ঐ-শ্রেণীর ব্যাপার। কারণ তাঁর কাছে উর্বশী বেদ থেকে, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনুষঙ্গে সমৃদ্ধ, কিন্তু আর্টেমিস্ তাঁর সাহিত্যিক হিঁদুয়ানিতে অপরিচিত লাগে। কথাটা অবশ্য তাঁরই অত্যুক্তি, তিনি বলেন যে গ্রীক্ বা ইওরোপীয় পুরাণ সাহিত্যশিল্প এমনকি দেবদেবীর নাম তিনি জানেন না, কাজেই ঐশ্বর্যময় প্রতীক উর্বশীর প্রতিপক্ষতায় তাঁর মনে নাকি আসে ঘটোৎকচ—উর্বশী ও ঘটোৎকচ। কিন্তু কবিতাটিতে এবং সেই থেকে বইটির নামকরণে উর্বশী প্রতীকের কেন্দ্রের বিপরীত কাব্যাবেগ দানা বেঁধেছিল আর্টেমিসের রূপে, শুচি কৌমার্যের তনু দেবী, চন্দ্রের হিম-অধিষ্ঠাত্রী, শিকারের দেবতা আর্টেমিসেই। এবং এর জন্য শুধু ইংরেজি কাব্যলোকই যথেষ্ট। তাছাড়া হয়ত ভারতীয়-গ্রীক যোজনাও মনের পিছনে ছিল।

আধুনিক শিল্পীরা এমনিতর সমালোচনায় আজকাল আর কেউ অবাক হন না। কারণ স্বকীয়তার স্বর্ণমারীচ সন্ধানে চমকপ্রদ প্রয়াসে তাঁরা কেউই যে অস্থির নন সে-বিষয়ে তাঁরা নিজেরা নিঃসন্দেহ। এমনকি তাঁরা জানেন যে স্বকীয়তার নিত্য বিসর্জনেই, নিজের সামান্যতার সত্যেই শিল্পের এবং শিল্পীর ব্যক্তিস্বরূপের উৎকর্ষ। শিল্পশুদ্ধির সাধনা চিত্তশুদ্ধির অনুরূপ, এবং সে গৌরীর তপস্যায় ঋজু একনিষ্ঠতাই কাম্য, ধ্যানের প্রাথমিক ক্লেশ কঠিনতার ভয় সত্ত্বেও।

তাই পিকাসো আনাতোল জাকফ্স্কিকে আর-দ-ফ্রাঁসে 'মিদিস্ আভেক পিকাসো'তে বলেছিলেন : আমি কিছু খুঁজে বেড়াই না। আমার কাজ শুধু আমার ছবিতে যথাসম্ভব মানবতা এনে দেওয়া। তাতে যদি প্রথাসিদ্ধ মানব-পুত্তলীরা চটেন, তাহ'লে নাচার। তাছাড়া তাঁরা আয়নায় আরেকটু মনোযোগ দিয়ে নিজেদের দেখলেই পারেন।...তলার দিকে ওই মুখটা কার? ওটা কি কারো ফটো? একটা রঙিন মুখোশ? না ঐ হচ্ছে অমুকের মুখ যেভাবে অমুক আর্টিস্ট মুখটিকে রূপায়িত করেছে? ও কে সামনের দিকে, মাঝখানে বা পিছনদিকে? আর বাকিটা কি? প্রত্যেকেই কি দেখে না নিজের বিশিষ্ট ধরনে? এখানে বিকৃতির সুযোগ নেই বললেই হয়। দমিএ আর লত্রেক্ মানুষের মুখ দেখেছিলেন আঁাগর বা রেণোআর থেকে ভিন্নভাবে, এই ত ব্যাপার। আর আমি, আমি দেখছি এইভাবে···আসলে আমি যা দেখি তাই শুধু আঁকি। আমি দেখছি, অনুভব করেছি, হয়ত ভিন্ন-ভিন্নভাবে আমার জীবনের ভিন্ন-ভিন্নযুগে, কিন্তু যা আমার দর্শনে বা অনুভবে আসেনি তা আমি কখনই আঁকিনি। একজন আর্টিস্টের আঁকার স্টাইল বা ধরনটা যেন হস্তলিপিবিশারদের জন্য তার লেখার মতো। সেখানে মেলে গোটা মানুষটিকে। আর বাকি যা-কিছু সে-সব হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাপার, টীকাকার সমালোচকের ব্যাপার, ও-সব নিয়ে আর শিল্পীকে মাথা ঘামাতে হয় না।

—প্লাস্টিক কলাকৌশল? ও আমি বুঝি না। ছবিতে সবকিছুই শুধু একটা চিহ্ন একটা অভিজ্ঞান। সুতরাং যা চিহ্নিত হ'ল সেইটাই মূল্যবান্, তার প্রক্রিয়া নয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞান আর শব্দ বা অভিধানের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। যেমন 'চেআর' কথাটায় কিছু চিহ্নগুণ নেই। কিন্তু আঁকা হ'লেই 'চেআর' হ'য়ে ওঠে একটা অভিজ্ঞান। তখন তার ব্যাখ্যা চলতে পারে অনন্তকাল অবধি। ব্যাপারটা দেশি চল্তি বুলির মতো, যাতে 'জিনিষ' বা 'যন্ত্র' বললেই মরা শব্দটা ভেঙে গিয়ে অনেক কাব্যগত অর্থ পেয়ে যায়। ঢোকবার পথে তুমি একটা ছবি দেখেছ, যার শিল্পীর নাম আমি বলব না। সত্যিই! ছবিটা খুব খারাপ। অথচ সেজানের হাতে ঐ-বিষয়ই ঠিক ঐভাবেই প্রয়োগ ক'রে ঠিক ঐ-রঙে এঁকেও অতি সুন্দর হ'য়ে উঠত। কারো হাতে বেরোয় ওস্তাদের কাজ, কারো হাতে কিছুই নয়। সহজে এর ব্যাখ্যা নেই। কোন দুটি রং পাশাপাশি রাখলে বস্তুত তারা গান ক'রে ওঠে? এ কি সত্যি ব্যাখ্যা করা যায়? না। তাই ত ছবি শিখে আঁকা যায় না।

জানতে চাও তরুণদের বিষয়ে আমার কী মত ? কিন্তু তরুণ ত অনেকরকম··· যৌবনের ত বয়স নেই। এখন অনেক তরুণ রয়েছে যারা কয়েক শ বছর আগে মৃত কোন-কোন শিল্পীর চেয়েও বৃদ্ধ। অবশ্যই তাদের উচিত তাদের নিজেদের কাল থেকে আরম্ভ করা। আধুনিক শিল্প থেকে, ভালো ক'রে বুঝেসুঝে। মোটর কার যখন হাতের কাছে রয়েছে, তখন ঘোড়া বা সাইকেল নিয়ে যাত্রা স্থরু করার কোন যুক্তি নেই। এই অছিলায় যানবাহনের অনেক ফ্যাশন চালু হয় যা আঠার বছর বিশ বছর তিরিশ বছর আগে সার্থক ছিল···সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে যে তারা যা তাদের নিজের ভিতরে আছে তাই দিয়ে কাজ করুক, যা অন্যের নয় বা যা অন্যেরা খুঁজে পেয়েছে তা নয়।

চারুশিল্প-বিদ্যালয়ে যা শেখা যায় তা শুধু হাতের কারিগরি, চিত্রকলা নয়। ঐভাবেই ত সাবো (কাঠের জুতা) তৈরি করা শিখতে হয়···তৎসত্ত্বেও ঐ-ছাত্রদের কারো তৈরি সাবো কেউ পায়ে প'রে চলতে পারে না।

—এই নক্শা দেখো : ওগুলি যে ওরকম হয়েছে তার কারণ এ নয় আমি ওগুলি রীতিবিন্যস্ত ছকে ফেলেছি। ও শুধু নিজেরই বাইরের রূপের চাপে ঐ-রকম। আমি কোনদিনই 'প্রকাশের' সন্ধানে ঘুরিনি। স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার জন্য আর কোন চাবি নেই কবিতা ছাড়া।···যদি লাইন এবং রূপ মিল পায় এবং পরস্পরকে প্রাণময় ক'রে তোলে, তাহ'লে সে ত কাব্যই। তার জন্য অনেক কথার প্রয়োজন নেই। অনেকসময়ে একটা মস্ত লম্বা কবিতার চেয়ে দু-তিন লাইনে কবিত্ব বেশি পাওয়া যায়।

জাকফ্স্কি জিজ্ঞাসা করেন : তাহ'লে আপনার মনে হয় একটি ছবি বা তসবির আর ফ্রেস্কোতে কোন তফাৎ নেই ?

—না, অবশ্যই নেই। আছে শুধু ভালো আঁকা আর খারাপ আঁকা। আর ছোট আকারে যা স্থন্দর হ'য়ে উঠেছে তাকে আবার বড়ো করার দরকার কি ? মানুষের মহত্ব আসে তার মাত্রাজ্ঞানে, তার আকারে নয়। আর, যা-হোক্ ক'রে তাই সাজন করবার ইচ্ছাই বা কেন, যা চিরকাল একইভাবে রয়েছে ?

আঁকা কাগজের দুটি স্থবিধা আছে দেয়ালচিত্র বা দেয়ালবস্ত্রের তুলনায় ; এতে খরচ কম এবং এ আরো বেশি পাল্টানো যায়।

জাকফ্স্কির প্রশ্ন : আর-একটি প্রশ্ন ! আপনার মতে কি আর্টিস্ট ও জন-সাধারণের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ আছে ?

—হাঁ, অন্তত বর্তমান মুহূর্তে। কিন্তু দোষটা আর্টিস্টেরও নয়, জনসাধারণেরও

নয়! জনসাধারণ সাধারণত আধুনিক আর্ট বোঝে না সেটা সত্য, কিন্তু তার কারণ চিত্রকলার কাজ যে কী নিয়ে সে-বিষয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়নি। লোককে পড়তে লিখতে শেখানো হয়, আঁকতে গাইতে শেখানো হয়, কিন্তু ছবি কীভাবে দেখতে হয় সেটা শেখানো হয় না। রঙের কবিতা, বস্তুরূপের বা ছন্দের একটা জীবন, সংক্ষেপে বলতে গেলে ঐ প্লাস্টিক মিল যার কথা বলছিলুম—এ-সব জনসাধারণ একেবারে অবহেলা করে। অবশ্য কাব্যের প্রতীক বা সমস্বর বুঝতেও সে খুব একটা দক্ষ ব্যক্তি নয়। আমার ইচ্ছা যে আমার এনগ্রেভিংগুলির অনেক সংখ্যক কপি করি, যাতে সস্তায় অনেক লোকের কাছে বিক্রি করা যায়। আমি শীঘ্রই বিশেষ ক'রে এই কাজে মন দেব।

পিকাসোর ছবির দুর্বোধ্যতার একটি কারণ তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত বিস্ময়করতা। তাঁর বারো বছরের আঁকা তিনটি পোর্ট্রেটের ছাপাছবি দেখেও বোঝা যায় বালক পিকাসোর অসামান্যতা, যেমন বোঝা যায় প্রবীণ পিকাসোর আঁকা বুফোঁর বইয়ের চিত্রাবলিতে। পিকাসোর ছেলেবেলার ছবিতে নেই বালকোচিত অজ্ঞতা বা অক্ষমতার কোন বৈশিষ্ট্য, শিশুশোভন সরল কল্পনার পরিবর্তে আছে বৃদ্ধ ওস্তাদের শিল্পকর্তৃত্ব, নিশ্চিত পেশীর পরিণত শক্তিমত্তা। বৃদ্ধ পিকাসোই বরং শিশুর আশ্চর্য জগৎ স্বকীয় মাহাত্ম্যের কঠিন সারল্যে সৃষ্টি করেন। পিকাসো তাই আমাদের বারেবারে অবাক ক'রে দেন, শিল্পীর গুণাবলির বিকাশ বা প্রগতি সম্বন্ধে মামুলি ধারণা তাঁর ক্লান্তিহীন শিল্পধারা কেবলই ভেঙে দেয়। এর কারণ পিকাসোর ঐ অবিশ্রাম দৃষ্টিময় বিস্ময়ই, তাঁর বিশ্বের সবকিছুই তিনি সমানে দেখছেন, এই বিচলিত অস্থির বিশ্বে, ভঙ্গুর গতিশীল সমাজে যা-কিছু ভাঙাচোরা বাঁকা সোজা সবকিছুই তিনি দেখেন এবং অন্য শিল্পকর্মের মহারথীদের মতোই, রাবেলে, সেরভান্তেস্, ডিফো, ফীল্ডিং, ডিকেন্স, তলস্তয়, বালজাকের মতোই প্রচণ্ড নিষ্ঠুর দরদী কিন্তু সর্বদাই একনিষ্ঠ এক অন্তর্নিহিত কবিত্বের সততায় রূপায়িত ক'রে যান।

চোখ বুজে বুদ্ধির অন্ধকার ঘরে তিনি বাস্তবকে প্রত্যক্ষকে খুঁজে বেড়ান না, আশ্চর্য এই জীবন তার নানা চেহারায় নানা মেজাজে তাঁর রচয়িতার চোখকে কেবলই ডেকে বেড়ায় এবং তাঁর তৎকালীন তন্ময়তা হ'য়ে ওঠে ধ্যানী: নৈর্ব্যক্তিক, নির্মম বৈজ্ঞানিক মন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতো থেকে-থেকে রঙীন হ'য়ে ওঠে তার স্বাভাবিক হিস্পানি দরদে বা নিষ্ঠুর কর্কশতায় আরব, মুর, গ্রীক, রোমক

এক ভাবপ্রবণতার কুইক্‌সোটিক্‌ রঙে। পিকাসোর মতে প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির পরিণতি অনেক প্রত্যাখ্যানের, অনেক বিসর্জনের যোগফল আর এই জিজ্ঞাসাটা তরুণ শিল্পযাত্রীদের রাখা দরকার। কারণ শিল্পরচনার বিকাশের খাড়াই পথ ক্ষুরধার কাঁটায় পাথরে দুর্গম। শিল্পের সাধনায় প্রথম পথ নাকি প্রেমের, গ্রহণের এবং দ্বিতীয়টি বিতৃষ্ণার, বিরাগের। প্রথমটি এতই সুখকর পথ যে অনেক যাত্রীই মাঝপথে অনুরাগের আরামে ঘুমিয়ে পড়ে, গন্তব্যে আর পৌঁছায় না। কিন্তু ঘৃণার বন্ধুর পথ, রাগের হিংস্র পথ যদি কেউ সাহস ক'রে ধরে, তাহ'লে হাতড়ে-হাতড়ে শেষ অবধি পৌঁছানো যেতে পারে, অবজ্ঞা নিন্দা কুড়িয়ে শেষ অবধি সে জিততে পারে। সেজানও এই পথই ধ'রে ছিলেন, কিন্তু তিনি কৌতূহল বাদ দেন তাঁর সাধনার টানে, ছোট করতে চান তাঁর বিশ্বকে, ভয়াবহ এই বিশ্বকে। আধুনিক দুঃসাহসে অস্থির পিকাসো, বৈজ্ঞানিকের নির্ভীক নাস্তিক্যে অস্থির পিকাসো, চোখের মনের হাতের বিশ্বব্যাপ্ত জিজ্ঞাসায় সাম্যবাদীর মতো আস্তিক অন্বেষায় বিশ্রামহীন পিকাসোর সময় নেই সেজানের মতো বিষয়তন্ময় মমতার দীর্ঘ ধ্যানের। এ-কালের ভঙ্গুর পশ্চিমা সমাজের চিত্রকর তিনি, তাঁর আসন নিত্য পরিবর্তনশীল, তাঁর প্রতিভার অফুরান বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাল রেখে। বুর্জোআ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লীলাভূমি দুর্গত কিন্তু এই প্রাচীন সভ্য দেশের যামিনী রায়ের মতো স্থির কেন্দ্রের রীতিবিন্যস্ত সন্ধান তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক।

পিকাসো এবারে এলেন মস্কোয়। মস্কোর বুর্জোআতিক্রান্ত জীবনের ধ্যান যদি পিকাসোর অনন্যসাধারণ প্রতিভাকে আরেক কেন্দ্রিকতার স্থৈর্য দিত, যদি ভাঙন পেত সংগঠনের অনুরাগ, ব্যবচ্ছেদের পরম্পরা হ'ত মমতার পুনর্নিমাণ!

শিল্পের ক্ষেত্রে আবেদনের যে উভমুখ সমস্যা চিরন্তন, সে-সমস্যাকে পিকাসোর বৈশিষ্ট্যই অনেকের কাছে আরো কঠিন ক'রে তোলে। কারণ উল্লেখযোগ্য শিল্প-সৃষ্টিমাত্রই সম্ভব নিতান্ত একটা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা বা বোধের ফলে এবং এই নন্দনকার্য নির্ভর করে শিল্পীর ক্ষমতার ব্যক্তিস্বরূপের উপরে এবং সে-বৈশিষ্ট্য চালু আইনকানুনের নির্বিশেষ অভ্যাসের গণ্ডি মানে না। ঐ প্রথাসিদ্ধ বা আকাডেমিক আইন, ঐ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক শুধু সীমানাই নির্দিষ্ট করে এবং সবাইকে সে-বিষয়ে বাধ্যত সচেতন ক'রে রাখে। ঐ-সচেতনতাই হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে সামাজিক ব্যাপারটার মূল কথা, এরই সঙ্গে শিল্পীর দর্শনের তাগিদের হরগৌরী লীলাতেই শিল্পে রূপান্তর ঘটে এবং আসে সার্থক আবেদন। অবশ্য প্রামাণ্যের গাঁটছড়ায় বাঁধা ঐ সামাজিক বস্তুর সঙ্গে শিল্পের সর্বজনবোধ্যতা জড়িত নয়। অনেক সময়ে

দেখা যায় যে সর্বজনবোধ্য উৎকর্ষের কোন দাম নেই, অর্থাৎ গভীর আবেদন নেই সামাজিক অর্থে, আধেয়ের বা কণ্টেণ্টের অর্থে, যেমন সার্জেণ্টের আঁকা পোর্ট্রেট্, যেমন আকাডেমির হাজার-হাজার ছবি। আবার দেখা যায়, সামাজিক অর্থে গভীর শিল্পকার্য হয়ত রূপান্তরের দিক থেকে মোটেই সর্বজনবোধ্য হ'ল না, কারণ সে-শিল্পকার্যের যে গুণনীয়ক, যে-আধার বা ফর্ম তার নিয়ম সাধারণের অপরিচিত। ফেরনাঁ লেজেরের কাজ এর মহৎ উদাহরণ। পিকাসোর বিচিত্র কর্মশালার মধ্যে এইধরনের বিস্তর কাজ পাওয়া যায়, যেমন আবার পাওয়া যায় কমবেশি ব্যক্তিগত প্রেরণার বহু শিল্পরচনা। দু-রকমের কাজই দুর্বোধ্য লাগতে পারে এবং একই কারণে। তার জন্য দরকার, পিকাসো যা বলেছেন, জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা, নিজের কাজ বদলাবার মিথ্যা চেষ্টা নয়।

বিখ্যাত সাম্যবাদী চিত্রকর লেজেরের কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'সুতরাং কথাটা হচ্ছে এই যোগসূত্র পুনর্বন্ধন করা যায় কী ক'রে। জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ কেন আমরা করতে পারছি না? তার জন্য প্রধানত দায়ী তাদের যে অত্যন্ত খারাপ শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ হ'তে হয় সেটাই। শিল্পের বিবর্তন রেনেসাঁস ব'লে একটা যুগে এসে পড়ল। তার আগে শিল্পচিত্র গণ্য হ'ত একটা আবিষ্কার, একটা নির্মাণকার্য, কল্পিত বস্তু হিসাবে (যথা রোমানিক ছবি যা মোটেই প্রকৃতির অনুকরণ নয় বা মিশরীয় শিল্পকার্য যা বহুকাল আগেই তার নিজের শিল্পরূপ আবিষ্কার ক'রে বসেছিল)। মধ্যযুগে স্যাঁ-সুলপিসের মূর্তিচর্চা হয়নি: হয়েছিল শুধু 'উৎকৃষ্ট বস্তু'র চর্চা, রসজ্ঞসমাজের রুচিজ্ঞানানুসারে নির্ধারিত এবং জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত। ব্যাপারটা পাকিয়ে উঠল রেনেসাঁস থেকে। কারণ ইতালীয় রেনেসাঁস এল কপি করার, মানবদেহ অনুকরণ করার চিন্তা নিয়ে। তখন থেকে শিল্পবিচার শুরু হ'ল তুলনা ক'রে: যত ভালো নকল তত ভালো।...বেচারা বড়ো রুসো যিনি নিজে অসামান্য আর্টিস্ট ছিলেন, তিনিও একবার আমায় বলেছিলেন: "দাভিদ্ আশ্চর্য জাতের শিল্পী, কিন্তু বুগারোর ক্ষমতা আরো বেশি, দেখছ তাঁর হাতে আঁকা জলের উপরে ছায়া পড়ে কী রকম?" এ-সবই সমাজে চালু শিক্ষাদীক্ষার উপরে নির্ভর করে আর স্কুল-কলেজে শিক্ষাব্যবস্থা একেবারে জঘন্য। মাস্টারেরা শেখায়: রেনেসাঁসের কাজ দেখো, ঐ ত শিল্প-সভ্যতার চরম; ঐ ত প্রগতি। যা-কিছু ক্ষতি সব এসেছে ঐ-ঘোষণা থেকে। শিল্পের ইতিহাসে প্রগতি ব'লে কিছু নেই। মিশরীয় একটি মূর্তি রাফাএলের ছবির মতো, মিকেলাঞ্জেলোর পটের মতোই সমান সুন্দর।...শিল্পে বাস্তববাদ নিরর্থক।

পোর্ট্রেট হ'লেই যে আর্ট হবে এমন কোন কথা নেই। স্কুল-কলেজ নয়, চাই লোকের বাড়ির সব সংগ্রহ সব মিউজিঅম সাধারণ লোকের আয়ত্তে আসুক। কিন্তু দেখো মিউজিঅম বন্ধ হ'য়ে যায় ছটার সময়ে, ঠিক যখন মজুররা কলকারখানা থেকে ছুটি পায়। মঁসিঅ উইস্‌মাঁ যখন বোজ্‌-আর সন্ধ্যায় খুলে রাখার ব্যবস্থা করলেন, তখন থেকে ত লোকে ভিড় করে যেতে লাগল।'

লেজের বলেন: 'সাধারণ মানুষের দরকার অবকাশ, বাছবার, ভাববার, দেখবার অবসর দরকার। এখনও সাধারণ মানুষের সে-সময় নেই, যেটুকু অবকাশ মেলে তাতে লোকে শুধু একটু হয়ত বেশভূষা করতে পারে, স্নান করতে পারে, সিনেমা যেতে পারে, আমাদের কাছে আসতে পারে না। ভেবো না সাধারণ মানুষ এ-সব ব্যাপার তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। সাধারণ মানুষ যখন সাজগোজ করে, তখন সে পছন্দ-অপছন্দ বাছাই ক'রেই করে; এই নীল পিরাণটা বা ঐ লাল শার্টটা সে বাছাই ক'রে পছন্দ করে; বাছাই করতে সে খানিকটা সময় নেয়। রুচিজ্ঞান তার আছে। দরকার হচ্ছে তাকে এই রুচিজ্ঞান বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া।'

টমাস্ স্ট্যর্নস্ এলিঅট

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের যে মৌল প্রভেদ দু-শবছরের রাজদণ্ডের প্রতাপেও ঘোচেনি, সে দুস্তর ব্যবধানবশত সাহিত্যের গৌণ তথ্যের মাহাত্ম্য শুধু সাহিত্য-বিচারেই আবদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে এলিঅট তাই বলাই বাহুল্য মার্কস্‌বাদের মতো সৌরবিবর্তন নয়, কিন্তু একটা চাঁদিনী রাত বটে। মার্কসের পুঁথিপত্রে এল সারা ইওরোপ, ইওরোপের আন্দোলনে এল সারা দুনিয়াই আমাদের মনের জীর্ণ বিশ্বে, ভারতবর্ষই এল সেই নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। সেই ব্যাপ্ত বিশ্বের যোগাযোগে সাহিত্যের যে-সব কুঠুরি খুলল, তার একটি হচ্ছে কাব্যচর্চার তীব্র শুদ্ধি ও বিজ্ঞানবদ্ধ বোঝবার চেষ্টা। সে-চেষ্টায় গত শতকের ইওরোপের, বিশেষত ফ্রান্সের দান নগণ্য নয়।

আশ্চর্যের কথা, আমাদের যে গুরুজন ফরাসি সংস্কৃতির বাংলা স্তম্ভপ্রায়, সেই প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশ্বেও এই উনিশ শতকের শেষ অর্ধেকের এবং এ-শতকের ফ্রান্স প্রায় নেই। বদ্‌লেয়র ও তাঁর অনুবর্তী ফরাসি কাব্যসাধনা; গতিএ, র‍্যাঁবো, মালার্মে, লাফর্গ্, ভালেরি অবধি কাব্যাদর্শের যে-বিপ্লবপ্রয়াস—তার প্রভাব একদিকে আমেরিকার এজরা পাউণ্ড এলিঅট থেকে ওদিকে প্রথম বিপ্লবী কবি মায়াকভ্‌স্কি ও পাস্তেরনাক পর্যন্ত প্রসারিত। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মহাজনরা এদের বার্তা আনেননি, রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন টেনিসনের 'ডে প্রফুণ্ডিসে'র বাণী, প্রমথ চৌধুরী অস্কার ওয়াইল্ডের ফ্রান্সের।

এই ইওরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিকে প্রতিভাত হ'ল দেরিতে, বলা যায়, প্রায় টি এস্ এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়। কলকাতার প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা বোধহয় সেই ছাত্রসভার বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধে, যা পরে ছাপা হ'ল "কাব্যের মুক্তি" নামে। সেই এলিঅটের প্রবেশ বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়, মুখ্যত ১৯২৫-এর কবিতাবলি এবং 'দি সেকরেড উড্' আর 'ক্রাইটেরিঅন' পত্রিকা-সমেত। বিশ শতকের সুখী যদিচ ফাঁপা যুগে প্রায় ঠিক লগ্নেই, বিষিয়ে ওঠার কিছু আগেই; স্নায়ু তখন এক পাহাড়ে চূড়ায়, বেটোফেনের অন্তিম সঙ্গীতের আলোয়, নেতিবাচক পুঙ্খানুপুঙ্খতার আর প্রবল নিরুদ্যমের মুখে। কিন্তু ফল তখনো তিক্ত নয়। অথচ আমরা তখন প্রায় সেই

তিমিরেই, আজ যে-তিমিরে। নেতির সংযমে শিক্ষা সুরু হ'ল, ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হ'ল কর্মিষ্ঠ, সচল, ব্যাখ্যা থেকে পরিবর্তনের, ভেঙে পুনর্গ্রহণের নির্মাণের। জ্ঞানে হলুম আমরা "গেরোনশন" থেকে 'ওএস্টল্যাণ্ড'-এ উপনীত। তাই থেকে এল মীরাটযুগে "এরিএল" কবিতাবলি, ভদ্র অসহযোগের নৈরাশ্যে এল 'অ্যাশ্ ওএড্‌নেস্‌ডে', যন্ত্রণার মুঠিতে এল আস্থা আর হাজার কাটাকুটিতে আঁকা আশা।

ব্যাপারটাই নাটুকে—বাংলা দেশে এলিঅট। এই বাংলা দেশের বুকেই—যদিচ এক যুগান্তে, জনযুদ্ধের যুগে—আরেক কবি, সুকুমার তরুণ কিন্তু প্রতিভা-সম্ভব ইংরেজ কবি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে মাথা কোটেন। এলন্ লুইস্ দেখেছিলেন যে ইংরেজ ভারতকে দিয়েছে রুটি নয়, পাথর। বিরোধে তাঁর জর্জর মন তাই ত্রাহি-ত্রাহি করেছিল, তাই তাঁর করুণ শেষ হ'ল ব্যর্থ মৃত্যুতে, আরাকানের খদের ধারে দাঁড়িয়ে রিভলভরে নিজের প্রাণদানে। লুইস্ তাই 'ম্যান্ ইন্ ইণ্ডিআ'র আর্চরকে লেখেন: 'And India is a hard country to mature in. There is so much to anger you in the human scene, so much to dismay you in the social scene, so much to humble you in the universal scene.... Bat what untouched wealth the Indian writer has—if only the climate of the soul was more conducive to a free and deep development of his material. Something seems to have gone wrong out here, and everything is tainted.'

এ-বোধ প্রাথমিক বোধ, এ ছাড়া মানসলোকের সেই জলবায়ু হয় না, যাতে কাব্য ও কবির বিকাশ সুযোগ পায়। এই বোধই ক্লাইভ ব্র্যানসনের পত্রাবলিকে দিয়েছে তার মহৎ মানবমর্যাদা, জুগিয়েছে তাঁর জীবনদর্শনের চিত্রবস্তু। ব্র্যান্-সনের কাব্যরচনায় কেন ঐ সুস্থ জীবনদর্শন সমাহিত হয়নি, কেন তাঁর কাব্য মামুলি সে-প্রশ্ন এখানে অবান্তর। মায়া ও সত্তা-র অসামান্য লেখক স্পেনযুদ্ধের বীর কড্‌ওএলের স্বকীয় কাব্যের বুর্জোআ রূপবিচারের মধ্যেও এ-সমস্যার উভমুখ প্রশ্ন।

এলিঅট আমাদের জানালেন যে কাব্যে বড়ো বিবেচ্য ঐ মানসের জলবায়ু, জানালেন রচনাবস্তুর স্বতন্ত্র ও গভীর বিকাশের বিষয়ে সজ্ঞানতার প্রাথমিক সার্থকতা। সেই প্রস্তুতির ভিত্তিতেই আজ আমরা বলতে পারি লুইসের ভাষায়: 'Don't you think India has reached the stage, where the lotus becomes as much a 'lie' as the rose in Europe (Mallarme's

theory) and there is need for a screeching sweated realism also as much in the village as in the city. And why is this realism so hard to attain ? The sun teaches it every day.'

রৌদ্রের এ-অভিযান আরম্ভ যে-রাত্রিশেষে, সে-রাত্রি আশাভঙ্গের, জিজ্ঞাসার, আত্মসচেতনতার, যে-আন্দোলনের রাত্রিতে আসে সংগঠনের প্রভাত। এলিঅটের প্রভাব সেখানে রূপকবৎ, সে-রূপক খুল্‌ল গান্ধিজির নীতির গোধূলিতে রবীন্দ্রনাথের সমর্থ নিভৃতিতে লালিত খোলা হাওয়ার ধ্যানধারণায়। সাধারণ্যেই এলিঅট পেলেন সমব্যথী, যদিচ আমরা ছিলুম তখনো সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। আত্মসচেতনতা ছিল, তবে তখনো সেটা বিচ্ছিন্ন—প্রুফ্রকের মতো। আত্মসচেতনতা তখনো তাই বিড়ম্বনা, বিরহী প্রেমিকের মতো। কিন্তু তা ছিল সৃষ্টিময়; প্রগতির প্রথম ক্ষেপ, যদিচ হয়ত আত্মসচেতনতা তখনো সেই সম্বন্ধস্বীকারের গভীরতায় পৌঁছয়নি, যেখানে দুঁহু কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। তখনো আমাদের পরোক্ষ ভাবনা স্বভুক্, ভালেরির সাপের মতো; আমাদের আত্মস্থতা তখনো প্রায় হিণ্ডেন্‌বর্গ জার্মেনিতে রিল্‌কের সুদূরপিয়াসী টিউটনিক্ আত্মম্ভরী নৈঃসঙ্গ্য কিংবা ইএট্‌সের মতো তন্ত্রমন্ত্রের রাজারাজড়ার কুহকজালের যন্ত্রণা সম্ভোগ।

এলিঅটের কাছে বাংলা লেখকদের ঋণগ্রহণ মুখ্যত এই আত্মসচেতনার ক্ষেত্রে। আত্মসচেতনতা হ'য়ে উঠ্‌ল কবিমার্গে প্রত্যক্ষ সত্তাসম্পন্ন। ঋণের অন্যান্য দিক এরই জ্ঞাতিসম্পর্কীয়, যথা, বিশেষ কবিতা ভালো কাব্য হয় তখনই যখন তা বিশেষ একটি ভালো কবিতাও বটে। সাহিত্যের ইতিহাস যে স্বকীয় রচনায় ও তার বিবেচনায় প্রাণবান্ ব্যাপার, সে-বোধও এলিঅটের সাহায্যে তীব্র হ'ল। তিনি আমাদের সাহিত্য অর্থাৎ একপ্রকার কর্মের বীক্ষায় ব্যাপ্তি ও গভীরতা বর্ধন দুই-ই করেন। অজ্ঞাতসারেই এলিঅটের সমালোচনায় মার্কস্ অঙ্গীকৃত, তাঁর কাব্যের মুক্তিতে সাম্যবাদীর আরম্ভ, যদিও হয়ত সে-সত্য তিনি জানেন না বা মানেন না।

আরাগঁর বিখ্যাত 'এলসার চোখ' নামক কবিতাগ্রন্থের সমালোচনামূলক ভূমিকায় এই সত্য প্রকাশিত। সাম্প্রতিক ফরাসি কাব্যের মুক্তিচেষ্টার পটে তাঁর মুক্তিসন্ধান, ফরাসিকাব্যের ইতিহাসচর্চা কাব্যের ঐতিহ্যে সাম্যবাদী কবির প্রতিরোধ ও প্রেম তাই স্বপ্রতিষ্ঠ হবার চেষ্টায় মূল্যবান্! আরাগঁ প্রসঙ্গত বলেছেন: 'তাই বলি যে ভাষার গভীর চর্চা ছাড়া, প্রতিপদে ভাষার পুনর্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারবার ভাঙতে হয়। কবিদের পক্ষে এই-ই ত মুক্তির পথে দীর্ঘ

উত্তরণ। এবং এই মুক্তিতেই, এই প্রকৃত স্বাধীনতাতেই সম্ভব আমার যথাযথতার প্রয়াস, এই দীর্ঘ পথ—প্রায় পঞ্চাশ বছরের—অতিক্রম প্রয়োজন ছিল, বরাবরই এ সমর্থনীয় ছিল, উগোর হাতে ধ্রুপদী পদ্যের ভাঙাগড়া থেকে প্রতীকীদের মুক্তছন্দ অবধি—ভেরলেনি ভ্রান্তি আর সেইসব মিল বা যমকঘটিত কসরতের পরে।

'এর প্রয়োজন ছিল—মুক্তছন্দের গলিত-দন্ত চিরুনি থেকে অর্ধ শতাব্দীর একশরকম কাব্যাদর্শের, 'ইলুমিনাসিওঁ'—থেকে সুররেআলিস্ট পর্যন্ত। এবং আজ যখন দেখি, কেউ-কেউ অযথা রাজনৈতিক আওয়াজে গত অভিজ্ঞতার এটা কিংবা ওটা বাতিল করেন এবং বলেন যে আমাদের জাতীয় প্রতিভা শুধু বাঁধা পদ্যের সড়কে চলবে তখন আমি হেসে ফেলি, আর যে-মূর্খেরা ভাবে, পেড্‌ল দিয়ে পিয়ানো বাজায় তাদের ডেকে বলতে ইচ্ছা হয়: খোকা হাত দিও না। এই দীর্ঘ অভিযান প্রয়োজন ছিল, যাতে আমরা সচেতনভাবে ফরাসি কাব্যের দীর্ঘ ইতিহাস ধরতে পারি, পুনরাবৃত্তির জন্য মুখস্থ বিদ্যায় নয়, কিংবা ডিগ্রি পেতে নয়, ফ্রান্সের একটা গভীর অর্গানিক অনুভূতি আয়ত্তে আনতে। আজকাল যে এই কবিদের মধ্যে উচ্ছ্বসিত গীতচেতনাকে দাবাবার নির্বোধ ফ্যাশন কোথাও-কোথাও চালু হচ্ছে সে-ব্যাপারে দুঃখ হয়। এ-ফ্যাশনের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করা আমার কর্তব্য। আমি জানি, এখন বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞা কথাদুটো অপব্যবহারেরই প্রতিক্রিয়ায় অনেকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেন। আমি আস্তাকুঁড় অবধি এ দুটো কথা অনুসরণ ক'রে সম্মানিত হ'তে চাই। সকলেই যদি যে—কর্মক্ষেত্রে যিনি অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ, সেই-সেই ক্ষেত্রে তাই করেন, তাহ'লে দুনিয়া জায়গাটার কিছু উন্নতি হয় এবং মূর্খের হাততালি কুড়িয়ে যে-সব গাঁওয়ার হাতুড়ে-র মাহাত্ম্য কীর্তন করে, তাদের সংখ্যাও কমে।'

তাই আরাগঁ বলেছেন: 'কাব্যের ইতিহাস তার টেক্‌নিকের ইতিহাস। যারা আমাদের নীরব করতে চায় তারা সেই শ্রেণীর নিকৃষ্ট লেখক, যারা কিছুই নির্মাণ করেনি, যারা শুধু গোটা কয়েক ছক টেনে প্যাঁচ ক'ষেই ক্ষান্ত হয়। আমি ত আজ অবধি কবিতার প্রতিটি অঙ্গ বিষয়ে না-ভেবে, আগের লেখা আর পড়া কাব্যাবলি বিষয়ে সচেতন না-হ'য়ে কোন কবিতা লিখিনি।'

আরাগঁ বলেন: 'আধুনিক কবিতান্দোলনে আমি এত গভীরভাবে এবং নিজেই অংশগ্রহণ করেছি যে তার সাময়িক রূপগুলিতে ক্লান্ত হ'য়ে যখন আমি তার দীর্ঘ বহু শতাব্দীর উত্তরাধিকার, লোকোত্তর ভাষার অভিজ্ঞতার সন্ধানে একাগ্র, তখন আমার পক্ষে এমন পথ ধরা সম্ভব নয়, যা অন্যের পক্ষে সার্থক

হ'লেও আমার সাহিত্যসাধনায় পরধর্মী।'

তাই আরাগঁ শেষে বলেছেন যে তাঁর কণ্ঠ রোধ করা যাবে না: 'আমার গান চলবে, সে-ও ত নিরস্ত্র মানুষের একটা অস্ত্র, কারণ সে মানুষেরই গান, যার পক্ষে জীবনই যথেষ্ট প্রেরণা। আমি গাই কারণ ঝড়ের সে-শক্তি নেই যে সে আমার গানকে ডুবিয়ে দেয় আর কাল যদি তোমরা তাই করো, তাহ'লে আমার প্রাণও নিও, কিন্তু গান আমার চলল অনির্বাণ।'

আরাগঁর কথা তোলার কৈফিয়ৎ দেওয়া বাহুল্য। তাঁরই দেশে প্রায় সত্তর বছর ধ'রে চলেছে আধুনিক কাব্যের পরীক্ষা, তিনি নিজে বিখ্যাত লেখক, কর্মী, সাংবাদিক, সোভিয়েটের বাইরে সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে এলুআরের পরে তিনি অন্যতম। কাব্যের স্বকীয় গতি, ইতিহাস এবং আত্মসচেতন কবিস্বরূপের আলোচনা তাই তাঁর মধ্যে বিশেষ পরিণতি পায়। বাংলা কাব্য অবশ্যই ফরাসি কাব্যের সমগোত্র নয়, তবু প্রগতিশীল সাহিত্যবিচারে তাঁর আত্মজ্ঞানের সাক্ষ্য মূল্যবান।

এ-সাক্ষ্য যে পৌঁছল আমাদের সাহিত্যিক অন্তঃপুরে, তার কারণ শুধু একবিশ্বে দুনিয়ার সংকোচন নয়, জনযুদ্ধ নয়। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই যে সাহিত্যজগতে আমরা এই পথে আনাগোনা সুরু করেছিলুম অনেক আগেই, ১৯১৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের সমাজে শিল্প ও সাহিত্যের স্থান তার নির্দেশ। এবং উত্তরকালে নেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সমালোচক ও কবি এলিঅট।

আরাগঁ বলেছেন কাব্যসাহিত্যে কোন ডগ্‌মাই প্রযোজ্য নয়। এলিঅটের ডগ্‌মা অবশ্যই আমাদের পক্ষে অগ্রাহ্য। ভৌগোলিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক স্থূল কারণেই অগ্রাহ্য, আমাদের জীবনে ও জীবিকাতেই এলিঅটের ডগ্‌মার অসারতা স্পষ্ট।

কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য স্বীকার্য। আমাদের পিতা-পিতামহেরা সাহিত্য বলতে বুঝতেন মিল্টন, শেক্সপিঅর এবং তা-ও এলিজাবিথান্ জগত থেকে বিচ্যুত একক শেক্সপিঅর এবং শুধু উনিশ শতাব্দীর ইংরেজি কাব্য। মাইকেল অবশ্য ইওরোপীয় পটও চিনতেন, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় জগতে বিচরণ করতেন, তবু মোটামুটি অগ্রজেরা কাব্যজিজ্ঞাসাকে সীমাবদ্ধই রেখেছিলেন। উনিশ-শতকের আগে ও শেষ দিকে এবং ইংলণ্ডের বাইরে তেয়ন্ ও আমিএল ছাড়া যে ইউরোপ ছিল সে-বিষয়ে যথোচিত চর্চার সুযোগ সেকালে ছিল না। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের বিরাট স্বয়ম্ভর প্রতিভার বিচার এ-প্রসঙ্গে উঠছে না।

ইংরেজি, ইওরোপীয় এবং আমাদের নিজেদেরই সাহিত্যের ঐতিহ্য সন্ধানে তাই এলিঅটের নিদর্শন শ্রদ্ধেয়। এবং এ-সন্ধান একরকম নির্মাণ, কর্মিষ্ঠ পরিবর্তন, এ-কথা এলিঅটই অত ভালো ক'রে সাহিত্য-প্রসঙ্গে বলেন প্রথমে। আরাগঁ যখন সেই কথা আজ বলেন, তখন আমরা প্রস্তুত থাকি এই মার্ক্সিয় প্রস্তাবের জন্যে। কারণ কথাটা মার্ক্সিয় ডায়ালেক্টিক্‌সেরই সম্পূর্ণ, যান্ত্রিকতা বা আদর্শবাদ কোনটাতেই নয়।

তাই পটভূমি ভিন্ন হ'লেও এলিঅটের অভিজ্ঞতার তুল্য মেলে আমাদের মধ্যে, অভিজ্ঞতার মূল্যনির্ধারণ বাদ দিয়েই বলা যায়। এক হিসেবে আমাদের সুবিধাও আছে ইংরেজি সাহিত্যের তুলনায়। ঘোর দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে গিয়েও ভারতীয় জীবনে এখনো একটা বিস্তৃত অপিচ স্থূল ঐতিহ্য আছে, সোফিস্টিকেশন বা জীবন-চর্চার একটা সভ্য কিন্তু লৌকিক ঐতিহ্য। এল্‌উইনের ছত্তিশগড়ি গানে তার প্রমাণ। অবশ্যই সে-ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'য় মেলে না, সে-ঐতিহ্য ব্যবহারের পথ আপাতসহজ না-ও হ'তে পারে, এবং সে-বিচারে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র তুল্যমূল্যও নয়।

সংস্কৃত ব্রহ্মণ্য ও দেশজ সংস্কৃতির যোগাযোগে দ্বন্দ্বে সমন্বয়ে নানা যুগে নানাভাবে তার নানা রূপ খুলেছে। অনেকসময়ে অবশ্য সে-রূপ অভ্যাসের সহজ সংকেতিত মার্গে প'ড়ে ছকে পরিণত হয়েছে। মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ অভ্যাসিক-তার পাঁচিল ভেঙে আমাদের মুক্তি দিলেন। এলিঅটের সীমাবদ্ধ সার্থকতা ও ব্যর্থতার করুণ নিদর্শনে বুঝলুম ঐ-প্রাচীরের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, তার সীমা, রূপায়ণের দ্বন্দ্ব; অর্থাৎ শিখলুম ঐ-মুক্তিকে ব্যবহার করতে, ধারাবহ করতে।

এলিঅটের নির্দিষ্ট দান সার্থক তাই রামমোহনের ঐতিহ্যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতের অভিজ্ঞতা ও পুরুষার্থের গণ্ডি বিস্তারে এবং তারই সঙ্গে আমাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্রতর করায়। অর্থাৎ নিজেদের ও বিশ্বের বিষয়ে আমাদের চৈতন্য ক্ষুরধার করায় অবস্থাটা করুণ বা বীরত্বব্যঞ্জক—যে-দৃষ্টিতে দেখি। বীরত্বের দিকটাই আমাদের কাছে মহার্ঘ—সন্ধানের, নির্মাণের কর্মিষ্ঠ দিকই।

তাই আমরা বুঝলুম যে, কবিতা একটি বিশেষ কাব্যবস্তু এবং বিশেষ কাব্যবস্তু আর প্রক্রিয়া দুই-ই। বুঝলুম যে এই প্রক্রিয়ায় চাই যথাসম্ভব চিত্তশুদ্ধি; এ-বিশ্বাসে এমনকি প্রত্যক্ষ লিখনকর্মের ব্যাপারেও। আবার এ-ও জানলুম যে শুদ্ধকাব্য প্রযুক্ত হ'তে পারে অশুদ্ধভাবে, যেমন যে-কবিতা প্রক্রিয়ায় রূপায়ণে সৎ,

তার প্রয়োগ হ'তে পারে কাব্যের বাইরেও। প্রায় ক্রোচের মতো পাঠক হ'য়ে উঠলুম আমরা, দান্তের ক্রোচের মতো। এবং মার্ক্স এঙ্গেলসের শেক্সপিঅর, বালজাক্, গয়টে, হায়নে কিংবা ইবসেন বিচার বোধ্য হ'ল আমাদের কাছে।

তাই এলিঅটের সব কবিতার অনুবাদ ঘটনে বাধা থাকলেও তাঁর রীতি আমাদের সহায়, এমনকি তাঁর কবিতার অলঙ্কার অঙ্গবিন্যাস, জগৎ ভিন্ন হ'লেও। কাব্যের মুক্তির চেতনায় ফল হয়েছে এই। প্রতীকী রীতির নিহিত স্বাধীনতার বশেই রাজর্ষিদের যাত্রার মতো ক্রিস্টিয়ান কবিতা গান্ধিজির দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদ সম্ভাব্যতা পায়, 'কোরিওলান' পায় ইন্‌টেরিম সরকারের কালে, 'গেরোনশন' হঠাৎ এসে যায় অবলম্বন-অনুবাদের মিশে যাওয়া গোধূলিতে, যখন কলকাতার উন্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধিজি অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে শোভাযাত্রায়। তাছাড়া, এই প্রভাব বা তুল্যমানসের প্রসার আজও চলছে। আজই হয়ত সে-প্রসারের সীমা স্পষ্ট—বুদ্ধদেব বসুর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ জনপ্রিয় লেখক বন্ধুরাও আজকাল বলছেন পরিশ্রমী ও আত্ম-সচেতন কাব্যসাধনার কথা এবং ওদিকে ইতিমধ্যে কমলবন পরিক্রান্ত আর গোলাপের রহস্য আমরা নিঃশেষ ক'রে ফেলেছি। আর প্রতীক্ষা করছি তীব্র স্বেদাক্ত প্রত্যক্ষবাদের।

এলিঅটকে তাই আমরা আজ প্রকৃতই সাবালক শ্রদ্ধানিবেদন করতে পারি তাঁর ষাটবছরের জন্মদিনে, ভিন্‌গায়ের ভিন্নধর্মী খুড়ো-মেসোর মতো।

প্রমথ চৌধুরী ও আমরা

প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' এবং অন্যান্য বইগুলি প্রকাশ করার জন্য বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়কে ধন্যবাদ। প্রমথবাবুর অনেক রচনাই বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছেন, আশা করা যায়, তাঁর অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য রচনাগুলিও তাঁরা ভবিষ্যতে প্রকাশ করবেন। কারণ রচনার সুখপাঠ্যতায় ও শুভবুদ্ধির চর্চায় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আজও আমাদের মনোযোগের ও শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁর প্রয়োজন আজও সমধিক বর্তমান। আমাদের দুশ বছরের ইতিহাসে নানা বাধাবিপত্তির কারণে যে-কুসংস্কার, অজ্ঞতা, যুক্তিহীনতা এখনও শিক্ষিত শ্রেণীকে অবনত রেখেছে, তার বিরুদ্ধে অভিযানে যেমন ঐতিহাসিক কার্যকারণ নির্দেশ ও প্রয়োগবিস্তার মূল্যবান্ তেমনি এই চলিত দুরবস্থার মধ্যেই যাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের লেখা অধ্যয়নও বুদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও রুচির স্বাস্থ্যসন্ধানে বিশেষ সহায়। প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলি এই সভ্যতার চর্চায় তাই এত মূল্যবান। ভূত, ভগবান, ভালবাসা মানেন না এমন 'কল্লোল'-মার্কা কথা তিনি কৈশোরেও বলেননি, তাই প্রবীণ বয়সেও শুধু নির্বিশেষ মানুষকেই তিনি পরমপুরুষ ভাবতেন। মৌতাত তিনি ঈশ্বরে খোঁজেননি, তাতানো শূন্যের কংগ্রেসেও না, তাই ইআংকি ডুড্‌লকে নিয়েও তাঁকে মাততে হয়নি।

অবশ্য এই যুক্তিনির্ভরতা স্থানকালপাত্রে অসম্পূর্ণ থাকতেই পারে। সে-কথা স্মরণে রাখতে নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু যদি আধাবুর্জোআ, বা একপ্রকার লুম্পেন্-বুর্জোআই আমাদের দুর্গত পটভূমির কথা ভাবা যায়, তাহ'লে প্রমথ চৌধুরীর কীর্তিই হ'য়ে ওঠে প্রধান বিবেচ্য। তাঁর সমসাময়িক কেন, অতীতের বুর্জোআ ইওরোপের বুদ্ধিচর্চার মান প্রমথ চৌধুরীর প্রায় একক চেষ্টার তথা বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মিলবে না। এবং একই ঐতিহাসিক কারণে, যার জন্য প্রমথবাবু দায়ী ত ননই, বরঞ্চ এ দেশের মধ্যবিত্তের দায়ভাগের ভুক্তভোগীমাত্র। বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই দুর্ভোগ রবীন্দ্রনাথেরও বিরাট ও তীব্র প্রতিভার স্বরূপ ও তার শতরূপ প্রকাশকে বিড়ম্বিত করেছে; যার জন্য সেই মহাকবির স্বজাতি তাঁকে আজও জাতীয় সত্তার কবি হিসেবে পেল না, গ্রীস যেমন পেয়েছিল হোমরকে, রাশিয়া যেমন পেয়েছে সেকালের অসম্পূর্ণ কবি পুশকিনকে আজকের সম্পূরণের জাতীয় কবিরূপে।

এরই ফলে প্রমথ চৌধুরীরও থেকে-থেকে পদস্খলন হয়, তাঁর ক্ষিপ্র বাকচাতুর্য হ'য়ে যায় অগভীর রসিকতামাত্র। ভারতচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ চৌধুরীই, বাদশাহী বীরবলের মতো বাংলার গোপালভাঁড়ও ত তাঁর স্বদেশের, তাই তিনি 'বীরবলের হালখাতা'য় লিখে ফেলেন : 'তোমরা বিয়ে করো, আমাদের বিয়ে হয়।' অত্যন্ত বাস্তব ও গভীর চিন্তার মধ্যেও এইরকম মনোরঞ্জন চেষ্টা প্রমথ চৌধুরীর মতো দুর্লভ সহৃদয়তা ও মননশীলতার মধ্যে কী ক'রে আসে, তার ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু খানিকটা যে আসে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অজ্ঞতার ঢাকনা, ভারিক্কি ভাবের ও ভাষার প্রতিবাদেই, তাতে সন্দেহ নেই।

এরই জন্য হয়ত প্রমথবাবুর একটা বাঁকা প্রভাব বর্তমান বইয়ের বাজারে অর্থবান হ'য়ে উঠেছে ব'লে শোনা যায়; তার কিছু, যাকে বলে আরামকুজন বা রম্যরচনা নামে এক বস্তু, কিছু-বা আধা গালগল্প বা দেশ-বিদেশের কল্প-কাহিনী। এ-সব সাহিত্যের অর্থাৎ ছাপা বইয়ের বাজারদর হচ্ছে সেটা ভালো কথা। কিন্তু 'চার-ইয়ারি কথা'র মতো অশরীরী গল্প আজও আবার পড়লে যেটুকু তৃপ্তি হয় তার বা তাঁর 'গল্পসংগ্রহ'র ধারের তুলনা একালের শ্রেষ্ঠ-পসারী বইয়ে কোথায়? তাঁর অনেক প্রবন্ধেও ব্যঙ্গ ও ব্যঙ্গোক্তিতে বক্তব্য পাঠককে যে-আঘাত করে, সে-আঘাত গভীর হৃদয় ও সজাগবুদ্ধি ছাড়া সম্ভব নয়; এবং ঐ-স্তরের হৃদয়বুদ্ধি দুর্লভ। 'রায়তের কথা' প্রবন্ধটি এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া প্রমথ চৌধুরীর কীর্তিবিচারে বা বাংলা সংস্কৃতির নির্মাণের চেষ্টায় তাঁর চাতুর্যের এই তথাকথিত প্রভাব গৌণ প্রশ্ন। সজ্ঞানবুদ্ধি ও বিদ্যাচর্চার মাহাত্ম্যবোধই প্রমথ চৌধুরীর মুখ্য দান, সাম্প্রতিক স্মার্টমন্যতা বা বয়স্ক ছেলেমানুষীর চালিয়াৎ খেলা নয়।

অবশ্য সেখানেও ঐ ঐতিহাসিক কারণেই প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা মাঝে-মাঝে খণ্ডিত হয়। তাঁর জাগ্রত দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মনন ঘুলিয়ে ওঠে, তখন তিনি তাঁর নিজেরই কথার উল্টো বুলি বলেন; রামমোহন প্রসঙ্গে আলোচনায় ভুলে যান যে ইংরেজ ও ইংরেজের শেখানো কিছু লোক ছাড়াও বাংলা দেশে আরো মানুষ ছিল ও আছে; তখন তাঁর মনে হয়: বাঙালি জাতির জন্ম তারিখ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ। অথচ 'প্রবন্ধসংগ্রহ'র একাধিক প্রবন্ধ, "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান" বা "হিন্দু-সংগীত" এ-কথার মূর্ত প্রতিবাদ।

দেশজ অতীতের দিকে ও দেশের সাধারণ মানুষের দিকে, তাঁরই কথায়,

রায়তের দিকে তাঁর মনন অগ্রগণ্য ও কার্যকর হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সময়ের দেশের চৈতন্য আমাদের খণ্ডিত সমাজে তাঁর মতো অতি উচ্চশিক্ষিত মনীষাকে বাধ্যতই দূর থেকে ছুঁয়েছিল। তিনি নিজে ছিলেন অতি উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত অর্থাৎ অর্ধশিক্ষিত তাঁর সমাজ তাঁকে মুক্তি দেয়নি। এবং ফলে এই সীমায়ন ব্যাপারটা যে শুধু দেশীয় আলোচনার ক্ষেত্রে নয়, তার প্রমাণ তাঁর ফরাসি সাহিত্যচর্চা। ও-বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ সুখপাঠ্য এবং বাঙালি পাঠকের পক্ষে সাহায্যকর প্রবন্ধটি ইংরেজি-পড়া ছাত্রদের যে-কোন বই, যথা হোম য়ুনিভার্সিটির 'ফরাসি' সাহিত্যের পথের নিশানা'র পরে শুধু যে অগভীর লাগে তা নয়, মনে হয় আঠারো শতকের পরে প্রমথবাবুর কাছে ফরাসি সাহিত্যের যাথার্থ্য ছিল না। অথচ জ্ঞান তাঁর ছিল, অন্তত গতিএর তিনি ভক্ত ছিলেন। এই লঘুক্রিয়া কি বাংলা সংস্কৃতির প্রাদেশিকতার জলবায়ুর জন্যই ঘটে? না-হ'লে রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বমানব, ইওরোপ যাঁর বহুপরিচিত, তাঁর রচনাতেও কেন ইওরোপ এত কম প্রকাশ পায়? মনে হয়, আমিএল, একটু-বা গয়টের আলোক-প্রার্থনা, টেনিসনের 'ডে প্রফুণ্ডিস', মূরের 'মেলডিস্' একটু-বা উগো বা ওঅট্সনের শরতেই তাঁর ইওরোপের পরিচয় নিঃশেষ? সেই জন্যই কি একালে ইওরোপ-বিহারী বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন যে তিনি কাব্যে মালার্মেপন্থী? যদিচ উনিশ শতকের ফরাসি মালার্মের পন্থা একরকম মন্ত্রবাদের, স্বপ্নপূজার পন্থা, যা ধ্বনি-মন্ত্রের ইন্দ্রজাল বা সঙ্গীত-যোজনার অনির্বচনীয়তার বা অশেষ রেশের মধ্যে দিয়ে বস্তুর রূপায়ণে স্পষ্ট এবং বাংলায় ঝোঁক যায় প্রতীকের কুহকে বা সঙ্গীতময়তার মধ্যে দিয়ে বস্তুরূপায়ণে ততটা নয় যতটা শব্দের প্রত্যক্ষ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অভিধার দিকে।

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনাটুকু শ্রদ্ধা নিবেদনেরই নির্দেশ। কারণ আমাদের এই মহাজন গত শতাব্দীর মহাপুরুষদেরই পরিপূরক। তাঁর কালে ভগীরথের পথ হয়েছে কখন সৌখীন, কখন দুর্গম, কখন বা তির্যক বন্ধুর। তাই গত শতকের বিদ্যাসাগরের মহৎ শুভবুদ্ধির গম্ভীর অনুকম্পা, দীনবন্ধুর বা কালীপ্রসন্নের সমব্যথী ব্যঙ্গ, বঙ্কিমের অনিশ্চিত কিন্তু প্রথম বয়সের আন্তরিক চেষ্টা, বা মাইকেলের অন্তরঙ্গ ইওরোপীয় বিদ্যা একালে দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের স্বয়ন্তর প্রতিভার তৃপ্তিহীন ব্যাপ্তি আজকের পটে, আমাদের দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্বের মধ্যে আকাশের মতো মনোরম কিন্তু দূর। প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিবাদী আয়াসসাধ্য মানবিকতা আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে একান্ত মূল্যবান্। প্রমথ চৌধুরীই লিখেছিলেন : 'বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার প্রজার অবস্থা বিবেচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রায়তকে যে-

অবস্থায় আমরা রেখেছি, তার ফল ত্রিবিধ—দারিদ্র্য মূর্খতা দাসত্ব। তিনি আরও বলেন যে, 'ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্বলাভ করিতে উন্মুখ হয়।'

অবশ্য প্রমথ চৌধুরীও জানতেন যে, 'যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারও মতে সে বলশেভিক, কারও মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে-বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক সম্প্রদায়ের মারামারি কাটাকাটির পক্ষপাতী।'

কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণে ছিল যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। তাই 'রায়তের কথা'র উপসংহার এই ব'লে :

'তিনি আরও বলেন—

'এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে।

'বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জান?—ইংরেজিতে যাকে বলে কম্যুনাল প্রপার্টি। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাংলার প্রজাকে peasant proprietor না করে তুলি তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হতে আর বড় বেশিদিন লাগবে না।"

বিদ্যাসাগরের বাংলার ইতিহাসে যে-অবিচারের বিষয়ে স্বল্পবাক্‌ ধ্রুপদী আভাস আছে, এবং যার স্বরূপ বঙ্কিমের নবীন আদর্শবাদের চক্ষে স্পষ্ট হয়েছিল, প্রমথ চৌধুরীরই পুস্তিকায় বাংলার সমাজ ও তার ফলে সংস্কৃতির সেই মূল প্রশ্ন প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে বিস্ময়করভাবে আলোচিত হয়েছিল। তারপরে যা হয়েছে তা খুবই সাম্প্রতিক এবং স্বল্প, এক 'সাহিত্যপত্র'তেই এ-প্রসঙ্গে যা-কিছু আলোচনা দেখা যায়।

আর্য কোশাম্বীর কাণ্ড

আমাদের বর্তমান জীবন বুঝতে গেলেও সাবেক সমাজবিন্যাসের ইতিহাস অবশ্য আলোচ্য। দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাস আজও পুরো জানা যাচ্ছে না, কি তত্ত্বে কি তথ্যে। আর এই ইতিহাস এত দীর্ঘকালব্যাপী এবং এত বিরাট ভূখণ্ডের এতরকম লোকসমাজ এর উপজীব্য যে সংক্ষেপে এবং আন্দাজে কিছু নির্ধারণ করাও অর্থহীন। অবশ্য মাঝে-মাঝে পণ্ডিতব্যক্তিরা নতুন জ্ঞান পরিবেশন করেন।

অধ্যাপক কোশাম্বীর রচনা কমই দেখা যায়, কিন্তু তাঁর লেখা সর্বদাই চিন্তাশীল এবং আমাদের পাণ্ডিত্যের ভারিক্কি জগতে তাঁর মননের উদ্ধত জৌলুষ একটা বিস্ময়কর আরাম। এইরকম মুখরোচক লেগেছিল কিছুকাল আগে আর্য বিষয়ে শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের মহারাষ্ট্রীয় ইতি-বিলাস। কিছুকাল হ'ল, ইন্দো-সোভিয়েট সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের পত্রিকাতে কোশাম্বী একটি প্রবন্ধে এ-বিষয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। অবশ্য উক্ত পত্রিকাতে স্তালিন বিষয়ে যুক্তিহীন রূঢ়তা প্রকাশ কোশাম্বীর বা পত্রিকার পরিচালকদের রুচি বা শুভবুদ্ধির পরিচয় দেয় না।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপক বলেছেন: ভারতেতিহাসে উন্নতির মূল পর্ব হচ্ছে নাগরিক কিন্তু স্থাণু সিন্ধুসভ্যতা, এরই ছাপ পরের টেক্‌নিকে, প্রতিমাবর্ণনে বা আইকনগ্রাফিতে, এবং সম্ভবত সামাজিক বিধিব্যবস্থাতেও।

দুঃখের বিষয় এই সমাজের উন্নতির পর্বগুলির পরম্পরা বা স্বরূপ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ এবং সে-জ্ঞান কোশাম্বী কিছু বৃদ্ধির চেষ্টা করেননি। তাছাড়া, এই উন্নতির আগের অবস্থার বিষয়েও তিনি নীরব। ফলে, আমরা, আমাদের অতীত শিকড়ের সন্ধানী সাধারণ ভারতীয় পাঠকরা না-জানি এই উন্নতির উৎস, না-জানি টেক্‌নিকে বা সমাজে এর ছাপের প্রকৃতি। কী ক'রে যে এই সভ্যতা নাগরিক এবং স্থাণু অবস্থায় পরিণত হ'ল সে-বিষয়ে কোশাম্বীর নীরবতায় মনে হ'তে পারে যে বিকাশ-সমস্যা বাদ দিয়েও কোন সভ্যতা একেবারে পরিণত অবস্থায় পৌঁছায়; বলাই বাহুল্য, সেটা ভুল হবে। বিকাশের এ পূর্বাপর নিয়মের কথা ছাড়াও আরেক বিষয় আমাদের জানা দরকার; এই-যে মাথাভারি নড়বড়ে নগরসভ্যতা, মহেন্‌জোদারো বা হারাপ্পাই ধরা যাক্‌, এর ত একটা গ্রামীণ জোড় বা গ্রামের অর্থবহ শাখার সম্বন্ধ থাকা আবশ্যিক; এবং আম্‌রি,

নাল্, কুল্লী ইত্যাদির পুরাতত্ত্বের জ্ঞান তা সমর্থনই করবে। এ-প্রশ্নের উত্তরের তথ্য হয়ত কম, কিন্তু ইতিহাসতত্ত্বে এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকে ভারতের ভূগোল-ঘটিত তাৎপর্যও কোশাম্বী বোঝেননি। কৃষি কি সেকালে লোকের পক্ষে অতিপর্যাপ্ত ছিল এবং কৃষি ও বাণিজ্যের সম্বন্ধে ভারমাত্রার অসাম্য ঘটেছিল কতটা এই ভূমির পর্যাপ্তির জন্য? তারপরে, সমস্যা থেকে যায় যাতায়াত ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা এবং তজ্জনিত প্রাথমিক উৎপাদক এবং পণ্যবিক্রেতার মধ্যে কোন জীবন্ত গতিশীল এবং পারস্পরিকভাবে সার্থক সম্বন্ধপাতের অভাব।

ভারতবর্ষের ইতিহাস-আলোচনায় ভূমির ভৌগোলিক বিস্তার, তার অর্থনৈতিক এবং সামাজিক তাৎপর্য একটা বড় বিবেচ্য। এই ভূমির প্রভাব ইতিহাসকে ভালোই হোক্ মন্দই হোক্ এক বিশেষ চেহারা দিয়েছে; এ-দিকে সজাগ থাকলে কোশাম্বীর মতো সুপ্রস্তুত পণ্ডিত তথাকথিত এশিয়াটিক রহস্যের দিক নির্ণয় করতে পারতেন।

দ্বিতীয় বিবেচ্য নিশ্চয়ই বৃহৎ সমাজের মধ্যেই নিহিত বিরোধসমষ্টি; গ্রামীণ ও নাগরিক আর্যপূর্ব সমাজে, আর্যেরই মধ্যে, আর্য ও আর্যেতর এবং তারপরে আর্য ক্ষমতারই নতুন বিন্যাসের মধ্যেই। এটা মনে না-রাখলে আমাদের ইতিহাসের ধারায় বিরোধের, বিজয়ের এবং আপোষের, বিদ্রোহের ও পুনর্ব্যবস্থার এবং শেষ পর্যন্ত স্থাণুতার ব্যাখ্যার দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। মনে রাখলে বোঝা যায়, কেন বাণিজ্যিক বিকাশের পথে আদিম বৌদ্ধযুগে বা অশোক সাম্রাজ্যে কিংবা বহু পরে মুঘলযুগেই ধরা যাক্—বারবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু এ-দেশে সৌখীন শিল্পের আশ্চর্য বিকাশ হ'লেও ইওরোপের সমতুল্য কৃষিবিপ্লব বা পণ্য বিপ্লব হয়নি; গ্রীকোরোমক্, মধ্যযুগ বা নবজাগরণেরও তাই এ-দেশে যথার্থ তুল্য কিছু নেই। আর্যের পরোক্ষধর্মী আধিভৌতিক ধ্যানধারণা এবং অন্যপক্ষে লৌকিক পুরাণ বা মিথগুলির প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রকৃতি কীভাবে হিন্দুসংস্কৃতিতে এখানে-ওখানে কমবেশি মিশ্রিত হ'ল, এ-দৃষ্টিতে সে-বিষয়ে আলোকপাতেও সাহায্য হয়।

ভারতেতিহাসের এবং তার দায়ভাগের উপরে মার্ক্সের শ্যেনদৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়েছিল তার এই বিরোধী স্বভাব, ভারতের গ্রাম্যসংস্কৃতির ব্যাপ্তি ও উৎকর্ষ এবং ভয়াবহ রুদ্ধতার দীর্ঘ আয়ু।

সময়ে-সময়ে প্রত্যাগতির দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, আমাদের অনেক আদিমগণের পুরাণে মেলে এই সভ্যতা থেকে আত্মরক্ষার জঙ্গলে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী।

একদা যদি সিন্ধুসভ্যতার সমগোত্র মানুষের সঙ্গে কিছু-কিছু আদিবাসীগণের পূর্বপুরুষদের আত্মীয়তার খবর পাওয়া যায়, তাহ'লে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এবং তখনই দাক্ষিণাত্যও ভারতেতিহাসের মানচিত্রে যথার্থ মর্যাদা পাবে।

এই ভূমির স্থান ও জীবনযাত্রার কালের ব্যপ্তির বিষয়ে উদাসীন অধ্যাপক তাই ভারতীয় আর্য শাসকদের বলেছেন প্যাস্টরল নোমাডিক ট্রাইবল ব্যবস্থা অর্থাৎ পশুপালক যাযাবর গণসমাজব্যবস্থা। পরমুহূর্তে তিনি স্থান কাল পাত্র-ভেদ না-রেখে এই ব্যবস্থাকে চতুর্বর্ণ শ্রেণীতে পর্যবসিত এবং নতুন দেশে পত্তনরত দেখছেন। এর আগেই কোশাম্বী তথাকথিত সিন্ধুসভ্যতার মধ্যের স্ববিরোধকে উড়িয়ে দিয়েছেন, ফলে, মনে হয় যেন সিন্ধুযুগে শুধু নগরই ছিল এবং সমকালীন বনবাসীগণ ছিল না। তেমনি কোশাম্বীকাণ্ডে আগন্তুক আর্য এবং অনার্যের মধ্যে, পরের বিস্তৃততর আর্য উচ্চনীচবাদী সমাজের অন্তরস্থ ভিন্ন-ভিন্ন ভাগের মধ্যে বিরোধী এবং বলপ্রয়োজক সম্বন্ধপাতের নির্ণয়ও গৌণ। অবশ্য কোশাম্বীর পরোক্ষ ঝোঁক ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে পুষ্টি পেয়েছে।

ভারতের ইতিহাসের পরের যুগকে কোশাম্বী বলেছেন ইওরোপের সমতুল্য পিওর ফিউডালিজম্। তাঁর অভিজ্ঞা শব্দের ব্যাখ্যা তিনি দেননি, সম্ভবত কোশাম্বী বিশুদ্ধ সামন্ততন্ত্র বলতে বোঝেন পশ্চিমা একপক্ষে ম্যানরিঅল প্রজা ভিলেনেজ এবং অন্যপক্ষে ক্রমবর্ধিষ্ণু নগর—গিল্ড কারুসঙ্ঘ। তিনি কি শার্লমানের সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলছেন? নাকি বাইজাণ্টিয় রাজন্যপ্রধান সমাজব্যবস্থার?

ইওরোপের ইতিহাসে সার্থক নামশব্দ তিনি ব্যবহার করেন, কিন্তু তার ভারতীয়-ভেদে প্রতিশব্দ ব্যাখ্যা করেন না, ফলে সাধারণ পাঠক আমরা উদ্‌ভ্রান্ত। অশুদ্ধ ফিউডালিজম্ বস্তুটা কি? ভারতের কি সে-ভূমিব্যবস্থা ছিল, যার ভিত্তিতে এখানে শুদ্ধ ফিউডালিজম্ গ'ড়ে উঠবে?

প্রাচীন ভারতের আর্যীকরণের এ কোশাম্বী-কৃত ছবি পরোক্ষধর্মী ব'লে ভূখণ্ড এবং কালের গতির বিষয়ে দুর্বল ত হবেই। তাঁর আর্য বিষয়ে প্রত্যেকটি নাম প্রয়োগে আর্যরা অত্যন্ত বিশিষ্ট হ'লেও তিনি তাই বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বলেছেন: আর্যরা জাতি নয়। নাৎসি জাতিমাহাত্ম্য আর সনাতন হিন্দুত্বের সংশোধক হিসাবে মন্তব্যটি নিশ্চয়ই সাধু। কিন্তু তারপরে তিনিই আবার বলেন যে ঐ আর্যরা এক স্বতন্ত্র, নৃতাত্ত্বিক অর্থে জাতি বা দল বিশেষ, তাদের ভাষা ভিন্ন, তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক বিধিব্যাবস্থা ভিন্ন, তারা অন্তত সিন্ধুসভ্যতার বা অনুরূপ নাগরিক সমাজের লোক নয়, বরং এ-সভ্যতা তারা ধ্বংস করেছিল এবং তারা

আর্যপূর্ব আরণ্যকও নয়।

কোশাম্বীর চেষ্টা ভারতীয় সমাজের বিরোধকে গৌণ করা, তাই তিনি আর্যের জাতিহরণ করতেও দ্বিধা করেননি এবং শেষ পর্যন্ত অতীন্দ্রিয় ধর্মেই তাঁর মার্ক্সের চেয়েও মার্ক্সবাদী দর্শনের মুক্তি। তিনি বলেন, মার্ক্সের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত উপমা এশিয়াটিক ফিউডালিজমের মূল সূত্র হচ্ছে এশিয়াটিক ধর্মে। দুঃখের বিষয় এই এশিয়াটিক ধর্মেও তাঁর সমস্যার সমাধান মেলে না। এমনকি দুটি এশিয়াটিক দেশ ভারত ও চীনের সমাজব্যবস্থার প্রভেদও এই এশিয়াটিক ধর্মের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

তার চেয়ে বড়ো কথা, কোশাম্বী ভুলে যান যে ধর্মও কিছু একটা অনাদ্যন্ত মৌলিক বস্তু নয়, ধর্মও সমাজজীবনের নক্ষত্রবিন্যাস মাত্র। সেইজন্যই ভারতের বর্ণজাতিনির্ভর ধর্ম ও মান্দারিন-প্রধান চীনের ধর্ম ভিন্ন, দুয়ের মধ্যে অনেক নৈকট্য থাকলেও।

অবশ্য কোশাম্বী বারবার বাস্তব জীবনের তথ্যের মুখোমুখি হবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর অতীন্দ্রিয় ঝোঁক সত্ত্বেও। উদাহরণত, তিনি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠেছেন "এই নবট্রাইবল অর্থব্যবস্থা"য়। অবশ্য তিনি তিনটি কথার একটিরও সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি!

তাই, তিনি যখন তাঁর প্রতিপাদ্যের মর্মে অর্থাৎ হিন্দু সমাজে জাতিভেদ সমস্যায় পৌঁছান, তখন তিনি বলেন বটে যে শূদ্ররা ছিল ট্রাইবল বা গোষ্টিকে গোষ্ঠী হিসাবে হিলটস্ বা আদিম সমষ্টিগত কিন্তু বহুজনীন সমাজের মধ্যে দাস-পদবাচ্য। কিন্তু তাঁর নিজেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যা স্পষ্ট, তাও তাঁর এশিয়াটিজম্ বা এশিয়াবাদের ধোঁয়ায় হারিয়ে যায়। তাঁর মতে ধর্মের শৃঙ্খল অর্থনৈতিক দাসত্বের চেয়ে শোভন। তাঁর স্বদেশপ্রেম নিশ্চয়ই ভালো জিনিষ, কিন্তু তিনি ভুলে যান ধর্মের ব্যবস্থা এ-ব্যাপারে তখন থাকতে বাধ্য ছিল, কারণ সে-সমাজ ছিল তাঁরই মতানুসারে যথাক্রমে ট্রাইবল, প্রিমিটিভ, কম্যুনল, প্যাস্টরল এবং কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার স্তরে। যে-স্তরে কর্তারা বণিকপ্রভু হয়ে ওঠে না, হয়ে আসে ব্রাহ্মণ, কর্মীরা দাস না-হয়ে হয় শূদ্র।

অসতর্ক কিন্তু এক সৎ মুহূর্তে কোশাম্বী ব'লে ফেলেছেন যে রোমক প্রভুদের মতোই আর্যরাও শূদ্রদের অর্থাৎ বিজিত অনার্যদের নিয়োগ করতেন—বাস্তব ঐশ্বর্য ও আয়ের জন্য। তিনি এ-ও বলেছেন যে শূদ্ররাই শ্রমের প্রধান উৎস, তারা আধাস্বাধীন এবং সম্পত্তির অধিকারহীন। আমরা এ-ও জানি যে ব্যক্তিক

অর্থাৎ ছোটোখাটো স্থানীয় ব্যবসায়ীর রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে কোন হাত ছিল না। এ সমস্তই, কোশাম্বী বলেন ধর্মের ব্যাপার। এ যে আদিম-সমষ্টিগত আর্যসমাজের দাস্যভাব নয় কিন্তু আদিম অথচ অশ্বে লৌহে শক্তিশালী, পরোক্ষচিন্তায় কথঞ্চিৎ পারদর্শী, উদ্বাস্তস্বভাব এক সমাজের অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক জয়পরাজয় ঘটিত বিরোধের জন্যই ঘটেছিল, সে-কথাটা তিনি উড়িয়ে দিতে চান। অথচ তিনিই অন্যত্র বলেছেন যে আর্যের এই বিশেষ ধর্মও উৎপাদনের নিম্নস্তরের ফল, বাস্তবকে এড়ানোর ফল। আরেক পৃষ্ঠায় তিনি 'সস্তা দাসশ্রম' একথাও বলেছেন।

আর্যামি বা হিন্দু ধর্মে কোশাম্বী গড় বেঁধেছেন, এই আর্যামিতে নাকি শাসকের বলপ্রয়োগ থাকে না, আর থাকে না শাসিতের প্রতিবাদ এবং বারবার দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়াস।

আর্যপর্বের পরে ঐতিহাসিক বিকাশের নির্দেশ না-দিয়েই কোশাম্বী একেবারে চ'লে আসেন বুদ্ধের কালের গণরাষ্ট্রগুলিতে এবং তাদের নাম দেন 'অব্রাহ্মণীকৃত আর্যগোষ্ঠীগণ'। কিন্তু কেন যে পাহাড়ীরা অব্রাহ্মণীকৃত, কেন বা কেমন ক'রে বা কার দ্বারা বাকি আর্যরা ব্রাহ্মণীকৃত সে-বিষয়ে তিনি মৌন।

অধ্যাপক কোশাম্বীর সহস্রবর্ষব্যাপী এক-একটা লম্ফে ত্রিকালের মাথা ঘোরা স্বাভাবিক। এমনকি তাঁর হাতে ভূগোলও হয়ে যায় সার্কাসের খেল্। তিনি বলেন, রাজগির নেপালের মতোই নাকি হিমালয় পদগিরিতে অবস্থিত, আবার তিন পৃষ্ঠা বাদে রাজগিরকে চালান ক'রে দেন সিংভূম ধলভূমে। এবং ভূগোলের এই ভিত্তিতে কিছু বড়ো-বড়ো ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ক'রে বসেন।

তারপরে আমরা এসে পড়ি "সম্পূর্ণ বিকশিত ফিউডালিজমে"—যা সেকালের নিতান্তই শুদ্ধ ফিউডালিজম্ থেকে ভিন্ন। এই 'পূর্ণ ফিউডালিজম্' হল পিকিউলি-আরলি এশিয়াটিক মোড্ অব্ প্রোডাকশন অর্থাৎ উৎপাদনের একান্তই এশিয়াটিক বা ধার্মিক প্রণালীর ফলে।

এরকম একটা জেটবিমানে ভারত পরিক্রমার পরে যে কোশাম্বী স্তালিনের উপরে মেগালোমেনিয়াক আক্রমণ করবেন, সেটা বোধহয় স্বাভাবিক। অধ্যাপকের মনে হ'ল স্তালিন নাকি এন্টি-এশিয়াটিক। কারণ স্তালিন মার্ক্সীয় ভাষায় এশিয়াটিক ও প্রাচীন উৎপাদন-জনিত সম্বন্ধের পুনর্ব্যাখ্যায় বলেছেন উৎপাদনের আদিম গোষ্ঠীগত সমাজ ও দাসত্বের সম্বন্ধের কথা। তাতে নাকি ধর্মের মাহাত্ম্য হানি হয়। অথচ গত একশ বছরে ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের জ্ঞানের বিস্তারে বোঝা যাচ্ছে যে এশিয়াটিক নামে বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক সংজ্ঞা নিষ্প্রয়োজন। এশিয়ায় দেখা

যায় একদিকে আদিম গোষ্ঠীগত জীবনযাত্রার জের এবং তারই সঙ্গে-সঙ্গে অন্য-পক্ষে দাসস্তরের সমাজব্যবস্থা। এই স্তরে ভারতের আর্য-অনার্যের বহু জাতিগত কারণেই শূদ্রত্বের জাতিভেদ আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল। ধর্মের বর্ণবিন্যাস এরই ভিত্তিতে।

কোশাম্বী বাল্মীকিকে এবার ধূলিসাৎ করবেন—কারণ বাল্মীকি সাতকাণ্ড রামায়ণে নাকি একবারও বলেননি সীতা কার পিসি।

সুরুচি ও পণ্ডিতম্মন্যতা

এ-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে ভারতীয় কোনো কবিই ইংরেজি গদ্য বা পদ্যকাব্যে সুরাওআর্দির সমকক্ষ নন, তা সে শ্রীমতী নাইডু বা ইক্‌বাল, দত্তপরিবার বা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ বা কাশীপ্রসাদ যাকেই ধরুন। এক শুধু মনমোহন ঘোষই সুরাওআর্দির কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনীয় এবং তার কারণ ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগের বেশি ঘনিষ্ঠতা ততটা নয়, যতটা হয়ত মনমোহনের কবিত্ব বা সাত্ত্বিকতর কবিস্বভাব।

বিদেশির কাছেও স্পষ্ট যে সুরাওআর্দি ইংরেজির মর্মে প্রবেশ করেছেন। রোমান্টিকতা বা ভাবালুতায় ইংরেজিতে বিদেশি তথা স্বদেশির পক্ষে একটা সহজ আপাতসুবিধা আছে, যেটা রসিক কাব্যে নেই। এবং সুরাওআর্দির কীর্তিই তাঁর বিদগ্ধ লঘু নাগরিক কবিতাগুলি। সুরাওআর্দির সমাজ-ভ্রমর নাগরিকোচিত বৈদগ্ধ্য ও ইংরেজিতে তাঁর অন্তঃশীল মমতায় তাই সোনায় সোহাগা হয়েছে। বিদেশির পক্ষে এ-কৃতিত্ব বিস্ময়ের ও প্রণম্য। অবশ্য বিদেশিসুলভ কথার নেশায় এখনও তাঁর মধ্যে-মধ্যে শিথিলসমাধি ঘটে, ফলে কবিতা হয়ে পড়ে গৌণ, মুখ-রোচক শব্দটাই হয়ে ওঠে মুখ্য। ইয়েট্‌সের ভাষায়, তার ফর্ম বা প্রজ্ঞামাত্রিক ভাবনা নেই, তাঁর প্রেরণা গদ্যের আভিধানিক শব্দ-স্বাতন্ত্র্যে কাব্যের অখণ্ড কেলাসিত রূপ তাঁর আয়ত্তে নেই। তাই obstreperous বা lone কথাদুটি তাঁকে পেয়ে বসে। তাঁর কথাপ্রয়োগ প্রায় হয়ে ওঠে স্থানকালপাত্রবোধহীন, তাতে আর আকস্মিক বিস্ময়ানন্দও থাকে না। তাই চীনসাগর থেকে তাঁর কবিতায় ritornels দেখেও বিচলিত হই না, যদিচ কথাটি গতিয়ের ভিনিসীয় কবিতায় সার্থক।

এই গদ্যস্বভাবের আরেকটি দিক দেখি তাঁর কাব্যে মহাজনের প্রতিধ্বনির বিশেষত্বে। প্রথম কবিতায়ই ব্রিজেস্‌-মার্গে তাঁকে দেখি এবং যেহেতু ব্রিজেসের কাব্যে আবেগ ও শব্দস্রোতের উচ্চাবচ নেই, তাই সুরাওআর্দিও এখানে প্রায়

Essays in Verse by Shahid Suhrawardy (University Press, Cambridge), 1938.
Prefaces by Shahid Suhrawardy (University Press, Calcutta), 1938.

অখণ্ডতা অর্জন করেছেন। প্রসঙ্গত, কীট্‌স্ ও ইয়েট্‌সের অনুরূপ তাঁর সমাস-যোজনা যথেষ্ট রসঘন হয়নি, এমনকি বাধ্যতামূলক ব'লেই মনে হয়। যেমন মনে হয় "The Asoka Tree" নামক উপাদেয় মুক্তছন্দ কবিতাতে in the days of yore। কিন্তু পরের কবিতাটি জয়সের সঙ্গে তুলনা করলে সুরাওআর্দিকেই অভিনন্দিত করতে হবে। অথবা তার পরবর্তী কবিতাটির Beside the primrose landslides of the South অডেনের হাতে মানায় কিন্তু But abating my sense ?

এখানে বলা দরকার যে সুরাওআর্দি মহাকবিদের রচনা পাঠ করেছেন বটে, যেমন প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই করা উচিত; কিন্তু কাব্য তাঁর পেশা নয়। তাঁর বিদগ্ধ মনে তাই অনুকরণই হয়, তাঁর রচনা অনুকরণ হয় না। এটা মনে রাখলে "When you Unloose your Hair", "Foam of the Sea", "I Sat", "Lines for an Album", "You Will not Miss Me" (মনরো বা হমবর্ট উল্‌ফ ?), "An Old Man's Songs—I" (সাইমন্‌স্ ?) নামে কবিতাগুলিতে আর ইয়েট্‌সের সন্ধানে ঘুরতে হয় না অথবা "Moon in the Sky" এইচ্. ডি. কে বা "Cotswolds"-এ ব্লণ্ট মেরেডিথ ও টেনিসনকে; "My Thoughts Flock to Thee"-তে মেনেল্‌কে; "In Russia"-তে ভের্‌লেন্‌কে; "In the Earth"-এ টম্প্‌সন্ বা এ. ই. কে অন্বেষণ করতে হয় না। বরঞ্চ তারিফ করতে হয় তাঁর কুম্ভীরকবৃত্তির নৈপুণ্য এই উদ্ধৃতিতে :

> Ruth singing waist-high midst my lands,
> Reaping with splendid hands
> The lean harvest of my hazardous plight !

যদিচ "A Fragment" কবিতাটি শিথিল ও কীট্‌সীয় উক্তির পরে O Shulamite, my Shulamite ইত্যাদিতে মন বিক্ষিপ্ত হয়।

তাঁর শাস্ত্রমানানুগ কবিতাগুলিতে আপত্তি উঠতে পারে যে, গাঢ়বন্ধ বহিরঙ্গরূপে পদ্যসুলভ সংহতিতে তিনি সংযমের প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সেই কারণেই ফাঁকিও দিয়েছেন। কিংবা Narcisse Mallarmeen-তে তিনি মোটেই মার্লার্মেপন্থী নন, এ-কথাও উঠতে পারে। অবশ্য সুরাঅআর্দির প্রকৃতি ও প্রস্তুতিতে সেটা সম্ভবও নয়, *Prefaces*-এর শেষ প্রবন্ধে মালার্মে বা ভালেরি সম্বন্ধে সমাচারেই তা বোঝা যায়। মালার্মের নাম না-ক'রে সিমণ্‌স্, ডগ্‌লস্ বা ওশনেসির নামই হয়ত তাঁর করা উচিত ছিল। এলিঅটের মতো তিনিও গতিয়ের

-সুলভ ভাস্কর্য-কঠিন চতুষ্পদী ব্যবহার করেছেন এবং যেখানে এলোপাথাড়ি নানাবিধ জহরতের নাম করেছেন, সেখানে হয়ত আমাদের গতিয়েকে—বা প্রাচীন মার্ভ্‌ল-কে পড়বে না, পড়বে ঐ সিমণ্ডস্‌কেই, ইয়েলোবুক্‌ ও রাইমর্স্‌ ক্লাবের কবিকিশোরদেরই। এবং সেটা নিন্দার্হ নয়। সুরাওআর্দি মানুষ নাইন্‌টিইস্‌য়েই। তাঁর অন্যান্য কবিতাতেও তা বোধগম্য। তাঁর *Prefaces*-ও এই কথার সাক্ষ্য এমনকি তাঁর গদ্য বাক্যরচনাতেও, পেটারে ও সংবাদপত্রের সংমিশ্রণে।

কিন্তু "To My Dog", "Letter from O' ni" ইত্যাদি কবিতা সকলেরই ভালো লাগবে—বিশেষ যদি ক্যাভালিঅর ভঙ্গিটি তাঁদের ধাতে সয়। কারণ শাহেদ্‌ সুরাওআর্দি ইরানি-ইংরেজি শেষ ক্যাভালিঅর্‌। দ্বিতীয় চার্লস্‌ আজ মৃত, সপ্তমের নাতি অষ্টম এডোআর্ড আজ বনবাসে, যাযাবর ইরানিরা আজ অনেকেই ইউ. এস. এস. আরে প্রগতিশীল—তাই সুরাওআর্দির "At Tennis"-এ মনে হয়:

Friend, the world smashes in my brain—
Girders and plinths, limbs and stars !
In the sudden upheaval of unbidden centuries
The lands convulse with cataclysmal speed.
Flaming wide nostrilled monsters plunge
Across the convex of the skies,
I stretch torn hands to reach your piteous hands ;
I seck through tattered space your ample eyes.
But you,
Stranger to apocalyptic needs,
In the narrow orb of your accurate mind
Rotate from hour to hour :
Dinner for two ;
Tennis at four ;
Odol and powder before going out to friends ;
Cautious caresses ;
Honourable amends ;
Lips painted to the crimson of a wound

After sentimental flutters ;—
Whatever happens one should go to sleep
Carefully drawing to the shutters...
Oh ! Passion lionhearted, that ruled calamitous wilds,
Browses on well-laid lawns, a weary sheep.

শেষ দুই লাইন প্যারডি মনে হ'লেও, আমাদের অনুকম্পা উচ্ছল হয়ে ওঠে কবির জন্যে এবং অপ্রত্যাশিত দাবিতে কাতর নায়িকার জন্যেও, যাঁর মধ্যে লা পাসিওনেরা-কে খোঁজাটা অবিচার অথচ অবস্থাবিশেষে হয়ত স্বাভাবিক।

সুরাওআর্দির এই কবিস্বভাবের বিদগ্ধ নাগরিক বৈশিষ্ট্য মনে রেখে তাঁর অধ্যাপকোচিত প্রথম আত্মপ্রকাশ *Prefaces* বা মুখবন্ধমালা পড়লে পাঠকেরই সুবিধা। কারণ যস্মিন দেশে যদাচার এবং সুরাওআর্দি যে সভ্যজগতে বাস করেন, সে বিদগ্ধ তত্ত্ববিশ্বে পাণ্ডিত্য কারও পেশা হতে পারে না, সেখানে শিল্পীর ফরমায়েস্ থাকলেও সেখানে কেউ শিল্পী নয়, আর পুরাতত্ত্বে বা ইতিহাসে বা নৃতত্ত্বে তথা শিল্পানুরাগে আত্মহারা হওয়া সে-জগতে বর্বরতারই নামান্তর। প্লেটোর নাম করলেও তাঁর জপমন্ত্র সৌন্দর্য, সক্রেটিসের টোকালন নয়। তাই প্লেটোর ভ্রান্তপাঠে সুরাওআর্দির মনে হয় আর্ট ও সুন্দর সমপদবাচ্য, যেমন ব্যবহারিকার্থ ও পুরুষার্থ নিয়ে পাত্রাধারতৈলমূলক বাক্যজাল বিস্তারের পরে তিনি প্রস্তর যুগের শিল্পীর ম্যাজিকাল বা অথর্ববৈদিক আর্ট বিষয়ে যা বলেন, তা বর্কিট বা চাইল্ড, বল্ড্উইনব্রাউন্, বা ব্রোইল্ কারও মাথাতেই আসেনি।

এসব অনুরূপ তথ্য তাঁর প্রথম প্রবন্ধ "On the Study of Indian Art"-এ পাঠক পাবেন। বহুকাল আগে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের এই বিষয়ে একটি ছাত্র-বোধ্য প্রবন্ধ পড়েছিলুম, সেটি লেখার পর ত্রিশ বছর কেটেছে, অনেক জ্ঞান বেড়েছে, তবু সুরাওআর্দি সে-লেখাটি সবিনয়ে পড়লে তাঁর ভ্রান্তিবিলাস হয়ত কমত। কিন্তু তাঁর প্রাগৈতিহাসিক গবেষণা তাঁর মনোলৌল্যই, যার দুঃসাহস এবং নিশ্চিন্ততা চাইল্ড, পীক্ বা ফ্লুরের ঈর্ষ্যা জাগাবে। অবশ্য প্রবন্ধটিতে তিনি নিজের কীর্তিঘোষণার সঙ্গে উর্ধ্বশ্বাসে অনেকেরই নামোল্লেখ করেছেন। তবে সে নাম, শুধু নাম, বিনয়ী পাঠককে ধাঁধানো ও ভয় দেখানো মাত্র। এবং এস্কিমো ছাড়া য়ুরোপের সর্বদেশের সেইসব পণ্ডিতদের অন্তত অনেকেই, যথা সারে বা ডল্টন্ যে সুরাওআর্দির অনুশীলন ও সিদ্ধান্তের জন্যে তাঁদের দায়ী করলে মামলা আন্‌বেন, সে-কথাটা ঘুণাক্ষরে জানাননি। শেষে শুধু স্তম্ভিত পাঠকদের তিনি

জানিয়েছেন যে, যাই হোক্ শেষ পর্যন্ত তিনি শিল্প কারুকলা বা টেক্‌নিক্ বিচার এবং সমাজতত্ত্বের মিলিত সাহায্যে শিল্পালোচনার পক্ষে। আমরাও তাই। ফলে উদ্‌গ্রীব হয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধের লোকশিক্ষা ও শিল্প বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাধুকথার চর্বিতচর্বণ সাঙ্গ ক'রে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার ইন্দো-পারসিক চিত্রে এসে স্বদেশে স্বভূমিতেও বেঘোরে ঘুরি।

অথচ শিল্পের ক্ষেত্রে যেটা প্রাথমিক, সেই চোখ মন, সেই শিল্পসংবেদন ও স্বাভাবিক সৎরুচি সুরাওআর্দির প্রধান গুণ এবং যেহেতু ঐ-গুণ ভারতীয় শিল্পা-লোচনায় একান্ত দুর্লভ, তাই সুরাওআর্দিকে সাদর শ্রদ্ধায় স্বাগত বলতে হয় ভারতীয় শিল্পবিদ্যার প্রাদেশিকতা অধ্যাত্মবিলাস রুচিহীনতা ও সংবেদনহীনতার মরুভূমির মধ্যে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে স্বকীয় রুচিবোধ ও সংবেদন খাতির পায় না, খাতির পায় একরকম চর্বিতচর্বণ পণ্ডিতম্মন্যতা এবং সুরাওআর্দির মতো রসজ্ঞ ব্যক্তিকেও বাধ্য হয়ে এই পণ্ডশ্রমে নামতে হয়েছে। নিজের প্রকৃত শিল্পবেদনা ও স্বকীয় প্রজ্ঞার প্রতি একরকম দায়িত্বের অপলাপ, সুরাওআর্দির মতো শিল্পসাহিত্যের কমলবনবাসীকেও যে দেশের মত্তহস্তীদের মধ্যে নিজেকে হারাতে হয়েছে সেটা আমাদেরই একটা ট্র্যাজেডি।

উপভোগ্য তাঁর দায়িত্বহীনতা বটে, কিন্তু হায়, সমাজতত্ত্বের বিস্তর প্রস্তুতি, শিল্পজ্ঞানের সাধনা এবং মনোধর্ম বিচারের সতর্ক সংবেদ্যতা যেখানে নেই, সেখানে উদ্ধত অগ্রজদ্রোহিতায় অন্তত পাঠকের কোন পদবৃদ্ধি হয় না। কারণ পাণ্ডিত্য-প্রমাণের স্বকীয়তায় তন্ময় সুরাওআর্দি ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্পশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান সবই ভুলে গেছেন গোপাল ভাঁড়ের সেই বিশ্বপণ্ডিত উৎকলবাসীর মতো। তাই পারস্য তাঁর কাছে একচ্ছত্র রাজবংশের একটানা ইতিহাসের পেয়ালায় ঘনীভূত। তাই তাঁর মহাব্যসন উদ্ভট ইরাণতত্ত্বে বলে যে উক্ত ইরানিরা পারস্যের অনাদ্যন্ত মধ্যপদলোপী রাজা অর্থাৎ এলামিরা ছাড়াও সেলুকিয়, পার্থিয়, দামাস্কি, খলিফা, বোগদাদি খলিফা, গজনিক, সেলজুক তুর্কি, মোঙ্গল, তৈমুরি ইত্যাদি বহু বিদেশি বংশ বাদ দিয়ে তাঁর পারস্যের ইতিহাস শুধু একিমেনি, সাসানি ও সফবিতেই নিবদ্ধ। কিন্তু তিনি মার্ক্স-বিরোধী হ'লেও ইতিহাস তাঁর মুখোপেক্ষী নয়। আর আমাদেরও হবার হেতু নেই। একাধিক চিন্তাশীল ও বিদ্যানম্র মনীষী সুরাওআর্দির চেয়ে দীর্ঘতর জীবন কাটিয়েছেন এই নানা উৎসবের মধ্যে পারস্যের শিল্প-ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে। তাই স্যার টমাস আর্নল্ড যেখানে পদক্ষেপে দ্বিধান্বিত, সেই অজ্ঞানশান্তিতে সুরাওআর্দি ধাবমান হ'লেও আমরা হব না। তাই সারের সঙ্গে

আমরা পারস্যশিল্পের জন্ম খুঁজব অসিরিয়ায়, গ্রোমানের সঙ্গে ঘুরব মিশরে। এবং পারস্যে সুমেরিয় প্রভাব এবং গ্রিক, রোমান ও পরে বাইজান্টিয় এবং আরবিদের প্রায় ক্রোক্‌ করবার মতো ঋণ আমরা হিসাব করতে যাব, সুরাওআর্দির রসিক সঙ্গ অগত্যা ছেড়েই। চীনের কুটুম্বসৎকারও আমাদের গোচরে আসে পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ এবং সাকিসিঁয়া, মার্টিন বা ব্লশের সাহায্যে। তদুপরি সহজবোধ্য বিনয়ী বিনিঅন্‌ বা ব্যাজল্‌ গ্রে ত আছেনই।

তাই কুমারস্বামী, হ্যাভেল, ব্রাউন প্রভৃতিকে সুরাওআর্দির ভোজপুরীতে ভূমিসাৎ দেখেও অস্থির হই না, যখন দেখি যে মুঘল ও রাজপুত চিত্র পারসিক হ'ল এই তিন কারণে। প্রথমত, মুঘল, রাজপুত ও পারসিকদের ইতিহাসেতর পূর্ব-পুরুষ হ'ল ইরানিরা; দ্বিতীয়ত, পারসিক তথা রাজপুত চিত্রের বর্ণাঢ্যতা; তৃতীয়ত, কোন-কোন পাহাড়ি চিত্রের পটভূমিতে স্থাপত্য নিদর্শন নাকি পারস্য-সুলভ এবং হিমালয়-প্রাপ্য তনুপর্ণ গাছের আলঙ্কারিক প্রয়োগ নাকি মূর্খ উদ্ভিদ্‌-তাত্ত্বিকদের মত সত্ত্বেও পারসিক সাইপ্রেস্‌ বৃক্ষজ।

তাই আগ্নেয়গিরির এই মূষিকপ্রসবে আমাদের আর কোন বিস্ময়ের কারণ নেই। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়েছি লেখক পারসিক জাতীয় মহাকাব্য পড়েননি দেখে, সে ত ইতিহাস নয়! পড়লে তিনি জানতেন যে তাঁর একচেটে যাযাবর ইরানিরা সেখানে ইরানি নয়, তুরানি; এবং ইরান তুরানে যুদ্ধ চলে। অধিকন্তু মিজেঁা প্রমুখ বিশেষজ্ঞের মারফৎ পারস্যের ভিতরে কীরকম অনিরানি মধ্য-এসিআর মোঙ্গল প্রভাব গিয়েছিল, তা-ও সহজে জানা যায়। স্টাইন, পেলিও, মুন্‌স্টেরবের্গ, গ্রুন্‌বেডেলের সমর্থিত একটি তথ্যও লেখক চেপে গিয়েছেন, অজ্ঞাতসারে হয়ত, কারণ তাতে তাঁর ইরানি কীর্তনের হানি হয় না। বরঞ্চ মধ্য-এসিআয় যে ভারতীয় ধর্মশিল্পের উপনিবেশ ও পরে স্বকীয় বিকাশ, যার পারমার্থিক শাখা গেল চীনে এবং সাংসারিক প্রেরণা গেল পারস্যে,—সেই যোগসূত্র ধ'রে সুরাওআর্দির ভারতীয় ও পারসিক শিল্পের আরেকটা রাখীবন্ধন করতে পারতেন। যেমন পারতেন বৈদিক পুরুষে বা ইহুদি আদিপিতা অ্যাডামের কথা তুললে।

পাঠক বলতে পারেন, রাজপুত চিত্র কি ভিন্ন প্রকৃতির? যেহেতু রাজপুত চিত্র হচ্ছে মূলত ফ্রেস্কো বা টেম্পেরা চিত্র আর পারসিক চিত্র মিনিএট্যর বা আলঙ্কারিক এবং ইলস্ট্রেশন বা চিত্রোপাখ্যান। এ-দুয়ের জাত আলাদা, ধর্ম আলাদা। বাঘ জোগিমারা অজন্তার ঐতিহ্যে রাজপুত চিত্র, তা সে অভিজাত বা লৌকিক, রাজস্থানি বা পাহাড়িই হোক্‌, প্রাণ পেয়েছে, যার প্রমাণ বহু বিরাট

চিত্রে ও চিত্রের খসড়ায় এবং তার অবশেষ এখনও জয়পুর প্রাসাদে দ্রষ্টব্য। তারপরে রঙের বিশেষত্ব, রঙের প্রয়োগ, পটভূমিতে হিমালয় বা রাজপুতানার নিসর্গদৃশ্য ; ভারতীয় প্রতীক ব্যবহার যথা জলের প্রতীক চক্রাবর্ত, ত্রিকোণোপস্থ হ্রদসরোবর, পদ্মাদিফুল, বক সারসাদি পাখি, ভারতীয় গাছ গাছড়া ত আছেই। সর্বোপরি রাজপুতের এবং তদ্‌গৃহীত পরিণত মুঘল চিত্রে পারস্যজাত বর্তনা বা সার্ফেস মডেলিং বাই শেডিং আকাশ বা স্পেস্ ও পরিমণ্ডল বা অ্যাটমস্‌ফিঅর এর আভাস। এই গোত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ এখনও সাক্ষাৎ না-জানা গেলেও এর ভারতীয় ধারাবাহিকতা অনুমেয়, বিশেষ ক'রে সমাজচৈতন্যব্যাপী ব্যক্তি-অতিরিক্ত শিল্পধর্মের কথা মনে রাখলে। বিষ্ণুপুর বা মেদিনীপুরের পট ও পাটায় এই ঐতিহ্যেরই বঙ্গীয় বিকাশ, নেপালি চিত্রেও এর অনুরূপ সাক্ষ্য। জৈন চিত্রকে নিন্দা ক'রে রাজপুত চিত্রের ঠিকুজি কষতে পারস্যে যাওয়া স্যরাওআদির খেয়াল মাত্র—চীনে গেলেও বরং বুঝতুম, কারণ কাগজ, তুলি ও রঙের আমদানি হয়ত একদা চীন থেকেই হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি কুমারস্বামীকে সংশোধন ক'রে বলেছেন, বাজারের কথা "তিব্বতি" থেকেই নাকি পারসিক প্রভাব স্পষ্ট। আমাদের কাছে নয়, তিব্বত পারসিক বা ইরানি নয় ব'লেই, চৈনিকাত্মীয় ব'লেই আমরা জানি। আর রাজপুত চিত্রের স্ট্রেনগেন আণ্টিকেন্ লিনিএনফ্যুরুং বিষয়েও তিনি অন্ধ, যদিচ এই বলিষ্ঠ প্রাক্-সভ্যসুলভ লৌহতন্তুবৎ কঠিন বাহ্যলেখার তুলনা খুঁজতে যেতে হয় মিশরে, অসিরিয়ায়, মাইকেনিতে, আদিম গ্রিসে।

কিন্তু তাঁর মনই বিপরীতধর্মী, তাই তিনি মুঘলচিত্রের দেশি পরিণতিতেও শুধু পারসিক মার্গ দেখেন, শিল্পীর দৃষ্টিতে যা দেখা অসম্ভব। আর তিনি মুঘল-চিত্রে শুধু পারসিক গজল, দ্বিপদী বা সোরাব-রুস্তম ও বহরামগোর্ আজাদকেই দেখেন [লয়লামজনুকে দেখেন না], যদিচ সামান্যশ্রমেই তিনি জানতে পারতেন যে আকবরের রাজত্বেই রামায়ণ, মহাভারত, যোগবাশিষ্ঠ, নলদময়ন্তীর কথা, অথর্ববেদ হরিবংশ, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদির অনুবাদ চল্‌তি হয়েছিল। গোআলিঅর-প্রাসাদে 'রজমনামা' নামক মহাভারতের আকবরী সচিত্র অনুবাদ এখনও রক্ষিত। এমনকি, বিজাদের কালে স্যুফিদের প্রতাপ বিষয়েও স্যরাওআদি অচেতন। তাই তিনি পূর্বাচার্যদের ব্যঙ্গ ক'রে বলেছেন যে পারসিকে চিত্রের নাটকীয় বা বর্ণনাত্মক গুণ তাঁদের চোখের দোষ, যদিচ তিনি কোনমতেই চক্ষুবিশারদ নন্ ব'লে তার চেয়ে আর্নল্ড বা বিনিঅনের উপরেই আমাদের আস্থা। এবং এ-প্রসঙ্গে অন্য প্রবন্ধেও তিনি ইস্তাহার দিয়েছেন যে ভারতীয় শিল্পই উপাখ্যানাত্মক ও

নাটকীয়। কারণ ভারতীয় শিল্প ধর্মতাত্ত্বিক ও শিল্পশাস্ত্রানুগ। কিন্তু বিড়াল কখন-কখন থলি থেকে বেরোয় এবং বিজাদ-কে স্থরাওআর্দি ব'লে ফেলেন প্রাচ্যের রাফাএল। তিনি যে বতিচেল্লির নাম করেননি, সেটা তাঁকেই সাজে। সুধী পাঠককে এই তুলনায় রাফাএল বিষয়ে অদ্ভুত ভ্রান্তির বিশদ ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, শুধু রাফাএলের বহুধা প্রতিভার একদিক স্মতর্ব্য—যে রাফাএল উপাখ্যানচিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

এই চিরসবুজ অবুঝ রোমান্টিক মনোবৃত্তি ও তজ্জনিত বিশ্বের শিল্পধর্মের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধ্যানাভাবে যামিনী রায়ের উপর প্রবন্ধ বা *A Nations Art*-ও তাই গোড়ায় গলদে টলমল। লোকশিল্প সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি থাকলে তিনি আর গান্ধিজিদের ধমক দিয়ে ইতিহাস-বিমুখ হয়ে লোকশিল্পের শান্তিনিকেতনি চালে প্রাণহীন উজ্জীবন কাম্য ভাবতেন না। জাতির সমষ্টিগত চিন্তাধারা ও শিল্পৈতিহ্যের বংশ-পরম্পরায় যে লোকশিল্পের জীবন ও জীবিকা, এ-আর্যসত্য নৃতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান না-প'ড়েও স্থূল শুভবুদ্ধিতেই বোঝা উচিত। কিন্তু সমাজোৎসারিত এই সহজবৃত্তি ভুলে লেখক গেয়েছেন যে, লোকশিল্প মহান, লোকোত্তর এবং সেইখানেই বিদেশি শিল্পের নিছক শিল্পগত চালের বিশেষ প্রভাব অন্বেষ্য। আধুনিক ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যে সভ্য শিল্পী, যথা পিকাসোর কথা তিনি ভেবেছেন বা হয়ত পড়েছেন যে পল ক্লে কিরকম তাঁর ছবির পূর্বজ খুঁজেছেন কপ্টিক বস্ত্রে, বাইজান্টিয় প্রস্তরখচিত কুট্টিমে, গথিক ভাস্কর্যে, ঈস্টার দ্বীপের প্রতিমায়, আলাস্কা-এস্কিমোর মুখোসে, অস্ট্রেলিয় কালো মানুষের বল্কলচিত্রে, প্রাচীন কাঠখোদাই-এ, প্রাক্-জর্মান শিল্পে, এবং এল গ্রেকো, সেজান, রুসো, পিকাসো, গোইআ, ব্লেক্, মাতিস্ বা বিআর্ডস্লি-র ছবিতে।

ফলে কালিঘাটের পুতুল হয়ে পড়েছে মিশরাগত। স্থরাওআর্দি বলেন তার হেতুও স্পষ্ট: বাংলাদেশ সমুদ্রতীরে অর্থাৎ মিশর বাংলায় পি. এণ্ড. ও জাহাজের যাতায়াত ত খুবই বেশি। ব্রতচারী নাচে ক্ষণে-ক্ষণে যে মিশরী পার্শ্বচিত্র ফোটে, সেটা তিনি কিন্তু লক্ষ করেননি। উড়িষ্যার কুটিরচিত্রণও কি মিশরি চিত্রের কথা মনে আনে না? বাংলা মেয়েলি ব্রতে যে বৈদিক সামের এবং মিশরি মন্ত্রের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, সে-বিষয়েই-বা স্থরাওআর্দি মৌন কেন? আর বাংলা আল্পনার সংকেতিতালঙ্কার প্রতীক কি জর্মানি-তে বা স্কটল্যাণ্ডে, আমেরিকায় বা চীনে, রাশ্যায়, বা পূর্ব এসিআয় তিনি দেখেননি? এদেশি মাটির পুতুলের সঙ্গে কাণ্ডিয়ায় পালাইকাস্ত্রোপ্রাপ্ত নৃত্যপ্রতিমার সঙ্গে কি মিল নেই? যামিনীবাবুর

একটি ছবির মুখ ও ভারতীয় মধ্যযুগান্তিকঅহল্যাবাই জাতীয় দেব-মূর্তির সঙ্গে বেনিনস্থ কপ্টিক ব্রঞ্জ ধূপাচির সাদৃশ্য বা গিনি প্রদেশস্থ মুখোস বা বেনিনের ব্রঞ্জ মুখের সমতুল্য ভারতীয় মূর্তি বা মুখ কি তিনি দেখেননি? ভারতীয় শিল্পের ভঙ্গ দেখে কি তাঁর মনে হয়নি যে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্র বা প্রতিমাশাস্ত্র গ্রীক-প্রভাবে মানুষ, কারণ এফেসাসি হর্মিস দণ্ডায়মান আমাদেরই পরিচিত ভঙ্গে? তবে তিনি বলেছেন যে, রাজপুতনায় বাহু-লেখময় খসড়া চলতি থাকলেও, বা অজন্তায় খসড়াচিহ্ন দৃশ্য হ'লেও, প্রতিবাহিত প্রযোজনা পারসিক আমদানি। অতঃপর তিনি বলেছেন কন্দাকৃতি পল্লব প্রায় সব দেশের লোকশিল্পে, যথা বাংলা পটে রাস্তান্ লুবকে সুলভ, রাজপুত-চিত্রের ঐরকম গাছ নাকি ইরানি। এখানে পাছে পাঠক ভাবেন যে সুরাওআর্দি নিজেকে পারসিক মনে করেন, তাই জানানো ভালো যে ডি এইচ লরেন্সের পত্রাবলিতে প্রকাশ, সুরাওআর্দি আরবি সৈয়দ।

কিন্তু সত্যই তাঁর আত্মবিসম্বাদী কথার কোন ব্যাখ্যা নেই। পারম্পর্যহীন ও একেবারে বিপরীত এলোমেলো কথায় তাঁর অসতর্ক লেখা এত কণ্টকাকীর্ণ যে তার উদাহরণে অবলীলায় পাঁচ পাতা না-ভরিয়ে একবার যামিনী রায়ের উপর প্রশংসামূলক উপাদেয় প্রবন্ধটিই চকিতে দেখা যাক্। তার মধ্যে তিনি যে ভর্টিকাল বা উর্ধ্বমুখ ও হরাইজন্টাল বা অনুপ্রস্থ রেখা নিয়ে বা ধর্মতান্ত্রিক ও ধ্রুপদী এবং দেশি রীতি নিয়ে শিল্পজ্ঞম্মন্য কায়দা অকারণে দেখিয়েছেন সে-বিষয়ে না-হয় বোরিঙ্গর বা ব্যোল্‌ফ্লিনের কথা ভেবে ধৈর্যধারণ করা যাক্। কিন্তু যামিনী রায়কে যে তিনি নিজের রোমান্টিক কল্পনায় বাক্‌শক্তিহীন অবুদ্ধিবাদী বলেছেন তার মধ্যে সত্য কোথায়? যামিনীবাবুকে আমার চেনার সৌভাগ্য আছে। তিনি নিজের ও আনুষঙ্গিক শিল্প সম্বন্ধে জটিল ও গভীর আলোচনা ক'রে আনন্দ পান এবং আমাদের শিক্ষাদান ক'রে থাকেন। তিনি কোনমতেই অন্ধ তাড়নায় তাঁর চিত্রের আনন্দচিন্ময় রেখাশুদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ করেননি। এবং তাঁর বাউলচিত্রের মধ্যে কোন বিকলাঙ্গ নেশাখোরের ঘোর নেই, তাঁর বাউল আপন ভূতমাত্রিক রূপেই চিত্রের শিল্পগত প্রজ্ঞামাত্রায় বিরাজমান, বাউল যিনি দেখেননি, তাঁর কাছে তা মনে না-হ'লেও। তেমনি অন্তঃসারহীন ও ভিত্তিহীন যামিনীবাবুর ছবিকে প্রাকৃত বা বর্ণনাত্মক বলা। আর ঐ হরতনমার্কা বক্ষ সম্বন্ধে গবেষণারই সার্থকতা কি?

সুরাওআর্দির পক্ষে ত এ-সব কথা বলা খেলামাত্র। কারণ তাঁর মনের ঝোঁকই এই দিকে। সেইজন্যই ত তাঁর মুঘল প্রতিচিত্র এত ভালো লাগে, তাই তাঁর

পারসিক পুস্তকচিত্রে এত কাব্যি জাগে। তিনি ত আর রজর্ ফ্রাই বা বেরেন্‌সন্‌ নন, সাহিত্যবিলাসী শিল্পবিলাসী তাঁর কবিকিশোরমন তাই যাযাবর ইরানি ঘোড়সওয়ারকে যেখানে-সেখানে লাফাতে দেখে আত্মহারা হয় এবং তিনি মিশরি যুগের সাসানি মুদ্রাঙ্কিত এই প্রতীকটি বাংলা পটে খুঁজে পান ইরানি প্রভাবের আরেকটি নমুনা হিসাবে। অবশ্য প্রতীকতত্ত্বে তা সমর্থন করবে না, এলিঅট্ স্মিথের বিস্তার প্রসারে বা রুথ্ বেনেডিক্টের ছকে এ-প্রভাব অচল। তবে যাঁর আনন্দ শুধু বাক্যে, শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে, তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। কিন্তু স্থরাওআর্দির অজ্ঞাতসারে এই প্রতীক প্রস্তর যুগের মানবমনকেও নাড়া দিয়েছিল। আর তিনি বলেছেন মিশরিরা মগ্ন কালাতীত মুহূর্তের স্তব্ধতায়, চৈনিক ও পারসিকরা সৌখিনতায় ও কারিকুরিতে, এবং ইরানিরা বিরাট স্থাপত্যাত্মক পরিকল্পনায়! বেশি কিছু নয়, ওএলি আর চাং ঈ-র সাহায্য নিলেই তাঁর বোধগম্য হ'ত যে, চৈনিক শিল্পে আশ্চর্য সৌখিন ও সুকুমার নৈপুণ্য থাকলেও তাদের সাধনা ও সিদ্ধি কঠিন শক্তির সংহতিতে ও অতীন্দ্রিয় অবিদৈবত ব্যঞ্জনায় পেশা-অস্থির উচ্ছ্বসিত প্রাণধর্মে। আর বিরাট স্থাপত্যগুণ ভারতীয় শিল্পেও প্রাপ্তব্য, মিশরে, অসিরিয়াতেও তা পাওয়া যায়।

তবে, স্থরাওআর্দির আনন্দ কল্পনাবিলাসে। নচেৎ অমরাবতীর সম্বন্ধে তিনি হঠোক্তি করবেন কেন? অথবা কুশনশিল্পে বিরাট পরিকল্পনা না-পেয়ে বস্তুতান্ত্রিক তদ্‌গত কারিকুরিই বা পাবেন কী ক'রে? কিংবা সেজানের চরিতকারদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে সেজানের প্রভাঁসযাত্রায় আত্মপ্রত্যয়ই বা আসে কী ক'রে? ভারতীয় শিল্পে এবং চৈনিক শিল্পে তিনি জীবজন্তু ও মানবশরীর সম্বন্ধে অনুকম্পা না-পেয়ে শুধু ইরানি শিল্পেই তা খুঁজে পান। বিলেনস্কির মারফৎ তাঁর জানা দরকার যে নিরাসক্ত শুদ্ধ শিল্পীরা ও শিল্পজ্ঞরা ঠিক উল্টো কথাই বলেন।

আর ঐ ইরানি যে কাল্পনিক, সেটা দুর্বল মুহূর্তে লেখক ব'লে ফেলেছেন—ইরানি হয়ে পড়েছে, তাঁরই কথায় তুর্কি, শক, চৈনিক আদির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক। তাই কড্রিংটন বা বাখ্‌হোফেরের নির্মম মতের প্রতিধ্বনি না-ক'রেই পাঠকদের জানাই যে, স্থরাওআর্দি অন্তত ভারতীয় প্রজ্ঞামাত্রিক শিল্প বোঝেননি বা দেখেননি। শিল্পজ্ঞান ও স্বাভাবিক রুচিরসবোধ তাঁর এ-বইয়ে শেষপর্যন্ত অনেকটা নঙর্থক।

এবং সেটা শুধু শিল্পে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় নির্দিষ্ট ব'লে উপাদেয় ও আমাদের পক্ষে মূল্যবান প্রবন্ধ দুটিতে: "On Theatrical Art"

ও "The Modern European Stage"-এও তার অর্ধসত্য মূলক প্রমাণ মিলবে। যথা, ভারতবর্ষে নাকি জীবনে ট্র্যাজেডি নেই, কারণ এখানে মানুষ ব্যক্তিসর্বস্ব নয় সামাজিক জীব। তাই নাকি এখানে নাট্যে ট্র্যাজেডি নেই, তাই নাকি শান্তিনিকেতন ও স্টার থিএটারে মর্মান্তিক ব্যর্থতা ও মৃত্যুর সঙ্গে জোটে অপ্রাসঙ্গিক গান ও নাচ। নাটকের জন্ম এ-দেশে নাকি ছায়ানাট্য বিদূষণ থেকে, বড়জোর না-হয় বৈদিক ক্রিয়াকলাপে বা রিটুআল্সে আর গ্রিসে নাকি ব্যক্তিসর্বস্ব ডায়োনিসিয় orgies থেকে, রিটুআল্সে নয়। বলা বাহুল্য, আরিস্টটেলি মত যাঁরা মানেন না, সেইসব গ্রিক পণ্ডিতেরাও এ-কথা ভ্রান্ত বলেন এবং orgies বা ভোগবিলাস স্বরাওআর্দির কল্পনাকে যত চঞ্চল করুক, ডায়োনিসিয় গ্রিক দেবলোকে আসন পাবার পরে তাঁর উৎসব যখন হয়ে উঠল রিটুআল্স্, তখনই তার থেকে নাটকের উৎপত্তি। আর ভারতীয় নাট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধ্যয়নেই জানা যায় যে জীবনমৃত্যুঘটিত ভারতীয় সাধারণ্যসূচক ঈশ্বর, জন্মান্তর, কর্ম প্রভৃতি তত্ত্বের কারণেই ভারতীয় নাটক ট্র্যাজিকোত্তর। সাংবাদিকেরও এটা জানা উচিত।

বোধহয় সংবাদপত্রের কথাটা অন্যায় হ'ল, কারণ তারও গুরুদায়িত্ব আছে, তার জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয়। বরং স্বরাওআর্দি সাহেবকে বিদগ্ধ ভদ্রলোক বলাই সঙ্গত, অতিসভ্য বিশ্বমানবিক সমাজের নাগরিক ভদ্রলোক। শুনেছি এই শ্রেণী নাকি আজকাল অনেক প্রাচীন জন্তুর মতোই লুপ্তপ্রায়। এদের শেষদলের আদ্যলীলা নাকি গত শতকের শেষভাগে, সপ্তম এডোআর্ডের যৌবনে। এই শ্রেণীর প্রতি কোন-কোন মার্ক্সিস্টদের বা মার্ক্সবিরোধীদের মতো আমার কোন বিরাগ নেই—যদি তাঁরা তাঁদের বৃন্দাবনেই আবদ্ধ থাকেন। এবং *Prefaces*-এর ভূমিকায় স্বরাওআর্দি যে তাই থাকেন তা জানা গেল। সত্যই উপভোগ্য তাঁর ধন্যবাদ ও বন্ধুকৃত্যের এই আবহ, যেখানে সত্যের চেয়ে চক্ষুলজ্জার খাতির বেশি। সমগ্র বইটির সার্থকতাই মনে হয় এই ভূমিকার জন্যে।

সুখের বিষয়, কবিতাতে স্বরাওআর্দি লক্ষ্মণের গণ্ডীতেই আবদ্ধ। ইংরেজি কবিতার বিরাট ও গভীর ঐতিহ্যের দরুণই হোক্ বা কবিতায় এদেশি অধ্যাপকোচিত পাণ্ডিত্যপ্রমাণ অনাবশ্যক ব'লেই হোক্, তাঁর কবিতার বইটি বিনীত ও সুখপাঠ্য। বইটির ছাপাও পাঠকের সহায় হয়, যেমন এই ছাপার পার্থক্যেই কেম্ব্রিজ ও কলিকাতা বিদ্যায়তনের তুলনাও সহজ হয়ে ওঠে।

ভারত-পথিক ইংরেজ কবি

১৯৪৪ সালে এলন লুইসের অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে কীড্রিখ রিজ লেখেন :

Going forward on detachment in Arakan,
Carrying the usual revolver loaded at the time,
He tripped and fell and the hammer struck a stone.
He died on a Sunday in March at eight o'clock.

শুনেছিলুম লুইস মিলিটারি ইণ্টেলিজেন্সের স্বভাববিরোধী কাজে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতেন। কর্নেল সাহেব এদিকে নাছোড়বান্দা। ফলে নাকি লুইস একদিন একটা খাদের ধারে দাঁড়ান, বোঝাই রিভলভারটা রগে লাগানো। তারপর তিনি নিচে প'ড়ে যান, পরে দেখা যায় কপালে গুলির পোড়া দাগ। ছুটিতে কলকাতার দিকে আসা আর হ'ল না। লুইসের স্বদেশবাসী ভর্নন ওআটকিনস্ তাঁর মৃত্যুতে একটি সনেট লেখেন :

He was astonished by the abundance of gold
Light. In the street a beggar stretched her hand
Dying. Then the shudder ran through him. Once
he had planned
To outdistance the sun in a chariot.
But how might he hold
That instant, those uncurbed horses, and mix with
the mould
Her liquid shadow near the lotus and timeless sand ?
A slighter man would have noticed the ripples expand
From the stark regenerate symbol. But to him that cold
Figure was real. Ah yes, he died in the green
Tree. What was it, then, pierced him, keen as a thorn.
And left him articulate, humble, unable to scorn
A single soul found on Earth ? O, had he seen

In a flash, all India laid like Antony's Queen,
Or seen the highest for which alone we are born ?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে-সব ইংরেজ কবি মারা যান, তাঁদের মধ্যে সিড্নি কীজ্ এবং এলন লুইসের কবিপ্রতিভা অবিসম্বাদী। লুইস আমাদের কাছে অনেক বেশি আপন, কারণ ভারতবর্ষ যে ক'জন ইংরেজ কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল কবিত্বের আবেগে, তাঁদের মধ্যে লুইস, শুধু যুদ্ধের সময়ে নয়, গোটা বৃটিশপর্বের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহ। যুদ্ধের সময়ে যাঁরা ভারতীয় দৃশ্যের তাড়না বোধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়ত আর কাব্যচর্চা করেননি, কেউ-কেউ অকালে মারাই গেছেন, যেমন ক্লাইভ ব্র্যানসন্। কিন্তু যে-সব কবিতা আমরা পেয়েছি, পড়েছি, তাতে: অনেকের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখি ভারতবর্ষের বর্তমান দৃশ্য এঁদের কতটা নাড়া দিয়েছিল। তাই এঁদের অনেকের কবিতা, অন্তত কিছু-কিছু কবিতার পঙ্ক্তি মনে থেকে যায়, এমনকি অনেক লেখার হয়ত নিছক কবিত্বগুণ বিশেষ স্মরণীয় না-হ'লেও। মার্টিন কর্কম্যানের ভাষায় বলা যায়:

You say this is not poetry :
You are right :
Upon this page
Is bloodred rage.

রাগ, অবজ্ঞা, লজ্জা, দুঃখ, অর্থাৎ এক কথায় মানবিক করুণা বা অনুকম্পা: এঁদের অনেকের মনে জেগেছিল সেই অনুকম্পা যাতে মানুষ মানুষকে একাত্মভাবে ভাবতে চায়; দায়িত্বের অংশীদার নিজেকেও মনে করে; জীবনের বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে। ওএনের বিখ্যাত যুদ্ধ ও করুণার কথা তাই মনে পড়ে, যদিও হয়ত এঁরা অনেকেই কবি হিসাবে ইংরেজি সাহিত্যে নাম লিখে গেলেন না। কিন্তু যুদ্ধের করুণা এ-ক্ষেত্রে আবার সাম্রাজ্যের নির্মমতার পাপে দু-তিন শতাব্দীব্যাপী সাক্ষাৎ ও প্রচ্ছন্ন এক দীর্ঘ যুদ্ধের শোষণের পাপে আরেক মৌলিক তীব্রতা পেয়েছিল। তাই জর্জ টেলরের মনে হয়েছিল:

I sit here in my uniform
Ignored because of what has been.

তাই এলন লুইসের রেজিমেণ্ট-সহকর্মী জন টর্নরের মনে হয়েছিল:

O Brother, it is strange that you and I should be so far
divided yet so near

প্রার্থনায় আকুতি জেগেছিল :

O God that I could break this iron shell
And give this dry and thirsty country rain.

একে সাম্রাজ্যের দীর্ঘকালের সিন্দবাদী বোঝা ঘাড়ে চেপে, তার উপরে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, আর রাজনৈতিক অশান্তি ; সবসুদ্ধ ভারতচিত্র হয়ে উঠেছিল সাধারণ সৎ ইংরেজ সৈনিকের কাছে যেমন করুণ তেমনি পীড়াদায়ক। এদিকে মেলামেশায় পাপক্ষয় প্রায় অসম্ভব। এ ভারতীয় দৃশ্যে নিজেকে সহজে মেলানো যায় নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের চেষ্টায় ; যৎসামান্য সেতুবন্ধের চেষ্টা করা যায়, যাকে বলা যায়, নিম্নশ্রেণীর নিচু জাতের লোকের সঙ্গে, কপাল ভালো হ'লে দূর থেকে চাষাভুষার সঙ্গে একটা আত্মীয়তাবোধে। এলন লুইসকে কারানৃজে গ্রামের মন্দিরের খবর দেয় ছাউনির ধাঙড়, সেই শ্রেণীর লোক যার মৃত্যুতে পল উইডোজ লেখেন :

Monotonous, yes. Degarding, perhaps. But still
He has, for what it's worth, a cast-iron defence,
Who passed his whole God-given existence,
Emptying the faeces of sahibs, until
Death eventually rewarded his diligence.
At least he can claim in Nirvana without pretence
That his life was dedicated to the Fundamental.

তাই প্রথাসিদ্ধ দর্শনীয় বিষয়ে এঁদের জাগে প্রতিক্রিয়ার বিতৃষ্ণা। রেজ লেভির তাজমহল দেখে মনে হয়েছিল, মোগল-বৈভবের ঐতিহাসিক ব্যঙ্গ :

Their lifetime's living glory built great halls,
In jewelled state enthroned to sit all-wise
Among the passive people—they who weighed
With agony and tears such graciousness.

রালফ্ ব্রুকের "চাঁদিনী রাতে তাজমহলে"র শেষ লাইনক'টি হয়ে পড়ে :

Children lay hungry in their mud-built huts
And war was waging over all the earth.
And rocket bombs fell on the ones we loved :
We came to see the wonder of the world.

তাজমহলের চেয়ে অনেক নিকট আবেদন করে অসহায় মৃত্যু, সাম্রাজ্যের সূর্যাস্তে দুর্ভিক্ষের মৃত্যু। ডগ্‌লাস গ্রের ভাষায়:

The outstretched hand
Of mute request
Condemns the soul
Who yet can rest.

এমনকি কাপ্তেনজাতীয় অফিসর ব্যক্তিদেরও হৃদয়বত্তা আত্মপ্রকাশ করে ভারতীয় দৃশ্যের প্রবল আবেদনে। রনাল্ড গিব্‌সন লেখেন "পুলিশ রিপোর্ট"-এ:

Reported : One o'clock ; Track Eight.
Woman, nearnaked, lying flat, Had been dead five hours.
Lightly she lay as a fallen cone
On the cold stone.

Item : One corpse, weight sixty pounds.
(Why will they trespass in private grounds ?)
Cause of death, hunger.
Back to the chawls here low life eddies
To wait for bodies.

Effects : One hobble-stick, value nil,
(It cannot pay for her funeral).
Guide, witness, mourner,
To one performer.

O ! the level paddy,
The water and the buffalo ;
See, she lies dead, my scarecrow
Guarding the lightgreen paddy.
On the blackstone.

অথবা রাল্‌ফ করির

Unconsidered bodies
Float down the tide

Of holy rivers ;
Down the Ganges
With hunched shoulders
Past Benares' steps ;
Godavery, Cauvery,
The River Kistna.
Today I found
Under a dam,
Dedicate to Allah,
Blessed by Vishnu ;
Serving provinces
With light and water,
A broken body
Stretched across a rock.
Coolies working near
Saw, but ignored it—
Nobody wanted it
Even for record.

ভারতবর্ষের মানুষ কবি সাহেবের মনকে টানে, চোখকে মুগ্ধ করে :

Wearing their single garment with an air
Of swaying gracefulness I once thought dead.

অবশ্য এঁদের অনেকের বিকাশের আর-কিছু খবর আমাদের জানা নেই ; অনেকের হয়ত ভারতীয় অভিজ্ঞতারও আর-কিছু পরিণতি হয়নি। তবে কারো-কারো মনের গভীরতর সংবাদ পাওয়া যায়। আরাকানে অকালে মৃত ক্লাইভ ব্র্যানসনের কবিতায় না-হোক্ পত্রাবলিতে এই ভারতীয় দর্শন আশ্চর্য বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে উজ্জ্বল। মার্ক্সবাদের সাহায্যে যে-সুবিধা অর্থাৎ জীবন বা ইতিহাস বোঝার ব্যাপারে যে-সাহায্য পাওয়া যায়, ব্র্যানসন সে-তত্ত্বের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। এবং অসুবিধাটুকু, অর্থাৎ বেশি দ্রুত বেশি সহজে সমস্যাটা ধ'রে ফেলার ব্যাপারটা তাঁর প্রকৃত শিল্পীস্বভাব পরিহার করেছিল। তবু কেন ব্র্যানসন কবিতায়, যেখানে কিছুই আর মনের অগোচর থাকে না সেই রচনার লোকে তেমন সিদ্ধিলাভ

করেননি ? তার কারণ বোধহয় এই যে, ব্র্যানসন মুখ্যত চিত্রকর ছিলেন, কবিতা তাঁর দ্বিতীয় কর্মবৃত্তি। অবশ্য কডওএলের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, তাঁর অসামান্য গদ্য তাঁর পদ্যের গতানুগতিকতা—ইংরেজি কাব্যের ঐতিহ্যের চাপেই বোধহয়—অধিকতর স্পষ্ট ক'রে তোলে। ব্র্যানসনের চিঠিতে প্রকাশিত তাঁর শিল্পীসত্তা যা তাঁর মার্ক্সবাদে শিক্ষিত মনকে ভারতীয় যন্ত্রণার ও করুণার পথে সংক্ষেপের সুযোগ দেয়নি। শিল্পীর সততায় সংক্ষেপের সুযোগ কম, যেমন ধরা যাক্ সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী লেখক সমরসেট্ মমের লেখায়। মমের ক্ষেত্রে ব্র্যানসনের মতো বুদ্ধি বা বিশ্বাসঘটিত কোন বিশেষ সুবিধা ছিল না, বেলগ্রেভিয়ার মানুষ তিনি, তবু ত এই বিখ্যাত প্রবীণ ও বিত্তবান্ ইংরেজ লেখকের ভারত ভ্রমণের শেষ হয় এইভাবে :

"ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার সময়ে লোকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কোন্ দৃশ্য আমাকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছে। আমিও প্রত্যাশিতভাবেই উত্তর দিলুম। কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল তাজমহল নয়, বারাণসীর ঘাট নয়, মাদুরার মন্দির বা ত্রিবাঙ্কুরের পর্বতমালা নয় ; আমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল চাষী ; ভীষণভাবে জীর্ণ-শীর্ণ ; তার নগ্নতা ঢাকবার জন্য শুধু এক টুকরা কানি তার নিজের চষা রৌদ্রদগ্ধ মাটির রঙ তার ঘর্মাক্ত শরীরের মধ্যভাগে জড়ানো, ভোরে হিমে কম্পমান, দুপুরের তাপে ঘর্মাক্ত চাষী, শুকনো ক্ষেতের উপরে যখন সূর্য লাল হয়ে অস্ত যায় তখনও যার ছুটি নেই, উপবাসী চাষী যে অবিশ্রাম খাটে, উত্তরে-দক্ষিণে-পূর্বে-পশ্চিমে সারা ভারতের বিরাট ভূখণ্ড ব্যেপে যে কেবল খেটে চলেছে, যেমন তার বাপ খাটত তেমনি বংশের পর বংশ খেটে চলেছে তিন হাজার বছর ধ'রে, সেই যখন আর্য আগন্তুকেরা এদেশে হানা দিল সেই কাল থেকে খেটে চলেছে সামান্য এক মুঠো খাদ্যের জন্য, যার একমাত্র আশা কোনমতে বেঁচে থাকা। এই দৃশ্যই ভারতবর্ষে আমার কাছে সবচেয়ে মর্মস্পর্শী লেগেছে।

ওএলিংটন নাকি বলেছিলেন যে ওঅটরলু-র যুদ্ধ জেতা হয়েছিল ইটনের খেলার মাঠে। মনে হয় ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকেরা বলবেন যে, ভারতবর্ষের সর্বনাশ হয়ে গেল ইংলণ্ডের যত পাব্লিক স্কুলে।"

শিল্পী বা সাহিত্যিক যদি সততায় সজাগ হন, তাঁর চোখ-কান-মন খোলা রাখাটাই যদি তাঁর শিল্পকর্মের অভ্যাস করতে পারেন, তাহ'লে ভারতে এলে সে-অভিজ্ঞতার প্রচণ্ডতা তাঁকে নাড়া দেবেই এবং ভারতীয় দৃশ্যের স্বরূপ তাঁর মননে, অন্তত চৈতন্যের আভাসে ইঙ্গিতে ধরা পড়বেই। গত যুদ্ধের ইংরেজ

কবিদের মধ্যে এলন লুইসের কাব্যপ্রতিভা ও মনন তাই ভারতে এসে তীব্রতায় কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। দুঃখের বিষয়, এই গভীরতা সংহতির কৈলাসকেন্দ্রে পৌঁছবার আগেই আরাকানে অকালে তার পূর্ণচ্ছেদ হয়। লুইসের ইচ্ছা ছিল কলকাতায় ছুটিতে আসার, বাংলা শিল্পসাহিত্যের সমাজে আলাপ পরিচয় করার।

লুইসের দ্বিতীয় এবং ভারতীয় কবিতার বই *Ha ! Ha ! Among the Trumpets*-এর ভূমিকা লিখেছেন বিখ্যাত কবি ও সমালোচক রবার্ট গ্রেভস্। উৎকৃষ্ট ভূমিকা এবং কিছুকাল আগে দেখলুম বৃদ্ধ অগ্রজ তাঁর ক্লার্ক বক্তৃতাবলিতে অনুজ লুইসকে একজন প্রধান কবি বলেছেন। গ্রেভসের ভাষায় আমি নিশ্চিন্ত হলুম, কারণ আমার একটা আশঙ্কা ছিল যে, হয়ত আমার ভারতীয়পনার মমত্বে এলন লুইসের কবিত্বে এতটা অভিভূত হয়েছি। গ্রেভসের মতো সুদূর ও কঠিন কবি-সমালোচকের সমর্থনে তাই লুইসের ভারতচিত্রের মূল্য যে তাঁর ইংরেজি কবি-বিকাশেরই সার্থকতার সমার্থক তা প্রমাণিত হ'ল।

লুইসের ভারতজিজ্ঞাসা সততানুসারে স্বভাবতই তার ব্যথাময় উদ্‌ভ্রান্তিতে আরম্ভ। সেই সময়ে তিনি ফৌজি আইন এড়িয়ে নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে লিখেছিলেন তাঁর প্রতিবাদ : "আমরা এদের দিয়েছি রুটি নয়, পাথর।" সেই পাথরের ব্যথার আবর্তে তাঁর মন সমানেই কাতর হয়েছিল। তাঁর চিঠিতে, কবিতায়, কম্‌লাবনের গল্পে এই সুরটিই সবচেয়ে তীব্র। অবশ্য ব্রানসনের মতো কার্যকারণের জ্ঞানে তাঁর যন্ত্রণার দিগ্‌দর্শন আসেনি সহজে। তাই ইঙ্গ-ভারতীয় রাষ্ট্রের শত্রুর কথা ভেবে লুইসের মনে হয় :

And though the State has enemies we know
The greater enmity within ourselves.

যদিচ আমরা

Kept from the dew and rust of Time.
Instinctive trnths and elemental love.

আর তার পরে স্বভাবতই মনে হয় :

Only aloneness, swinging slowly Down the cold orbit of
an older world
Than any they predicted in the schools
Stirs the cold forest with a starry wind,
And sudden as the flashing of a sword

The dream exalts the bowed and golden head
And time is swept with a great turbulence,
The old temptation to remould the world.

নৈঃসঙ্গ্যের এ-সান্ত্বনায় কিন্তু মানুষ নিয়েই হয় মুশকিল। বাঘের থাবা বা পাইড্ পএস্ড্ মাছরাঙার ইনস্টিংক্টিভ রাইট্নেস্ এই মেজাজে অনেক আপন লাগে। তবু ত লুইসের ভারতপথিক কবিমন আসন্ন অভিজ্ঞতার মর্যাদায় যাত্রার আরম্ভেই নিবিষ্ট হয়েছিল।

তারপরে বোম্বাই, ১৯৪২ সালের বোম্বাই, মারাঠা পাহাড়, কারাঞ্জে গ্রামের দেবমন্দির, সত্তার প্রতীক দেবমূর্তির আহ্বান, এদিকে অপরিসীম দারিদ্র্য আর বিরূপতার ছবি :

But the people are hard and hungry and have no love,
Diverse and alien. uncertain in their hate,
Hard stones flung out of creation's silent matrix,
And the Gods must wait.

এমনকি ভারতবর্ষের ক্লান্ত শুকনো মাটিও লুইসকে অস্থির করে গ্লানিতে। এদিকে লুইসের মনে হয় তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক, সব দিক থেকেই ভারতীয় জগতে বহিরাগত : "ভারতীয় সাহিত্য আমার প্রায় অজানা, বেদ-উপনিষদের এভরিম্যান অনুবাদ, টাগোর আর আনন্দ্ ছাড়া ভারতীয় সাহিত্য আমার পড় নেই। ভারতীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বও পাইনি। আমার সবচেয়ে সহজ যোগাযোগ আর স্বাস্থ্যের ও কাব্যের সবচেয়ে স্বাভাবিক উৎস হচ্ছে ভারতীয় চাষী…দুর্ভিক্ষে অনাহত এ অঞ্চলে মনে হয় চাষীই যা কিছু "সভ্য" ভারত হারিয়েছে, তারা জিম্মাদার।" এই প্রসঙ্গেই লুইস লেখেন আর্চরকে : "কিন্তু কী আনকোরা ঐশ্বর্য ভারতীয় লেখকদের হাতে রয়েছে—শুধু যদি মনের আবহাওয়াটা বিষয়বস্তুর স্বাধীন ও গভীর বিকাশের পক্ষে আরও অনুকূল হ'ত। এখানে কী যেন কোথায় বিগড়ে গিয়েছে আর সবকিছুই হয়ে পড়েছে দূষিত।" এই সূত্রেই লুইসের সাহিত্যজিজ্ঞাসা জাগে : "তোমার কি মনে হয় না যে ভারত এখন যে-অবস্থায় পৌঁছেছে সেখানে "পদ্ম" ব্যাপারটা য়ুরোপের গোলাপের মতোই (মালার্মের মতবাদ) মিথ্যা হয়ে গেছে? আর এখন চাই প্রখর স্বেদাক্ত বাস্তবতা, তা সে কি গ্রামে কি শহরে? কেন বলো ত এই বাস্তবতা আয়ত্তে আনা এত কঠিন? প্রতিদিন সূর্য ত এরই শিক্ষা দিচ্ছে।"

রেজিমেণ্ট সঙ্গী জন টর্নরের ভিন্ন মনেও প্রশ্ন প্রকাশ পেয়েছিল ধর্মপ্রাণ আরেক ভাষায় :

So we must know the land,
Know the lie of the land
The lie of the soil
The lie of the soul.

সত্তার প্রশ্নে, প্রেমের পরম মূল্যে জড়িয়ে যায় এই জিজ্ঞাসা। সত্তাবাদের মরমী কবি রিল্‌কের কথা লুইসের মনে হয় :

"রিলকে যদি জানতে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চেয়েছি
তাহ'লে হয়ত তুমি আমাকে বলতে :
মানবসমাজ বেছে নেয় তার বরপুত্রদের, যাদের কাছে সে সঁপে দেয়
হয়ত-বা কানাকড়ি, কিংবা জহর, নিদেন একটা বোধ
যাতে জানা যায় কার বিকাশ সম্ভব আর কিই-বা সর্বদা স'য়ে যেতে হয়
আর সে কী উত্তর যা জীবিতেরা দিতে পারে মৃতদের।

এ-সব মানুষদের মুখ দেখে চেনা যায় ;
অন্তত নজরে পড়ে তাদের অনুপস্থিতি ;
তাদের কখনও ঘটে না সুযোগ বা উপলক্ষ্যের অভাব,
তারা নির্বিষ্ট স্বভাব।"

আমাকে খুঁজতে হয় উপলক্ষ্য।
আর পরিশ্রম অবসাদ দৌরাত্ম্য বাধায়
জলস্থলব্যাপী চাকচিক্য, আত্মপ্রচারের ঘটা যত-কিছু
এই হিংস্র প্রতিযোগী দিনকাল দাবি করে।

তবু মাঝে-মাঝে, খুঁজে ফিরে প্রহরেরা অন্তরে নামায় ডানা
কোমল এণ্টিনা জোড়া পেতে রাখে আমার হৃদয়ে,
আর আমি ভুলে যাই সহস্র যোজন অভিযান
যেন-বা এবারে সৃষ্টি শুরু হ'ল প্রথম বিস্ময়ে।

তাকিয়ে দেখেছি আমি কোথা শুচি দিগন্তের কোণে
পৃথিবী উঠছে ঐ ধূসর বিরিক্ত শিখরে-শিখরে
যেন ধরে ভাঁজে-ভাঁজে ঝুরু-ঝুরু শূন্য মাটি হাতের আড়ালে
অথবা যেমন শিশু রঙিন জিনিস ধরে ছোটো-ছোটো মুঠির ভিতরে
পরম খুশিতে : আমি জানি অজানিত দেশ ঐ দুই পা বাড়ালে
নিকটেই এবং বাস্তব, যেন সদ্য প্রসবের ক্ষণে।

তারপরে হ'ল রোগ আর অস্থিরতা।

জ্বরের প্রদাহে আর ঘামে সারা সপ্তাহটা জেলে
প্রবল তৃষ্ণায় চাই নিস্তব্ধতা তুমি যা অর্জন করেছিলে,
আর জানো তোমাকেই ঈর্ষ্যা করি, যেন বা সে-উপহার
জন্মদিনে সৌভাগ্যবান্ যা পেয়ে যায়।
তখন ভেবেছি আমি তৎ যা সৎ তা না-খুঁজেই মেলে।

সমুদ্র এখন দূর, মালবাহী ভাড়াটে স্টীমার
আরেক সমুদ্রে অন্য আরোহীর দল নিয়ে যায়।
তাঁবুর ভিতরে আমি ব'সে আছি ভারতবর্ষের
আঁধারের মাঝে, আর লণ্ঠনের আলো কাঁপে দম্‌কা হাওয়ায়।

শৃগালেরা ফেউ ধরে আর আর্তনাদ করে নালায়-নালায়,
খড়পাতা মাটির শয্যায় স্থির ঘুমায় রাখাল,
আর আমি বুঝি বেশ কোন কিছু আসে-যায়নাকো
কোথায় কে থাকে কার ভাগ্যে কিবা ঘটবে যে কাল।

এদিকে বিষ্ণুর মূর্তি, গ্রামীণ শিল্পীর গড়া নিষ্ঠার নির্দেশে,
প'ড়ে আছে এক গাদা পাথরের পাশে, নির্বিকার
শুধু চায় সরলতা যেটা 'সে' ও আমি ভালোবেসে
খুঁজে পেয়েছিলাম, যা বুঝতে তুমিই বেশ ভালো
চূড়ান্ত চরম সেই পাওয়া, রিল্‌কে, কিন্তু আহা এ কী দূর দেশে

ভারতীয় অভিজ্ঞতার যন্ত্রণার মধ্যে লুইসের কবিসত্তা এবং প্রেম, তাঁর স্ত্রীর প্রবাসী স্মৃতি লুইসকে মননের কেন্দ্রচ্যুতি থেকে বাঁচায়। ফলে আমাদের হতভাগ্য জীবনের মূল রূপটি লুইসের মনে এবং কাব্যে আস্তে-আস্তে ব্যক্তিক পরিগ্রহণের পূর্ণতা পায়। স্টিভন স্পেণ্ডর দু-কথায় লুইসকে বাতিল করেছেন ছেঁদো কথার ব্যাপারি বা facile ব'লে। এক হিসাবে, অন্তত ভারতীয় পর্বে লুইসের ফ্যাসি-লিটিরই অভাব দেখা যায়। অবশ্য এই ভারতীয় অভিজ্ঞতা বুঝতে হ'লে মনে যে শুধু বুদ্ধি বিনয় থাকা দরকার, তা স্পেণ্ডরের মতো মেসিয়ানিক নাটকীয় ইংরেজের পক্ষে সহজলভ্য নয়। আর দু-চার সপ্তাহ বেড়িয়ে গেলেই ভারতীয় অভিজ্ঞতা যে আয়ত্তে আসে না, মার্কিন কবি কার্ল শাপিরোর ক্ষেত্রেও তা দেখা গেছে।

ভারতীয় জীবন রূপ ধ'রে লুইসের মনে এবং কাব্যে উভয়েই, বরঞ্চ বলা যায়, লুইসের কবিস্বভাবের গভীরতা এত সংহত যে, ব্যক্তিগত চিন্তায় চিঠিতে যদি-বা কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে, তা কাব্যে সমগ্রতার রসাভাস পায়। অনেক সময়ে দেখা যায়, শিল্পী বা কবি বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে বোঝেন অনেকটা, কিন্তু তাঁর শিল্প-চৈতন্যের গভীরতর রূপান্তরের বিশ্বে সে-বোঝা নানা কারণে রূপ পরিগ্রহ করে না। লুইসের ক্ষেত্রে তাঁর কাব্যের প্রতিশ্রুতিই মুখ্য, অর্থাৎ ভারতীয় জীবনের বাস্তবতা তাঁর সমগ্র স্বভাবের একাত্মীকরণের ব্যাপার, বহিরঙ্গ জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত আবিষ্কার নয়। এর একাত্মীকরণের প্রক্রিয়া স্বকীয় ব'লেই এর উপলব্ধি মন্থর, ক্রমিক, কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত, ব্যথিত কিছুটা নৈঃসঙ্গ্যবোধের উপর নির্ভরশীল।

তাই প্রাকৃতিক সত্যের সরলরেখায় মন নিশ্চিন্ত বোধ করে: 'ইস, আমার কলম থেকে কীরকম বাক্যই-না বেরোচ্ছে দেখো। আসলে আমি অনেক সোজা কথা বলতে চাই। কালো নদীর বালিতে বাঘের প্রকাণ্ড থাবার চাপ মাড়ালুম, তাকিয়ে রইলুম, তাজা দৃষ্টিতে, খুশি লাগল স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা জীবনের চিহ্ন দেখে। মনে হ'ল—কালিতে গভীর ঐ-ছাপগুলি যদি উঠে আসে আরকটি থাপ্পড়ে আমায় নীরব ক'রে দেয়—বাঃ—এবং অনেকদিন বাদে প্রথম একটা স্বতস্ফূর্ত চমক পেলুম কাব্যিক আবেগের এবং কাব্যিক পুরুষার্থের। কাব্য ত প্রেমের মতো, আর সৈনিকত্ব একটা বন্ধ্যা ব্যাপার।'

কারণ দেশের মানুষের সমাজে বিদেশি সৈনিকের বাধা অনেক:

'ভাষার বা লোকেদের রীতিনীতির জ্ঞান আমার এতই কম যে, আমি শুধুমাত্র শ্রদ্ধানম্র বিদেশি হিসাবে বিনীত চুপচাপ থাকতে পারি। এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বেজায় ক্লান্তিকর। আমার যদি সময় আর অনুশীলন থাকত, তবে

সেতুবন্ধের চেষ্টা করতুম। কাল একটা আরণ্যক নদীর উপরে নড়বড়ে দেশি সাঁকো পার হলুম, পায়ে ছিল একরকম সুকুমার অনুভব, সেটা সাঁকোর নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বেগ নয়, বরং সেটা গ্রাম্যজীবনের ধরনধারণের বিষয়ে একটা বোধ। এবং প্রাচীন ও অপূর্ব-সংকল্পিত এই জীবনযাত্রার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার থেকেই আমার কবিতা আজকাল এত দ্বিধান্বিত হয়। কয়েকটি কবিতা আপনাকে পাঠাচ্ছি, অনুরোধ এই-এই কোণ থেকে আমার বিচার করবেন।

লুইসের ভারতীয় কবিতার মিতবাক্ করুণায় হার্ডির কথা মনে পড়ে, সহানুভূতির এই দ্বিধা-বিনম্র স্বচ্ছ দৃষ্টি ক্লাইভ ব্রান্সনকে খুশি করত। ভারতবর্ষে রাত্রির অন্ধকারে য়ুরোপীয় অতীতও লুইসের কাছে ব্যাপকতর বিন্যাসের ফোকস্ পায়:

এখানে মাইনজাল নেই বিদীর্ণ গহ্বর
কাঁটাতারে ছিন্নভিন্ন পশ্চিমের নিসর্গের মতো
এ-প্রাচ্যের প্রাকৃতিক আরণ্যকদেশে
মানবিক যুদ্ধ অপসৃত।

এখানে তিনটি ভাগ অন্ধকার কুর্নিস জানায়
যেদিকে সিকির ভাগ জ্বলে সদা আলোক উৎসবে,
জীর্ণশীর্ণ গ্রামগুলি মুখ তোলে আর মৃদু হাসে
দিনে-দিনে বাড়ে চাঁদ কুমারসম্ভবে।

আমি সারা পৃথিবীকে পুড়িয়েছি প্রদাহে নির্বোধ,
ভূমিসাৎ করেছি ত সমুচ্চ স্বর্লোক,
প্রতিটি সহজ কাজে মিশিয়েছি লজ্জিতের ক্লেদ,
নিজের আবেগ ব'লে কিছু ছিলনাকো দুঃখ-সুখ।

ডুবেছি খেদের স্পন্দে জোয়ার-ভাঁটায়
সাগররাজের বালুশয্যায় অতলে
প্রত্যয়হীনের উপসাগরের লজ্জিত ধারায়
আসঙ্গ করেছি লাভ মৃতদের রক্তদন্ত কন্যাদের দলে,

যতদিনে তুমিই-না দীর্ঘশ্বাসে জাগালে আমায়

আমার মাথার রুদ্ধ অন্ধকারে ছড়ালে আরাম,
গান ক'রে গেলে আর থামলে না, যবে শেষটায়
তোমার হৃদয়ে আমি নৈবেদ্যের প্রসাদ পেলাম।

আমরা দিয়েছি ফেলে মরণকে তিক্ত দুর্বিষহ
যার দুই হাতে বাঁধা জীবনের ক্ষীণকটি কায়,
এবং একটি শ্বাসে করেছি সংগ্রহ
যা-কিছুর আদি-অন্তে পুরুষ-ও-জায়া।

তাই ত যদিও ভ্রান্তি বেড়ে চলে যন্ত্রণার ভারে
এবং যৌবন প'ড়ে থাকে লাস্ তোরণের পাশে
এবং সুন্দর বহু দেহ শক্ত হ'য়ে ওঠে মাটির তুষারে
এবং প্রাচীন নিষ্ঠা থেকে নবতর ঘৃণা আসে,

তবুও সময় থাকে পূর্বাকাশে অচল অটল
দীঘিতে চাঁদের আলো স্থির থাকে আর মানুষের
যন্ত্রণা আরাম আনে নীড়ে শুষ্ক ঠোঁটে
এবং তোমার শান্ত শুভ্র মুখ আমি দেখি ফের।

বিচিত্র কম্পন জাগে পশুর হৃদয়ে
কত অজানিত বিশ্বে মৃত্যুতে সে লোটে ;
তোমার হাতের মধ্যে, তোমার শান্তিতে আমি রই,
আর দেখি এই শেষ জ্যোতির্ময় বিশ্ব জেগে ওঠে ॥

আমাদের দুর্ভাগ্য যে লুইসের বিকাশ সম্ভাবনার পর্বেই শেষ হয়ে গেল। ১৯৪৪-এর মার্চে মৃত্যুর সংবাদ বেরোল ; গ্রেভস বলেছেন : পুরানো কাগজ দেখো, কোথাও পাবে না এই প্রাথমিক ঘোষণাটুকু : এলন লুইস মহান কবিতা লিখেছেন। গ্রেভসের মতে লুইসের শক্তি নিহিত ছিল লুইসের কাব্যিক সততায়। বিয়াল্লিশে ভারতযাত্রা এই সততার পরিণতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ গ্রেভসের ভাষায় ভারতবর্ষ এমন এক দেশ, যেখানে সুসময়েও প্রেমের পরীক্ষা হয় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে। এবং লুইস আসেন ভারতের দুঃসময়ে। যদিও স্বভাবের সততা

তিনি রক্ষা করলেন, যন্ত্রণাভোগ করতে হ'ল বেশ : My insides are haggard। গ্রেভসকে লুইস লেখেন : ভারতের তুলনায় ইংল্যাণ্ড ত 'সহজ'—Easier to corrupt, and easier to improve.

নিজের কাব্যসাধনার অসম্পূর্ণতার বোধ নিয়েই লুইস জীবনান্ত করলেন, কিন্তু সেই ক্ষোভের মর্মে রইল একটা বলিষ্ঠতা। I can't reach it—do you see how a poem is made or fails ? By perpetual trying, by closer pointing, by seeking and not finding and still seeking, by a robustness in the core of sadness. ক্ষোভের মর্মস্থলে, বিষাদের অন্তস্তলে এই যে অপরাজেয় মন, যার বলে অন্বেষণ হার মানে না, ভারতবর্ষে তার কথা এই কবি বলতে পেরেছেন। লুইস তাই আমাদের আত্মীয়, ইংরেজি কাব্যে আমাদের দরদী শহীদ।

ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ ও এজরা পাউণ্ড

রবীন্দ্রনাথ খুশিতে হেসে বলেছিলেন, এজ্‌রা পাউণ্ড, সে আমার ভারি ভক্ত ছিল, একেবারে পাগল, প্রায়ই আসত, সোফায় বসত না, পায়ের কাছে বসত, লিখেও-ছিল আমার বিষয়ে।

কল্পনা করা যায়, লণ্ডনের বাসায় একান্ন বছরের প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ, পায়ের কাছে মাঝ-পশ্চিমা আমেরিকান উদ্দাম কবি ছাব্বিশ বছরের এজরা। সরোজিনী নাইডুর গল্প মনে পড়ে, হায়দ্রাবাদে নিজামপ্রাসাদে সন্ধ্যা ছটায় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, পায়ের কাছে ফরাসি-শিক্ষিত তুর্কি সুলতান-কন্যা নিজামের পুত্রবধূ কবির দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থেকে-থেকে বলছেন, ইউ আর বিউটিফুল। কয়েকবার এ-কথা শোনার পর পশ্চিমগামী সূর্যের দিকে ধ্যানমগ্ন কবি মুখ নামিয়ে বললেন, ইউ টু আর বিউটিফুল!

এজ্‌রা পাউণ্ড অবশ্য তাঁর প্রথম উচ্ছ্বাস অচিরেই কাটিয়ে ওঠেন, যেমন ওঠেন উইলিঅম বট্‌লর ইয়েটস্‌। কারণ প্রায় একই। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনায় ক্রমেই ভাবের দিকে, আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক পড়ছিল; বাংলায় তাঁর যে অসামান্য কবিপ্রতিভা বিচিত্ররূপে নানা কবিতায় কাব্যশরীর পায়, সেই কাব্যশরীর এইসব ইংরেজি ভাবানুবাদে বড়োই অশরীরী হয়ে ওঠে। ইংরেজ পাঠকরা তাই অল্পকালের মধ্যেই পুনর্বিচার করতে আরম্ভ করেন। পাউণ্ডের ১৯১২-এর ভক্তি শীঘ্রই ঔদাসীন্যে দাঁড়ায়। তবু বলতে হবে ইয়েট্‌সের ঘোর অবজ্ঞার রেশ বোধহয় পাউণ্ডে পাওয়া যায় না। ১৯১২ সালে পাউণ্ড হ্যারিএট মনরোকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠান, লেখেন ভেরি গ্রেট বেঙ্গলি পোএট, রবীন্দ্রনাথ টাগোর অনুবাদকে বলেন ভেরি বিউটিফুল ইংলিশ প্রোস্‌, উইথ মাস্টারি অফ কেডেন্স।

১৯১৩ সালের জানুঅরিতেই পাউণ্ড চক্ষুষ্মান্ বা সাবালক হয়ে উঠেছেন। তখন রাজা পঞ্চম জর্জের জন্য রবীন্দ্রনাথ কিরকমভাবে গান লেখেন, ভারতীয় ছাত্র কর্তৃক তার কাহিনী পাউণ্ড মহাকৌতুকে স্বকীয় পিতৃদেবকে লিখছেন। এপ্রিল মাসের চিঠিতে পাউণ্ড কয়েকটি কথা লেখেন, যার সমালোচনা মূল্য অনেক বিস্তৃত প্রবন্ধের চেয়ে বেশি। সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় এমনি একটি প্রবন্ধ পড়বার

সৌভাগ্য হ'ল, তাতে পণ্ডিতপ্রবর শিবনারায়ণ রায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের পুনর্বিচার চেষ্টায় যে-অন্যায় করেছেন, সে-বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। শুধু আমাদের অনেক সময়ে অসতর্কতার বশে কীরকম ভুল হয়, তার একটি উদাহরণ দিই। শিবনারায়ণবাবু ভুলে গেছেন যে রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে জর্মান সুরকারদের তুলনাই হয় না, কারণ তাঁরা কথা ও সুরে অর্ধনারীশ্বর রবীন্দ্র-গীতির রচয়িতা নন। পাউণ্ডের এই সমালোচনাটুকু তার স্বকীয়তার জন্য মূল ইংরেজিতেই উধৃত করি :

God knows I didn't ask for the job of correcting Tagore. He asked me to. Also it will be very difficult for his defenders in London if he takes to printing anything except his best work. As a religious teacher he his super-flous. We've got Lao Tse. And his (Tagore's) philosophy hasn't much in it for a man who has 'felt the pangs' or been pestered with Western civilisation. I don't mean quite that, but he isn't either Villon or Leopardi, and the modern demands just a dash of their insight. So long as he sticks to poetry he can be defended on stylistic grounds against those who disagree with his content. And there's no use his repeating the Vedas and other stuff that has been translated. In his original Bengali he has the novelty of rime and rhythum and of expression, but in a prose translation it is just mere theosophy', small of course if he wants to set a lower level than that which I am trying to set in my translations from Kabir, I can't help it. It's his own affair.

১৯১৭ সালে পাউণ্ড লেখেন রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার রহস্য বিষয়ে একটি মজার চিঠি। এলেক এরনসনের 'পশ্চিমার চোখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' বই যাঁদের পড়া তাঁরা অবশ্য এই রহস্যের কাহিনী জানেন।

Tagore got the Nobel Prize because, after the cleverest boom of our day, after the fiat of the omnipotent literature of distinction, he lapsed into religion and optimism and was boomed by the pious non-conformists. Also because it get the Swedish Academy out of the difficulty of deciding between

European writers whose claims appeared to conflict. (Sic.) Hardy or Henry James ?

Tagore obviously was unique in the known modern Orient. And then, the right people suggested him. And Sweden is Sweden. It was also a damn good smack for the British Academic Committee, who had turned down Tagore (on account of his biscuit complextion) and who elected in his stead to their August corpse, Alice Meynell and Dean Inge.

Therefore his Nobel Prize gave pleasure unto the elect.

১৯৩৯ সালের এক চিঠিতে পাউণ্ডের উদ্গার পাওয়া যায় ভারতবর্ষ বিষয়ে, তার শেষে আসে এই বাক্যটি Rabi himself poifickly hopless re statal sense etc.

হয়ত-বা ভক্তির জালে পড়লে পরে মানুষ এইভাবে নিজেকে বার করবার চেষ্টা করে ; ভাবে না-হ'লে সে 'লায়েক' বা সাবালক হ'তে পারছে না। কিন্তু ১৯১২-র শেষে পাউণ্ডের প্রবন্ধটি তৎসত্ত্বেও বিস্ময়কর লাগে, তাঁর চোখ-কানের প্রখরতার প্রমাণ হিসাবে। তাছাড়া পাউণ্ড বা ইয়েটসের মতো তীক্ষ্ণধী কবি-সমালোচকদের কথা আমাদের অনেক-কিছু বিষয়ে ভাবাতে পারে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ইংরেজি চেহারায় রবীন্দ্রনাথের কীর্তির অসম্পূর্ণতা, তাঁর কবিত্বশক্তির প্রবলতা এবং তাঁর চারিত্র্য এই অনুবাদে প্রায় চাপা প'ড়ে আছে, আধ্যাত্মিক আবেদনের বিষয়ে একটা সাময়িক ধারণার জের ইংরেজিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকাশকে ব্যাহত করে। কর্তৃপক্ষের উচিত রবীন্দ্র-রচনার নূতন মানের অনুবাদের ব্যবস্থা করা।

পাউণ্ডের প্রবন্ধটিতে তিনি লেখেন : 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতাবলির প্রকাশ আমার মতে একটা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। জানি না, পাঠকদের এ-কথা বোঝাতে পারব কিনা। আমার কথার প্রমাণ অবশ্য কবিতাগুলিই। এ-কবিতা পড়তে হবে আস্তে-আস্তে, নিস্তব্ধ শান্তিতে চেঁচিয়ে। কারণ এর ইংরেজি অনুবাদ লিখেছেন একজন বিরাট সংগীতকার, একজন ওস্তাদ শিল্পী যাঁর কারবার আমাদের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম সুকুমার সংগীত নিয়ে।

'এক মাস হয়ে গেল, শ্রীযুক্ত ইয়েটসের ঘরে গিয়ে দেখলুম তাঁকে মহা উত্তেজিত এক মহাকবির আবির্ভাবে, আমাদের সকলের চেয়ে মহত্তর এক কবি।

'কোথায় আরম্ভ করব ভাবছি। বাংলাদেশে পাঁচ কোটি লোক। বাইরে থেকে মনে হয় রেলগাড়িতে আর গ্রামোফোনে এ-জাতটা বুঝি ডুবেছে। কিন্তু এর তলায়-তলায় আছে একটা সংস্কৃতি, যার সঙ্গে তুলনীয় বিংশ শতাব্দীর প্রভঁস্।

'ঠাকুরমশায় এদের মহাকবি মহাসংগীতারও বটে। ইনি এদের জাতীয় সংগীত দিয়েছেন, মার্সেএস্-এর সঙ্গে তুলনীয় প্রাচ্যশোভন গান। তাঁর সোনার বাংলা আমি শুনেছি। তার সুর সম্পূর্ণ প্রাচ্য, কিন্তু অদ্ভুত তার জাদু, ভিড়কে মাতাবার মতো। এ-গানটা জাতে সীমাবদ্ধ, ঠুংরী জাতের, ব্যক্তিগত কিন্তু কর্মোদ্দীপনায় পূর্ণ।

'প্রসঙ্গত ও-কথাটা বললুম। এতে এই প্রমাণ হয় যে, দান্তে-কথিত তিনটি মহাকাব্যের বিষয়ই রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে: প্রেম, জাতীয়তা বা যুদ্ধ, আর আত্মিক মাহাত্ম্য।

'মধ্যযুগের আরেকটা গুণও লক্ষ করা যায় এখানে। ঠাকুরমশায় বহু লোককে তাঁর গান শেখান, তাঁরা জঁগলোরের মতো বাংলাময় সেই গান ছড়িয়ে বেড়ায়। ক্রবাদুরদের মতো তিনিও গর্ব করতে পারেন, এ-সব আমার রচনা, কথায় ও সুরে।

'এ-কবিতার বাংলা কাব্যরূপ খানিকটা প্রভঁসাল কানৎসোনি আর প্লেই-আড্‌দের গাথা, রাউণ্ডেল ইত্যাদির মাঝামাঝি। মিলের ব্যবহার অন্যরকম, বাংলাতে চার অক্ষর বা স্বরবৃত্তের মিল পাওয়া যায়, যা লিওনিন বা মধ্যযুগের অন্তমধ্যমিলান্ত ষট্‌মাত্রিক শ্লোকের চেয়েও সূক্ষ্ম ও কঠিন।

'বাংলা ছন্দবৃত্ত পশ্চিমের মধ্যে মুক্তছন্দের সবচেয়ে আধুনিক বিকাশের সঙ্গেই তুলনীয়। ভাষাটাও সংস্কৃতজ। এর আওয়াজ আমার কানে শুদ্ধ গ্রিক ভাষার সবচেয়ে কাছাকাছি লাগে।'

'বাংলাভাষা বিভক্তিমূলক, তাই এতে মিল সহজ। গ্রিক বা জর্মানের মতো বাংলাতে সমাস বা সন্ধি চলে। ঠাকুরমশায় বললেন, তিনি এর ব্যবহার প্রায় সব কবিতাতেই করেন।

'এ-সব দিয়ে দেখাতে চাই যে, বাংলাভাষা কবিতার সহায়, এর তারল্য এবং ব্যাকরণের নমনীয়তায় শব্দে সার্থক তীক্ষ্ণতা আনা যায়। এ-ভাষায় কথার পারম্পর্য এদিক-ওদিক করা যায়, ইংরেজির মতো অর্থের গোলমাল না-ক'রে।

'ঠিক মানেটা, ধারালো সার্থকতা এতে সহজ, কারণ প্রত্যেক বস্তুরই প্রায়

স্বতন্ত্র নামশব্দ, পাওয়া যায়। উদাহরণত ইংরেজিতে আমরা বলি স্কার্ফ, ঠাকুর-মশায়ের গান শোনাতে-শোনাতে অনুবাদে কথাটা এসেছিল, কিন্তু বাংলায় স্কার্ফ এক বস্তু নয়, যথা অঞ্চল ও উত্তরী বা কোঁচার খুঁট।

'এ-বইয়ের শ'খানেক কবিতা সবই প্রায় গান। সুর আর কথা এখানে অঙ্গাঙ্গী এবং প্রাচ্যের সংগীত এ-বিষয়ে বিশেষ শোভন মনে হয়। প্রথমত এখানে হারমনির হাঙ্গাম নেই। দ্বিতীয়ত, গ্রিক মোড্‌স্‌-এর মতো রাগরাগিণীর ব্যাপারটাও সাহায্য করে। কারণ এই রাগিণীতে ভাবানুষঙ্গ জাগে, ফলে বাঙালি শ্রোতা প্রথম চরণ শুনেই কবিতার স্থানকালপাত্র বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পারে।

'রাগরাগিণীর এই সঙ্গতি আমার ত মনে হয় ভারি কার্যকরী। অন্তত এতে কবিতা বা গানে একটা ধর্মাচারমূলক প্রথাসিদ্ধ শক্তি আসে এবং একটা বিশেষ কবিতা বা গান একটা সয়ম্ভু খাপছাড়া ব্যাপারও থাকে না, গানের ও জীবনের একটি সর্বগ্রাহী সম্পূর্ণতার অংশমাত্র হয়। তাই এ-গানে মানুষ ব্যক্তিত্বের গণ্ডি থেকে সহজে মুক্তি পেয়ে কালস্রোতে, বিশ্বপ্রকৃতির সম্পূর্ণতায়, যথাযথ বিধিবদ্ধ শান্তিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

'লেখকমশায় বলেন জানি না এতে আরো-কিছু আছে কিনা, আমাদের কাছে এর মূল্য সমধিক, কিন্তু সে হয়ত অনুষঙ্গে। আগের সন্ধ্যায় তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এই অনুবাদে কী পাও? য়ুরোপীয়কে টানবে ব'লে কখনও ভাবিনি।

'আশ্চর্যই বা কি যে ঠাকুরমশায় বিদেশি ভাষায় গদ্যে তাঁর কবিতায় কী থাকে তাই ভাবেন, মূলের আঙ্গিক সৌন্দর্য, সুর, ছন্দ, মিলের সূক্ষ্ম মিশ্রণ এ-সবই ত অনুবাদে বাদ পড়েছে।

'আমি বোধহয় তাঁর দিক থেকে সময় নষ্ট করেছি, কারণ আমি তাঁর কবি-মানস ও বক্তব্য ছেড়ে তাঁর শিল্প ও প্রকাশভঙ্গি নিয়েই আলোচনা আরম্ভ করলুম।

'তাঁর ভাষার যাথার্থ্য রইল। শুধু চোখে পড়লে তাঁর ইংরেজি গদ্যের গতি এড়িয়ে যাবে। চেঁচিয়ে, একটু দ্বিধান্বিত চালে পড়লেই কিন্তু ছন্দের সুষমা ও সৌকুমার্য স্পষ্ট হয়। এই ছন্দোসৌভাগ্য আমার বিশ্বাস চৈতন্যের গভীরে ঘটেছে, আকস্মিক নয়। দীর্ঘকাল শব্দসুরায়ণের পরে কোন লোক এরকম গদ্যছন্দ-ব্যবহার করতে পারেন। নিজের অজ্ঞাতসারেও তিনি শব্দের বেসুরো যোজনা করতে পারেন না।

'তারপর যেটা সবচেয়ে সহজে চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে মধ্যে-মধ্যে জলজলে কথা পাওয়া যায়,—কখনও বা তাতে হেলেনিক শুদ্ধি, কখনও বা দ'গুরমোঁ বা বদলেয়রের চরম নাগরিক চাল।

'কিন্তু এর ভিতরে আর একে ঘিরে আছে একটা শান্ত স্থিরতা। হঠাৎ আমরা খুঁজে পেলুম আমাদের নূতন গ্রিস। রেনেসাঁসের সময়ে য়ুরোপে যেমন সামঞ্জস্যবোধ ফিরে এল, তেমনি আমার মনে হয় যে আজকের এই যন্ত্রের বিষম ঝঞ্ঝায় আমাদের মধ্যে এল এই একটা সুস্থ ধীরতা।

'অডিসির নীতি—সুস্থ শরীরে সুস্থ মন, মধ্যযুগের বিড়ম্বিত চিন্তাধারাকে এর চেয়ে বেশি মুক্ত করতে পারেনি।

'এ-সব কথা হঠাৎ বলছিনে, আবেগের মাথায় বা একটা বড়ো কথার ঝোঁকে এ-বিষয়ে মাসাধিক কাল ভেবেছি।

'এখনও ঠাকুরমশায়ের অননূদিত অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে বলবার সময় আসেনি। যে-বইটি সামনে রয়েছে, তার সঙ্গে তুলনায় আমার জানা একটি বই-ই শুধু মনে পড়ছে, দান্তের 'পারাডিসো'।

'Ecco chi crescera linostri amori (ঐ দেখ! আমাদের প্রেমগুলি যিনি বিকশিত করেন) দান্তে চতুর্থ (?) স্বর্গে ঢুকে সহস্র আত্মার এই গান শোনেন। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের কণ্ঠ অন্যরকম, তার অতীন্দ্রিয় ভক্তি ততটা আবেগময় নয়, বরং শান্ত। এরকম কথা—Poiche fur gioconde della faccia di dio (যেহেতু ঈশ্বরের মুখশ্রীতে এদের আনন্দ) প্রাচ্যের স্তব্ধতা ভেঙে দেবে ব'লেই মনে হয়।

'বোধহয় স্বর্গের মৌমাছিরা গোলাপের মধ্যেই অন্তর্স্ফুট, এই দিব্যচিত্রই রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের চাবি।

'তাঁর মধ্যে প্রকৃতির স্তব্ধতা সমাহিত। কবিতাগুলি মানসিক জলঝড় বা আগুনে তৈরি নয় ব'লে লাগে, মনে হয় তাঁর স্বাভাবিক মনের ধারণাটাই এইরকম। প্রকৃতিতে তিনি মিল পেয়েছেন, সেখানে তাঁর কাছে কোন বৈষম্য বা বিরোধ নেই। প্রতীচ্যরীতির সঙ্গে এইখানে তাঁর দারুণ তফাৎ, 'মহৎ নাটক' আমরা লিখতে পারি মানুষ আর প্রকৃতির দ্বন্দ্বের বিষয়েই। হেলেনিক ধারণা যে, মানুষ দেবতাদের হাতের পুতুলমাত্র, এবং কি দেবতা কি মানুষ উভয়েই ভাগ্যের ক্রীতদাস, এ-ধারণা এই প্রাচ্য কবিতার বিপরীত।

'ছ-মাস আগে আমি রেনেসাঁসের মানবধর্ম প্রসঙ্গে লিখেছিলুম মানুষ মানুষ

নিয়েই জড়িত, ভুলে যায় সমগ্রকে, দেশকালসন্ততিকে। ফলে পাই প্রথমে নাট্যের যুগ, তারপরে গদ্যের।

'এ-জাতের মানবধর্ম আজ স্রোত হারিয়ে শুকনো, মনে হয় বাংলা থেকে বুঝি তার সংশোধন ও সুসমীকরণ এল।

'প্রমাণ করতে পারব না। মহৎ সৃষ্টির সমালোচনা প্রমাণ করার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিতেই সার্থক।

আজি শ্রাবণ-ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে॥

'একশোটার একটা গান এটি, ইংরেজিতে এর বঁদেল রূপও নেই, উন্মনা, সুকুমার সুরও নেই। ছন্দোবৃত্তের কথাটা ভাবো, প্রথম শব্দে গলার তীব্রতা, তারপরে তিন-চারটি স্বরে তারই রেশ টানা, ট্রকেইকের চেয়ে দীর্ঘ ছন্দোবৃত্তে।

'উধৃতির জন্যে যে-কবিতাই তুলি, পরেরটা প'ড়ে ভাবি বুঝি ভুল করলুম। হয়ত সরল স্বীকারোক্তি সবচেয়ে ভালো সমালোচনা। ঠাকুরমশায়ের ব্যক্তি-স্বরূপের সঙ্গে তাঁর রচনা মেশাতে চাই না, কিন্তু এক্ষেত্রে দুই-এর সম্পর্ক এত নিকট যে, আমি দুটো কথা বলব কিছু ব্যাখ্যা না-ক'রেই সোজাসুজি।

'ঠাকুরমশায়ের কাছ থেকে যখন আসি, তখন নিজেকে মনে হয় যেন একটা বর্বর, পরনে জানোয়ারের ছাল, হাতে পাথরের অস্ত্র, মোটা ভারি কাঁটাওয়ালা অস্ত্র।

'একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে, হয়ত কী রকম স্বস্তি তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে আছে। ঠাকুরমশায় সোফায় ব'সে, বাংলা থেকে প'ড়ে আমায় শোনাচ্ছেন, এমন সময় বাড়ির কর্ত্রীর তিন বছরের মেয়ে ঘরে ঢুকে ভীষণ হাসতে আর গোলমাল করতে লাগল। কবি তক্ষুনি হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, ঠিক শিশুটির সুরেই।

'তিনি কি হঠাৎ শিশুর উল্লাসে তার সঙ্গে এক হয়ে গেলেন? না এ কি প্রাচ্য ভদ্রতা? অথবা এটা কি সোজাসুজি স্বীকার, যে বিশ্বের সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনা আর শিশুর স্ফূর্তি একই ছকে পড়ে?

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।

'এ-কবিতাগুলিকে বৌদ্ধভাবাপন্ন ভাবলে, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমাদের চলতি ধারণা বদ্‌লে যাবে। কারণ এতে সেই তথাকথিত নেতিবাদ ত নেই, আছে গ্রহণের আলোক।...

'সংক্ষেপে এ-কবিতাগুলিতে আমি পাই একটা চরম শুভবুদ্ধি, যাতে ক'রে আমাদের পাশ্চাত্য জীবনের বিশৃঙ্খলায়, শহরের গোলমালে, কলে তৈরি সাহিত্যে, বিজ্ঞাপনের ঘূর্ণিতে যে-সব জিনিস চাপা প'ড়ে যায়, তাই আবার চোখে পড়ে।

যদি কোন দোষ থাকে, তাহ'লে কবিতাগুলির সাধুভাবই হয়ত জনসাধারণের পক্ষে দোষ ব'লে গণ্য হবে। আমি অবশ্য তা মানি না। আমার ত করুণাই জাগে, যখন দেখি কোন পাঠক বোঝে না যে, এ-সাধুতা বা ভক্তি দান্তের মতো কবিত্বজ ভক্তি এবং সুন্দর।

সোনালি রুপালি সবুজে সুনীল
সে এমন মায়া কেমনে বুনিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধা-সরসে।

যেদিন ফুটল কমল কিছু জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।

আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে-চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবনসমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।

এই প্রশান্তিই দেখি মৃত্যুর কবিতাগুলিতে।

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।

অনেকদিন ছিলাম প্রতিবেশী
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।

'সুইনবর্নের কবিতার আবহাওয়া অবশ্য ঠাকুরের কবিতা থেকে একেবারে আলাদা—ঠাকুরমশায় সত্যই বলতে পারেন—

আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলংকার;
তোমার কাছে রাখেনি আর সাজের অহংকার।

'নিছক স্বার্থে আমি 'গীতাঞ্জলি'র সমাদর চাই। ঠাকুরমশায়ের এছাড়াও

অনেক রচনা আছে, নাটক, প্রেমের কবিতা ইত্যাদি। 'শিশু'র কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন, কবে বেরোবে আগ্রহে ভাবছি।

'সমালোচনায় যখন কূল পাওয়া যায় না, তখন সমালোচ্য রচনার মূল্য সম্বন্ধে নিজেকেই ব্যক্তিগতভাবে জমা রাখতে হয়।

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই॥

'এ-কথা ঠাকুরমশায় নিজের লেখার বিষয়ে খুবই বলতে পারেন, সব মহৎ শিল্পেই দূরের লোক বন্ধুতায় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। পরস্পরের শ্রদ্ধা এতে বাড়ে, অর্থবিজ্ঞানের শান্তি-প্রস্তাবের চেয়ে অনেক বেশি।

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতা দিয়ে স্বদেশসেবার চরম করলেন। তিনি বাংলা দেশের পররাষ্ট্র বিভাগের শ্রেষ্ঠ দূত।

'তাঁর কবিতার সৌন্দর্য স্পষ্টতই প্রাচ্যের, কিন্তু সংহত কঠিন। অধিকাংশ দক্ষিণ প্রাচ্যের শিল্পের অতিপ্রাচুর্য এতে নেই, আমাদের মন এতে ব্যাহত হয় না। সর্বোপরি, তাঁর রচনা শান্ত ধীর রৌদ্রদীপ্ত, বসন্তময়।···একটি কবিতা উদ্ধৃত ক'রে আমার কাজ শেষ, এর পরে বলব বইটি পড়তে।

গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।'

ডেভিড হর্বার্ট লরেন্স

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রমসাধ্য সৌখীনতা লরেন্সের পত্রাবলিতে একেবারেই পাওয়া যায় না। লরেন্সের রচনায় যে-প্রতিভার আয়াসহীনতায় মুগ্ধ হই, সেই সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য পাই এই পত্রাবলির অনেকগুলিতেই। লরেন্স মারা যাবার পরে বই দুটি বেরোয়। প্রবন্ধটিতে মানবজীবন ও যীশু সম্বন্ধে যে মনোযোগ ছিল, তা নিছক সাহিত্যিক মূর্তি পেয়েছিল *The Man Who Died*-এ। *Apocalypse* তারই আরও স্পষ্ট ও যুক্তিপ্রবণ মতামতের প্রচার। মরণাহত লরেন্সের এই শয্যাশায়ী রচনার অসংশোধিত আশ্চর্য গদ্য ভূমিকা-লেখক অল্ডিংটনের মতো সবাইকে অভিভূত করে। ছোটো-ছোটো স্পষ্ট বাক্য জুড়ে যে কী ছন্দ আনা যায় এবং কী যুক্তির অতীত কাব্যলোক সৃষ্টি করা যায়, তা দেশছাড়া নির্যাতিত রোগীর এ শেষ রহস্যোদ্ঘাটনেও পাওয়া যায়। যে-প্রতিভা তাঁর সব রচনাতেই অতীতে আমাদের কমবেশি অভিভূত করেছে, সেই প্রাণশক্তির আভাস এ দুটি বইয়েও ক্ষণে-ক্ষণে মেলে—যদিচ চিঠিগুলি পেশাদার পত্রলেখকের নয় এবং প্রবন্ধটি টীকার সংযত রীতিতেই লেখা।

এ দুটি বই প'ড়ে আবার মনে হ'ল যে লরেন্স সম্বন্ধে মুখ্য বিবেচ্য হচ্ছে এই প্রতিভাই, এই অসাধারণ প্রাণশক্তি ও রূপদক্ষতাই। লরেন্স ছিলেন ব্লেকের জাতের। পৃথিবীর ব্লেকেরা, তলস্তয়েরা, থরো-রা আর যাই করুন, সাধারণ বুদ্ধির, সমাজশোভন স্বাস্থ্যের ধার ধারেন না। তাঁদের লেখার শুধু যে সাহিত্যিক লাভ হয়, তা নয়। লরেন্স বা ব্লেকের মস্তিষ্কাতীত-বাদ আমাদের অনেকেরই জীবনবোধ ধারালো করতে পারে। কিন্তু তাঁদের মতবাদে যেটুকু অনুকরণীয় সে হচ্ছে তাঁদের সংগতির আকাঙ্ক্ষা, জড়চৈতন্য বা প্রাণচৈতন্যের একচ্ছত্রতা স্বীকার নয়। সাধু পল বা গান্ধি যেরকম একদেশদর্শী মাত্রাজ্ঞানহীন, তাঁদের বিপক্ষের নেতারাও তাই। অবশ্য লরেন্স নিজেকে ঠকাননি—তাঁর মতের পারমার্থিক ও নৈতিক এবং সামাজিক ফলাফলের দায়িত্বও তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন। স্বীকার করেননি

The Letters of D. H. Lawrence edited by Aldous Huxley.

Apocalypse by D. H. Lawrence.

শুধু তার মানসিক অসম্ভবতাটুকু। ইংরেজি সাম্রাজ্যসচ্ছল রোমাণ্টিক উচ্ছৃঙ্খলতার শৃঙ্খল লরেন্সের কলমেও জড়ানো ছিল।

অল্ডস্ হক্সলির সানুরাগ শ্রদ্ধা সেইজন্যই লরেন্সের প্রতি উৎসারিত হয়েছিল। বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ হিসাবে অগ্রগণ্য হ'লেও হক্সলির মধ্যে ঐ একটু পলীয় ভাব, একটু সেকালের ব্রাহ্ময়ানা, দেহের প্রতি একটু বিতৃষ্ণা গোপন আছে। এবং হক্সলি জানেন যে সে-ভাবটা একেবারেই কাম্য নয়। তাই শাদা-কালোর মতো হক্সলি ও লরেন্সের বন্ধুতা। এই বন্ধুতার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি হচ্ছে—পত্রাবলির ভূমিকা যাতে তিনি লিখেছেন—হয়ত তাঁর প্রস্তাব কাজে রূপান্তর করা অসম্ভব, হয়ত তাঁর কথায় বা লেখায় এমন কিছু থাকত যা স্পষ্টই ভুল, এমনকি কোন-কোন ক্ষেত্রে (বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আলাপেই ধরা যাক্) আজগুবি। কিন্তু তবু বলা যায় যে তাতে কিছু এসে গেল না। আসল ব্যাপার হচ্ছে লরেন্স নিজে, তাঁর মধ্যে জলন্ত যে প্রাণ তার আগুন, যে-আগুনের আভায় তাঁর সব লেখা ভাস্বর।

এবং ডায়েরির থেকে—এ সেই অসামান্য লোক যার জন্য আমার শ্রদ্ধা বা বিস্ময় উচ্ছ্বাসিত। অধিকাংশ বড়ো লোকের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে দেখেছি জাতে তফাৎ লাগে না। কিন্তু এ-মানুষটি জাতে ভিন্ন, এর মহত্ত্ব স্বতন্ত্র শ্রেণীর, শুধু মাত্রার তারতম্য নয়। ···কেমন যেন আরেক জগতের লোক, অনেক বেশি সচেতন, সাধারণ মানুষদের মধ্যে যাঁরা গুণীব্যক্তি, তাঁদের চেয়ে অনেক বেশি আবেগের শক্তিধর। এবং যদিচ লরেন্স ছিলেন অতি অমায়িক বন্ধুতাপ্রবণ ও সাদাসিধে মানুষ—তবু To be with him was to find oneself transported out of the frontiers of human consciousnes। এই আশ্চর্য বোধশক্তিই, অগোচরজ্ঞানই, কল্পনার এই বাস্তবতাই লরেন্সের রচনাকে এবং অনেকাংশ জীবনকে অদ্ভুত করেছে। কারণ লরেন্সের আবেগ ও তার প্রকাশ-ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ।

লরেন্সের জীবনীর দ্বারা যে তাঁর সাহিত্যরচনার অর্থ করা যায় না, হক্সলির এ-কথা আমিও মানি। এবং লরেন্সের মতো আর্টিস্টের পক্ষে পারিপার্শ্বিকের ছায়া যে অপেক্ষাকৃত গৌণ, তাও আমি জানি। আবেগে জীবন্ত কল্পনায়, তীব্র বোধশক্তিতে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে বহু অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে, তার প্রখর উপলব্ধিতে তাঁর জীবন চঞ্চল ও রচনা অসামান্য হয়ে উঠেছিল। লরেন্সের মন ছিল হুইট্‌ম্যানের সেই শিশুর মতো, যে প্রতিদিন পৃথিবীতে নূতন ক'রে

চ'লে যেত, যার কাছে বিশ্ব ছিল নিত্য নূতন আবিষ্কার। লরেন্সের বিশেষত্ব হচ্ছে যে, সে-আবিষ্কারে শুধু জানার চেনার বিস্মিত আনন্দ নেই, তাতে আছে পরিচিতের অন্তরস্থ রহস্য—সমস্ত কিছুর পরিচয়ান্তের মিলনান্তের the essential otherness, মৌল ভিন্নতা বা বিশ্বের আদি রহস্য। তাই প্রেমের বিস্ময়কর একাত্মতার মতোই, প্রেমের অতিগভীরেও যে দুই চৈতন্যের নগ্ন দ্বৈততা, সেই ভেদরহস্যও লরেন্সকে মুগ্ধ করেছিল। সভ্যতার বিজলিআলোর অভ্যাসে এই রহস্যময় উপলব্ধি আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। উপরি-বুদ্ধির স্পষ্টতায় অভ্যস্ত ও পল্লবগ্রাহী হৃদয়বৃত্তি নিয়ে আমাদের তাই লরেন্সকে দুর্বোধ্য লাগতে পারে। বিশেষ ক'রেই লাগতে পারে, কারণ লরেন্সের মতে এই অপরত্ব বা otherness-এর উপলব্ধিতেই মানবজীবনের সার্থকতা। এইখানেই তাঁর তত্ত্ব, তাঁর নীতি ও সভ্যতা-সংস্কারের ভিত্তি। ১৯১৪ সালে গার্নেটকে লেখা এক চিঠিতে এই চৈতন্যলোকের কথাই লরেন্স লেখেন: "...but somehow, that which is physic—nonhuman in humanity, is more interesting to me than the old-fashioned human element, which causes one to conceive a character in a certain moral scheme and make him consistent. The certain moral scheme is what I object to. In Turgenev, and in Tolstoy and in Dostoievsky, the moral scheme into which all the characters fit—and it is nearly the same scheme—is, whatever the extraordinariness of the characters themselves, dull, old, dead. When Marinetti writes : 'It is the solidity of a blade of steel that is interesting by itself, that is, the incomprehending and inhuman alliance of its molecules in resistance to, let us say, a bullet. The heat of a piece of wood or iron is in fact more passionate, for us, than the laughter or tears of women—then I know what he means. He is stupid, as an artist, for contrasting the heat of the iron and the laugh of the woman Because what is interesting in the laugh of the woman is the same as the binding of the molecules of steel or their action in heat : it is the inhuman will, call it physiology, or like Marinetti, physiology of matter, that fascinates me. I

don't so much care about what the woman feels—in the ordinary usage of word. That presumes an ego to feel with. I only care about what the woman is—what she is—inhumanly, physiologically, materially—according to the use of the word : but for me, what she is as a phenomenon (or as representing some greater inhuman will). Instead of what she feels according to the human conception ......You mustn't look in my novel for the old stable ego of the character. There is another ego, according to whose action the individual is unrecognisable, and passes through, as it were, allotropics states which it needs a deeper sense than any we've been used to exercise, to discover are states of the same single radically unchanged element. (Like as diamond and coal are the same pure single element of carbon. The ordinary novel would trace the history of the diamond—but I say 'Diamond, what ! This is Carbon.' And my diamond might be coal or soot, and my theme is carbon.) চৈতন্যের এই গভীর স্তরে বারবার আসে অন্যের কঠিন অন্যতা—otherness। এই অন্ধকার নিঃসঙ্গলোক ফ্রেজার্ ও ফ্রয়েড্ পাঠান্তেও কল্পনায় অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারে। ভুল বোঝার সে-সম্ভাবনা লরেন্সও জানতেন। কিন্তু তাঁর শক্তি—হক্সলির ভাষায় daimon বা দানো তাঁকে তবু মুক্তি দেয়নি। আর তিনি বাস্তবিক মুক্তি চাননি—নিজের স্বভাব থেকে মুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া ক্ষমতার জ্ঞানও তাঁর ছিল—যদিও তিনি প্রেরণাবাদী ছিলেন। তাই তিনি বন্ধু গার্নেটকে লিখেছিলেন *Sons and Lovers* প্রসঙ্গে—It is a great tragedy, and I tell you I have written a great book। নিজের এ বিশেষ শক্তিকে লরেন্স বহু বাধা থাকলেও কখনও অপমান করেননি, করতে পারেননি। আর্টিস্ট চরিত্রের স্বাভাবিক নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মিশে এই অসামান্য দৈবশক্তির ভার তাই লরেন্সকে সারা জীবন ব্যথিত করেছে। কারণ লরেন্সের স্বভাব খুবই বন্ধুতা-প্রবণ, খুবই হৃদ্য। এবং লরেন্সের পরিচিতেরা তাঁর সঙ্গলাভে মুগ্ধই হয়েছেন। কিন্তু লরেন্সের হৃদয়বৃত্তি তবুও অতৃপ্ত। ক্যাথারিন্ কার্সওএলকে তিনি যা লেখেন, তা তাঁর নিজের সম্বন্ধেও খাটে : 'I think you are the only woman I

have met who is so intrinsically detached, so essentially separate and isolated, as to be a real writer or artist or recorder. Your relation with other people are only excursions from yourself. And to want children and common human fulfilments is rather a falsity for you, I think. You were never made to meet and mingle, but to remain intact, essentially ; whatever your experiences may be.'

কিন্তু হক্সলি যেভাবে মরির ঈশদ্ নাটকীয় *Son of Woman*-কে উড়িয়ে দিয়েছেন, সেভাবে বোধহয় লরেন্সের বাল্যযৌবনের অভিজ্ঞতা, তাঁর বাড়ির ছাপ ওড়ানো যায় না। লরেন্স যে হক্সলি হ'লেও হক্সলির মতো না-লিখে লরেন্সের মতোই লিখতেন, এ-কথা হঠাৎ মানা কঠিন। অবশ্য লরেন্সের বিষয়ে এ-সব মতামত গৌণ। লরেন্সের স্বকপোলকল্পিত বাইব্‌ল্‌-ব্যাখ্যাও আমরা না-মানতে পারি। খৃষ্টধর্ম যে মানুষের স্বার্থপরতা ও কর্তৃত্ব-কামনার বেলায় প্রায় চোখ বুজে মানব-সাধারণকে ছেড়ে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত-স্বভাব ব্যক্তির আত্মসাধনায় ঝোঁক দিয়েছে ; এবং এর ফলে যে পৃথিবীতে দুঃখ অসম্পূর্ণতা ঘৃণ্যতার বন্যা বয়ে চলেছে তার প্রতিবিধান যে রক্তাম্বর যথার্থশাসক রাজা (বা মুসোলিনি ?) ও ক্ষাত্র আভিজাত্য, এ-সব তত্ত্ব শিরোধার্য না-হয় করলুম। বর্তমান য়ুরোপ ছেড়ে ইট্রুরিয়া, অতীত মিশর, অসভ্য মেক্সিকো বা ভারতবর্ষে মুক্তি সন্ধানেরই বা বাধ্য-বাধকতা কি ? লরেন্সের আসল দান হচ্ছে তাঁর কাব্য যার উচ্ছল প্রাণবন্যা শুধু হক্সলিদের গার্নেটদের বা মোরেল এস্‌কিথ্‌কেই ভাসিয়া নিয়ে যায়নি, কেম্ব্রিজের পরীক্ষাগার থেকে গণিতপূজারী রসেল্‌কেও বার করেছিল। তাছাড়া এই শ-গাল্সির মানসিক যুগেও এই আশ্চর্য সত্য কথা কেবল মৃতপ্রায় লরেন্সের মুখ দিয়েই বেরিয়েছিল : "What man most passionately wants is his living wholeness an his living unison, not his own isolate salvation of his "soul". Man wants his physical fulfilment first and foremost, since now, once and once only, he is to the flesh and potent. For man, the vast marvel is to be alive. For man, as for flower and beast and bird, the supreme triumph is to be most vividly, most perfectly alive. What ever the unborn and the dead may know, they cannot know the beauty, the marvel

of being alive in the flesh. The dead may look after the afterwards. But the magnificent here and now of life in the flesh is ours, and ours alone, and ours only for a time. We ought to dance with rapture that we should be alive and in the flesh, and part of the living, incarnate cosmos. I am part of the sun as my eye is part of me. That I am part of the earth, my feet know perfectly, and my blood is part of the sea. My soul knows that I am part of human race, my soul is an organic part of the great human soul, as my spirit is part of my nation. In my own very self, I am part of my family. There is nothing of me that is alone and absolute except my mind, and we shall find that the mind has no existence by itself, it is only the glitter of the sum on the surface of water." (*Apocalypsc*, পৃ ২২২-২৩.)

মার্কসের বস্তুবাদের মধ্যে এই নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধ-স্থাপনের দ্বৈতাদ্বৈতে সার্থক ও প্রাণবন্ত। কিন্তু লরেন্স আবেগের স্রোতে সে চিন্তায় আশ্রয় পাননি। এমনকি রিল্‌কের পক্ষেও যে নিঃসঙ্গতা ও ব্যক্তিস্বরূপের সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে মানসের একটা প্রগতিসন্ধান সম্ভব হয়েছিল, তাও লরেন্সে নেই। ইংরেজ সাম্রাজ্যের কুয়াসার মধ্যে তাঁর প্রাণসূর্যের দীপ্তিই আশ্চর্য ও নমস্য।

সাহিত্যের দেশবিদেশ

মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স

১৮১৭ সালে ক্যানিং সাহেব ভারত কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-কে লেখেন,

I apprehend nothing to be so little useful as reasoning by analogy from Europe to India.

ইংরেজ আমলে কি ইংরেজ কি ভারতীয় সকলের ঘাড়েই চেপেছে এই তুলনার ভুলের বোঝা। জমির ব্যবস্থা, সমাজবিন্যাস, শাসনযন্ত্র প্রয়োগের সব ব্যাপারেই আমরা নিজেদের ভেবেছি প্রায় সাহেব; ইওরোপ, বিশেষ ক'রে ইংলণ্ডের সঙ্গে কল্পিতসাদৃশ্য খুঁজে আমরা দেশে বিদেশে এ দাবি-দাওয়া তুলেছি এবং কৃপণ উপহার গ্রহণ করেছি। সাহিত্যক্ষেত্রেও আমরা উপমা খুঁজেছি ইংলণ্ডে এবং জ্ঞানানুসারে কিছুটা হয়তো লাতিন ইওরোপে। এমন কি আমাদের অপরিসর সাহিত্যের বিরাট চমকপ্রদ মুষ্টিমেয় প্রতিভাধরদের আদিপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্তও এই উপমানির্ভর যুক্তির একজন প্রাথমিক শহীদ। মাইকেলের জন্ম ১৮২৪-এ বায়রনের মৃত্যুর বছরে, শেলির মৃত্যুর দু-বছর পরে; আমাদের হিন্দু পেট্রিঅট হরিশ মুখুজ্জের তিনি সমবয়সী; ফরাসী কবি বদলেয়র জন্মান ১৮২১এ, কীটস্-এর মৃত্যুর বছরে।

বাপমা-র আদুরে ছেলে, মাইকেল হয়তো ঠিক একটা আদর্শ গৃহশিক্ষা পান নি, তবে তাঁর মায়ের কল্যাণে দেশের কাব্যজগতে তিনি শৈশবে প্রবেশ করেছিলেন। শৈশবের এই পরিগ্রহণই পরে বাংলা পদ্যের মর্মস্থল অন্বেষণের অধিকার দিয়েছিল এই ইওরোপ-মাতাল শক্তিধরকে। কারণ সেকালের বহু নব্যশিক্ষিত বাবুদের মতো মাইকেলও ঐ ক্যানিংএর উপমা মরীচিকার পিছু ধাওয়া করেছিলেন এবং একেবারে বালক বয়সেই এই অসাধ্যসাধনার আরম্ভ। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকঙ্কণ চণ্ডী যশোর-খিদিরপুরের ছেলেরও রক্তের মধ্যে অমর হয়ে রইল। বস্তুত মাইকেলের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হয় এই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়েই, কারণ এই ঐক্যভঙ্গ সারা ইঙ্গভারতীয় যুগের ভিত্তিতে, সামাজিক রাজনৈতিক মানসিক সব অর্থেই।

অবশ্য তাঁর স্বদেশবাসী অনেকের চেয়ে মাইকেলের অভিযান ছিল অনেক বেশি একাগ্র, অনেক দুঃসাহসী পরিশ্রম তাঁর ইওরোপ আবিষ্কারে। ইংরেজি,

লাতিন, ফরাসী, জর্মান, ইতালিআন, গ্রীক, সংস্কৃত ফারসী – নানা ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁর উৎসাহ ছিল গভীর। কিন্তু বাংলার ফল্গু-প্রভাব এ সবের তলায় তলায় চলে এবং মাদ্রাজফেরতা এই আজব ইঙ্গবঙ্গীয় যুবককে দিয়ে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক লেখায় বাংলাতেই এবং তাঁর প্রথম পঠনীয় কাব্যও তাঁকে লিখতে হল মাতৃভাষাতেই। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা গুরুও পেয়েছিলেন অসামান্য, রিচার্ডসন ডিরোজিওর মতো শিক্ষকের প্রেরণায় মাইকেলের ইওরোপযাত্রী মন উধাও হয়ে গেল।

আজকের দিনের আত্মপ্রসাদে মনে হতে পারে গোটা ব্যাপারটাই ছিল অস্বাভাবিক, কিন্তু এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটা ঘটেছিল একটি সমগ্র জাতের উপরে ইতিহাসে প্রায় তুলনাহীন ঘোর অস্বাভাবিক এক জগদ্দল চাপে। বরং, মাইকেলের ইংরেজী ব্রত পালনের মধ্যে একটা চরম ন্যায়নিষ্ঠতা দেখা যায়। আমাদের পুরোধাদের অধিকাংশই সদরে শ্বেতদ্বীপের কাছে আত্মা বিকিয়েছিলেন কিন্তু অন্দরে দেশী অভ্যাসিক গার্হস্থ্য ও সমাজ-জীবনের নিরাপদ পুণ্যের মায়া ছাড়েন নি। পূর্বসূরী মনীষীদের মধ্যে এর ব্যতিক্রম বেশি ছিল না ; এক বিদ্যাসাগর মশায় নিঃসঙ্গ অন্তরাত্মার সংহতিকে আহত হতে দেননি, তিনিই সজ্ঞানে ইওরোপকে দেখেছিলেন, ইওরোপের মানবিকতার দিকটাই তাঁকে যথোচিতভাবে আকৃষ্ট করেছিল। বুর্জোয়াযুগের ইংরেজের উদ্দাম কিন্তু অগভীর জয়যাত্রার আপাত জৌলুষে তিনি ভোলেন নি, যদিচ এই ভোলার সম্ভাবনা আমাদের বিড়ম্বিত ইতিহাসে নিহিত ছিল।

এখনও আছে, যদিচ ইওরোপ অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন ফরাসী ইত্যাদির পশ্চিমা সভ্যতা আজ আর উঠতি নয়, জৌলুষ আজ জরার কায়কল্প সজ্জায় মরীয়া অস্তিত্ব-সর্বস্ব মোদকের প্রসাধনে। কিন্তু ঐ পশ্চিমের উপমা আজও আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে। তাই আমরা যখন অতীতে শিক্ষা নিতে চাই তখন মাইকেলকে প্রাপ্য মনোযোগ দিই না, দিই বিদেশী মহাজনদের, যথা বদলেয়র-কে, দিই হয়তো প্রতিভান্বিত সেই বালক র‍্যাবোকে। এবং সমস্ত ইহুদি ও খৃষ্টধর্মের ভগবদ্‌-ভিত্তিক পাপপুণ্যের মর্ম-বিস্তার বাদ দিয়ে ভাবি যে, পাপ বোধ যেন বিজ্ঞাপন দিয়ে আমদানি করা যায়, তাই বাংলা কবিতায় বড় জোর ভগবানকে বলা যায় ভগবান মদেচূর, বদলেয়রের মতো জীবনাত্মুগ! আর কবি কাটান নরকে এক যুগ অর্থাৎ র‍্যাবোর নরকে এক ঋতুর চেয়ে অনেক বেশি কাল! তাই ফরাসী কাব্যের আমদানির বাংলা জগতে রাসীন্‌ কনেই বা হু'গো লামার্তিনের স্থান

নেই, জর্মান কাব্য আসে গয়টে শিলারের বড় রাস্তায় নয়, আসে হে'লডেরলিনের দিব্যোন্মাদে অথবা রিল্‌কের তীব্রতার সাধনার অস্বাস্থ্যে।

অথচ এই সব তুলনার পশ্চাদ্ধাবন জীবনের ও সাহিত্যের নানা বাধায় শৌখীনতার গণ্ডীও পেরোতে পারেনি। মাইকেল অন্তত সেকালে ইওরোপোপমা তাঁর স্বভাবের প্রাবল্যে নিঃশেষ ক'রে পান করেছিলেন। কিন্তু তিনিও পশ্চিমার বুনিয়াদী খৃষ্টধর্মের মর্ম পান নি, বাঁড়ুজ্জে মশায়রা যা খুঁজেছিলেন। মাইকেলের ধর্মান্তর নিতান্তই পার্থিব কারণে, বিলাত যাবার সুযোগ রচনা করতে। এবং অন্তত মাদ্রাজ অবধি যাবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। সেই বাইবলবর্ণিত উড়নচণ্ডী ছেলের মতো মাইকেলের নিজ বাসভূমে প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল নিশ্চয়ই নানা কারণে। হাওয়াতেই তখন চালু হয়েছিল বাংলায় ফিরে আসার ধ্বনি। তখনই তো বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয় দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ মশায়রা গুপ্তকবির পথ পাকা ক'রে বাংলায় গড়ছেন। এমন কি, পাইকপাড়ার সিংহেরা, পাথুরেঘাটার মহারাজা ঠাকুর প্রভৃতি বনেদী বাবুরাও এই স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তির ভাষার সন্ধানে উৎসাহী ছিলেন। তাই ইংরেজমন্য মাইকেল নিজের কবিত্বের দুর্মর গরজে ইংরেজিপনার মূলত ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে ঘরে ফিরলেন, ঘরের ছেলেই বেলগাছিয়া নাট্যশালার বাংলা নাটক লিখলেন।

মাইকেল-মানসে কবিত্বের আবেগেই এর মুখ্য কারণ, সেই আবেগের তীব্রতা এবং ইংরেজিতে তাঁর অসামান্য ব্যুৎপত্তি থেকেই তাঁর প্রত্যাবর্তন। তাঁর ইংরেজি তথা ইওরোপীয় ভাষায় সাহিত্যে জ্ঞানের স্বাচ্ছন্দ্য আজও বিস্ময়কর, কিন্তু তিনি বুঝলেন যে, ইংরেজিতে—মাই ডিআর ফেলো—যতই আশ্চর্য চিঠি লেখা যাক্, সাহিত্য সৃষ্টিতে দরকার রক্তের চেনা ভাষা। তাই তো তিনি লেখেন তাঁর মহাবন্ধু জন, মেদিনীপুরের প্রাতঃস্মরণীয় পেডাগগ্‌কে, যাঁর সাহিত্যরুচি এবং সাহিত্যজ্ঞান তাঁর মহৎ চারিত্র্যেরই তুল্য ছিল:

I never study to be grandiloquent like the majority of the 'barren rascals' that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration……

আজকের ভাষায় যাকে বলে অবচেতন।

আরেকটি চিঠিতে তিনি রাজনারায়ণকে লিখছেন:

I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue

would place at my disposal such exhaustive materials, and you konw I am not a good scholor. The thoughts and images bring out words with themselves – words that I never knew. Here is a mystery for you.

রহস্যই বটে। অলৌকিক কবি-প্রতিভার অসমাহৃত দ্বন্দ্বের রহস্য। কি করে এই প্রায়-বাইরের মানুষ ভাষার প্রকৃতির একেবারে অন্তরের খোঁজ পেলেন? চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্বেই কি এর দুঃখময় কঠিন কিন্তু দুর্বার নির্দেশ ছিল না? শব্দের পর্যায়ে হয়তো তাঁর উপযুক্ত স্বাভাবিক ঐশ্বর্য কম ছিল, মাতৃভাষার সেমান্টিকতত্ত্বে হয়তো তিনি যথোচিত কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছিল ভাষার কথনছন্দ, ভাষার দেশজ ব্যবহারের স্মৃতি। আজকে হয়তো আমাদের কানে 'রে' ও 'লো' ব্যবহারের কিঞ্চিৎ আধিক্য অস্বস্তিকর লাগতে পারে, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ঐ দুটি তুইতোকারি সম্বোধন বাংলা ভাষার নিজস্ব ধারার যাঁরা বাহক অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যে এবং সাবেকী পুরুষদের মধ্যেও সমধিক প্রচলিত ছিল; এখনও সেই সব সামাজিক অঞ্চলে আছে, যে স্তরে বাংলা ভাষা আজও তার স্বকীয় বিন্যাস বা বাক্‌ভঙ্গী ও বাকছন্দ কলকাতাই নীরক্ততায় বর্জন করেনি। মাইকেল যে তাঁর অস্বাভাবিক-ভাবে দ্রুত বাংলা পঠনপাঠনের ফলে মাঝে মাঝে রীতিদুষ্ট হন সেটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়, স্মরণীয় হচ্ছে বাংলা কথনছন্দের ধ্বনি ও গতি এবং দেশজ বাক্‌ভঙ্গী বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত নিশ্চিতি, মাঝে মাঝে তাঁর বিড়ম্বিত সংস্কৃতপনা সত্ত্বেও।

ভাবতে মজা লাগে যে, এই মাইকেলই একদা তাঁর হিন্দু কলেজের এক বাল্যবন্ধুর পটলডাঙার বাড়িতে এসে যাবার সময়ে গাড়ির বাতি চেয়েছিলেন: পারো কি – দিতে দুটা বাতি – আমার গাড়িতে? – তখনও বাংলা কবিতার বাতি তিনি জ্বালেন নি। যখন জ্বালালেন তখন দেখা গেল অন্তরস্থ সেই আজন্ম সাযুজ্য, যে উৎসের অমোঘ শক্তি গোটা হিন্দু কালেজ ও তাঁর ফিরিঙ্গি কৈশোর যৌবনকে ভাসিয়ে দিলে, জীবনের বৈপরীত্য সত্ত্বেও কাব্যের মুক্তিতে। এ শক্তি নিহিত ছিল তাঁর মানসের গভীরতম স্তরে যে স্তরে কবিতার মূল, যার কল্পনা-বিহারকে আমরা ভাষান্তরে বলি স্বপ্নজগত। আর মাইকেল তা জানতেন, তিনি তাই বন্ধুকে লেখেন যে, তিনি মনে প্রাণে একজন গর্বিত, মিতবাক্, নিঃসঙ্গ গানে-পাওয়া মানুষ, a proud, silent, lonely man of song, তাই বাংলা ছন্দের স্বভাব সম্বন্ধে তাঁকে আর কারো কাছে পাঠ নিতে হয়নি, তিনি নিজের

সহজাত বোধেই আবিষ্কার করেন যে, আমাদের সপ্তপদী বা সপ্তমাত্রিক পদ্যই আমাদের হিরোইক মেসার্, কারণ আমাদের ভাষা স্বরাঘাত ও স্বরমানের দিক থেকে অগ্রদানী, পতিত। প্রসঙ্গত, মনে রাখা ভালো, আমরা হয়তো এই সপ্তস্বরা বা পয়ারের আঁটসাঁট কটিবন্ধে আড়ষ্ট বোধ করেছি এবং ইংরেজি আয়ম্বসের পঞ্চপদী পূর্ণতার সন্ধানে দুটি পদ বা স্বরাক্ষর যোগ করেছি, কিন্তু সচরাচর ফলটা হয়েছে বাকবাহুল্য এবং স্ট্রফি বা শ্বাসপর্বের শরীরে হয়তো বা একটা মেদাক্ত দৌর্বল্য।

প্রকৃতপক্ষে বাংলা পদ্যে মাইকেলের পরে একটা ঝোঁক দেখা যায় গোটা লয় পর্বের সামগ্রিকতা ছেড়ে একটি লাইনসর্বস্বতার দিকে এবং তার ফলে একটা সিংসং বা কাব্যি-কাব্য অভিন্নস্বরতার দিকে, ভাস্কর্য ছেড়ে যেন রেখার সরলতায়। তাই বাংলা পদ্যে ও আবৃত্তি-যান্ত্রিক পদ্য-পাঠের রীতিতে সচরাচর স্ট্রফির দৃঢ়বন্ধনীবি সেই দীর্ঘায়িত সৌন্দর্য থাকে না, যা ইংরেজি কাব্যে আমাদের মুগ্ধ করে এবং যে পদ্যবন্ধ ও বাক্যবিস্তারের আততি সৎ পদ্যের হাতের পায়ের উভয়ত বলিষ্ঠতায় একটি অপরিহার্য গুণ।

মাইকেলের কাব্যোৎসের গভীরতার একটি প্রায় মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ মেলে শৃঙ্গার নামক তাঁর দুটি সনেটে। ফরাসী কবি আঁতোআন্ দ' বাঈফের প্রেম* নামক সনেটের তুল্য এই সনেট দুটিতে আমরা মেঘনাদবধকাব্যের যুদ্ধের ছবির একটি অবচেতন গভীর প্রেমযুদ্ধের আধার প্রতীক পাই। মেঘনাদবধের প্রেরণার আবেগ কি কবির মনে শুধুই রামায়ণ আর মিলটন্ থেকে তার অবশ্যম্ভাবিতা পেয়েছিল? না তা সমর্থন পেয়েছিল যুদ্ধ ও প্রেমের মিলনান্ত তাঁর প্রতীকের ব্যাপ্তিতে।

মাইকেলের যাত্রারম্ভই এই দেশের মানসের ও ভাষার সঙ্গে স্বকীয় স্নায়ু-তন্ত্রের যোগ থেকে এবং পদ্যে যে মৌলিক প্রয়োজন কি সে বিষয়ে তাঁর ইওরোপীয় জ্ঞানের কল্যাণে আর জানতে কিছু বাকি ছিল না এবং তাঁর রুচি বা মানদণ্ড ছিল সভ্য অর্থাৎ বিশ্বমানবিক আশ্চর্য মাত্রায়। আশ্চর্যই, কারণ তিনি যে ভিক্টোরীয় সাম্রাজ্যের প্রাদেশিকমাত্র প্রজা ছিলেন, সে সাম্রাজ্যের লোকেরা একাধারে দ্বীপমণ্ডুকতায় আর বিশ্বব্যাপী পণ্য-ব্যবসায়ী সামরিক শাসনের চারিত্রিক দোষত্রুটিতে ছিল আচ্ছন্ন।

* হে বিদেশী ফুল অনুবাদ সংকলন দ্রষ্টব্য

আমাদের বার বার স্মরণে রাখা দরকার যে, মানসে বা সুকুমার সংবেদ্য স্বভাবে ভেদবুদ্ধির প্ররোচনা ও ফলে ভাঙন আমাদের মাতা-পিতামহদের স্বর্ণ-যুগেও বাস্তব সত্য ছিল : হয়তো এই ক্ষতির যন্ত্রণা বিষয়ে অবহিতি এবং স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা তখন এতটা তীব্র হবার প্রয়োজন ছিল না। এবং মুষ্টিমেয় ইংরেজিনবিশদের মধ্যে সমবেদনবৃত্তি এবং বোধবিচার সম্পন্ন মানুষ নিতান্তই আঙুলে গোণা যেত। অল্পসংখ্যক বাবুই ভালো জিনিসকে সাহসের সংগে গ্রহণ করতে পারতেন এবং যাঁরা পারতেন তাঁদের প্রায় সবাই হয় মাইকেলের পৃষ্ঠপোষক নয়তো তাঁর বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। কিন্তু প্রথমত তাঁরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যেও রাজেন্দ্রলাল বা রাজনারায়ণ বসুর মতো বিচার-বুদ্ধিমান মানুষ একটি দুটিই। আমি অবশ্য বলছি না যে, হিন্দু কালেজী বাবু সাহেবরা বা বেলগাছিয়া পাথুরিয়াঘাটার জমিদারবাবুরা ছাড়া আর কেউ মাইকেলের কবিতা প'ড়ে আনন্দ পাননি। বেনিয়ানের কেরানী বা চীনাবাজারের দোকানদারও ছিলেন মাইকেলের কবিতার সমঝদার পাঠক। আমার বক্তব্য কেবলমাত্র এই যে, প্রকৃত সংবেদনশীল মানুষ কলকাতার সমাজে তখন অত্যন্ত কম এবং যে বিষঙ্গ বা অসংহতি বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘ সর্বনাশের দিকে ঠেলছিল, তার প্রভাবে নিছক মননের প্রক্রিয়াও স্বাস্থ্য হারাচ্ছিল। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাবিধ আভাস পাওয়া যায় মাইকেলের পত্রাবলীতে। স্বয়ং আমাদের রবীন্দ্রনাথও এই অস্পষ্টতায় এক সহজ ভাবের এক সহজ ভাষার অলীক প্রত্যাশায় মহাকাব্য কল্পনায় মাইকেল-হেমে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, যদিও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মহাকাব্যের আরেক ব্যাপক প্রশ্ন তুলে বালক বয়সেই স্বীয় মনীষার আরেক প্রমাণ দিয়েছিল। এমন কি, মানুষ হিসাবে ও পণ্ডিত হিসাবে বিস্ময়কর মানুষ রাজনারায়ণও সাহিত্যসংস্কৃতির বিচারে একেবারে স্বাধীনমনা ছিলেন না, ব্রজাঙ্গনা সমালোচনায় যার প্রমাণ। হয়তো বিশ্বস্তর জ্ঞানের অধিকারী রাজেন্দ্রের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু এর প্রমাণ দেন মাইকেল আবাল্য-বন্ধু রঙ্গলালও, যাঁর সঙ্গে মাইকেলের রুচির মানভেদ প্রায় মৌলিক বললেই চলে, যদিচ রঙ্গলালের কাছে মাইকেল-হেমের অনুজ ঋণ স্বীকার্য। রাজনারায়ণকে এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

He reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way, no doubt, but by no means of the highest school of poetry, except perhaps Byron, now and then. I like Wordsworth better.—

— মাইকেলের পক্ষেই সে যুগেও সম্ভব এই নিশ্চিত মূল্যায়নে কাব্যবিচার — তাঁর নিজের দেশের শিক্ষাদীক্ষা যুগধর্ম ইত্যাদি সত্ত্বেও। বায়রনের বিচারটুকু এবং বিশেষ করে ওঅর্ডসওঅর্থ বিষয়ে মন্তব্যটি স্মরণীয়, তখন বিলাতেও ওঅর্ডস-ওঅর্থ-বাদীরা অনাগত।

ইংরেজীতে হলেও মাইকেলের চিঠি থেকে আরেকটি উদ্ধৃতি দিই, তাঁর সাহিত্য-বিচারের কালোত্তীর্ণ পরিণত বুদ্ধির বিষয়ে আমরা প্রায়ই যথেষ্ট অবহিত থাকি না। মাইকেলের কাব্য টেকনিকে সজ্ঞান কর্তৃত্বের একটি আশ্চর্য উদাহরণ এই পত্রাংশে :

Last evening I got a copy of the new Meghnad forwarded to your address. I hope it will reach you safe. After you have got through the thing, you must lay aside all business and write to me ; for there is no man whose opinion I value more than that of a certain Midnapore pedagogue....Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is long. I believe you like the opening line of the 2nd book of the Meghnad. In that description of evening you have these lines —

আইলা তারাকুন্তলা, শশী সহ হাসি
শর্বরী ; বহিল চারিদিকে গন্ধবহ।

How if you throw out the তারা কুন্তলা and substitute সুচারু তারা you improve the music of the line because the double syllable ন্ত mars the strength লা। Read

আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি
শর্বরী

And then সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে and the passage assumes quite a different tone of music—

আইলা সুচারুতারা, শশীসহ হাসি
শর্বরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন কোন ফুলে চুম্বি কি ধন পাইলা।

অবশ্য পাঠক মাইকেলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত নাও হতে পারেন, আইলার লা-র শক্তিমত্তা বিষয়ে কবি কিঞ্চিৎ দুর্বল মনে হয়, বরং তারাকুন্তলা-র তরঙ্গায়িত ধ্বনি এবং চিত্রময়তায় পর্বটি আরো সাঙ্গীতিক ঐশ্বর্য লাভ করত—

আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি
শর্বরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে—।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মাইকেলের বাংলায় কান এত অভ্রান্ত, যাঁর কবিতার প্রেরণা জীবনের ও শিক্ষার এত বাধা ভেঙে পাহাড়ে নদীর বেগে প্রকাশ পেল, তাঁর কাব্যে কেন এত অসমতা? সে কি ঐ প্রেরণার মূলে বিপত্তির জন্যই, যার ফলে পাহাড়ে নদীর আঁকাবাঁকা, পাথরে বালিতে এই ডুব-জল আর এই চড়া? তাই কি মেঘনাদবধ বাদ দিলেও ছোট ছোট কবিতাতেও এই প্রেরণার অস্থিরতা দেখা যায়? অথচ মাইকেলের কবিতার মার্জনা-কার্যে বারবার প্রমাণিত তাঁর জাগ্রত কাব্যিক শুভবুদ্ধি। ধরা যাক্‌ ব্রজাঙ্গনা-কাব্য, 'যমুনাতটে'র:—

তোমার মনের কথা কহ, রাধিকারে,
তুমি কি জান না ধনি, সেও বিরহিনী—

এর প্রতিশ্রুতি কেন এগারো স্তবকের সংগঠনে হারিয়ে গেল? অথবা 'উষা'র—

কনক-উদয়াচলে তুমি দেখা দিলে

হে সুরসুন্দরি!—অথবা ধরা যাক 'কুসুম'-এর প্রথম কয় লাইন:

কেন এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?
আর কি যতনে কুসুম রতনে
ব্রজের বালা?
আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী?
কেনে লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী?
অলি বঁধু তার; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী?

যদি ভাবা যায় মাইকেলের কবিত্বের বুঝি আরম্ভেই স্ফূর্তি, তাও ঠিক হবে না; যেমন "গোবর্ধনগিরি"র প্রথম স্তবকের প্রতিশ্রুতি চতুর্থেও বর্তমান, অথবা "সারিকা"-তে যেমন ষষ্ঠ স্তবক, অথবা "নিকুঞ্জবনে"-র দ্বিতীয়টি। "ব্রজাঙ্গনা"-র চেয়ে অনেকের মতে "বীরাঙ্গনা"-র ঐশ্বর্য বেশি, কিন্তু "বীরাঙ্গনা" কাব্যেও সমস্ত সর্গ সমান নয়, অনেকের কাছে হয়তো দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা একাদশ সর্গ অধিক উত্তীর্ণ মনে হবে। চতুর্দশপদী এবং বিবিধ কবিতার অনেকগুলি অবশ্য প্রায়ই সামগ্রিকতা লাভ করেছে। "কবিমাতৃভাষা", "আত্মবিলাপ" বা "বঙ্গভূমির প্রতি" সবার পরিচিত। যেটা উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে মাইকেলের তথাকথিত নীতিগর্ভ কাব্যের মাঝে মাঝে আশ্চর্য বাচন, ভাষা ও ছন্দে একেলে মজায় যা অদ্ভুত। চতুর্দশপদী-গুলিও সুপরিচিত, তার মধ্যে "বঙ্গভাষা", "কমলে কামিনী", "অন্নপূর্ণার ঝাঁপি", "কাশীরাম দাস", "কৃত্তিবাস", "পরিচয়", "কবি", "নিশাকালে নদীতীরে", "সীতাদেবী", "কপোতাক্ষ", "আমরা" (শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে?), "শ্রীমন্তের টোপর", "কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া", "সমাপ্তে" প্রভৃতি অনেক সনেটই একাধিক ও ভিন্ন ভিন্ন কারণে স্মরণীয়। শৃঙ্গার-রস সংক্রান্ত সনেটদ্বয় পূর্বপ্রসঙ্গ হেতু এখানে অসঙ্গত হবে না:

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জকাননে,
মনোহর বীণাধ্বনি,—দেখিনু সে স্থলে
রূপস পুরুষ এক কুসুম আসনে,
ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।
হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণীচয়, কামাগ্নি-নয়নে,—
উজ্জিল কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ-ছলে!
সে কামাগ্নিকণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে; ফুল ধনুঃ ধরি,
হানিতেছে চারিদিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব কি নর, উভে জর জর করি।
"কামদেব অবতার রসকুলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।" জাগিনু শিহরি।

নহি আমি, চারুনেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী ;
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে ?
চন্দ্রচূড়রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়াল থেকে, বাঁধ লো সুন্দরি,
নাগপাশে আর তুমি ; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহু ভূকম্পনে অধীর লো করি !
এ বড় অদ্ভুত রণ ! তব শঙ্খধ্বনি
শুনিলে টুটে তো বল ! শ্বাসবায়ু বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে।
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদিন,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে ?

মাইকেলের কবিতায় অসমতার কারণ নির্দেশ শেষ অবধি পাঠককে কবিতার বাইরে নিয়ে যায়। কেন তাঁর খণ্ডকল্পনা প্রচণ্ড কাব্যবেগ সত্ত্বেও সংকল্পনায় গঠিত হয় না, সে বিচারের দায়িত্ব কবির একলার প্রাপ্য নয় ; তাঁর সমাজ, তাঁর যুগও ঐ ভঙ্গিলতার জন্য দায়ী। এই ব্যাপক কারণেই বোধহয় মাইকেলের প্রবল ব্যক্তিত্বের ও কবিত্বের ক্রমোৎকর্ষে ব্যক্তিস্বরূপের আভাসময় সেই ইতিহাস-মর্যাদা নেই, যা আমরা পাই ওঅর্ডসওঅর্থে বা পাই রবীন্দ্রনাথের বিরাট বিকাশে। অবশ্য বলা যায় যে, শুধু কালধর্মের গুণেই যদি এই স্বাক্ষর মেলে, তবে দেবেন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়াল, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি সুকবিদের মধ্যে তা নেই কেন ? কিন্তু এঁরা প্রায় সবাই সুকবি হলেও গৌণ কবি, তাঁদের কবিসত্তা সারস্বত অপেক্ষা অভ্যাসিক মার্গেই স্বস্তি বোধ করত। কিন্তু মাইকেল যে ব্যক্তিত্ব ও কবিত্বের প্রমাণ তাঁর বীরত্বমূলক প্রয়াসে শুরুতেই দাখিল করেন, সে মানসিক কাব্যিক শক্তিমত্তা প্রতিকূল অবস্থায় যেন মাত্র বহিরঙ্গ জয়েই নিঃশেষ এবং তাঁর কবিতার অলঙ্করণস্বভাব ফ্যান্সিতেই আবদ্ধ থেকে গেল। আর এটা যে শুধুমাত্র তাঁর ধ্রুপদী রূপের বিষয়ে উৎসাহবশত হয়, তাও নয়, কারণ মিলটনও মাইকেলের তুলনায় ব্যক্তিস্বরূপকে মূর্ত করেন অনেক বেশি। অধিকন্তু, তাঁর কবিতাবলীতেও

মাইকেলকে ঠিক নৈর্ব্যক্তিক বলা যায় না।

মাইকেল অত্যন্তরকম উনিশ শতকী নব্যমধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যিনি ইওরোপের তুলনা টানতে গিয়ে স্থান-কাল-পাত্র বিষয়ে বিভ্রান্ত, যিনি পশ্চিম ইওরোপের রেনেসান্স আর আমাদের মহারাণীর যুগ প্রায় সমার্থক ভেবে বসেছিলেন। তাই তাঁর জীবন করুণ অপরিচ্ছন্নতায় অকালে শেষ হয়, কিন্তু কীর্তির দিক থেকে তিনি নব্যভারতীয় কবিদের মধ্যে অসংহত অথচ বিরাট পুরুষ, রূপক হিসাবে মহান্। বড় কথা হচ্ছে ঐ কবিত্ব, মাইকেলের মানসে কবিতা ভর করেছিল। এবং এ কবিতা প্রাণ পেয়েছিল ইএটস্-কথিত সেই মহাজননীতে, যুগ-যুগান্তব্যাপী জাতীয় জীবনে তার ভাঙন সত্ত্বেও, সমগ্র দেশের মানুষের স্মৃতিমন্থনে মিথস্ বা পুরাণ-কাহিনীতে, লৌকিক কাব্যে রূপকথায়, যে স্মৃতির ঐশ্বর্য-বিস্তার ও তীব্রতা ইঙ্গ-জাগরণের আগে ও তার পরিধির বাইরে দেশকালে ব্যাপ্ত। তাই তো এই খ্রীষ্টান বাঙ্গালী সাহেবের মনে হয়েছিল :

I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry.

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেউ কি নিছক কবিত্বময়তার জোরে, এমন কি নিজের দেশের কবিত্ব ভরপুর ব'লেই স্বাধিকারে মহাকবি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন ? পারেন না ঠিক, যদি না তাঁর মানসে, সবাক মানসে মিলে যায় দেশের যুগের কবিমানস তার অতীত ও বর্তমান সমেত আগামী ইঙ্গিতময়তায়। যদি না তাঁকে ব্যক্তিস্বরূপের আত্মসন্ধানে বা ব্যাপ্ত কোনো সংলগ্নতার মর্মান্তিক জিজ্ঞাসায় চরম এক উৎক্রান্তি বা ক্রাইসিসের মুখোমুখি হতে হয়, যে আততিতে কবিমনের বিকাশ স্বাক্ষর পায়। সচরাচর এই কবিতার চেতনা, এর আধিদৈবিক (কথাটা রাজেন্দ্রলালের) শক্তিমত্তা শরীর পায় কবির স্বকীয় ক্রাইসিসে, রবীন্দ্রনাথের মতো সদর স্ট্রীটে গরু-গাধার মৈত্রীর দৃশ্য দেখে এক নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে অথবা আবার প্রবীণ সিদ্ধির বয়সে অরাম-মেট্ মার্কা আত্মহত্যার লক্ষণযুক্ত ঝোঁকে। এ লক্ষণ অনেক বড় কবির বিকাশসন্ধিতে দ্রষ্টব্য—একটা অন্তঃশূন্যতা, ভয়ানক নিঃসঙ্গ একটা ব্যর্থতাবোধ ; ওঅর্ডসওঅর্থের ভাষায় a kind of desertion বা blank treachery, যা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল যখন ইংলণ্ড ফরাসীবিপ্লবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। কিংবা এমন একটা দীপ্ত আনন্দ যাতে চিত্তবৃত্তির বা সংকল্পনাশক্তি উজ্জীবিত হয়, পেশীবদ্ধ হয়, স্বর্গীয় আলোকে মর্ত ও নরকও সংলগ্ন স্পষ্টতা পায়।

মাইকেল তাঁর যন্ত্রণার উৎক্রান্তিপর্বের অনির্দিষ্টতাতেই আবদ্ধ ছিলেন ঐতিহাসিক সামাজিক ঘূর্ণীর কারণে। এ বিষয়ে তাঁর চেতনাই বোধ হয় ইঙ্গ-জাগরণের আবর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল, অন্তত অস্পষ্ট ছিল, না হলে তিনি নিজ মনের ভাষায় কর্তৃত্ব অর্জন করবার মুখে ফ্রান্সে গিয়ে বিদ্যাসাগরের শান্তি ও নিজের আয়ু ক্ষয় করবেন কেন? তাই তাঁর কবিতাতেও তাঁর দৈবী প্রেরণা দীর্ঘকায় সংগঠনের, অখণ্ড মানবিক কল্পনার পরম মাহাত্ম্য পায় না।

তবু মানতে হবে মাইকেল তাঁর দেশকালগত ও ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে পাঠ নিয়েছিলেন আশ্চর্য ভালো, যেমন আরেকভাবে ওঅর্ডসওঅর্থ বন্ধনের ব্যর্থতায় ও সার্থকতায় পাঠ নিলেন প্রকৃতির কাছে ও রাজধর্মতন্ত্রের নিরাপত্তায়। মাইকেল তাই দুঃখময় স্বল্পকালের পরিণতির মধ্যেই বুঝেছিলেন তাঁর দেশের মধ্যের দোটানা, ইঙ্গ-জাগরণের অনিবার্যতা অথচ শূন্যকুম্ভ তিক্ততা। ব্যক্তিজীবনে তথা ব্যক্তিস্বরূপের কাব্যিক সংহতিতে তিনি এই জ্ঞান হয়তো সম্পূর্ণ রূপায়িত করতে পারেন নি, কিন্তু কাব্যে তিনি নিজেকে গণ্ডীমুক্ত করেছিলেন অনুপ্রাণিত কবির আবেগে, যদিচ উদ্‌ভ্রান্ত কবির বিক্ষিপ্ততায়। রাম এবং রামের rabble-এর প্রতি তাঁর প্রতিবাদী অবজ্ঞা তাই a man of song—গানে-পাওয়া মানুষের প্রবল আবেগে এত গম্ভীর, প্রায় রাজদ্রোহী, দেবদ্বেষী। তাই তাঁর স্নায়ুতন্ত্রে বাংলা কবিতার রেশ, দেশজ কথনের ছন্দ ইওরোপের উপলস্রোতে মুখর। তাই ঐ অনৈক্যের শিকড়ে তিনি বাংলা কাব্যে যে উজ্জীবন আনলেন, সে উপনয়ন কিছুটা খণ্ডিত থেকে গেল, কিছুটা অংশপ্রধান বহিরঙ্গ বা কন্‌সীটময় রইল। এবং সে প্রেরণার ঢেউ যে পরিমাণে প্রাবল্যে উচ্চ সে পরিমাণে বহমান হল না। তিনিও তা জানতেন, তাঁর সাধ ছিল মিলটনের অনুরূপ লেখা, কিন্তু ইংরেজি বিপ্লবের মহাকবির তুল্য হতে তিনি পারেন নি। Many say it licks Kalidasa—এই তাঁর সান্ত্বনা ছিল এবং কন্‌সীটের দিক থেকে কথাটা হয়তো সত্য, যদিচ কালিদাসের কাব্যে সংকেতিত মার্গে লিখেও স্বকীয় উত্তরণের দিক থেকে মাইকেলের আত্মপ্রসন্ন তুলনাটা অর্ধসত্য। কিন্তু মিলটনের আত্মস্থ পিওরিটান সমগ্রতার ব্রত মাইকেলের পক্ষে আয়ত্তে আনা সম্ভব ছিল না; যখন হুতোম প্যাঁচারা কোটরস্থ আর ঘরে ঘরে আলালের দুলাল, তখন কোথায় সেই আত্মস্থতার স্বর্ণঈগল গর্ব, যার জোরে মিলটনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল একাধারে স্বদেশের তথা অংশত নব্য ইওরোপের স্বাধীনতা সংগ্রামে কর্মিষ্ঠ পক্ষগ্রহণ এবং বাণীমূর্তিদান। অবশ্য কারণটা শুধু মাইকেলের নিজের দুর্বলতায়

নয়, সে সময়ের দেশের ইতিহাসেই নির্ধারিত ছিল তাঁর কীর্তির সীমা। বিস্ময়কর হচ্ছে তাঁর কীর্তির বিষয়ে তাঁর নিঃসঙ্গ সচেতনতা ; কারণ বিশ্বসাহিত্যে প্রযোজ্য সমালোচনার মান ও রুচিজ্ঞানে দেশে তাঁর সহচর প্রায় ছিল না বললেই হয় !

মাইকেলের এই ইওরোপীয় রুচিজ্ঞান তাঁর কালে তো বটেই, আজও গ্রাম্যতাদুষ্ট বাংলা দেশে অসামান্য মনে হয়। অন্তত ইওরোপীয় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য বিষয়ে সাক্ষাৎ জ্ঞান তাঁর গভীর ও বিস্তৃত ছিল। বাল্মীকি, ব্যাস ও কালিদাসের সঙ্গে হোমর্‌ ও ভর্জিল, শেক্সপিয়র ও মিল্টন, রাসীন্‌ ও হ্যু'গো এঁদের তিনি জানতেন এবং দান্তে পেত্রার্কা বা তাস্‌সোও তাঁর পরিচিত।

এলিঅট বা আর্ভিং ব্যাবিটের মতো পশ্চিম ইওরোপবাদীরা খুশি হতেন এই ভারতীয় কবির ইংরেজিপনায়। এই ইওরোপীয়-তত্ত্বের কিছু আভাস এলিঅট সাহেব নানা প্রবন্ধে, বিশেষ ক'রে ভর্জিল বিষয়ে প্রবন্ধ দুটিতে দিয়েছেন। পশ্চিম ইওরোপের সভ্যতা বিষয়ে তিনি একটা মোটামুটি ধারণা করে নিয়ে তাকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেন এবং তাঁর মতে এই দুই পর্যায়ের দুটি প্রতিভূ কবি : ভর্জিল আর দান্তে। এলিঅটের ধারণা যে সারা দুনিয়াকে বাঁচাতে এবং ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে এই পশ্চিম ইওরোপের সভ্যতা, যাকে তিনি অন্যত্র বলেছেন অভিজাত শ্রেণীর উত্তরাধিকার, খৃষ্টানও বটে, তবে ঐহিক অর্থে ধর্মাতিরিক্ত মূলত অভিজাত শ্রেণীর। অবশ্য ইওরোপ বলতে এলিঅট ইওরোপের এক অংশ বোঝেন, এমন কি খৃষ্টধর্মতন্ত্র বলতে তিনি গ্রীক বা সীরীয় গির্জা সবই বাদ দেন। তাঁর কাছে তত্ত্বের খাতিরে তথ্য হয়ে যায় গৌণ। এবং খৃষ্টপূর্ব রোমক সাম্রাজ্যের যুগ এবং খ্রীষ্টীয় যুগে সামন্তভিত্তিক মধ্যযুগের ঐতিহ্য তিনি সহজ সংক্ষেপে সংলগ্ন করেন! তাই খৃষ্টোত্তর ব্যবসায়িক যুগকে অর্থাৎ ক্যাপিটালিসমকে তিনি উড়িয়ে দেন "অর্থনীতির সামান্য একটা গোলযোগ" ব'লে। এবং লাতিন ইওরোপ ছাড়া একমাত্র তাঁর ধাত্রীভূমি ইংলণ্ডই এ ইওরোপে স্থান পায়, যদিচ খিড়কি দোর দিয়ে। এমনকি মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানি এবং তার বাণীমূর্তি গয়টেকেও তিনি অপাংক্তেয় রাখেন : কুরটিউস সাহেব এ অন্ধতার উপাদেয় টীকা করেছেন। বলাই বাহুল্য এশিয়া ও আফ্রিকা এ সভ্যতার লাভ থেকে বঞ্চিত, কারণ খাদ্য ও খাদক কখনোই এক নয়। মানবিকতার দিক থেকে এলিঅট অগ্রাহ্য এবং রিচার্ডস্‌ যা বলেছেন, এলিঅটের এলিট বা অভিজাত স্বপ্ন আজকের

জ্ঞানের বিজ্ঞানের সংলগ্নতায় নিতান্তই অসার ভ্রান্ত। তিনি তাই কাপিটালোত্তর নব ইওরোপের বা সভ্যতার স্বপ্ন পরিহার করেন, যদিচ সেই ইওরোপে তথা বিশ্বেই ক্লাসিক যুগ, ধর্মীয় ও সামন্ততন্ত্রী যুগ এবং পণ্যার্থনৈতিক যুগ আর তার পরের সামাজিক যুগের মানব-সভ্যতার সামগ্রিক স্বীকৃতি। যদিচ এই উত্তরণের পথেই ভাবা সম্ভব জীবন্ত মানবসমাজের কথা, ঐক্যে শান্তিবদ্ধ একটি বিশ্বের কথা। এডমণ্ড উইলসনের কথায়, এ স্বপ্নের রূপ দেখা যায় আধুনিক জীবনের মহত্তম গদ্য মহাকাব্য, ডাস্ কাপিটাল পুস্তকে।

মাইকেল ইঙ্গজাগরণের প্রথম দিকে অন্তত চেষ্টা করেছিলেন ইওরোপীয় সভ্যতার এই শৈশব জগৎ ধরবার, যে জগতে পরিণামে স্বর্গনরক বৈপরীত্যের স্বর্ণশৃঙ্খলে মহাশূন্যে আবদ্ধ। তিলোত্তমা কাব্যে তিনিও ভর্জিলের মতো fate বা নিয়তির কথা ভেবেছেন। কিন্তু তাঁর কবিমানসের বাস ছিল ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায়ে এক অত্যন্ত সভ্য কিন্তু ইওরোপতাড়িত দেশে, যে দেশের নাভিশ্বাস উঠছিল ঐ আধুনিক ইওরোপেরই লোভী ও নির্মম খলতার শাসনে শোষণে।

তবে এলিঅট যখন ভর্জিলের কবিত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর জাগরুকতার আলোচনা করেন, তখন তাঁর লেখা মনোজ্ঞ এবং মাইকেল-পাঠকের পক্ষে চিন্তাপ্রসূ,—ভর্জিলের কাব্য জাতীয় জীবনের কাব্য, মানবিক কাব্য, ভর্জিলের ধ্যান ইতিহাস, রোমক ইতিহাস, পশ্চিম ইওরোপের আসন্ন ইতিহাস। মানবেতিহাসের আদিম কাব্যচেতনায় ভর্জিলের মনে হয়েছিল মানুষের জীবনে নিয়তির কথা, মানবিক ভবিতব্যতার কথা : শ্রম, ব্যবহারিক জীবনে ধর্মনিষ্ঠতা বা পিএটাস এবং মানুষের জীবনে ভবিতব্যতা বা ফাটুম। তারপর এলিঅট তোলেন দান্তের পর্যায়, তাঁর আমর্ বা প্রেমের চেতনা ও দিব্যলোকের চৈতন্য।

ভর্জিলের কপাল ভালো ছিল, তিনি জন্মেছিলেন রোমের খাস সৌভাগ্যের মধ্যে, রোমক সাম্রাজ্যের কোনো হতভাগ্য কোণে নয়। তার দান্তে জন্মান সংগ্রামশীল ফ্লরেন্সের গৌরব যুগে। মাইকেল দেখতে পান ঐ শ্রম বা লাবর্ ঐহিক নিষ্ঠাপরায়ণতা আর মানবেতিহাসে ভাগ্যের লীলার শ্বেতদ্বীপাশ্রিত এক নিষ্ঠুরতম পরিহাস। একমাত্র মুক্তির আহ্বান তিনি পেয়েছিলেন কবিতায়, বিড়ম্বিত কিন্তু দুর্দমনীয় কবিপ্রেরণায়। তাই মাইকেলের ব্যক্তিগত ও কাব্যিক জীবন উভয়ত একটি মহৎ ট্রাজেডি, ভারতে ইংলণ্ডের কর্মকাণ্ড যার আরেক নামপত্র। তাই তিনি আমাদের কাছে এক প্রতিভাময় প্রতীক। তাঁর ট্রাজেডি ইঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসের অন্ধকারে মিথ্যা উপমা অনুধাবনের নাটক।

মাইকেল মাতৃভাষায় আত্মগ্লানি মোচন করেন মহাবিদ্রোহের পরেই। শতাব্দীতেও তাঁর প্রতিভান্বিত শিক্ষা আমরা আত্মস্থ করতে পারিনি। অথচ তা যদি করতে পারি তবেই ফিরবে আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি, রচনা করতে পারব ভবিতব্যতার নিশ্চিত ইতিহাস, আমাদের প্রকৃত রেনেসান্স। পশ্চিম ইওরোপের স্বপ্নে আমাদের মুক্তি নেই, না ভাড়াকরা পাপের সন্ধানে, না অস্মিতার জীবন্মৃত ক্লান্তিতে, না সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশী স্বাধীন সংস্কৃতির হাহাকারে।

আত্মঘাতী প্রতিভাবাদ ও পাস্তেরনাক

I am Cinna the poet, I am Cinna the poet, I am not Cinna the conspirator.

কাসিরেরের মতানুসারে ক্লাইস্ট যেমন কান্টের দর্শন ভুল বুঝে ছিলেন, পাস্তেরনাকও তেমনি কাণ্ট-এর বা নব্য কাণ্টিয় দর্শনতত্ত্বকেই ভুল বোঝেন, কারণ পরাবিদ্যা বা মেটাফিজিক্স আর জ্ঞানশাস্ত্র বা এপিস্টেমলজি-কে তিনিও এক ভেবে উদভ্রান্ত হন। ক্লাইসটের মতোই তাঁর অনুবাদক পাস্তেরনাক একটি পাঁচিল খাড়া করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা সংগ্রহের একান্ত সবজেক্টিভ বা বিষয়ীপ্রধান ধরণ আর বিশ্ববিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং তাঁর কবির স্পষ্ট কল্পনার মধ্যে, কারণ কবির কল্পনা চায় প্রত্যক্ষ বস্তুর সত্তাটি ধরতে, সেই বস্তুই হয়ে ওঠে তার উপজীব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরোক্ষ বেদনা। মার্টিন হাইডেগের একেই বলেছেন আর্টের মৌলিক স্বরূপ: যা আছে, যা অস্তি, তারই সত্য নিজেই প্রকৃত বা বাস্তব হয়ে ওঠে।

ক্লাইস্টের কাব্যরচনার কৌশলও পাস্তেরনাকের রচনায় প্রভাব বিস্তার করেছে, যেমন সাপেক্ষ উপাদানবাক্যকে ভেঙে চুরে বিশেষণকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেবার জন্য দূরে স্থাপন। এবং গয়টে আজ থাকলে ক্লাইস্টের মতো পাস্তের-নাককেও তাঁর অসুস্থ প্রতিভা ব'লেই মনে হত। গয়টে বলেছিলেন যে, পরিণত মনের পক্ষে এ রকম সব প্রবৃত্তির প্রচণ্ডতায় কোনো আনন্দ পাওয়া অসম্ভব। বলেছিলেন যে, হতে পারে ক্লাইস্টের বিকাশ হয়তো বা তাঁদের কালের হাওয়াতেই ব্যাহত, কিন্তু কারণ যাই হোক এটা সত্য যে তিনি তাঁর সম্ভাবনা বিষয়ে যে-সব প্রতিশ্রুতি করা হয়েছিল তা কিছুই পূর্ণ করেননি; তাঁর পিত্তোন্মাদে তাঁকে নষ্ট করে দিলে মানুষ এবং লেখক হিসাবে। তাই তাঁর বিখ্যাত নাটকের বিষয়ে গয়টেকে বলতে হয় যে এ অর্থ ও অর্থহীনতার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। এবং পরে অবশ্য ক্লাইস্ট নিজেও পাস্তেরনাকের মতোই ত্রুটি স্বীকার করেন।

কিন্তু কান্টের মতে বস্তুসত্তা তথা তৎসৎ অজ্ঞেয় হলেও এবং সময় বা কাল ও স্থানের সম্বন্ধ নির্ণয় পাত্রের বা মনের মুখাপেক্ষী হলেও বস্তুজগত অজ্ঞেয় নয়

এবং স্থান ও কাল উভয়েই মানবিক অভিজ্ঞতায় দুটি সত্য। কাণ্টের দর্শনে ক্লাইস্ট বা পাস্তেরনাকের মতো অজ্ঞানবাদী সুতরাং কর্মবিরোধী বিলাসের প্রতিশ্রুতি নেই। প্রকৃতপক্ষে এই দুশ্চিন্তার রূপ ও রূপান্তর ঘটে বিষয়-বিশ্বের কাছে বিষয়ীর আত্মবিসর্জনে, চিত্তশুদ্ধিতে, বৈরাগ্যে, বিরিক্তির অধ্যাত্মগ্রহণে। সাহিত্যে এই চিন্তা সঙ্গত প্রকাশ যে পেতে পারে, তার প্রমাণ কম্যুনিস্ট-বিরোধী খ্রীষ্টবাদী রাজতান্ত্রিক ধ্রুপদভক্তে টি, এস, এলিঅটের কবিতা দি ওএস্টল্যাণ্ড অথবা মোটামুটিভাবে ফোর কোআর্টেট্স্। এলিঅটের পক্ষে শেষ অবধি এ রকম কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছে, কারণ এক পক্ষে তিনি ধর্মসাধকদের কাছে পাঠ নিয়েছেন বিষয়ীর প্রাধান্য ত্যাগের মন্ত্র, অন্যপক্ষে মালার্মেপ্রবর্তিত কাব্যজিজ্ঞাসায় তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, যেহেতু কাব্য অরূপ নয় রূপের বাহন, তাই বিষয়ীপ্রধান মনোনিবেশ অর্থাৎ অহমের লোভে সংগ্রহের উঞ্ছবৃত্তিতে নয়, তন্ময়তাতেই সম্ভব প্রতীকের চিন্ময় প্রতিষ্ঠা। চেক্ জর্মান কবি রিল্কের কাব্যসাধনাতেও ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে বঞ্চিত করে এই তন্ময় চিত্তশুদ্ধিই প্রাথমিক পদক্ষেপ। ভালেরির পরোক্ষ-প্রতীকের সন্ধানেও তাই ভোগ্য মাল কেবলই কবিকে ত্যাগ করতে হয়। বস্তুত এই নির্লোভ তন্ময়তাতেই আধুনিক কাব্যের প্রতিজ্ঞা। এই দিক থেকে পাস্তেরনাকের কাব্যসাধনায় বিস্ময়কর নাটকীয়তা ও নৈপুণ্য থাকলেও, বিষয়ীর আদি প্রাধান্যে অর্থাৎ তার নিজের অভিজ্ঞতায় কবির সমধিক লোভে বা আসক্তিতে কবিতাগুলি যথেষ্ট মাত্রায় কৈলাসভাবনা হয়ে ওঠে না। অথচ প্রতীকী কাব্যের কৈলাসে দেবতারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষের যত জটিলই হোক না কেন, মূলত শুদ্ধরূপের ভক্ত, পাস্তেরনাকের মতো খিচুড়ির নয়। এবং এবম্বিধ মিশ্র-ব্যঞ্জনে নৈপুণ্য থাকলেও আর নৈপুণ্য চর্চার প্রচুর সুযোগ থাকলেও, এ শিল্পতত্ত্ব রন্ধনের ক্ষেত্রে মূল্যবান ও বিদগ্ধ-শোভন হলেও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিকৃত সরলতারই পরিচায়ক। এই বিকৃত সরলতার ফলে এঁর কাব্যে কল্পপ্রতিমাগুলি প্রতীকনির্মাণে অপরিহার্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে না, কাহিনীর অঙ্গুলিনির্দেশ রূপকের ইঙ্গিতময়তা পায় না, নন্দনতত্ত্ব জীবনের সামগ্রিকতা পরিগ্রহণ করে না। পাস্তেরনাকের অসামান্য কুশলী কাব্যে কল্পপ্রতিমা তাই 'কনসীট্' বা প্যাঁচ হয়, কাহিনী নিজবেগ হারিয়ে লেখকের বক্তব্যে ঘুরে বেড়ায়, নন্দনতত্ত্ব তাই ভোগীর আত্মসর্বস্ব বিলাসের চমক দেওয়া মুহূর্তগুলির উদ্‌ভ্রান্ত সন্ধান হয়ে থাকে। পাস্তেরনাকের প্রেরণা ও নির্মাণ অভিন্ন নয়। আরিভিস্ত-সুলভ মাত্রাধিক্যে তাঁর কাব্যের আবেগে এসে পড়ে ব্যক্তিগত

ঝোঁকের অতিরিক্ততা, একটা অতিবিচলিত ভাবের যেন প্রতিশোধ নেওয়ার ধরণ, প্রায় একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ, যার ফলে কাব্যাবেগটা নয়, লেখকের মনোভঙ্গীর চটকটাই হয়ে ওঠে মুখ্য।

পাস্তেরনাকের এই অশুদ্ধির জন্য হয়তো ইতিহাস দায়ী। পশ্চিম ইওরোপে জীবনের সুস্থ অসুস্থ কিন্তু সম্পূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট্যে যে সব সুস্থ-অসুস্থ ভাবনাচিন্তা দর্শনে শিল্পে সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ পেয়েছে, সে সব ফুলফল বোধহয় অন্যত্র টবে চাষ করা যায় না। করতে গেলেই এসে যায় বিষয়ীর ক্ষেত্রে সরলীকরণ, বিষয়ের ক্ষেত্রে সামগ্রিক অর্গানিকবোধের স্থলে খুচরোর প্রতি লোভ, যান্ত্রিকতার প্রতি ঝোঁক; অপ্রাসঙ্গিকতায়, গৌণ তুচ্ছতায় নন্দনকাণ্ড হয়ে ওঠে হয় ভাল্‌গার নয় অমানুষিক, অন্তত অশুদ্ধ। পশ্চিম ইওরোপের এক আস্তাকুঁড়ে ভারতবর্ষে ব'সে এটা বোঝা কিছু শক্ত নয়। বাদশাহী রাশিয়ার জীবন নিশ্চয়ই এতটা বিভক্ত এবং এতটা দুর্গত ছিল না বা পশ্চিম থেকে এতটা দূর ছিল না। কিন্তু তবু যেটুকু আমরা জানতে পারি, তাতে মনে হয় রাশিয়ার রোমাণ্টিক, প্রতীকী, ভবিষ্যতবাদী ইত্যাদি সাহিত্যিক নামকরণে তুলনামূলক ভাবে একটা অসারতা আছে। সেরাপিঅন ভ্রাতৃগণ, এপিগনি ও নোভাতরদের লড়াই তাই একটু গৌণ, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড লাগে, একটু গ্রাম্যশহুরে লাগে, পাস্তেরনাকের নাটকীয়তা তাই মনে হয় জীবনের নাট্য নয়, সাহিত্যিক বারোয়ারি পূজার মঞ্চের নাটক-নাটক খেলা। পশ্চিমের সাহিত্যচিন্তায় অর্থাৎ সমালোচনার পক্ষে নিশ্চয়ই এই স্বকীয় তত্ত্বের এইসব খণ্ডিত বিদেশী প্রতিফলন থেকে ভাববার শেখবার কথা বর্তমান কিন্তু আমাদের পক্ষে এই উদাহরণ শিরোধার্য করার আগে দুবার করে ভাববার মতো দৃষ্টান্ত। রাশিয়ার অবশ্য পুশকিন গোগোল থেকে গোর্কি আলেক্সেই তলস্তয় অবধি বরাবর একটা পশ্চিম বিষয়ে জিজ্ঞাসার মন দেখা যায়, সমালোচনাসাহিত্যেও এই সরাসরি তুলনামূলক নকলের বা আমদানির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য মেলে। একালের মুখোমুখি দেখা যায় শুধু আর সাহিত্যের সমালোচকস্রষ্টারা নয়, সমাজকর্মীরাও এ বিষয়ে অর্থাৎ খণ্ডিত সমাজের ভাঙাচোরা পুরুষার্থ বিষয়ে ভাবিত হন।

না হয়ে উপায় ছিল না। কারণ সাহিত্যচিন্তা তো বিষকৌটায় পুরে রাখা যায় না, সমাজ বা জীবনই তার হাওয়ায় সঞ্জীবিত হয় বা ঘুলিয়ে ওঠে; কারণ এ সাহিত্যচিন্তা গোটা মানসকেই চেপে ধরে। অবশ্য পাস্তেরনাকের মতো পশ্চিম-শিক্ষিত মানুষ মাঝে মাঝে সত্যাসত্য স্পষ্টত বোঝেন, তখন তাঁরও মনে হয়

রুচি, নন্দনতত্ত্বের অর্থে, বন্ধন তত্ত্বের অর্থে নয়, নীতির সঙ্গে যুক্ত এবং আবেগ বা হৃদয়বৃত্তিই রুচির শিক্ষক। কিন্তু নীতি মানেই সম্বন্ধ, পারস্পরিক দায়িত্বের বন্ধন, তা সে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হোক বা একে অনেকে হোক। পাস্তেরনাকের এখানেই দ্বিধা, কারণ এ সত্যে ব্যক্তির বিষয়ীপ্রাধান্য সীমিত হয়ে যায়, অনাত্ম্য সত্য গ্রাহ্য হয়, নিজের বাইরে বিষয়জগত স্বতন্ত্র মর্যাদা দাবি করে, তখন আর আত্মসর্বস্ব ভোগবাদীর মুহূর্তবিলাস জীবনের সাধারণ্যে দাঁড়াতে পারে না, তার হৃদয় শুকিয়ে মুমূর্ষু শ্বাস ফেলে।

পাস্তেরনাকের আত্মজীবনী, সমালোচনা, গল্প, কবিতায় এবং সর্বশেষে তাঁর উপন্যাসে এই সমস্যাই নানাভাবে হুঁচোট খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, পাস্তেরনাক বেগতিক দেখলেই ঘোড়া খুলে গাড়ির পিছনে বাঁধেন অথবা সময়বিশেষে বিশেষকে নির্বিশেষ চেহারা আর নির্বিশেষকে বিশেষের চেহারা দেবার চেষ্টা করেন। অথবা আধার ও আধেয় নিয়ে ন্যায়ের কাকতালীয় খেলায় মাতেন। তিনি এ সার্কাসে নিজের নিঃসংশয় দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। এবং দক্ষতা অর্জনে স্বকীয় শক্তিমত্তা ছাড়াও তিনি সাহায্য পেয়েছেন পশ্চিম ইওরোপের সাহিত্য শিল্প দর্শনচিন্তার টুকিটাকি কুড়িয়ে, রাশিয়ার সাবেক আবেগময় মরমী স্লাভ ঐতিহ্যের নাটুকেপনায়; নিজের স্বোপার্জিত একচক্ষু একাকিত্বের স্থূলজগতে রুশজগতের বাদশাহীলোকে যেমন রাসপুতিন উঠেছিলেন, কাব্যের সূক্ষ্ম মননলোকে তেমনি পাস্তেরনাক। টোনিও ক্রোএগেরের মতো তিনিও a bourgeois who stayed off into art, a bohemian who feels nostalgic yearnings for respectability. an artist with a bad conscience.

—"সম্ভবত এটা ঘটেছে একটা মারাত্মক একাকিত্বের ফলে, যেটা প্রতিষ্টিত এবং সজ্ঞানে বর্ধিত করা হল মহাপণ্ডিতীভাবে, ইচ্ছাশক্তি যখন অবশ্যম্ভাবী পথ ধরে তখন যেমন পণ্ডিতীভাব দেখায়, সেইরকম যুক্তিতর্ক বিস্তার করে।" —

উধৃতিটি পাস্তেরনাকের লেখা থেকে. নিজের বিষয়ে দিব্যদৃষ্টির কথা নয়, কথাটা মায়াকৃভস্কির বিষয়ে। কারণ পাস্তেরনাকের সমস্ত লেখায় যে অহঙ্কার ওতপ্রোত, সে অহঙ্কারে কেউ আত্মজ্ঞানের ধারে কাছেও যেতে পারে না। দিব্যদৃষ্টিও এ অহঙ্কারে সম্ভব নয়, লিঅরের ফুলের দিব্যদৃষ্টি সম্ভব পিত্তোন্মাদে নয়, ব্লেকের মতো, হোএলডেরলিনের মতো, স্মার্টের মতো দিব্যোন্মাদে, আত্ম-বিসর্জনে, দিব্যের কাছে আত্মদানে, নিজেকে বার ক'রে দেওয়ায়, এমার্সনের

মতো দিব্যদর্শী তত্ত্বের সন্ধানে।* মার্থা নয়, মেরি ম্যাগডালীনের মতো বিলিয়ে দেওয়ায়। পাস্তেরনাক জ্ঞানপাপী না হলেও একেবারে অজ্ঞান নন, তাই তিনি ম্যাগডালীনের ভক্ত। তাই তিনি মাঝে মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার ছায়ানাট্যও করেন। বা পুতুলনাচই বুঝিবা। এদিকে তিনি সবজেক্‌টিভ বোধের এলোমেলো টুকিটাকি কুড়িয়ে বেড়ান, পূর্বাপর নষ্ট করেন বাক্সটা বা হাঁড়িটা ঝেঁকে ঝেঁকে নেড়ে চেড়ে। অতীত ও বর্তমানকে জোড়েন চৈতন্যের ভবিষ্যতমুখী ত্রিকালে নয়, জোর ক'রে ঠেসে ঠেলে বিচ্ছিন্ন বাক্যের মোচড়ে মোচড়ে। স্থান ও কালকে পাত্রে সংধৃত করেন না, কবিত্বময় শব্দের দড়িতে বেঁধে লাট্টুর মতো পাক দিয়ে দেন। এবং এ-সবই তিনি করেন, অক্ষম অসহায়ের বিনয়ে নয়, গর্বে, ফ্যারিসিদের সেল্‌ফ্‌রাইটিঅসের গর্বে, আত্মগরিমায়, মাতা মেরির সেই খেলুড়ের মতো নয়, আস্তাবলের সেই ক্যাডমনের মতো নয়। কি করেই বা তা হবে? নিকোডিমস্‌ কেবলমাত্র ভীরু ছিল, চালাক ছিল না, তাকেও আবার নাকি জন্মাতে হয়েছিল। পাস্তেরনাক নিকোডিমস্‌ও নন।

পাস্তেরনাকের কবিত্ববিলাসী মনে খণ্ডিতরূপ খৃষ্ট একটি মনবিলাসের উপজীব্যমাত্র। শুধু বিলাসই, কারণ খৃষ্টকে গ্রহণে তিনি কিছু কৃত্যকর্মের প্রয়োজন দেখেন না, এ গ্রহণে কিছু জের নেই, দায়িত্ব নেই। পাস্তেরনাকের মতে কোনো গ্রহণেই কিছু সম্বন্ধ স্থাপনের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ প্রতিভাধর মানুষ একক, নিঃসঙ্গ, সুতরাং একে আরেকে যোগাযোগ আপতিকমাত্র, সম্বন্ধস্থাপক নয়, পূর্বাপরহীন, দায়িত্বহীন। তাই প্রতিভা-মুহূর্তবাদী পাস্তেরনাকের জীবনদর্শনে তথা নন্দনতত্ত্বেও বিশেষ হয় সদাই নির্বিশেষে, যে কোনো বিশেষ যে কোনো ভিন্ন বিশেষের সমতুল্য। সমমূল্যও, এবং যে কোনো একটি বেছে নেওয়া যায় আপতিক ভাবে, তাতেই নাকি অন্তরিত সত্যের, সত্তার বা তৎসত্যের প্রকাশ সম্ভব। তাই কাব্যবিচারের এ কবির মনে হয় যে ইমেজ বা কল্পপ্রতিমাতে আবশ্যিকতা নেই, সেই সবই অন্তর্পরিবর্তনীয়। এমনকি এই ইমেজের আপতিকতাই আর্ট, এই হচ্ছে শক্তিমত্তার অর্থাৎ আবেগের প্রতীক। এ তত্ত্বেরই জের টেনে পাস্তেরনাক পরে তাঁর উপন্যাসে দেখান যে ছন্দও আপতিক, বহিরঙ্গ মাত্র। ঝিভাগো তাই এক ছন্দে কবিতা লিখে আমূল ছন্দ পালটায়, যেমন নাকি গদ্যের শব্দ পালটানো যায়। যেন ছন্দ কবিতার শুধু জামাকাপড়, কবিতার শরীর নয়, এ

* হে বিদেশী ফুল, ১৬২ পৃষ্ঠা

জামা ছেড়ে ও জামা পরলেও চলে। পাস্তেরনাকের ইমেজ তাই কল্পনার উপরতলার খেলা, কন্‌সীট্‌ মাত্র, এ প্যাঁচে না হলে ওটাও চলবে। জীবনের পুরুষার্থেও তিনি এই অসংলগ্নতায় বিশ্বাসী। বীলির তিনি ভক্ত, এঁরা নাকি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত, যদিচ রিলেটিভিটির সাধারণ বা বিশিষ্ট কোনো নিয়মেই অসংলগ্নতার আপতিকতার অঙ্গীকার নেই। তাছাড়া কিঞ্চিৎ গ্রাম্য, পশ্চিমের তুলনায় কিঞ্চিৎ পশ্চাদস্থিত দেশে অর্থাৎ যে-দেশে অধিকাংশ লোক পশ্চিমের তুলনায় পশ্চাদস্থিত এবং কয়েকটি লোক মনে প্রাণে পরবাসী সে-দেশে যা স্বাভাবিক, জারিস্ট রাশিয়ার অন্তিমদশায় অনেক লেখকেই এই ভ্রান্তি দেখা যায়, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের বিশ্ব ঘুলিয়ে ফেলেন, তখন নারীর আসঙ্গ-আকৃষ্ট হলে তাঁরা ভাবেন তাঁরা নিউটনীয় মাধ্যাকর্ষ তত্ত্বের উদাহরণ, পৃথিবী সূর্যের বাঁদী ব'লে তাঁরা ভাবেন যে এ পৃথিবীতে আমাদের কোনো স্বাধীনতা বা কর্ম নেই। দেশের সামাজিক অর্থনীতিক অস্পষ্টতার জন্য দশের পরিশ্রমী বৈদগ্ধ্যও থেকে যায় খাপছাড়া, চাতুর্য মিশে যায় গাঁওয়ার সরলতার অতিবাদে, আত্মসচেতনতা কুপমণ্ডুক থেকে যায়।

এইরকম একটা অতিবিদগ্ধ ছলাকলার সঙ্গে শিশুর মতো সরলতার সংমিশ্রণ পাস্তেরনাকে প্রায়ই পাওয়া যায়। কবিতা গল্প উপন্যাসের ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত ছেড়ে দিয়ে তাঁর একটি ১৯২২ সালের প্রবন্ধ থেকেই উদাহরণ দেওয়া যাক। "কোথায়, কোথায় এই আশ্চর্যের উৎস ?" না, একদা ছিল এক সতেরো বছরের রূপসী মেয়ে মেরি, স্টুআর্ট তার নাম, সে এক হিম অক্টোবরে লিখল ফরাসীতে এক কবিতা, যার শেষ এই কথায় :

যেহেতু আমার কিবা মন্দ কিবা ভালো সকলই তো শেষে মহামরুতে শুকাল।

Car mon pis et mon mieux
Sont les plus deserts lieux.

তারপরে একদা এক তরুণ কবি, সুইনবর্ণ, আরেক হিম অক্টোবরে শেষ করলেন এক প্রকাণ্ড পঞ্চাঙ্ক নাটক ঐ মেরি-স্টুআর্টকে নিয়ে। আবার আরেক হিম অক্টোবরে পাঁচ বছর আগে রুশ অনুবাদক কবি……ইত্যাদি ইত্যাদি…… জানালার ওদিকে, পাহাড়ের পায়ে……শেষ হল যা আর্টে!—হায় আর্ট, হায় অক্টোবর লগ্ন বিচার, হাতদেখা, যত রকম আপতিকবিশ্বাসী তুকতাক এই নাকি আর্টের স্বরূপ, এই নাকি, জীবনের দর্শন।

এই আপতিকদর্শন দিব্যদৃষ্টির বিরোধী, এতে না আছে আবেগের পূর্বাপরতা না আছে পারস্পরিকতার সম্বন্ধ সম্ভাবনা। কার্যকারণহীন পরম্পরাশূন্য এ আত্মবাদে কবিতাও হয় আপতিক যোজনার সঙ্কলন মাত্র, ডিসপ্যারেট এলিমেণ্টসের নক্সা, তা সে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি বা তাদের সংস্থান যতই চটকদার, চমকপ্রদ হোক না। মালার্মে, রিল্‌কে, ভালেরি, ইএট্‌স্‌, এলিঅট, ঈডিথ সিটওএল, অথবা লোরকা, ব্রেখ্‌ট, এলুআর, নেরুদা, মন্তালে আধুনিক কবি কেউই কবিতায় আপতিকের নৈরাজ্য, অসংলগ্নের মাহাত্ম্য মানতে পারেননি। বিশেষ অর্থবহতার জন্য বা অর্থঘনতার জন্য তাঁরা গাঢ়বদ্ধ শুদ্ধির সংক্ষেপের রীতি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বিচ্ছিন্নের নয়। পাস্তেরনাকের কবিতা অনিবার্য সমগ্রের আবেদন আনে না, বারবার আনে নৈপুণ্যের চকিত খণ্ডবিস্ময়, চাতুর্যের চূড়ান্ত ধৈর্যশালী ও শ্রমজীবী চমক। কারণ এ কবির উদ্দেশ্যই তাই, বিলেতী রেস্টোরেশনের কবিদের মতো, কিন্তু ব্যাজহীন নিরেট রুশমরমী বেশে।

আলোর ইঙ্গিত নেই, শুধু ভয়ঙ্কর
গরাসে গরাসে গেলা আর চটিজোড়া ছপ ছপ,
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস, অশ্রুর নির্ঝর—

বাগানে বৃষ্টির বিষয়ে তদগত কবিতা এটি নয়, চটিপায়ে ঐ কল্পনায় আমোদ করাটাই এখানে কবিতার তপোভঙ্গ করেছে। প্রায়ই করে, কখনও বিস্ময়কর ভাবে, কখনও প্রায় উৎরে গিয়ে, যেমন অক্ষম অনুবাদেও বোঝা যাবে এই চমৎকারী কবিতায়:

নক্ষত্রেরা উর্ধ্বশ্বাস। উপদ্বীপ সমুদ্রে উর্মিল।
লবণ ফেনায় অন্ধদৃষ্টি। অশ্রু শুকায় নয়নে।
বাসরে আঁধার জমে। উর্ধ্বশ্বাস চিন্তারা উধাও।
সহিষ্ণু স্ফীংকসও তার কাণ পাতে সাহারার পানে।

বাতি নিবু নিবু। রক্তধারা বুঝি তুহিন নিশ্চল
বিরাট কৈটভ দেহে। ক্রীড়ায়িত ওষ্ঠাধর উবে
স্ফীত হয়ে ওঠে মরুভূর নীল হাসিতে পাণ্ডুর।
রাত্রি নেমে যায় সেই ভাঁটার প্রহরে ডুবে ডুবে।

সমুদ্রেরা আন্দোলিত মরক্কোর হাওয়ায়।
সিমুম বইছে। হিম স্থমেরুর নাক ডাকে ঘুমন্ত তুষারে।

বাতি নিবু নিবু। 'ভাবীকথকের' আদি পাণ্ডুলিপি
শুকায় এবং ওঠে উষা ঐ গঙ্গার দুপারে।

(হে বিদেশী ফুল, ১৪০ পৃষ্ঠা)

কিংবা ধরা যাক্ ঝিভাগো কবির লেখা শীতরাত্রি বা বিচ্ছেদ বা আগস্ট নামক নাটুকেপনার কবিতা, তুলনা করা যাক স্টিভনসের মতো একজন গৌণ মার্কিন কবির সঙ্গেই।* বা এমিলি ডিকিনসন্ বা রবর্টফ্রস্টের সঙ্গে। পশ্চিম ইওরোপীয় মানস এখানে স্বাভাবিক সংহতভাবে অনুসৃত। কিংবা ঝিভাগোর রূপকথা নামক কবিতাটি ধরা যাক: এক অশ্বারোহী লড়াই করতে বেরিয়ে এসে পড়ল এক বনে, একটা ড্রাগন খেতে যাচ্ছে এক সুন্দরী তরুণীকে, হল লড়াই, মারল বল্লম ড্রাগনটাকে, আর অমনি –

1

Tightly closing eyelids.
Heights ; and cloudy spheres
Rivers. Waters. Boulders.
Centuries and years

2

Helmetless, the wounded
Lies, his life at stake.
With his hooves the charger
Tramples down the snake

3

On the sand, together –
Dragon, steed, and lance ;
In a swoon the rider,
Maiden in a trance.

* হে বিদেশী ফুল, স্টিভনস্ : ১৭৯ পৃষ্ঠা

4

Blue the sky ; soft breezes
Tender moon caress.
Who is she ? A lady ?
Peasant girl ? Princess ?

5

Now in joyous wonder
Cannot cease to weep
Now again abandoned
To unending sleep

6

Now his strength returning,
Opens up his eyes ;
Now anew the wounded
Limp and listless lies

7

But their hearts are beating
Waves surge up, die down,
Carry them, and waken
And in slumber drown

8

Tightly closing eyelids.
Heights and cloudy spheres
Rivers. Waters. Boulders.
Centuries and years—

লক্ষ্য করবার মতো চাতুর্য, পাঠকের মনকে চমকে চমকে ছড়িয়ে দেবার

প্রচেষ্টা, পূর্ণচ্ছেদের ভারীক্কি নাটকীয় ব্যাবহার। Heights; and cloudy spheres. Rivers. Waters. Boulders. Centuries and years. এই জেটপ্লেনবিহারী লুপিং দি লুপেও যদি পাঠক চমৎকৃত না হয়, তাই আবার শেষে স্তবকের পুনরাবৃত্তি, চমকগুলো হাতুড়ি পিটিয়ে পাঠকের মাথায় গাঁথবার প্রয়াসে। কোন্ এক মার্কিন ভদ্রলোক নাকি এর এক প্যারডি করেছেন :

Ulysses. The Vikings. The Armada. The Titanic.
Snowballs. Baseball. How time ages.
The nebulae. The suns. The Earth. Sputnik.
Dr Zhivago rages and Hippo enrages,

দ্রষ্টব্য যে, পাস্তেরনাকের ফ্যাস্সিবাদী কনসীটেড কাব্যে কন্‌সীট আছে, কিন্তু ইংরেজ কনসীটসাধক কবিদের মতো বুদ্ধির আত্মসচেতনতা নেই, পাস্তেরনাকের লেখায় কোনো উইট্ বা নাগরিক বৈদগ্ধ্য নেই, আয়রনি নেই; ব্যাঙ্গোক্তির উভবল গভীরতা এই রোমাণ্টিক কবির মধ্যে একেবারে অনুপস্থিত। এঁর কাব্যলক্ষ্মী রামগরুড়ের ছানার মতো আত্মজিজ্ঞাসার হাস্যে বঞ্চিত। তাই আত্মগরিমায় এই রকম সরল পণ্ডিতমূর্খশোভন বালোচিত বাণী পাওয়া যায়, কাব্যবিচারের প্রসঙ্গে আসে এই নাটকীয় গোটা শেষ প্যারাগ্রাফ : All this is unusual. All this is absorbringly difficult, পাঠকরা যাতে বিমূঢ় স্তম্ভিত হয়ে যায়। অথচ কোলরিজের জীবনিকার সাহিত্যকার চেয়ে বেশি অসামান্য বা মনোনিবিষ্ট জটিল অন্তর্দৃষ্টি তিনি কুত্রাপি দেখাননি। ঐ কবিতাই যদি ভাবা যায় : মৃত্যু ও প্রেমের মিশ্র কাব্য তো দান্তের ফ্রাঞ্চেসকাপর্বে পাওয়া যায়, ওভিডেও পাওয়া যায়, ভর্জিলেও। অথবা শেকসপিঅরের ভিনাস ও কীট্‌সের রূপকথা : সেই নির্দয় সুন্দরীর কবিতা। আর মনকে যদি ভূগোল জ্যোতিষে ছড়াতেই হয় তাহলে লুসির মৃত্যুর কবিতাই মানদণ্ড নয় কেন, যেখানে লুসির দেহ চিরতরে rolled round in earthe's diurnal course. With rocks and stones and trees.

পাস্তেরনাকের নিজের মতে মায়াকভস্কির সঙ্গে মেলামেশার ফলে তিনি নাকি রোমাণ্টিক ধরণ ত্যাগ করলেন। "কিন্তু আমি ধরণটা ত্যাগ করলেও রোমাণ্টিক ধরণের পিছনে উহ্য থেকে যায় একটা গোটা জীবনদর্শন। এ দর্শনে জীবন হচ্ছে কবির জীবন। এ ধারণা আমরা পেলুম প্রতীকীদের কাছ থেকে, এবং এটা গৃহীত হয়েছিল রোমাণ্টিকদের, মূলত জর্মানদের কাছ থেকে।'

'কিন্তু এই কবিপুরাণের বাইরে এলেই রোমাণ্টিক ছকটি মিথ্যা হয়ে পড়ে। কবি এই পুরাণের বা দর্শনের ভিত্তিকেন্দ্র এবং কবিকে ভাবাই যায় না অকবিদের পরিপূরক ভিড় ছাড়া······রোমাণ্টিক মানসে সর্বদাই দরকার ফিলিস্টাইনের অস্তিত্ব এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকলে রোমাণ্টিসিসমের অর্ধেক কাব্যবস্তুই উবে যায়।' তখন অগত্যা রচনা দুর্লভ হয়ে পড়ে, পরিশ্রমী চমকসৃষ্টিতে মন দিতে হয়, ব্যাকরণের খেলায় মাততে হয়।

অবশ্য মালার্মে খুবই কম লিখেছিলেন, র‍্যাঁবো মোটে ১৭ থেকে ১৯ বছর; ভালেরি ২০ বছর ধরে কবিতাই লেখেননি, সেটা বোঝা যায়, অসাম্যবাদী গণতান্ত্রিক দেশে লেখক স্বাধীন, ইচ্ছা হলে লেখেন, যেমন অন্তত্র এলিঅট্। কিন্তু অনেকের মনে হয় পাস্তেরনাকের প্রেরণার দুর্লভতার জন্য দায়ী সোভিএত সমাজ, কেন তারা ফিলিস্টাইনদের নিম্নমধ্যবিত্তদের দূর করে দিয়েছে, কেন তারা ঠগ বেছে গাঁ উজাড় করে দিয়েছে, যে গাঁয়ে কবি মোড়ল হতে পারত? গোর্কির মতন রোমাণ্টিকের বৈপ্লবিক রোমাণ্টিক রূপান্তর পাস্তেরনাকের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর রোমাণ্টিকতার গৌণতার জন্যই। কিন্তু তিনি সত্যিই কিছু কম লেখেননি, কারণ তাঁর ন-দশটি কবিতার বই বেরিয়েছে, শেষেরটি ১৯৪২-এ এবং সম্প্রতি একটি ছাপতে গেছে বা যাচ্ছে।

২

আগের আলোচিত সব দুঃখযন্ত্রণার সমস্যা এতদিনে পাস্তেরনাক্ সংগ্রহ করে তাঁর জাদুঘরে সাজিয়েছেন, নাম দিয়েছেন উপন্যাস: ডাক্তার ঝিভাগো। আগেকার অনেক অস্ফুট অশরীরী চিন্তাভাবনা এবারে সশরীরে অন্তত অর্ধমৃত বা মৃত শরীরে উপস্থিত হল উপন্যাসের মাধ্যমে।

আমি পাস্তেরনাকের সাবেক পাঠক, তাঁর গদ্য ও পদ্য লেখা অনুবাদের জিজ্ঞাসু চেষ্টাও করেছি। সোভিএত দেশে কেন এই "কবির কবি"-র নিজের থেকে দেশের 'সাধারণের কবি'তে বিকাশ সম্ভব হয়নি, সে কাব্যিক সমস্যা আমায় বরাবর ভাবিত করেছে, অথচ জানি যে তিনি শৌখীন রচনা সত্ত্বেও সোভিএত দেশে বহু প্রশংসিত বহুপঠিত কবি, অনুবাদক তো বটেই। তাই খুবই আগ্রহে উপন্যাসটি পড়লুম, বিশেষ করে ইওরামেরিকায় বহু সমালোচনায় সে আগ্রহ ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল। শেকস্‌পিঅরের তুল্য, এপিক ঐতিহ্যের তুল্য, তলস্তয়ের তুল্য, দস্তএভ্‌স্কির তুল্য, পুশকিনের লের্মন্তভের তুল্য, আবার প্রুস্তের সমান, এমন

কি ভর্জিনিআ উলফেরও, কতই না প্রলাপ শোনা গেল ; আবার তুল্য নয় সে বিলাপও কম হয়নি। এমনকি ক্লাইস্টেরও নয়, য়ুএনগেরের সঙ্গেও নয়।

কিন্তু সত্যিই কি চাষীমজুরদের একছত্র শাসন রুচির স্বায়ত্তশাসনের পরিপন্থী? অর্থাৎ বুর্জোআ শাসনের চেয়ে ক্ষতিকর? উইলিঅম মরিসের মতো সৌন্দর্য-ভক্তেরাও তা মনে করেননি। অর্থনীতি ও সমাজনীতির অনেক আমেরিকান অধ্যাপকেরাও তা মনে করেন না, কেনাবেচার উন্মাদ প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে সফল ও স্বচ্ছল দেশে বরং তাঁরা মনে করেন যে সমস্ত ধনগণতান্ত্রিক স্বাধীনতাই মনের সংহতিতে সংবেদ্যতায় ভাঙন ধরায়, সুরুচির ও স্বাস্থ্যের পরিপন্থী হয়ে ওঠে, তাই স্ট্যানফোর্ডের অর্থনীতির অধ্যাপক পল বারানের ভাষায় with bourgeois taboos and moral injunctions internalised, people steeped in the culture of monopoly capitalism do not want what they need and do not need what they want, তাই ব্যবসায়িক ও সাংবাদিক প্রচার বিজ্ঞাপনই আজ মেশকানিন সুরুচি-কুরুচির নন্দনবিধাতা। আজ চোখ ও কান এবং স্নায়ু নিত্য আহত, অন্তর ও বাহিরের নিস্তব্ধতা অর্ধমৃত। ওআর্ডসওআর্থের ভাষায়, শুধুমাত্র স্থূল ও প্রচণ্ড উত্তেজকেই এ সমাজে লোকের তৃপ্তিলাভের অভ্যাস হয়ে যায়। তবে ওআর্ডসওআর্থের সেকালেই মনে হয়েছিল that the time is approaching when the evil will be systematically opposed, by men of greater powers, and with far more distinguished success.

উপন্যাসটি প'ড়ে ভীষণভাবে আশাভঙ্গে ভুগতে হল। এ উপন্যাসে তলস্তয়ের মাহাত্ম্যের নামগন্ধও নেই, এতে কোথায় পুশকিনের প্রতিভার ছাপে ছাপে পরিমিতি, দস্তএভস্কির দিব্যোন্মাদের অনিবার্য তীব্রতাও এ বইএর অনায়ত্ত, তুর্গেনীভের সংযত সৌন্দর্যের বিষাদই বা কোথায়? এমনকি এপিক ঐতিহ্য আলেকসেই তলস্তয়ের মানবিক গভীরতা বা শোলোকভের নির্মম ঐতিহাসিকতায় যে সার্থকতায় রূপায়িত, তার আভাসমাত্র এখানে নেই। তবে কি পাস্তেরনাকের চেষ্টা ছিল ভর্জিনিআ উলফের মতো গীতিকাব্যত্ব অর্জন? টু দি লাইট-হাউস বা ওএভ্সের মতো? কিন্তু শ্রীমতী উলফ্ তাঁর নিজের সীমা প্রথম কটি উপন্যাসেই বুঝেছিলেন এবং স্বামীর নিষ্ঠার সাহায্যে নিজের শক্তি অনুসারে সীমায়িত সৌখীন শিল্পরূপের পরীক্ষায় মন দিয়েছিলেন। ছোট পরিসর, ছোট উদ্দেশ্য নিয়ে তাই তিনি এমন সৌখীন উপন্যাস লিখতে পারলেন, যা হল নতুন এবং সার্থক রূপের উপন্যাস। তাঁর বাতিঘর অথবা তরঙ্গমালা সেইদিক থেকে প্রতীকী কবিতার তুল্য কাহিনী।

মূল চরিত্র এ জগতেরই গৌণতায় রূপ পায় ইঙ্গিতে, পরোক্ষে, মালার্মের কবিতায় মূল অর্থের বা সমগ্র প্রতীকটির মতো ঢেউ এখানে পরোক্ষে মেশে ছটি চরিত্রের পরিবেশে। অবশ্য পাস্তেরনাকও এই পরোক্ষ চরিত্র চিত্রণের চেষ্টা করেছেন, পার্সিভালের মতো ইভ্‌গ্রাফ্‌ চরিত্র, প্রকৃতিকেও তিনি স্থানে অস্থানে বারবার ব্যবহার করেছেন মানবগীতির ধুয়া হিসাবে। কিন্তু এ ব্যবহারে নির্লোভ পরিমিতি নেই, প্রকৃতির ব্যবহার এত বেশি হয়েছে যে তার অর্থের বিন্যাস মুছে যায়, আর ঈভগ্রাফ্‌ শুধু স্বর্গীয় হস্তক্ষেপের যন্ত্র বা দেউস্‌ এক্‌স্‌ মাকিনা হয়ে যায়। এবং উপন্যাসের স্বজাত-জগত এবং খুচরো প্যাঁচ খাপছাড়া থেকে যায়! সেকালের ইতিহাসে নাট্যে সাধারণ মানুষ ছিল কোরসের মতো, তাই দেবতারা ছিলেন প্রয়োজনীয়। উপন্যাসের ব্যক্তিযুগে এল নায়কনায়িকাদের প্রাধান্য মানবিক স্বায়ত্ত শাসন। কিন্তু উপন্যাস যখন বিপ্লব বা একটা দেশের সমস্ত সমাজ নিয়ে ব্যস্ত হয় তখন ব্যাপারটা হয় জটিল, কোরস ও দেবতা দুই-ই হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ, ব্যক্তি হিসাবে ও সমাজ হিসাবে উভয়ত। পাস্তেরনাক এই উপন্যাসের নবজগতে দিশাহারা।

আসলে লেখকের মতি স্থির নেই। বইটার আরম্ভ সাবেকী উপন্যাসের চালে, নায়কের শৈশব থেকে। নাটুকে আরম্ভ: ধর্মসংগীত চলেছে, গায়করা থামলে তাদের পায়ের শব্দ, ঘোড়ার আর হাওয়ার ঝাপটে যেন তাদের গান চলেছে ঠিক। কার কবর হচ্ছে হে? ঝিভাগোর। ও তাই বলো। কর্তার নয় গো, গিন্নীর। তা সে একই ব্যাপার শেষ অবধি, ভগবান তাঁর সদ্গতি করুন, বেশ জমকালো অন্ত্যেষ্টি বটে।

তা সে একই ব্যাপার বটে, সবই এক। শুধু অন্ত্যেষ্টিটাই জমকালো। ঝিভাগোর মায়ের। এবং পরে ঝিভাগোর। পাস্তেরনাকের পক্ষে যেমন জমেছিল মায়াকভ্‌স্কির,* সেই একই চালে আবার ঝিভাগোর অন্ত্যেষ্টি।

যাহোক, ধর্মকর্ম সম্পাদিত হল, কাফুন বন্ধ করা হল, নামানো হল। মাটির ঢিপি উঠল এবং একটি দশ বছরের বালক তার উপরে লাফিয়ে উঠল, তারপরে না সে বক্তৃতা দিলে না, কেঁদে ফেলল।

আমাদের এই নায়ক ঝিভাগো। নাটকীয় আরম্ভ, কিন্তু এর কোনো সংলগ্নতা লেখক দেখাননি, এ শুধু খণ্ডচিত্র, এ যেন ঘটনা সর্বস্ব-সাংবাদিক ফিল্মে আইসেন-

* সাহিত্যপত্র: শান্তি বসু -কৃত অনুবাদ

স্টাইনী স্থিতচিত্রের মাহাত্ম্য। তারপরে মামা নিকোলাই, বহুধাবিচিত্র চিন্তায় অস্থির, মানুষ ভালো, পাস্তেরনাকের মতোই তাঁর চিন্তারাশি একটু বেরদাইএভ্-মার্কা, আধা-রাজনীতিক, আধা-মরমীয়া! তারপরে বাপ, ক্রোড়পতি উড়নচণ্ডী স্ফূর্তিবাজ দুশ্চরিত্র ঝিভাগো। স্বামীস্ত্রীর ছাড়াছাড়ি, স্থায়ী গৃহ নেই, নায়ক মানুষ হল against this untidy background. হঠাৎ সব গেল। ওরা গরীব হয়ে গেল। তারপরে মামার দার্শনিক আলাপ, পাভেল নামে চাষীকোচম্যানের সঙ্গে। য়ুরা অর্থাৎ বালক ঝিভাগোর ভালো লাগে তার মামার সঙ্গ; তার মায়ের মতোই নাকি মামার মন স্বাধীনভাবে চলে এবং ফিলিস্টাইন বা নিম্ন-মধ্যবিত্তেরা যাতে ভয় পায়, সেই অপরিচিত চিন্তাতে নাকি তিনি নন্দিত। তাঁর মনে নাকি অভিজাতসুলভ সমানবোধ আছে সর্বজীবে। য়ুরার তাই দুপ্লিআংকায় মামার সঙ্গে যেতে ভালো লাগে, তার মায়ের কথা মনে পড়ে, তিনিও প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন আর তাই গ্রামদেশের পথেঘাটে মাঝেমাঝে তাকে বেড়াতে নিয়ে যেতেন!

প্রকৃতিপ্রেমিক পাস্তেরনাকও, তাঁর কবিতাতেও তিনি আমাদের অরওএলী গোল্ডেন কান্ট্রিক মাঠেবাটে বেড়াতে নিয়ে যান। এই তার প্রকৃতি, সভ্যভব্য-জীবনের পটে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ, উইনস্টন স্মিথের চড়িভাতির অলঙ্কার। লুক্রিসিঅস, ভর্জিলের প্রকৃতি নয় অথবা একালের ওআর্ডসওআর্থের প্রকৃতি এ নয়, যে প্রকৃতিতে মানুষই অধিষ্ঠিত, যার সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয় মানব-জীবনের যন্ত্রপণ্যযুগের সমাধান। লেখক ইতিমধ্যে নায়কের খড়কুটা স্বভাবের সঙ্গে মামার দর্শনকে এক ভেবে সব ঘুলিয়ে ফেলেন, দর্শনটা অবশ্য ছেঁড়া জামার মতো খসে পড়ে, নায়কের খড়কুটাত্ব মৌলিক হয়ে থেকে যায়। বলাই বাহুল্য এই খড়কুটাত্ব কীটসের কবিস্বভাবের নেতিমূলক সদাসম্ভাব্যতা নয়, কারণ তাতে সমবেদনায় সম্বন্ধ সবসময়ে স্বীকার্য। আসলে ঝিভাগো কিছুই নয়, সেই বাজে লোকটা প্লাটনভও নয়, অব্‌লমভও নয়। ওবিভাটেল বা ফালতু লোক তো সে নয়ই, কারণ লেখক সবিস্তারে সযত্নে বরাবর বলেছেন যে সে অসামান্য ব্যক্তি। বিরাট চিন্তাবীর, প্রচ্ছন্ন দার্শনিক, মহাকবি, মহাবৈজ্ঞানিক, বিরাট ডাক্তার, বিরাট প্রেমিক। কিন্তু তবু সে ট্রাজিক নায়ক হয় না, কারণ তার কোনো চারিত্রিক প্রতিরোধ বা সত্তাই নেই, তার না-আছে কার্যকারণ না-আছে পূর্বাপরপরম্পরা, সে শুধু অসম্বন্ধ আপতিক ঘটনার ভাবনা চিন্তার জট পাকানো খড়কুটা, কিন্তু অসামান্য পুরুষ, সমস্ত সমাজের বিরুদ্ধে তার হাওয়াই ফুৎকার। সেই নাকি ইতিহাস, খ্রীষ্টের জন্ম থেকে সেই একমাত্র ইতিহাস।

ভীষণ নাটুকে ছেলে, ইতিমধ্যে ভীষণ অকালপক্কভাবে প্রার্থনা করে তার মায়ের সদ্গতির জন্য, দড়াম্ করে মূর্ছায় পড়ে যায়। অবশ্য অচিরেই সম্বিত ফিরে পায়।

এরই মধ্যে মধ্যে পাস্তেরনাকের শুভবুদ্ধি এবং লেখনীর নৈপুণ্য ঝিলিক দেয়, যেমন এইখানে ২১ পৃষ্ঠায় :

all the movements in the world, taken separatly, were sober and deliberate but taken together, they were happily drunk with the general flow of life which united and carried them. People worked and struggled, they were driven on by their individual cares and anxieties, but these springs of action would have run down and jammed the mechanism if they had not been kept in check by an overall feeling of profound unconcern. This feeling came from the comforting awareness of the interwovenness of all human lives, the sense of their flowing into one another, the happy assurance that all that happened in the world took place not only on the earth which buried the dead but also on some other level known to some as the kingdom of God, to others as history.

কিন্তু লেখকের লব্ধ জ্ঞানের আকস্মিকতা ও রচনার কর্মের মধ্যে যোগ থাকে না।

এরপরে আসে গর্ডনরা, মিশা ও তার বাপ, ইহুদি সমস্যার প্রতীক। সারা উপন্যাসে এ-সমস্যার সমাধান নেই পাস্তেরনাকের সভ্য খ্রীষ্টিআনির অসহিষ্ণু অন্ধকারে। মনে পড়েছে এর ঠিক উল্টো যুক্তি জাক্ মারিতঁ্যার ইহুদি সমস্যার পুস্তকে, যীশুর জন্যই, খ্রীষ্টধর্মের জন্যই ইহুদির ইহুদিত্ব মান্য। বস্তুত, ইহুদিদের বিষয়ে এ-রকম নিষ্ঠুর মতামত কোনো সভ্য সৎ লেখকে পাওয়া দুর্লভ, যেমন পরে ঝিভাগোর সঙ্গে লারার প্রেমালাপের মধ্যে মহিলাটি হঠাৎ চিরন্তন ইহুদি সমস্যা বিষয়ে যে বাণী দেন তাতে স্পষ্ট এই হৃদয়হীন জেণ্টাইল গোঁড়ামি। তারপরে এল নিকি। সমানেই আসে চরিত্রের পর চরিত্র, যেমন আসে তলস্তয়ের যুদ্ধ ও শান্তিতে, কিন্তু প্রায়ই এরা হয় আকস্মিক, উপন্যাসে তাৎপর্যবর্জিত। সময়ে সময়ে অবশ্য এপিক্ উপন্যাসের রীতিতে চরিত্রগুলি উপন্যাসে গ্রন্থিবদ্ধও

হয়, তাই এবারে এসে পড়ি গুইশার জগতে, আমালিআ রদিঅন ও লারিসার জীবনে। এই লারিসাই বড় হয়ে হবে লারা, লেখকের মতে অতুলনীয়া নায়িকা, এবং আসে চিরবজ্জাত কোমারভস্কি। তিভেরজিনরাও আসে, আন্তিপভ্‌রাও, যারা উপন্যাসের অংশীদার। কিন্তু অনেক চরিত্র আসে এবং অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তু আসে যা অপ্রাসঙ্গিক। এবং তার চেয়ে বড় কথা, মূল চরিত্রগুলিই থেকে যায় অস্পষ্ট, অশরীরী। আর সবটাই একেবারে মহাভারীকি হাস্যহীন, মাঝে মাঝে যেটুকু তিক্ত ব্যঙ্গ জোটে, তা শুধু বিপ্লবীদের বিষয়ে প্রযুক্ত বলেই আসে, যেমন প্রথমদিকেই, ৪১ পৃষ্ঠায়। বরং খানিকটা স্পষ্টতা পেয়েছে এরপরে ঝিভাগোর ভাবী শ্বশুরবাড়ির ছবি, কেমিস্ট্রির অধ্যাপক গ্রোমেকোর পরিবার! পরে ইনিই কৃষি অর্থনীতিক ব'নে যান, অন্তত সোভিএত সরকার তাঁকে এই পদে ডাকে,—এও কি ব্যঙ্গ না লেখক ভুলে গেছেন কি আগে লিখেছেন?

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে বারবার এই কথাই মনে হয়, যে লেখক আগে কি লিখেছেন তা ভুলে গেছেন, কারণ পাস্তেরনাকের বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ করা বা তাঁর ভীমরতি হয়েছে এটা ভাবাও সম্ভব নয়। তবু এই গ্রোমেকো পরিচ্ছেদকটিই জীবন্ত হয়েছে, ১৯০৫ এর পরে ১৯১৮'র আগে। বোঝা যায় লেখকের মন পড়ে আছে এই জগতে, সেই মুনির ইঁদুরের মতো। তখন মাঝেমাঝে নায়কের নাটুকেপণা ও অসুস্থতার বিষয়ে হঠাৎ লেখক আশ্চর্য মনোযোগ দেন, যেমন নেক্রোফিলিআ বা শবাসক্তি ও কাব্যের প্রসঙ্গে, লাসঘরের আধাঅন্ধকারে ডুবে-মরা মেয়েদের আর তরুণ আত্মঘাতীদের উলঙ্গ শরীর সব ফসফরের মতো ভাস্বর, ফটকিরির সুঁই দিলে সেগুলি আবার নিটোল দেখায়। এবং ফলে ঝিভাগো কবিতা লেখে। কবিতাগুলির 'জন্মের পাপ' সে ক্ষমা করে সেগুলির তেজী ও স্বকীয়ভাবের খাতিরে। কারণ উৎকর্ষ নয়, সুস্থ স্বচ্ছ মনোভাব নয়, স্বকীয়তাই বুর্জোআ কবির অসামান্যতার কাম্য। এবং ঝিভাগো তো অসামান্য লোক। এই পৃষ্ঠাতেই তাই সে মামার মতামতের প্রভাবে বিকাশলাভ করে, কিন্তু মিশা গর্ডনের বিকাশ বন্ধ হয়ে যায় কারণ সে ইহুদি। তাই ঝিভাগো ভাবে সেটা মিশার ইহুদি জন্মের জন্য; তাই সে ভাবে—ঝিভাগো ভাবে!—মিশা যদি আরো প্রত্যক্ষধর্মী বা অনুভবৈকপ্রামাণ্যবাদী হত, আরো জীবনের কাছাকাছি থাকত! যদিচ ১১১ পৃষ্ঠায় এই মিশাই দেখি, realised that it was immoral to look on idly while other people suffered with courage, to look on at their superhuman striving to overcome

their fear of death and to see what they risked and paid for it. But he did not think that merely crying over them was any less immoral. He believed in behaving simply and honestly, according to the circumstances in which life placed him.

কিন্তু ঝিভাগোর মতবাদ অকর্মক এককসর্বস্ব। এবং লেখকের পক্ষপাত তার পক্ষে, এ লেখকের কোনো আয়রনি নেই।

তারপরে সভেন্তিৎস্কিদের ক্রসমাস পার্টি। চমৎকার অধ্যায় ভাবী শ্বাশুড়ী আনার অসুখ ও নায়কের কথা—

But what is conciousness let's see. To consciouslv to go to sleep is a sure way to upset the stomach. Consciousness is a poison when we apply it to ourselves. Consciousness is a beam of light directed outwords. It lights up the way ahead of us so that we don't trip up. It's like the the headlamp on a railway engine, if you turned the beam inwards there would be a catastrophe.

শুভ সাধারণবুদ্ধির কথা, যদিচ মরণাপন্ন মহিলাকে এত কথা বলাটা সমীচিন নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু ঝিভাগোর নিজেরই এসব ভালোভালো কথা মনে থাকে না। অতঃপর চলল গল্পের এলোমেলো জলস্রোত, নদী খাল মরানদী মজানদী কানানদী নালানর্দমা। মাঝে মাঝে নাটুকে, মাঝেমাঝে অবান্তর, মাঝেমাঝে স্পষ্ট অথবা কবিত্বপূর্ণ, সবসুদ্ধ মোটামুটি নিষ্প্রাণ। ইতিমধ্যে জ্ঞানের বহর থেকে থেকে প্রকাশিত হয়, ছোট ছেলের মতো বা পাশকরা আধাশহুরে ছেলের গ্রাম্য-বাবার মতো; যেমন যুরি ঝিভাগো চোখের উপর কাজ করে থীসস্ লিখে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক পেল, লেখক বলছেন তাতো পাবেই কারণ সে তো নিজে স্রষ্টা আর তার কাজের ঝোঁকেই সে আর্টের ইমেজরি বা কল্পপ্রতিমালক্ষণ ও চিন্তাভাবের স্নায়ে ভাবিত, সুতরাং চোখের শারীরতাত্ত্বিক গবেষণা তার ভালো তো হবেই। রিচার্ডস অগডেনদের পণ্ডিতম্মন্য অক্ষিবিজ্ঞান বিষয়ে (সাইকি পত্রে ?) আলোচনা বা অমনি কিছু লেখকের হয়তো মনে ছিল, কিন্তু তার একি গ্রাম্য প্রয়োগ।

ইংরাজীতে একে বলে শার্লটানিসম বা অপোগণ্ড কোবিদপনা। যার আরো প্রমাণ আছে : ঝিভাগো নিদারুণ নিদানতাত্ত্বিক ডাক্তার, রোগ ধরে সে অব্যর্থ-

ভাবে, কিন্তু সে নিজেই বলে যে লোকে ভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিজ্ঞান! মোটেই তা নয়, সে যে রোগ নির্ণয় করে সেটা তার অন্তর্জ্ঞান, ইনটুইশন! ঝিভাগোর মহামূল্য জীববিদ্যার রিসার্চও এই স্তরের : জীবজগতে মৃত্যুই জীবন কারণ কবরে কি গাছ ঘাস গজায় না? অবশ্য হার্ডিও এ নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তত্ত্ব তৈরি করেননি। ঝিভাগোর আরেক কাজ হচ্ছে মানবজগতের মতো জীবজগতে মাইমেসিস্ বিষয়ে, আরিস্ততল থেকে আউএরবাখ্ সাহেব কামুফ্লাজের এ ব্যাখ্যায় মূর্ছা যাবেন, কিন্তু ঝিভাগোর বিস্ময়কর আবিষ্কার এই : জন্তুরা যে পারিপার্শিক থেকে আত্মরক্ষায় রং নকল করে, সেই নাকি মাইমেসিস বা অনুকারবৃত্তি? এই শার্লাটনিসমই উপস্থিত ঝিভের শিল্পজীবনতত্ত্বে, যেখানে মৃত্যুই প্রধান। এক জায়গায় (১১৬ পৃষ্ঠায়) নায়ক সাহিত্য বিচারে নেমে পাস্তেরনাক-ধর্মী লেখকদের আক্রমণ করছে, সেটা লেখকদের অজ্ঞাতসারে হলেও আয়রনির আস্বাদ জোগায়! এবং এর জবাবে উদারমতি বিপ্লবী মিশার জবাব প্রণিধানযোগ্য।

তারপরে বিপ্লব।

অতীতকে বিদায়। এই হল পরের অধ্যায়ের নাম। ঝিভাগো মহা উত্তেজিত, বিপ্লবের সে ভক্ত, বিলেতী হলদে-বই যুগের কবি সে, লায়োনেল জনসনের মতোই তারও মনে হয় could we but live at will upon the perfect height – আহা শুধু যদি বিপ্লবই থাকত চিরটাকাল, উত্তেজনার চূড়ায় কাটত দিনরাত, মাস বছর। কারণ পাস্তেনাকের দরকার, যাকে ওআর্ডসওআর্থেরা বলেছেন outrageous stimulation উৎকট রোমাঞ্চ, থ্রিলস্। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনটাই বিচ্ছিরি ১৩৬ পৃষ্ঠায় ঝিভাগোর বক্তৃতা স্মরণীয়। এই মেজাজের কবিতা আমরা স্বয়ং পাস্তেরনাকের কাছ থেকেও পেয়েছি : আমরা মানুষ নয় আমরা সব আস্ত যুগ we are not men, we are epochs কারণ,

> We are few, perhaps not more than three,
> Flaming, infernal, from the Don
> Beneath a sky racing and grey,
> Of ruin, clouds, soldiers bent upon
> Soviets, verses and long talk
> Of transport and the artist's work

কিন্তু মনে রাখতে হবে এই যে মহান মনোরম বিপ্লব এটা ঘটল ভুলের ভিত্তিতে, আপতিক ঘটনায়। তবে হ্যাঁ এর পিছনে প্রতিভাও আছে বটে, প্রতিভার ভুল,

এমনি ভুল নয়। মনে পড়ছে লেনিন বিষয়ে কবির নিজের কবিতা রচনা। লেনিন নাকি প্রায় পাস্তেরনাকের মতোই প্রতিভাধর ছিলেন। একজাতের ছিলেন।

বিপ্লব বেশ ভালো, উপভোগ্য অভিজ্ঞতা, ভোগ্য দৃশ্য। ভালো খাবার যেমন, কিন্তু তারপরে রান্নাঘর ধোয়া বাসনমাজা ঘর গোছানো—এটা বড় বাজে। এর পরের কাহিনী সেই কথাই বলছে, নানা বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে নানা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় মালমশলা ছড়িয়ে, সাম্যবাদীদের নানাভাবে হেয় করে। অবিশ্রাম বিপ্লবী বা চরমপন্থী লোক সব যায় আসে উপন্যাসের পৃষ্ঠার পর ক্লান্তিকর পৃষ্ঠায়; তারা সবাই হয় হৃদয়হীন বর্বর না হয় বদমাস। ঘটনাবিন্যাসও হয় সেইভাবে, শুধু সবই, কি চরিত্রচিত্রণ কি ঘটনাবিন্যাস সবই হয় অত্যন্ত অন্যমনস্ক অসংলগ্নতার মধ্যে দিয়ে। আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে আলো উঁকি দেয়, ১৬০ পৃষ্ঠায় ঝিভাগো বোঝে যে সে কি রকম নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছে। লেখকও বোঝেন কিছুটা, মামার বিষয়ে তিনি বলেন,

Admittedly he was overshadowed by the grandeur of the events, seen beside them he lost in stature. But it never occurred to Yury to measure him by this yardstick.

তা না করারই কথা, কারণ ঐতিহাসিক উন্মাদবাদের বক্তৃতা দেয় নায়ক এর পরেই। এবং সংগ্রহ করে খাদ্য আর জ্বালানি কাঠ।

বাস্তবিক, এই অধ্যায় থেকে কয়েক শো পৃষ্ঠা ধরে খাদ্য আর কাঠই উপন্যাসের মূল সুর, খাদ্য কাঠ আর প্রেম। প্রথমে তোনিআ তোনিআর সন্তানাদি। তারপরে লারা, প্রায় প্রতিভাময়ী লারা, তারপরে মারিনা দুটি সন্তানের জন্ম, তারপরে ফেরার। অসম্বন্ধবাদী লেখক ও নায়কের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, কারণ প্রেম বা যৌন-মিলনটা যতই সবিস্তারে ঘটা করে হোকনা শেষ অবধি দায়িত্বহীন সম্বন্ধহীন ব্যাপার, তার পূর্বাপর নেই। ঝিভাগো সেদিক থেকে বরাবরই মুক্ত পুরুষ। এদিকে সারা দেশ, সারা সমাজে রূপান্তর, এমনকি মামাবাবুই বলছেন:

Come on Yura, put your coat on and come out. You've got to see it. This is history-this happens once in a life time. কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণীয়, কারণ আগে এবং পরেও, মামার মুখে ভাগ্নের মুখে আমরা বহুবার শুনেছি যে খৃষ্টের জন্মে ইতিহাস জন্মাল এবং সেই ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নেই—এক শুধু প্রতি মাতৃ গর্ভে সন্তানের বৃদ্ধি ও জন্ম ছাড়া। এবং

ঝিভাগোও একরকম তা বোঝে, তাই সে শ্বশুর মশায়কে বোঝাতে যায় খবরের কাগজের টুকরোটা নিয়ে। এই সময়েই আকস্মিকতার প্রতীক ঈভগ্রাফের আবির্ভাব—এই বিপ্লবের প্রতিভায় যখন যুরি মুগ্ধ। প্রতিভা ছাড়া ঝিভাগোর কোনো সুখ নেই, এক খাদ্য আগুন জ্বালানি কাঠ আর নারীর বাহুবন্ধন ছাড়া,—সেও বোধহয় প্রতিভার অভিজ্ঞান্তর। তারপরে টাইফাস্। কিন্তু মৃত্যু সদয়, মৃত্যুবৎ ঝিভাগোর প্রতি। তাছাড়া আছে বিস্ময়কর কম্যুনিস্ট কিন্তু জাদুকর ছোকরা আধভাই ঈভ্গ্রাফ্, ঝিভাগোর হল পুনরুজ্জীবন, কারণ অদূরে মেরি ম্যাগডালীন ও স্বয়ং জীবন, অর্থাৎ ঝিভাগো, তাই সে সেরে উঠল। এইরকম কবিত্বের কায়দা লেখক প্রায়ই প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু রূপক মেজাজের টুকরো এপিকজাতীয় উপন্যাসে হারিয়ে যায়। অবশ্য তিনি অন্য পক্ষে নিছক বাস্তববাদী মেজাজও একই সঙ্গে ব্যবহার করেন এবং সে ব্যবহার উদ্দেশ্যের জাত হিসাবে প্রয়োজনীয় হলেও নিস্প্রাণ, আর নাহলে তা হয় সম্পূর্ণ অবান্তর, যেমন "যাত্রা" অধ্যায়ের অধিকাংশ। পরেও এরকম বহু অধ্যায়াংশ আছে যার একমাত্র বাস্তব অর্থাভাস হচ্ছে বিপ্লবী বা সাধারণ অকবি মানুষরা কি জঘন্য জানোয়ার তাই প্রমাণ করা।

এরই মাঝেমাঝে কবির আধা মরমীয়া বোধ প্রকাশ পায়, মিশ্রিত গোলমেলে ভাবে, তবু কবিত্বময় ভাবে এবং খানিক মরমীয়াভাবেও, যেমন তোনিআর সন্তান-সম্ভাবনায় য়ুরার চিন্তারাশি: যে কোনো মানবমাতার সন্তানধারণ ও জন্মদানের সঙ্গে যীশুর মাতার নিহিত তুলনা। মজা লাগে লেখকের এসব বিষয়ে আবিষ্কারের সুরটায়। যেন এ মনোভাব তাঁরই প্রথম সৃষ্টি। কিংবা ২৫৫ পৃষ্ঠায় আর্ট বিষয়ে চিন্তা অথবা পুশকিনের আলোচনাটি: পুশকিন কেমন অবশ্যম্ভাবী ছন্দ বেছে নিতেন, পুশকিন কিভাবে সাধারণ রুশজীবনে ডুব দিলেন, বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিক জীবনের হাওয়া, আলো কোলাহল রাস্তা থেকে ঢুকে ফেটে পড়ল তাঁর কাব্যে, পুশকিন হয়ে উঠলেন রাশিয়ার মহাকবি। নেক্রাসভের কাব্যের ক্ষেত্রেও সাধারণ জীবনের এই রাসায়নিক কীর্তি। মজা হচ্ছে এইসব কথারই পরে আবার প্রতিবাদ আছে। তখন কবি খাপ্পা হয়ে ওঠেন—সাধারণ, জনসাধারণ, মানুষ এই কথাতেই, বলেন: পুশকিন চেহভ ভালো লেখক কারণ তাঁরা কোনোকালে মানুষের জীবন, মানব সাধারণের নিয়তি বিষয়ে মাথা ঘামাননি গোগোল, তলস্তয়, দস্তএভস্কির মতো। ঝিভাগোর তখন আর মনে থাকে না যে ওন্যেগিনের সময়ে মধ্যবিত্ত বা মেশকানিন হওয়ার সাধ আর ঝিভাগোর সময়ে তাই নকল করার

৩

ডাক্তার ঝিভাগো উপন্যাস স্বচ্ছমতি রচনা নয়। পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক প্রেরণা তার মজ্জায় মজ্জায়, লেখকের জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে। অথচ সে প্রেরণায় এপিক উপন্যাস লেখার বালজাকী শক্তি এ কবির নেই। অথচ তিনি তা জানেন না, তাই তিনি মননের তন্বু উপন্যাস লিখতে যাননি, যদিচ রিলকের উপন্যাস তাঁর জানা। শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ওরই মধ্যে নিরাপদ রূপক লেখবার সীমাবদ্ধ কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক নির্লোভ মনও তাঁর নেই, যেমন ছিল কাফকার বা অন্যকায়দায় জএসের। একাধারে মনন এবং সমাজের বিন্যাসের ও পুনর্বিন্যাসের মহাকাহিনী লেখার ধৈর্য বা একাগ্রতা তাঁর নেই প্রূস্তের মতো। টমাস মান্ রূপক লিখেছেন, সাংগীতিক প্রতিভা এবং জর্মানিতে নাৎসিশাসনের যন্ত্রণা উভয়ে মিলেছে সেই বই-এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না হারিয়েই ব্যক্তিগুলি সেখানে উভবল রূপকের নটনটীও বটে। ডক্টর ফাউস্টুসের মতো পরীক্ষামূলক জটিল অথচ মহান ট্রাজেডী লেখা যদি আয়ত্তে নাই থাকে অন্তত "পুণ্যবান পাপী"র মতো সাক্ষাৎ মানবিক কাহিনী পাস্তেরনাকের লেখার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্যের শুদ্ধিতেই যদি গোলযোগ থাকে, তাহলে না হয় এপিক, না হয় লিরিক বা এলিগরি, শুধু টুক্‌রোর সংগ্রহ পড়ে থাকে। উইণ্ডাম লুইসের অসাধারণ শক্তিশালী উপন্যাস সেলফ্-কনডেম্‌ড-এ ব্যক্তির বিন্যাসে পশ্চিম ইওরোপের ইতিহাসের যন্ত্রণা হয়ে উঠেছে একাধারে প্রচণ্ড উপন্যাস এবং রূপক, যার জন্য এলিঅট এ বইকে গত পঁচিশ বছরের অর্থাৎ জয়সের পরে পশ্চিমা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা বলেন। সেই দুর্জয় আবেগের প্রায় দুঃস্বপ্নের মতো দিব্যদৃষ্টিসঞ্জাত প্রবল বর্ণনা ও চরিত্র রচনা দেখা গেল পাস্তেরনাকের সাধ্যে কুলাল না—তার কারণ কি শুধুই লেখকের নিজের দুর্বলতা বা অস্থিরতা? না পূর্ব ইওরোপের সে ভয়ঙ্কর দিব্যদর্শন ইতিহাসের সত্যে দাঁড়ায় না কবির পক্ষপাত সত্ত্বেও?

নিছক সৌখীন গীতিতুল্য গল্পলেখাই পাস্তেরনাকের উচিত ছিল, কিন্তু জীবনের এমনকি সোভিএত জীবনের ভোগ্য নানা বিষয় ভোজনে ও ভুক্তাবশেষ সাজনে তাঁর লোভ। আত্মসর্বস্বের বিষয়ীপ্রধান লোভ তিনি মনে হচ্ছে একবার ছেড়ে ছিলেন, যখন মায়াকভস্কির প্রতিভা এই প্রতিভাবাদীকে আত্মগরিমা থেকে ভাসিয়ে বার করে নিয়ে গিয়েছিল। তাই বারবার মনে হয় পাস্তেরনাকের ক্ষমতা

অনস্বীকার্য, তেমনি সে ক্ষমতার সীমাও। এবং তার পিছনে বা সঙ্গে আছে তাঁর অর্ধমৃত অর্ধবিদগ্ধ সমাজের শ্রেণীর উদভ্রান্ত নন্দনতত্ত্ব এ তত্ত্বে বস্তুত ঝিভাগো ও কোমারভস্কি সমান বা কোমারভস্কি ও পাস্তেরনাকই এক নৌকোয়। সুন্দর বস্তু প্রায় সবার ভালো লাগে লারার মতো সুন্দর মেয়ে বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য। কিন্তু সংযোগের অভাবে, প্রাণময় বা অর্গানিক সম্বন্ধের অভাবে, পূর্বাপর দায়িত্ব বন্ধনের অভাবে এ ভালোলাগা থাকে বিচ্ছিন্ন, প্রথমত মুহূর্তমূল্য, দ্বিতীয়ত মননে নিদিধ্যাসনে অভ্যাসে পরিণত নয়। অথচ সুন্দরের অভিজ্ঞতা তখনই সত্যের মর্যাদা পায়, যখন দর্শক-শ্রোতা-মানস নিজ আয়ত্ত অভ্যাসের আসনের সম্ভাবনায় তাকে বিন্যস্ত করতে পারে। আনন্দলোকের সেই স্থিতপ্রজ্ঞ মঙ্গলালোকের ইঙ্গিতে পাস্তেরনাক সত্যের মধ্যে সুন্দরের বিরাজ উপলব্ধি করেন না, কারণ তা করলে গ্রীকদের মতো কালোকাগাথিয়া বা নন্দননীতির সম্বন্ধ মানতে হবে, দায়িত্ব মানতে হবে, রুচির নন্দনকে বাঁধতে হবে প্রাজ্ঞের কর্মকাণ্ডে, চারিত্র্যে। এখানেই তিনটি পাখীর কল্পপ্রতিমার পরিণতি যে পাখী খেত ও যে পাখী দেখত এবং আজকের জ্ঞানেবিজ্ঞানে সম্ভব যে দ্বৈতাদ্বৈত পাখীর খাওয়া ও দেখা। আজকের মানুষের পক্ষে একাধারে আকাশ ও নীড়ের বিরোধভঞ্জন সম্ভাবনার জগতে এসে পড়েছে। পাস্তেরনাকের আনন্দ-তত্ত্ব দুস্থ, খণ্ডিত, ক্ষতিকর কারণ বিভ্রান্তিকর।

যে কোনো সভ্যতাতেই যে কোনো সাধনাতেই এই কথা বলবে, ভগবদ্ভক্ত বা মানবভক্ত, এমনকি ভয়াবহ কম্যুনিস্টও। ব্যক্তির স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বেচ্ছাচারিতার তোতা কথা এ তত্ত্বে ওঠে না। যেমন প্রেমে উভয়পক্ষের উভয়ত কমবেশি সম্পূর্ণ ক্রমিক দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধেই কমবেশি আনন্দ, তাকে বন্ধন বললে প্রেম নাচার। তাই যে অভিজ্ঞতাতেই আমরা নন্দিত সেখানেই আমরা অভিজ্ঞতাকে সম্বন্ধবদ্ধ করি, সুন্দর জায়গা ভাল লাগলে বা কোনো জায়গা আবেগ ধন্য হলে সেখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো, থরোর মতো থাকতে চাই, বারবার যেতে চাই। তৃপ্ত প্রেম পেলে তার পুনর্বৃত্তিতে ক্লান্ত হই না, সেই মেয়ে বা পুরুষেই আত্মদানের সম্বন্ধ গড়ে তুলতে চাই, অধ্যাত্মাভিজ্ঞতা হলে বারবার সেই অভিজ্ঞতা চাই। এবং এ চাওয়া একটা দায়িত্ব, এর একদিকে স্মৃতি আরেকদিকে প্রত্যাশা, এর জোরে গঠনের কর্মের দায়, চারিত্র্যে চারিয়ে যায় এই অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ আমাদের রূপান্তর ঘটে, বিকাশের সাধনা চলে। প্লেটোর নাম তিনি করেন, কিন্তু দিওতিমার উপদেশ পাস্তেরনাক শোনেননি।

শুনলে তিনি জানতে পারতেন যে নন্দনতত্ত্বে বা সুন্দরব্রতে নিরাসক্তি ও নিয়ন্ত্রণের কি স্থান ; জানতেন যে নন্দনতত্ত্বে অভিজ্ঞতার সংযোগ এবং পরম্পরার নিয়তনিষ্ঠ ক্রমিকতা অবশ্যসাধ্য। এবং এই ক্রমিক সংলগ্নতার আতত আয়াসের পটেই দিব্যদৃষ্টির আবির্ভাব সম্ভব আকস্মিকতায় নয়। সাহিত্যিক উৎকর্ষ বা আর্টের মহত্ত্বও এই নিত্য আততিতেই ফুটে ওঠে। বলা বাহুল্য, দিওতিমার নির্দেশে শেষ পর্যন্ত মানুষের সুন্দর সাধনা ও সিদ্ধির সেতুবন্ধ মানবিকভাবে সার্থক বা স্থায়ী হয় না, কারণ পরিবেশ, সমাজ, আর্থিক রাজনৈতিক বাস্তব-জীবনের নানা আকস্মিক দৌরাত্ম্য সমানে তপোভঙ্গ করে যায়, নিছক মুখ্য মানবিক আততিকে আক্রান্ত করে নানা গৌণ আপতিক বাইরের বাধা বিড়ম্বনা, অভ্যাস জ্যামুক্ত হয়ে পড়ে।

আজ অবশ্য এই বাইরের আকস্মিকের উপদ্রব দূর করা মানুষের সঙ্কল্পের আয়ত্তে, আজই তাই এই আকস্মিকতার পরাজয়ে সংলগ্নের বোধ ও প্রেরণা একান্ত প্রয়োজন। তাই আজ কোমারভস্কি ঝিভাগোতে আর দান্তে, শেকস্‌পিঅর, দাস্তিভস্কি, গয়টে, রবীন্দ্রনাথে তফাৎটা এত বড় হয়ে উঠেছে। নন্দনতত্ত্বের রুচি আর জীবনতত্ত্বের নীতি একটি আততিতে কেলাসিত এই নিঃস্বার্থ সংলগ্নতাতেই। কিন্তু রাশিআর অর্ধপক্ব বুর্জোআ মানসে সুন্দর থেকে গিয়েছিল উৎকেন্দ্রিক আর তারই স্মৃতিতে মানুষ পাস্তেরনাক। শেকস্‌পিঅরের অনুবাদক শক্তিধর কবি, কিন্তু নীরক্ত অসম্পূর্ণ রাজনীতিতে বা বিমুখ জীবননীতিতে তাঁর কাব্য-জিজ্ঞাসার আততি খণ্ডিত। কোলরিজের ইমাজিনেশন বা সংকল্পনা নয়, বিকল্পনার বিচ্ছিন্ন প্রয়োগই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্কল্পের দিকে থেকে ক্ষতিকর বিপদজনক প্রভাব তো বটেই।

সোভিয়েট দেশে, নিশ্চয়ই মুখ্যত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ঐতিহাসিক কারণে, সমালোচনার আত্মসমালোচনার উপলক্ষ উপাদান অনেক বর্তমান : এবং সমালোচনা সেখানে চলেছে ও চলছে। কিন্তু সে সমালোচনার স্রোতে পাস্তেরনাকের দান মূলত অবান্তর এবং সেইজন্য অস্বাস্থ্যকর। তবু তাঁকে সে দেশে যেভাবে স্তালিন থেকে শুরু করে অনেকেই স্বীকার করেছেন ও করছেন, অন্য দেশে ব্যবসায়িক সংস্কৃতির পণ্য-স্বাধীনতায় তা ভাবা যায় না। এখনও তাঁর কবিতা দুশমন সুরকভের কবিতার সঙ্গে সঙ্গে জনামিয়ায় বুঝি ছাপা হচ্ছে, তাঁর কবিতার একাদশ না দ্বাদশ সংখ্যার বইও ছাপতে গেছে। এতে ভরসা হয় মানবসভ্যতার ভবিষ্যতে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক মানুষের বিষয়ে। অবশ্য সবসময়েই

কবিত্বের বা প্রতিভাবাদের পিত্তোন্মাদ ভয়াবহ, বিশেষ করে সমাজগঠনের যুগে বিশেষ করে যদি সে উন্মাদ অনেকাংশে মূলত জীবনোত্থিত নয়, বরং এমিগ্রে বা পরবাসীমন্য আমদানি রোগ হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে এমিগ্রেরা সত্যিই দেশ ছেড়ে পালান না, দেশের বুকে বসেই বিদেশের মনোবিকার আমদানি করার চেষ্টা করেন। মনে হয় রুশরা যে পশ্চিমা-নকলের বিরুদ্ধে এত সজাগ ছিলেন ও আছেন, সে বোধহয় এই জন্যই, ভিন্ন স্তরের সমাজে বোধহয় পশ্চিমা চিন্তা-দুশ্চিন্তার শৌখীনতা সময়ে অসময়ে স্থানেঅস্থানে বেঁকে চুরে মারাত্মক হয়ে ওঠে, আসে এসেনিনের আত্মহত্যা অথবা আসে মায়াকভস্কির। ১৯২৪এ মায়াকভস্কিও তো লিখেছিলেন :

European technique, industrialism, any attempt to combine them with old Russia, still backward – such has always been the idea of the Futurist Leftists.

অথবা আসে মধ্যবর্তী পাস্তেরনাকের জীবন্মৃত সমস্যা—ফেৎ, বালমন্ত, আৎশিবাশেভ প্রভৃতি পশ্চিমবাদী রুশদের সমস্যা, যাদের এমিগ্রে বা বিদেশের ঘরজামাই মন পড়ে আছে দেসা, মাদো, লুসিঅ'র প্যারিসের পতনে। তাই বোধহয় লণ্ডনের স্টেটসম্যান আর কলকাতার স্টেটসম্যানে অত তফাৎ থেকে যায় পাস্তেরনাক প্রশস্তিতে, যেমন আবার থাকে এমনকি বিলেতী টাইমস্ আর মার্কিন টাইমে। পাস্তেরনাক উপন্যাসটি পুনর্লিখন করেছেন এ খবরটি সোভিএত বিদ্বেষহীন তাঁর সাবেক ভক্তদের পক্ষে সুখবর।

সাম্প্রতিক মার্কিন সাহিত্য

সেকালে গয়টে কবিতা লিখেছিলেন আমেরিকাকে: জীর্ণ ইওরোপের চেয়ে সৌভাগ্যবান ব'লে।

বছর বারো তেরো আগে এক উচ্চকপালবাদী ইংরেজ সাহিত্যিক পশ্চিম ইওরোপের অবক্ষয় দেখে আশা প্রকাশ করে ছিলেন যে, ঐ অভিজ্ঞতা থেকে মার্কিন মন শিখেছে বেশ কিছু, তাই জীবনজিজ্ঞাসা ও সংস্কৃতির নানা দিকে আমেরিকান-রা অনেক বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও দায়িত্ববোধে অগ্রসর। কনলি-র মতে সাবেক ডলার মাহাত্ম্যবোধ আস্তে আস্তে মার্কিন মনোজগতে ভেঙে পড়ছে এবং আত্মসমালোচনা, পরীক্ষানিরীক্ষামূলক অনুসন্ধিৎসা, হৃদয়বৃত্তির গভীরতা ও সংবেদনার প্রসার ইত্যাদি প্রাণময় বুদ্ধিজীবী মানুষের সব সদগুণ ইংলণ্ড অপেক্ষা নবীনতর আমেরিকাতেই বেশি গ্রাহ্য।

কথাটা কিছু বিস্ময়কর নয়, অনেকেরই একথা মনে হয়েছে। আর তার জন্য আমেরিকা যেতেও হয় না। এদেশেও এ তুলনা অনেকের মনে এসেছে যদিচ আমাদের কাছে আমেরিকা ইংলণ্ডের চেয়ে নিশ্চয়ই কম পরিচিত এবং সাম্রাজ্য-ঘটিত বাধা থাকায় এবং ডলার কর্তৃত্ব সত্ত্বেও আর মার্কিন হিসাবে আমরা নিতান্তই গরীব বলে, আমেরিকান প্রকৃত সাহিত্যিক বইপত্র আমরা পাই খুব কম।

সেকালে এই রকম প্রশ্ন দ'তকভিলের মতো আগন্তুককেও ভাবিত করেছিল। ফরাসী মনীষী শেষ অবধি সিদ্ধান্ত করেন যে বহুদেশাগত ছন্নছাড়া ঐতিহ্যছিন্ন এই বিরাট দেশের সুযোগদুর্যোগের মধ্যে তাহলে এক ব্যাপ্ত ও তীব্র মানবিকতাই সম্বল। ক্রমান্বয়ে নতুন পত্তনাবাদের উল্লাস ও নৃশংসতা, নতুন বসতি, নতুন সমাজগোষ্ঠী গঠন আর তার থেকে উৎসারিত মানবিক বা মানসিক ও সাহিত্যিক প্রশ্ন: নবীনতার দুঃসাহস ও আনকোরা ঐতিহ্যের করুণ বা অতি গর্বিত সন্ধান, বনেদীসুলভ অভ্যাসিক শালীনতার প্রতি লোভ অথচ থেকে থেকে জীবনের ভয়াবহতার সাক্ষাৎকার, করুণা বা অনুকম্পা এবং সদাসম্ভব বীভৎসের উপলব্ধি, ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গতা অথচ যন্ত্রসভ্যতার মধ্যে নিহিত ঘেষাঘেঁষি ভিড়ের আবশ্যিকতা, প্রাচুর্যের সুখসুবিধাভোগ ও অতিভোগ অথচ সহজ সরল নৈসর্গিক ঐক্যে সুস্থ দেহে ইন্দ্রিয়বেদ্য জীবনের তৃষ্ণা, একটা স্থূল ব্যবহারিক-

সর্বস্বতা বা অন্ত্যর্থকবাদের উগ্রতার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রায় মরমীয়া পরমার্থের ঝোঁক—সেকাল থেকে একাল অবধি মার্কিন সাহিত্যে এরই টানাপোড়েন।

তার রূপ নানারকম, কিন্তু একটা স্রোত বরাবর জলধারায় চড়ায় আঁকেবাঁকে চলেছে। এমার্সন, থরো, হুইটম্যান, মেলভিল, হ্থর্ন, মার্ক টোয়েন এবং খানিকটা গৌণ লেখক হলেও ঐতিহাসিক কারণে পো, এঁরাই জেমস থেকে একালের তরুণ অবধি সবার গুরু। পিতৃ পুরুষের এই আবেগময়তা, জিজ্ঞাসার সাহস, কল্পনার বা অনুসন্ধানের ব্যাপ্তি, কর্ম ও এষণার নানা নৈতিক দ্বন্দ্বের সমস্যা—এই সবের ধারা তাই নানারকম রূপে রূপান্তরে আধুনিক জীবনের সমস্যাসংকুল যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে একালের সাহিত্যেও গত বিশ পঁচিশ বছরের মার্কিন-সাহিত্যেও ধরা পড়ে। এমন কি যাঁরা এই বিশিষ্ট মার্কিন উত্তরাধিকার জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মানতে লজ্জা পান, তাঁদের রচনাতেও।

বস্তুত, পাউণ্ডের মতো প্রবল কাব্যচর্চা ইংলণ্ডপ্রবাসী মধ্যপশ্চিমা আমেরিকানকেই সাজে। অথবা ধরা যায় এলিঅট-কে। আমেরিকার বিভ্রান্তিকর ব্যাপ্তিতে ও জাতীয় নবীনতায় তিতিবিরক্ত হয়ে ইংলণ্ডের সাবেকী আশ্রয়ে আধাবাস্তবে আধাস্বপ্নে তিনি ঘর বাঁধলেন, কিন্তু তবু তার কবিতায় তাঁর মৌলিক স্বদেশ ফল্গুর মতো জেগে রইল, ড্রাই স্যালভেজেসের মিসিসিপি নদীর মতো প্রবল তাই হুইটম্যানের মতো উচ্চকণ্ঠ গণতান্ত্রিক কাব্যও এলিঅটের বিশুদ্ধ বনেদীভাবাপন্ন ইংরেজিপনার মধ্যে উঁকি দেয়, লিঙ্কনের হত্যায় হুইটম্যান যে লাইলাক রাশি ফুটন্ত দেখেছিলেন, সেই লাইলাকের মৃন্ময় স্মৃতিই এলিঅটের পোড়ো জমিকে গন্ধেবর্ণে উদাস করে দেয়, খাস বিলাতী ফুল নয়। প্রুফ্রকের শৌখীন টপ্পার নায়ক কি শেষ অবধি সেই শিশুই নয়, যাকে অন্তহীন দোলায় হুইটম্যান দেখেছিলেন, ভাবী হেনরী জেমসের ইওরোপ-তীর্থযাত্রী মার্কিন যুবকের আয়নার মধ্যে বাঁকাচোরা প্রতিফলন সত্বেও? মার্ক টোয়েনের মতো অনিংরেজ লজ্জাকর রকম নিম্নকপাল জনপ্রিয় মার্কিন লেখকের মিসিসিপির জীবন বা হকলবেরি ফিনের স্মৃতিও কি ফোর কোআর্টেটসে মেলেনি খানদানী ইংরেজ রাজা চার্লসের এক রাত্রির প্রার্থনামন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে?

দক্ষিণের কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া যাক, কারণ দক্ষিণের শহর ছেড়ে উত্তরে আবার প্রায় তিন শতাব্দীর পিতামহদের মার্কিন নবইংলণ্ডে এলিঅট প্রত্যাবর্তন করেন। এবং সেই মার্কিন উত্তরদেশে বসন্তের যন্ত্রণা যেমন তাঁর এপ্রিল বর্ণনায় স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট ঐ উত্তরের অধ্যাত্ম নিবিষ্ট ব্যক্তিস্বরূপজীবী মানসের মিতভাষী

দিব্যবাঙ্ময়তার প্রভাব এই ইঙ্গ মার্কিন ইংরেজ কবির জিজ্ঞাসার একাধারে সততায়, গভীরতায় ও প্রায় কমিক একচক্ষু গাম্ভীর্যে।

খাস মার্কিন কবিদের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠও যিনি, সেই রবর্ট ফ্রস্ট কিন্তু বাহ্যিক আরম্ভে এলিঅটের সমতুল্য হলেও মুক্তির সন্ধান—সে সন্ধানে মুক্তি অবশ্যই সরল রেখায় আসে না ইংলণ্ডের জীবন্মৃত রাজতন্ত্র বা দোঁআশলা ইঙ্গ ক্যাথলিক নামক অদ্ভুত গির্জাতন্ত্র বা উদ্দাম অর্থপিশাচের বিশৃঙ্খল যুগের মধ্যে ধ্রুপদী-বনিয়াদের স্বপ্নে—সে সন্ধান ফ্রস্ট করেন নিজের মধ্যে, নিজের পরিবেশের মধ্যে দেশের মধ্যে। ফ্রস্টের পিতাও উত্তর ছেড়ে দক্ষিণে যান, ফ্রস্টও ফিরে যান উত্তরে এমার্সনথরোর দেশে। ফ্রস্ট বিশ্ববিদ্যার খোঁজে কোনো আলয়ে আয়তনে যথোচিত কাল কাটাননি, তবে তিনিও ইংলণ্ডে প্রবাস নেন এবং সেখানেই হার্ডির মতো এডোআর্ড টমাসের মতো সমদৃষ্টি বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহে তাঁর কবিতা স্বপ্রতিষ্ঠ হয়, কিন্তু তিনি স্বদেশেই ফিরে আসেন, কারণ যৌবনেই তিনি নিজের সত্তায় পেয়েছিলেন আগুন ও বরফের উভয় আবেগ :

এ বিশ্ব নিঃশেষ হবে আগুনে—এ কারো মতবাদ,
কারো মতে হিমের কবরে ;
আমি যা পেয়েছি নিজে আকাঙ্ক্ষার স্বাদ
তাতে আমি জানি আগুনের মতবাদ,
তবে যদি একাধিকবার বিশ্ব মরে—
মনে হয় আমি জানি যতখানি ঘৃণা
তাতে এও বলা যায় কোনো দ্বিধা বিনা :
হিম ও ধ্বংসের তরে
বেশ শক্তি ধরে ॥

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচক মিডলটন মরির কথা ; মার্কিন কবিতা নাকি আবেগ ও ভাষার সংযমে বরফ হয়ে গেল ফ্রস্টে পৌঁছে। অথচ ফ্রস্টের কবিতা স্পষ্টতই আবেগে নাট্যধর্মী, বাদসম্বাদে তরঙ্গায়িত যদিচ তাঁর বচসা প্রেমিকের প্রতিবাদ, তাঁর নিজের কবরনামা কবিতায় তিনি লেখেন : আমার ঝগড়া ছিল দুনিয়ার সঙ্গে প্রেমিকের ঝগড়া। এমিলি ডিকিনসনের প্রবল—রাশটানা ভাষার জোরেই প্রবল কবিতাও মরি সাহেবরা সম্যক উপভোগ করতে পারেননি। এমিলি ডিকিনসনের কবিতায় সেই আধুনিক কাব্যেরই পূর্বাভাস যার বর্ণনায় ওআলেস স্টীভনস কবিতা লেখেন :

মনের কবিতা, মন সক্রিয় যখন
যথেষ্ট যা তাই খুঁজে।—আশ্চর্য এই মহিলা কবিটি মানুষ হিসাবে আর কবি হিসাবেও। এআরন কপল্যাণ্ডের স্বরযোজনায় এঁর ভাষার নিহিত আবেগ-প্রাবল্য স্পষ্ট রূপ নেয়। বস্তুত, আবেগের শক্তিমত্তায় ও ভাষার পরিমিতিতে তিনিই বোধ হয় সাফো থেকে যে নারীরচিত কাব্যের স্বল্পকায় ধারা, সে ধারায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি ; অ্যান ব্র্যাডস্ট্রীট থেকে ব্যারেট ব্রাউনিং ক্রিস্টিনা রসেটি ও এমিলি ব্রণ্টের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গত শতাব্দীর এই চিরকুমারীর কাব্যে এমন একটা নিরাভরণ সত্যের সাগরমন্থিত রূপ পেয়েছে, যা তথাকথিত আধুনিক কাব্যেরই সংজ্ঞা। দুবার নাকি তিনি হৃদয়ের সঙ্গী পেয়েছিলেন, কিন্তু একবার মৃত্যু ও আরেকবার ভুল বোঝাবুঝিতে শুধু ব্যথার স্মৃতিই তিনি লালন করেছিলেন বিশ ত্রিশ বছর ধরে বাড়ীর মধ্যে থেকে :

আমার জীবন তার অন্তিমের আগেও দুবার
রুধেছিল দ্বার।
এবারে দেখতে হবে অমরতা খুলে ধরে কিনা
তৃতীয় ঘটনা আরবার
দুবার যা ঘটেছিল তারই মতো
বিরাট ও কল্পনাতীত।
আমরা স্বর্গের জানি যেটুকু তা শুধুই বিচ্ছেদ,
নরকেও তাই তো চলিত॥

চাপাগলায় সূক্ষ্ম কথা বলা, চোখে মুখে দিব্যদর্শনের নিশ্চয়তার আভাস অথচ তার প্রকাশে উভবলী নম্র ইঙ্গিতময়তা, নিঃসঙ্গ বোধের আত্মস্থ বেদনা অথচ ক্রমান্বয়ে মানবসমাজে গোষ্ঠীজীবনে সংলগ্নতার ঝোঁক—নিদেনপক্ষে সে বিষয়ে জাগ্রত একটা বোধ এবং এই বৈপরীত্য থেকে সঞ্জাত একটা বুদ্ধিমত্তার আততি দান্ত বৈদগ্ধ্যের একটা লীলায়িত তীব্রতা—এই জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রায় গোটা মার্কিন কাব্যে মেলে, যদিচ মনে হতে পারে যে, এমিলি ডিকিনসন বা ফ্রস্ট বা ঈষৎ ভিন্নভাবে ওআলেস স্টীভনসের সঙ্গে কার্ল স্যাণ্ডবর্গের বা ল্যাংস্টন হিউজের আপাত উচ্চকণ্ঠের কোন মিল নেই। হুইটম্যানী উদাত্ত স্বরে নিশ্চয়ই স্টীভনসের মতো সুকুমার ইশারার কবিতা আপাতবিচারে জমে না। কিন্তু সংবেদনের দিক থেকে এও কি একই মন নয়?—

শ্যামাপাখী দেখার তেরোটি ধরণ—

বিশটি তুষার-পাহাড়ের মাঝে
সচল বস্তু শুধু
শ্যামা পাখীটির চোখ
আমি তো ছিলুম তে-মনা
যেন-বা একটি গাছ
যে গাছে তিনটি শ্যামা।
এক ঝাঁক শ্যামা শরতের হাওয়া ঝাপটে চলে
এ যেন বা এক গাজনের ছোটো পালা।
একটি পুরুষ এবং একটি নারী
তারা একই।
একটি পুরুষ ও একটি নারী এবং শ্যামা
একই।

কে জানে কোনটি বেশি পছন্দ করি
শব্দরূপের বাহার অথবা
বক্রোক্তির বাহার
শ্যামার শিসের মুহূর্তটুকু
নাকি ঠিক তার পরে।
—এ রকম আরো আটটি ধরণ।

অনেক সমালোচকের মতে ষ্টীভনসের শৌখিনকান্তি নন্দনতত্ত্বের প্রভাব হয়তো ক্ষতিকরই হয়েছে অর্থাৎ মার্কিন কাব্যে নীরক্ত জীবনবিমুখ একটা খেলার মেজাজকে প্রশ্রয় দিয়েছে। তবু যেহেতু সে প্রভাব বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি-স্বরূপের সমস্যায় একটি সরু চাপা গলার দক্ষ আলাপ, তাই মার্কিন কবিতা আমার তো মনে হয় না যে, সাম্প্রতিক ইংরেজি কবিতার মতো মূলত গৌণ অর্থাৎ অন্তরে অন্তরে বিচ্ছিন্ন আর তাই ক্লান্ত বিমুখ নয়। মার্কিন কবিতায় অন্যান্য কর্মের মতোই আছে একটা মূলত হাই সিরিঅসনেস, অর্থাৎ তার উৎস এখনও প্রাথমিক, ব্যাপ্ত, জীবন্ত। অবশ্য গ্রাণভিল হিকস বা অভিং হো বা আর্থর মিজনর-এর মতো সমালোচকদের মতে গত দশ পনেরো বছরে অর্থাৎ রুজভেল্ট যুগের পরে মার্কিন মনোজীবনে ও সাহিত্যে পুরুষার্থের দিক থেকে একটা চর্বিতচর্বণ, একটা খেলোআড়ী অসারতা দেখা যাচ্ছে। বস্তুত মার্কিন সমালোচনার

মত তীব্র আত্ম-সমালোচনা ইংলণ্ডে বা এদেশে দুর্লভ। কাজেই তাঁদের মতামত খুবই কড়া হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু বিদেশীর কাছে তরুণ মার্কিন সাহিত্য ঠিক পচা-হাজা মনে হয় না, যদিচ হয়তো জীবনজিজ্ঞাসা সেখানেও খানিকটা অসংলগ্ন সহজের বা শৌখীনের পথে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা কি বাস্তব-জীবন ঘটিত রাজনৈতিক সামাজিক কারণেও নয়? অবশ্যই ড্রাইসর, লুইস, হেমিংওয়ে ফকনর-এর সমান লেখক সহজে আজ মেলে না, এমনকি অ্যাণ্ডরসন, স্টাইন বেক, ডস পাসস, লার্ডনর, ফিটসজেরাল্ড, মার্কানড্, কল্ডওয়েলের মতো লেখকও। তবে কথাটা বলাই সহজ, প্রথমত, তুলনীয় নবীন লেখকেরা অনেকেই শুধু বয়সে নবীন নন, তাঁদের নিজ কীর্তির প্রতিষ্ঠাতেও এখনও পাকাপাকি ভিত গেড়ে বসেননি। তবু, আচমকা নাম করেই বলা যায়, পেন ওআরেন, সল বেলো, স্যালিঙ্গর, স্যারোইআন্, ক্যাপোট মেরি ম্যাকার্থি, কার্সন ম্যাকলরস, ইওডোরা ওয়েলটি, ক্যারোলাইন গর্ডন, জীন স্ট্যাফর্ড, ফ্ল্যানরি ওকনর প্রভৃতির শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, গল্পের উপন্যাসের জীবন-দর্শন ও রূপায়ন আমার কাছে তো মনে হয় খুবই শক্তিমান।

উপরের অবিন্যস্ত তালিকায় ছজন মহিলার নাম লক্ষ্য করবার বিষয়। বাস্তবিক ঈডিথ হোঅর্টন, স্যারা জুয়েট, গর্ট্রুড স্টাইন, উইলা ক্যাথর, এলেন গ্লাসগো, ক্যাথরিন পোর্টর কে বয়ল থেকে এইসব আধুনিক মহিলাদের নিজস্ব গৌরব, নারীশোভন অনুকম্পায়ী সূক্ষ্মতার সঙ্গে জীবানানুগ নির্ভীক অনুসন্ধিৎসা বিস্ময়কর। তুলনায় ইংলণ্ড বা ফ্রান্সও দুর্বল মনে হয়। ভর্জিনিয়া উলফের পরে কার নাম সমোচ্চার্য? ইলিজাবেথ বোয়েন, আইভি কম্পটন্‌বর্নেট? কিন্তু এঁদের পরিসর এত নির্দিষ্ট, ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজধানীর সচ্ছল বাসিন্দাদের সভ্যভব্য, কিন্তু অভ্যাসিক জীবন যাত্রা এত বেশি ক্লান্তিকরভাবে সীমায়িত যে, এঁদের নৈপুণ্যও শেষ অবধি অর্থহীন অবান্তর লাগতে পারে। প্রেম, অবৈধ প্রণয়, পানাহারের পার্টি ও ডেটস, নানাবিধ ব্যক্তি সম্পর্কের কাজে জট—এই যেন ইংরেজি সাহিত্যের তথা এ্যাংলো স্যাকসন এটিটিউডসের আজকের পরিধি। পড়তি ঘরে, সাম্রাজ্যের দায়ভাগে নাকি এই রকম ঘটে। তাছাড়া সাম্রাজ্যের আত্তিহীন সচ্ছলতার শিথিল অভ্যাস তো মনের আধিতে আছেই। মনে পড়ছে ভর্জিনিয়া উলফের মতো শিক্ষিত বিদগ্ধ সাহিত্যিকের নোট বুক: জেমস জয়েস বড় লেখক হতেই পারেন না, কারণ তিনি একে আইরিস তায় ক্যাথলিক, তা সে টম অর্থাৎ এলিঅট যাই বলুক, আর টম ঠিক বোঝেও না, কারণ সে তো

শেষ অবধি আমেরিকান। অথবা ডি এচ লরেনস—কয়লা খনির মজুরের ছেলে সে, সে কি করে বড় ইংরেজ লেখক হবে।

কথাগুলি ইংলণ্ডেই শ্রীমতী উলফের মতো লেখক বলতে পারেন, আমেরিকায় নয়। এলিঅট যে লিখেছিলেন: আমরা সব ফাঁপা মানুষ, ফাঁকা মানুষ এ ওর গায়ে ঢলে পড়ি ঠেস দিয়ে, সে বোধ হয় ইংলণ্ডে দেশান্তর গ্রহণ করার ফলে যেখানে মানুষের স্খলনে পতনেও কোনো সামগ্রিক প্রচণ্ডতা থাকে না। তাই বোধ হয় উইণ্ড্যাম লুইস একালের শ্রেষ্ঠ ইংরেজি উপন্যাসে পশ্চিমইউরোপকে বলেন সেলফ কনডেমড্, আত্মঅভিশপ্ত।

এবং এই জীবনবিমুখ ইতিহাসভ্রষ্ট অভ্যাসের দায়িত্ব শুধু সাহিত্য বিচারে আবদ্ধ নয়, তার চেয়ে বড় কথা সুস্থ বুদ্ধির ভীমরতি সারাটা জীবন বিষয়েই যেন ইংরেজ মনকে অবদমিত করে রাখছে। তাঁরা কেউ সান্ত্বনা খোঁজেন মার্কিন বা সোভিয়েত মানুষের ইংরেজি হিসাবে কেতাদুরস্ত পেলবতার অভাব দেখে। কিন্তু কর্কশ বা ভয়াবহ প্রচণ্ডতার বিষয়ে লিখনেও মার্কিন লেখকেরা সংবেদনের ও শিল্প কর্মের দক্ষতায় ইংরেজের চেয়ে নিরেশ নন। কজেনস বা ন্যাথনিয়েল ওয়েস্ট বা জ্যাক কেরুআকের নাম করে কিছু উন্নাসিক লাভ নেই, কারণ এ'দের লেখাতেও ক্ষমতার স্বাক্ষর কমবেশি স্পষ্ট এবং জীবনানুগত্যও একেবারে গৌণ নয়। এমন কি মেলর, জেমস জোনস, হ্যাবকভ বা রেকসরথের যে অস্বাস্থ্যবিলাসী প্রচণ্ডতা হেনরি মিলর থেকে তার ধারা খুঁজে পেয়েছে এবং যা অনেক শৌখীন ও শুচিবাগীশ ব্যক্তিকে আহত করে, সেই প্রকৃত প্রচণ্ডতা ওঁদের তুল্য ইংলণ্ডের রাগী যুবকদের মধ্যে অনুপস্থিত। নিশ্চয়ই শিল্প ও জীবনদর্শনে স্খলন ও লক্ষ্যের অশুদ্ধতার বিষয়ে একটা সন্দেহ কিছু কিছু মার্কিন সাহিত্যপাঠে মনে হতে পারে, কিন্তু মোটামুটি বিচিত্র মিশ্র অভিজ্ঞতাকে প্রবল শক্তিতে যদিচ হয়ত অনেক সময়ে দিশাহারা চোখে পরিগ্রহণ, এইটেই হল তার বড় পরিচয়।

শেষ অবধি সাহিত্য তো জীবনেরই ব্যাখ্যা বা ভাষ্য এবং জীবন বিষয়ে বুদ্ধির এই সাহসিকতা মার্কিন সাহিত্যে সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত। হয়তো গত দু-এক দশকের কবিদের মধ্যে একপ্রকার ম্যাকার্থিবাদের ভয় থেকে আত্মরক্ষার প্রচ্ছন্ন তাগিদে কবিদের মধ্যে সংস্কৃতির অতি মার্জনা বা বৈদগ্ধ্যের চর্চা মাঝে মাঝে খেলায় পর্যবসিত হয়। হয়তো এর কারণ শুধু রাজনৈতিক উদ্বেগ নয়, বৃহত্তরভাবে সামাজিকও বটে। যে অর্থ-করিতার সুযোগে, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সুবিধায়, নানা সাহায্য ব্যবস্থায় মার্কিন সাহিত্যিকের স্বাধীন অনুকূল পরিবেশ

জোটে, সেই নিরাপত্তাতেই এসে পড়ে একটা পল্লবগ্রাহিতা, বুদ্ধির শৌখীনতা। তবু র‍্যানসম, ন্যাশ, রয়থকে, মিউরিয়েল রুকেইসর, এবেরহার্ট, জ্যারেল, বেরিম্যান, শ্যাপিরো, ফিআরিং, উইনটরস, উইলবয়, লেওনি অ্যাডামস, ইলিজাবেথ, বিশপ, লুইস বোগন প্রভৃতি থেকে ইলিজাবেথ জেনিংস, মেরিল, মরউইন, লোয়েল, হল, মস স্নডগ্রাস প্রভৃতি কবিদের প্রচেষ্টা রবিনসন, ফ্রস্ট, স্যাণ্ডবর্গ, লিণ্ডসে, ষ্টীভনস, জেফরস ক্রেন, কমিংস, মারিআন মুরদের বিশ-তিরিশের কীর্তিকে লজ্জিত করে না। রয়থকে-র কবিতার পরিণত ব্যাঙ্গোত্তীর্ণ স্নিগ্ধ-চপল নৈপুণ্যের জুড়ি ইংরেজিতে বোধ হয় সম্প্রতি এক ইভর রিচার্ডসের কবিতাতে মেলে। অথবা তিরিশ বত্রিশ বছরের ডনাল্ড হল-কেই ধরা যাক; ইংরেজি সপ্তদশ শতাব্দীর বৈদগ্ধ্য আধুনিক মার্জনায় যে চেহারা নিতে পারে, তারই কি স্বল্পবাক রসাভাস পাই না এইসব যুবক যুবতীর কবিতার প্রয়াসে?

হয়ত এইটুকু বলা যায় যে, নবীন মার্কিনদের কবিতা—তা সে কবিরা প্রায় নিরাপদ মাস্টারিতে বা নানান ফেলোশিপে আশ্রিত বলেই হোক বা অন্য কারণেই হোক—গল্পোপন্যাস বা প্রবন্ধালোচনার তুলনায় একটু শৌখীন। মিসেস ম্যাকলরসের সাবলীল কল্পনার দুঃসাহস এবং বিষয়বস্তুর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রচনার নিশ্চিত উত্তীর্ণ প্রসাদ হয়তো কবিতায় তেমন সুলভ নয়, কিম্বা ট্রুম্যান ক্যাপোটের কাহিনীর বৈচিত্রময় কর্তৃত্ব অথবা ওডেটস উইলিঅম্‌স, মিলর, গুডম্যান, মেরিল, ও'হারা, এবেল প্রভৃতি ওনীলের উত্তরাধিকারীদের নাটকের বাস্তবসত্তার ব্যাপ্ত ও তীব্রবোধ। তবু আবেগের জটিলতা এবং শুদ্ধতা কবি-কিশোরদের কবিতাতেও দেখা যায়, বাংলা অনুবাদের অক্ষমতায় সে মেজাজ ঠিক না এলেও হলের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে তার একটা নমুনা দেখা যাক:

> যখন রাত্রির শয্যাবিলীন তিমিরে
> ছোঁয়া লাগে জড়সড় তোমার শরীরে
> যদিও প্রত্যেকে ভিন্ন একক স্বাধীন
> অগণন নির্বিশেষে লীন
> তবুও তখন পাই বিশেষের জ্ঞান,
> সূত্র পাই, পাব ফের সূত্রের সন্ধান॥

মোটামুটি বলা যায় যে মার্কিন সাহিত্যে এরকম জেটপরিক্রমাতেও হতাশ হতে হয় না কোনো বিশেষ ক্ষেত্রেই, খাস ইংরেজের তুলনায়। এমনকি প্রচ্ছন্ন মার্কসীয় সাহিত্যেও উৎকর্ষ মার্কিন দেশে উঁকি দেয় মস্কো বা লাইপৎসিগের

সংস্করণে ছাড়াও। তাছাড়া বহু জাতের বহু মানুষের ব্যাপারটা এক সোভিয়েত মহাদেশ ছাড়া আমেরিকাতেই খানিকটা মুখর। ইহুদিরা সে দেশে এখনও ইংরেজ বা ওলন্দাজদের প্রতাপের পাশে নিপীড়িত, নিগ্রো তো বটেই। তাই এঁদের সাহিত্য নাট্য সঙ্গীত চেষ্টা বিশিষ্ট চেহারা নিয়েছে। আরমেনিআনদের মুখপাত্র হিসাবে উৎকৃষ্ট লেখক স্যারোইআন বর্তমান। এক বোধ হয় আদিম রেড ইণ্ডিয়ানরাই একবারে উচ্ছিন্ন। এক লোক-সাহিত্য সংগ্রহে ও সমালোচনায় ছাড়া।

এই সমালোচনার ক্ষেত্রে গত ত্রিশ বছরের ইঅাংকি চেষ্টা সত্যিই অবাক করে দেয়, তার বিস্তার আর তীক্ষ্ণতায় উভয়তই। বই এদেশে আমরা কম পাই, তবু আমেরিকান প্রবন্ধ সাহিত্য দেখি বিষয়ে বিচিত্র আর সন্ধিৎসায় গভীর। নিছক পাণ্ডিত্যেরই উপকরণ ব্যবহারেও মার্কিন পাঠক সংখ্যা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও প্রকাশকেরা পণ্ডিতের সহায়।

এই প্রসঙ্গে মার্কিন কাগজ বাঁধাই গ্রন্থমালার উল্লেখও করা হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে উচ্চললাট বহু বই এই সব সীরিজে লক্ষ লক্ষ কপি চলে যা আবার প্রতিসাম্য পায় পরীক্ষামূলক দুঃসাহসী পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে বা প্যারিস রিভিউ-এর মতো সদরুদ্দিন আগা খানের আনুকূল্যে।

ইংরেজি, ফরাসী, প্রভৃতি সাহিত্যের দর্শনের ভাষ্য টীকা অনুবাদ ইত্যাদিতে এমনকি প্রধানত শত্রুভাবে ভজনার ফলে সাম্যবাদী রুশ তত্ত্বের অনুবাদে আলোচনাতেও মার্কিন গ্রন্থজগত ঐশ্বর্যময়।—ল্যাটিমোর, ফিটসজেরাল্ড গ্রেগরি, ফিটস, হমফ্রিস-দের কাব্যানুবাদ বিনি-অনের দান্তের মতোই মনোযোগের দাবি রাখে। এবং নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য অনুবাদ বা টীকা আরো অনেক হয়েছে যা আমার জানবার সুযোগ হয়নি। দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানগর্ভ ইওরোপীয় বইও এখন মার্কিন অনুবাদেই পড়তে হয়: আউয়েরবাখের মাইমেসিস, কুরতিউসের মধ্য যুগের লাতিন সাহিত্য কোয়েকেরিৎসের শেকসপীরীয় শব্দোচ্চারণ। আর যারা ইংরেজি সাহিত্যের সাহায্যে জীবিকার্জন করেন বা বিশুদ্ধ জ্ঞানপিপাসায় পড়াশোনাই করেন, তাঁদের পক্ষে তো মার্কিন পণ্ডিতের সটিক সংস্করণ পাণ্ডিত্যের শেষ কথা: মিলটনের রচনাবলী বা ডনের উপাসনা ভাষণ ওঅলপোলের পত্রাবলী ইত্যাদি: তেমনি সাহায্য করেন নিছক সাহিত্যিক সমালোচকবৃন্দ: র‍্যানসম স্পেনসর, উইনটরস, ব্রুকস, ট্রিলিং, ভ্যান ও'কনর, ব্ল্যাকমিউর, ক্যারথ,

শোয়ার্টজ, কৃলি, মিজনর, বিউলি, চেজ, রাভ, লেভিন, জেবেল—এমন অনেক আছেন, যাঁদের লেখা প'ড়ে প্রাচীন বা আধুনিক সাহিত্য উপভোগ আমার অন্তত সমৃদ্ধ হয়েছে, যেমনটি সেকালে হওয়া যেত ইংরেজ সমালোচকদের লেখায়। এবং কারণটা এই : ইংরেজ সমালোচকরা আজ বড়ই ক্লান্ত, বোরড, উৎসাহ ও সাহস দুইই তাঁদের অপেক্ষাকৃত বিবশ। ফলে এখনও এক সেই রিচার্ডস ছাড়া বা সেই লীভিস নাইটসের মতো তাঁর শিষ্যমহান্ত ছাড়া বড়তত্ত্ব বা বিশেষ প্রশ্ন তুলে আলোচনা ইংরেজিতে পড়তে গেলে এখন যেতে হয় লিও স্পিটজর, কেনেথ বর্ক, সুজান লাঙ্গের, আর এম অ্যাডামস, নর্থর্প ফ্রাই, হুইলরাইট, ব্ল্যাকমিউর প্রভৃতির কাছে। কারণ প্রতীক এবং পুরুষার্থ সংক্রান্ত ভাষার বা প্রকাশের মূল প্রশ্নগুলি আলোচনা আজ হোআইটহেড ডিউঈ স্যাণ্টাইআনা কাসিরেরের কল্যাণে মার্কিন জলবায়ুতে আর অস্বাভাবিক লাগে না, এমনকি ফলেন পরিচীয়তে এই মর্মে সাম্রাজ্য ব্যবসার যে স্থূল ব্যবহারিক দর্শন পশ্চিমা সভ্যতায় কয়েক শতাব্দী ধরে ওতপ্রোত, তার আলোচনাও মার্কিন দেশেই অধিক সার্থক। অন্যান্য শিল্পের আলোচনাতেও এর শুভফল দেখা যাচ্ছে। সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা গবেষণাতে তো বটেই, নর্বট ভীনর, এরিখ ফ্রম, রাইট মিলস, পলবারান, স্থইজি, এরিকসন, ক্লকহন, ম্যাকলুহনদের মূল্যবান রচনাবলীতে।

এবং অন্তত আমাদের পক্ষে এর প্রাসঙ্গিকতা রুশ বা চৈনিক অভিজ্ঞতার মতো না হলেও ইংরেজি উপমা সাধনার চেয়ে ঢের বেশি নিকট সত্য। পণ্যযুগের যন্ত্রমাহাত্ম্যের যন্ত্রণা, তার বিশৃঙ্খলা, মানুষের মানবিক বৃত্তি ব্যাপারে, ইন্দ্রিয়-স্নায়বিক সংবেদনের ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি আমাদের কাছেও আজ প্রয়োগে আর প্রয়োগের সম্ভাবনায় বাস্তব। আমেরিকায় যা অর্জনের শিখরে, ব্যবস্থায় সচ্ছলতায় প্রাচুর্যে, তাই আমরা পাচ্ছি উল্টাদিকে, শিখরের তলায়, দরিদ্রের কর্দমগহ্বরে, তীব্র অনুকরণের মধ্যে আসন্ন মননহীন অমানুষিকতায়। তাই বোধ হয় ওআশিংটন লিংকন জেফরসন থেকে, হেনরি অ্যাডামস হেনরি জর্জ থেকে প্রতিবাদী ওপেনহাইমর, ভীনর, চার্লি চ্যাপলিন প্রভৃতির মানস ও তার পুরুষার্থময় ভাষা আমাদের দুর্গতির দেশে আপনলাগে।

মার্কিন নরনারীর অন্তরঙ্গ জ্ঞান স্বদেশে বসেই যাঁর বহু বিস্তৃত ও আশ্চর্য রকম গভীর, সেই প্রতিভান্বিত শিল্পী যামিনী রায় মহাশয়ও এমনি কথা বলেন, প্রাচীন দেশ ভারতেও আজ আমরা মার্কিনের মতো ছিন্নভিন্ন, প্রাণ ওষ্ঠাগত একটি জীবনবেদ বা পুরাণের আশ্বাসের সন্ধানে বা ঐক্যের জলধারার খোঁজে, যা

ঐতিহ্যভঙ্গে আজকের উদ্‌ভ্রান্ত বর্তমানকে বাঁধতে পারবে জীবনের পলিতে মাটিতে বহুপল্লবিত বহুশাখ একটি বৃক্ষ—ধনতান্ত্রিক প্রাচুর্যের যান্ত্রিক সচ্ছলতার ফলিত বিজ্ঞানের জিগীষার শেষ পর্বে অথবা বহু বিলম্বিত ধনতান্ত্রিক স্ফেড়নাট্যের বিড়ম্বিত আদি পর্বেই, যা মূলত একই আকাশবিহারী। কারণ আজ পশ্চিমে দুটি দেশ বা দুটি সভ্যতা মাত্র বাস্তব, মার্কিন ও সোভিয়েত এবং শেষ অবধি একটা জায়গায় এর পূরবী ওর বিভাসকে আলিঙ্গন করবেই।

তাই বোধ হয় আমরা কেউ সোভিয়েত উদাহরণে ভরসা রাখি বেশি, কেউ বা বিভ্রান্তিতে বেশি তাকাই মার্কিন সহায়ের দরাজ মুখে। আর এই নিহিত এক সহমর্মিতার জন্যই বোধ হয় এমার্সন হুইটম্যান থেকে আজ অবধি অসাধারণ ও সাধারণ মার্কিন মানুষের ভারত বিষয়ে এত সন্ধিৎসা এবং হৃদ্যতাও। তাই কি ভারত শিল্পতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ বইগুলি বেরোয় আমেরিকাতেই, যদিচ হাইনরিখ জিমর মূলে জার্মান? তাই কি ভারতের জীবনের অর্থাৎ কৃষকের জীবনযাত্রার সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ দরদী মার্কিন অধ্যাপক ড্যানিয়েল থর্নর? তাই কি হুইটম্যানের সেই কবেকার ভারতাভিমুখে যাত্রা A Passage to India?

ভারত আবিষ্কারের পথেই কি আমেরিকায় বা মার্কিন সভ্যতার সূত্রপাত নয়?

আধুনিক কাব্য

১

ক্যাথলিক জাক্ মারিতঁ্যা একদা এক গাছের কথা লেখেন। সে গাছ নাকি বলেছিল, "আমি শুধু গাছ, আর কিছু নয় ; আমি যে ফল ফলাব, সে হবে শুধু ফল। সুতরাং মাটির যোগ আমি রাখবনা, মাটি তো গাছ নয় আর এ আবহাওয়া আমি চাইনা, এ তো শুধু গাছ-আবহাওয়া নয়, এ তো সারা প্রভাঁস বা ভাঁদের জলবায়ু। বাতাস থেকে আমাকে বাঁচাও।"

দীর্ঘকাল ধরে' কাব্যলক্ষ্মীও এই বুলি আওড়াতেন। টি, এস্ এলিয়ট্ তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে অন্য সুর বলান, এই তাঁর কৃতিত্ব। কবিত্ব করে বলা যায় যে এবার কাব্যলক্ষ্মী জীবনের সমুদ্র থেকে উঠলেন। উঠলেন বটে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে স্বধর্মে নিধন ভালো। ফলে দেখি দুর্বল ডে লুইস যে জীবন দেখেন, সে সংক্ষিপ্ত সরলীকৃত তথাকথিত কম্যুনিষ্ট জীবন। তাই এম্পসন্ ব্রিটিশ মিউসিয়মের বারাণ্ডায় আর মরিয়াম্ মূর জন্তুর বাগানে ; অর্থাৎ গাছ একটা না একটা আশ্রয় চায় — হয় শৌখীন গ্রন্থশালায়, নয় যাদুঘরে। কিংবা জীবনের প্রাত্যহিকতায় নয়, কম্যুনিষ্ট তত্ত্বের জামাকাপড় প'রে।

মারিতঁ্যা এক জায়গায় বলেছেন যে শিল্পীকে নিজের শিল্পে মানতে হয় একটা তপস্যার কাঠিন্য, ঋজু ব্রহ্মচর্য এবং তা মানতে গিয়ে অনেক কিছুই ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়। এই শুচিতা প্রায়ই বার্কার পালন ও রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর মধ্যে নিজের সুখদুঃখ দেহমন নিয়ে, নিজের বিশ্বালোচন নিয়ে নাটুকে আতিশয্য তাঁর কাব্যকে পীড়িত করে। কিন্তু এ ন্যাকামি স্পষ্ট বোঝা যায় প্রথম যৌবনের প্রায় স্বাভাবিক বিকার মাত্র। বিদ্যাপতি বিকারই রাধিকা প্রসঙ্গে বর্ণনা করে' গেছেন। এ কথা মনে হয় যে অন্য তিন কবির মতো বার্কার মানব জীবন ও সভ্যতার অলিগলিতে যান নি। যে পথে তিনি তারস্বরে আত্মকীর্তন করছেন, সে পথ বড়ো ঐতিহ্যের চওড়া পথ, সে পথে চলা যায় ও চলার পূর্ণ পরিণতি আছে। বায়রণের নাটুকেপনা — ডন্ জুয়ানের নয়, চাইলড্ হ্যারল্ডের, বার্কারের ঘাড়ে চেপে থাকলেও, তাই তাঁর মধ্যে মেজর কবির দূর সম্ভাবনা দেখি। অবশ্য বার্কারের প্রিয় মৃত্যু ও প্রেম এখনো কৈশোরের কল্পনা উন্মাদিত নাটুকে

প্রেম ও মৃত্যু। কিন্তু তিনি নিজেই নিজের সীমা বিষয়ে সজ্ঞান (Narcissus I) আর বার্কারের নাটুকেপনা ছাপিয়ে' ওঠে তাঁর উচ্ছল প্রাণশক্তি। এই উচ্ছল প্রাণশক্তি কিছুকাল আগে রয় ক্যাম্পবেলেও পাওয়া গিয়েছিল। ক্যাম্পবেলের মননমার্গ রোমান্টিক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার হওয়ায় তাঁর কবিপ্রকৃতি ম্যাজেপার ঘোড় দৌড়, ট্রিষ্টান্ ডা কুন্‌হা, গোখরো সাপ পোষা ইত্যাদিতেও চমৎকার আলঙ্কারিক ঐশ্বর্য্যেই রুদ্ধ হল। বার্কারের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, যে ব্যাপক জীবনায়ন ও নিজের সীমাজ্ঞান পাওয়া যায় তারই জন্যে ভরসা হয় তাঁর ভবিষ্যতে এবং ক্ষমা করা যায় এই রকম দুর্বল অনুকরণ—

Wondering one, Wandering on.
One among stars, gone
For ever from beneath the feet bereft
From your always wandering all is left.

কিন্তু চার পাঁচটি কবিতায় অন্তত বার্কারের সংযম এর চেয়ে ভালো কবিতা ও সম্ভব করেছে। এবং বার্কারের এই কবিতাগুলিতে স্বকীয়তার দীপ্তি আছে। বিশ্বজগৎ বার্কারের মনে বাঁধা সড়কে যায় না। এই মননের স্বকীয়তায় তাঁর হাতে ভাষার নির্বিশেষ কথা হয়ে উঠেছে বিশেষ। তাই হয়তো তাঁর শিল্পের ত্রুটি। তাঁর শিল্প তৈরি কিছু নিয়ে কারবার করতে পারে না, তাঁর শিল্প তাই— নিতান্ত ছেলেমানুষি ছেড়ে দিয়ে—একটু উচ্ছ্বসিত, Primitive। প্রিমিটিভ্ সম্বন্ধে মারিতাঁর বক্তব্য মনে রেখেই বার্কারকে এ নিন্দা করছি।

ডে, লুইস্‌কে এ নিন্দায় নন্দিত করা সম্ভব নয়। বার্কারের তপশ্চর্যায় ত্যজ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণে বয়সোচিত চাঞ্চল্য আর ডে লুইসের তপশ্চর্যাই নেই। তাঁর প্রবন্ধের বই পড়ে ও তাঁর গুরু ও বন্ধু অডেনের বিশ্বরূপদর্শনে (The Arts Today) নামক গ্রন্থে। জেনেছি যে কাব্য সম্বন্ধে ডে লুইসের বোধ শক্তি কিঞ্চিৎ বাঁধাধরা ও তাঁর বিশ্বলোচন মার্ক্সীয় পথে হাঁটতে গিয়ে গোলকধাঁধায় ঘুরছে।

এই নব রোমান্টিকরা যে শুধু সমাজরাষ্ট্রীয় পরিবর্তন চান, তা নয় তাঁদের জীবনায়নই সেখানে শেষ। এলিয়ট্‌পূর্ব কাব্য সম্বন্ধে আপত্তি হত সে কাব্যের বহুমুখ জীবনকে এই সংক্ষিপ্ত সহজ করাতেই ; সে আপত্তি আবার এই বামপন্থী কবিকিশোরদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ! এই ফাঁকি ডে লুইসেই সব চেয়ে সহজে ধরা পড়ে, কারণ তাঁর শিল্প স্থূলগ্রাহ্য। তাই তাঁর এ গুরুতর প্রশ্নের জবাব দেবার

ও প্রয়োজন হয় না—Is it your hope, hope's hearth, heart's home, here at the lane's end? বরঞ্চ হপ্‌কিন্‌সের জন্যে দুঃখই হয়। লুইসের যে মনন ক্ষীণ ও জীবনদৃষ্টি ধার করা তার একটা প্রমাণ তাঁর এই হপ্‌কিন্‌স্‌ ও অডেনের কবিতাশিল্পের কাছে ঋণ। তার চেয়ে বড়ো প্রমাণ তাঁর নাম-কবিতার শিল্পরীতির অন্তসার শূন্যতা। Yes, why do we all, seeing a Red, feel small?—ইত্যাদি প্রক্ষিপ্ত বাক্য ছাড়া সে কবিতাটি কিপ্‌লিং-নিউবোল্টের ভাষাতেই লেখা। এবারে লুইস্‌ pylon, cantilever, kestrel দের হাত এড়িয়েছেন বটে, কিন্তু অর্কেষ্ট্রাকবিতা লেখার মানসিক সম্পদ ও শিল্পক্ষমতা তাঁর এখনো হয় নি। শুধু তাই নয়। এটি পড়ে লুইসের কম্যুনিজমের ফাঁকি আরো ধরা যায়। তার কারণ এর বহু চর্বিত প্রেম (love) charity নয়, মৈত্রী নয়। তার কারণ এতে সেই বিশেষ নেই, যে বিশেষ কবির কোনো predominating passion থাকলে তাঁর কাব্যকে রাঙিয়ে দেবেই দেবে। তা ছাড়া, এই কম্যুনিজমের জয়গান যখন মানব-জীবনের বেড়ার বাইরে একঘেয়ে সুরে চলে, তখন সে কাব্যে কবির বিকাশের সম্ভাবনাই বা কোথায় আর বলিষ্ঠ জীবনানুগত্যই বা কৈ? আর মাত্র জীবনানুগত্যই যে কাব্যের উৎস নয়, সে কথা টমিষ্টরাও বলেছেন। লুইসদের এই শৌখীন সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ আশা করি প্রতিক্রিয়া হবে না।

জানি এখানে সামাজিক প্রশ্ন উঠছে। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর এলিয়ট তাঁর কবিতায় দিয়েছেন, স্বধর্মানুসারে বিপ্লবীরাও দিয়েছেন। এ সমস্যায় ডে লুইস ও তাঁর সমপন্থীরা গোলকধাঁধায় ঘুরছেন ও ঘুরবেন বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ তাঁরা ভুলে' যান মানবধর্ম এবং তাতে শিল্পের বিশেষ স্থান ও মর্যাদা কি ও কোথায়। মারিতাঁর ভাষায় তাঁদের দুর্দশার বর্ণনা এই—

And for this reason human production is in its normal state an artisan's production and therefore necessitates a strict individual appropriation. For the artist as such can share nothing in common; in the line of moral aspirations, there must be a communal use of goods, whereas in the line of production the same goods must be objects of particular ownership. Between the two horns of this antinomy St. Thomas places the social problem.

The instruments of labour,—land, agricultural implements the workshop, the tool—were the instruments of labour of single individuals, adapted for the use of one worker and therefore of necessity, small, dwarfish, circumscribed. But for this very reason they belonged as a rule, to the producer.

কিন্তু ঐ পূর্বোক্ত প্যাশন বা টমিষ্টদের কথায় habit—তার অভাবে লুইসের কাব্য যেমন দুর্বল, সেই অভ্যাসের জোরেই তেমনি মিস মূর বা এম্‌পসন স্বপ্রতিষ্ঠ। স্বধর্মস্থিত অভ্যাসের জোরেই—কারণ এঁরা কেউই মেজর কবি নন। তাঁদের কবি স্বভাব দুর্বল নয়, কিন্তু সুকুমার, যত্নপুষ্ট। কিন্তু শুভবুদ্ধি তাঁদের দিয়েছে সীমাজ্ঞান এবং তাদের স্বাভাবিক অভাব ও সার্থক অভ্যাস তাঁদের শিল্প ক্ষমতায় সংহত মূর্তি লাভ করেছে।

অবশ্য যে পাঠক হেনরি জেমস পড়েন নি, ডান্সিআড ও হুডিব্রাস যার ভালো লাগে নি এবং এমিলি ডিকিন্‌সন্‌ আর আলিস মেনলের কবিতা যাঁদেরকে অভিভূত ক'রে না, তাঁদের মারিআন্‌ মূর-কে ভালো লাগবে না। আর মার্ভলের বৈদগ্ধ্য ও রচেষ্টারের চিন্তা-শক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য যাঁরা বোঝেন নি তাঁরা এমপসনের সুকুমার বৈজ্ঞানিকমন্য কবিত্বও বুঝবেন না। অবশ্য এঁরা দুজনে সব সময়ে সুর ঠিক রেখেছেন ভাবলে ভুল হবে। তাল কেটেছে মধ্যে মধ্যে, মধ্যে মধ্যে তানও হয়েছে গোলযোগ। কিন্তু কয়েকটি ভাল কবিতা তো পাওয়া গেল আর তা ছাড়া—

The artist who has the habit of art and the quivering hand produces an imperfect work but retains a faultless virtue. (Art and Scholasticism).

মিস মূরের দৃষ্টি যেন সারসের মতো—মিস সিট্‌ওএলের কবিতা যেন কাকাতুয়ার আর্তনাদ। স্থির শান্ত তাঁর ভঙ্গী—হঠাৎ দেখি শিকার হয়ে গেছে—কবিতার বিশেষ মূর্তিটি আণুবীক্ষণিক দৃষ্টি ও ধারালো ঠোঁটে ধরা পড়ে গেছে। দৃষ্টি তাঁর হেনরি জেমসের মতো হডসনের মতো প্রখর, প্রয়োগ ও গতি তাঁর পোপের মতো, বট্‌লরের মতো তীক্ষ্ণ ও ক্ষিপ্র। অথচ আসন তাঁর সংযত শালীনতায় শ্রীমতী ডিকিন্‌সনের বা মেনলের মতো সুষ্ঠু ও সংহত-আবেগ। মিস মূরের ভাষাও অন্তরঙ্গ স্বকীয়তায় নিজের কাছে সার্থক ও পাঠকের কাছে মূল্যবান। মারিআঁর পরীক্ষা তিনি পেরিয়ে গেছেন—

it is bound fast to an object—any object to be made, certainly not an object of contemplation.

তাঁর, তথা এম্প্‌সনের, তপশ্চর্যা সার্থক সন্দেহ নেই। Selected Poems-এর ভূমিকায় এলিয়ট বলেছেন যে জীবজন্তুর প্রতি বিষয়গত টান দেখে যদি কেউ ভাবে মিস্‌মুর trivial, তাহলে বুঝতে হবে তারই মন trivial। নিশ্চয়ই বুঝতে হবে, আর বাইবলের কাল থেকে জীবজন্তুর বিষয়গত সার্থকতা তো আমরা দেখেই আসছি। কিন্তু এ কথা তো আধুনিক মনস্তত্ত্বে বলে ও সেণ্ট টমাস সেকালেই বলেছিলেন যে মানসিক ক্রিয়ার কারণে কোনো কোনো বস্তু, কোনো কোনো প্রতীক অন্যাপেক্ষা মূল্যবান—যথা ঘ্রাণগন্ধের সম্বন্ধে যা মানসিক ক্রিয়া হয়, তার চেয়ে দৃশ্যবর্ণের ক্রিয়া আরো গভীর। আধুনিক কবি হতে হলে পেতে হবে মহাকবির মনের ব্যাপ্তি—এ কথা মিস্ মূরকে বা এম্প্‌সন্‌কে বলা যায়। তাঁরা কবি এবং ভালো কবি; কিন্তু তাঁদের বাস যে জগতে সে জগৎ সীমাবদ্ধ। এখানে আরেকটা উদ্ধৃতি তাই দিয়ে ফেলছি—

For this reason art, as ordered to beauty, never stops,—at all events when its object permits it—at shapes and colours, or at sounds or words, considerd in themselves and 'as things' (they must be so considerd to begin with, that is the first condition), but considers them 'also' as making known something other than themselves, that is to say 'as symbols'. And the thing symbolised can be in turn a symbol, and the more charged with symbolism the work of art, the more immense, the richer and higher will be the possibility of joy and beauty. The beauty of a picture or a statue is thus incomparbly richer than the beauty of a carpet, a venetion glass, or an amphora.

কিন্তু এ দুঃখ নিয়ে কাব্য পড়া পণ্ডশ্রম। ইংরেজির মতো সাহিত্যেও তিন জনের বেশি মহাকবি আশা করাই অন্যায়। তাই এম্প্‌সন্ পদার্থ বিদ্যার জ্ঞানকে কাব্যমণ্ডিত করতে পারলেন না বলে দুঃখ না করে রাসায়নিক বিদ্যাকে ব্যবহার করতে পেরেছেন বলেই কৃতজ্ঞ রইলুম। Poems-এর আট নটি কবিতা ও Select Poems-এর ততোধিক যে কোনো পাঠককে তৃপ্ত করবে বলে' আমার বিশ্বাস। আর খুসি করবে মিস মূরের গদ্যের শব্দকে কাব্য মণ্ডনের ও এম্প্‌সনের

বৈজ্ঞানিক শব্দকে কাব্যভাষা করার ক্ষমতা দেখে।

কিন্তু এলিয়ট যে মিস্ মূরের লাজুক ও শালীন স্বভাব আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করে বলেছেন, তার দ্বারা কোনো প্রশংসাই হয় না। এ কুণ্ঠা যদি কোন বাধজ (inhibition) হয়, তো কবি চিকিৎসা করালেই পারতেন। তাছাড়া মিস্ ডিকিন্‌সনেরও তো এই বাধ ছিল, কিন্তু তিনি চিড়িয়াখানার আনাচে কানাচে ঘোরেন নি। মিস্ মূর লিখেছেন—

গভীরতম আবেগ সর্বদাই আত্মপ্রকাশ করে মৌনে
মৌনে নয়, সংযমে।

তাঁর গভীর হৃদয়াবেগ কঠিন শাসনের মধ্যেও বহমান দেখেছি। শুধু এই শাসনের গণ্ডী টেনে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ বিকাশেও রেখা টেনেছেন, এই ভয়। এ ভয় এম্‌প্‌সনের বিষয়ে আরো বেশি, কারণ তাঁর গভীরতা আরো আপাতদৃষ্ট, তাঁর স্বভাব আরো শৌখীন ও খেয়ালী। কিন্তু এঁরা দুজনেই স্বধর্মশীল তাই অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ কবি—যা ডে লুইসেরা নন্। মিস মূর তাই বলেছেন—

আমিও এটা অপছন্দ করি : অনেক কিছুই এই আবোল তাবোলের চেয়ে
মূল্যবান।
কিন্তু পড়তে গিয়ে, গভীর অবজ্ঞা সত্ত্বেও, আবিষ্কার করা যায়
এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা অকৃত্রিমের স্থান।
… … … …
তবে বিচার
ব্যতিরেক একটা করতে হয় বৈকি : যখন আধাকবিদের টানা
হেঁচড়ায় এসব জিনিষ মুখ্য হ'য়ে ওঠে
তখন ফলটা হয় না কবিতা,
যতদিন না আমাদের বাণী
সাধকেরা হচ্ছেন "কল্পনার মাছিমারা কেরাণী",
দুর্বিনয় এবং তুচ্ছতা ত্যাগ ক'রে নিরীক্ষার জন্যে উপস্থিত
করছেন কাল্পনিক বাগানে প্রকৃত ব্যাং, ততদিন
আমরা এটা পাব না। ইতিমধ্যে, যদি তুমি একদিন দাবি করো
কবিতার কাঁচা মালমশলা তার

আকাঁড়া উগ্রতায় আর
অন্যদিকে যদি চাও যা অকৃত্রিম,
তবেই তো তুমি কবিতায় অনুরাগী ॥

২

বিদেশী সাহিত্যে প্রবেশ স্বভাবতই আয়াসসাধ্য। প্রবেশ চেষ্টায় আমরা বহু বছর কাটাই কিন্তু ছাড় পত্র শেষে যদিই বা জোটে তো সে শুধু কাছারি বাড়ীতে বসবার জন্য কারণ অন্দরে যাবার প্রশ্ন আমাদের শিক্ষাকর্তাদের মনেই ওঠে-নি। সেই জন্যে আমাদের পড়তে হয় যে সব কাব্য চয়নিকা. তাতে চলা যায় ইংরেজি কাব্যের একটি মাত্র পাকা সড়কে। সে সড়ক আবার প্রায়ই অজ্ঞরুচির নির্দেশে হয়ে পড়ে খানাখোন্দল মাত্র। তাই যৌবনরূপ বিষম কালের পরে আমরা আর কবিতা পড়িনা। যদিই বা পড়ি ও পলগ্রেভের সোনালি টাঁকশাল বা কুইলরকুচ্ নামক ভদ্রলোকের অক্সফোর্ড কেতাব পড়ি। অথচ রডডেন্‌ড্রনগুচ্ছের তলায় যে পড়া উচিত The Weekend Book বা The Major ও Minor Pleasures of Life অথবা Come Hither সে বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

এই পাঠসঙ্কটে অডেনের সৎসাহস একান্ত প্রশংসনীয়। অডেন যে বহু কবিতা সংগ্রহ করেছেন তার বৈচিত্র্যই বিস্ময়কর। লিভ্‌শেট্ট বা স্কেলটনই যে শুধু এখানে জিহ্বা প্রদর্শন করেছেন, তা নয়, এংলোস্যাক্‌সন কবিতার অনুবাদ, ক্যারল, ব্রডশাটগাথা, সীশান্টি, প্যারডি, নার্শরি লোক কবিতা ও গান ইত্যাদিও আমাদের ইংরেজি কাব্যের অন্দর মহলে নিয়ে যায়। যে লুইস্ ক্যারল আমাদের স্কুলে কলেজে অজ্ঞাতনাম অথচ ইংরেজি বিজ্ঞানের বা অর্থনীতির বই-এ যাঁর কাব্যাদি থেকে উপমা পাওয়া যায়, তাঁরও বিস্তর প্রলাপ কবিতা অডেন সংগ্রহ করেছেন।

প্যারাডাইজ লষ্ট বা এপিসাইকিডিয়নের পেশীবহুলতা বা পক্ষসঞ্চার ছাড়াও ইংরেজ কবি-স্বভাবের যে খামখেয়ালী হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনার লীলা আমরা অনেকে বুঝিনে, তার সঙ্গে পরিচয় করানো এ সংগ্রহের একটা বিশেষ কাজ। এবং এ সংগ্রহ পাঠে এ তথ্যও কারো কারো হৃদয়ঙ্গম হতে পারে যে দ্বীপপ্রেম ও সাগর প্রীতি ইংরেজি কাব্যের নাড়ীতে বইলেও রোমান্টিক নবজাগরণই তার চরম কথা নয় এবং ভিক্টোরিয়া যুগের আদিকালে কতিপয় ইংরেজ মহাপুরুষ আমাদের

জন্যে শিক্ষায় যে সীমানির্দেশ করে দিয়ে গেছেন তা ভ্রান্ত না হোক, সঙ্কীর্ণ বটে। অডেন নিজে অসমান হলেও উৎকৃষ্ট কবি আর এদিকে মাষ্টারি করেন। তাই তাঁর বই ইংরেজ বালক ও বয়স্কদের জন্যে সঙ্কলিত হলেও যতদিন না হিন্দি আমাদের রাজভাষা হচ্ছে, ততদিন এই রকম বই স্কুল কলেজে আর বিশেষ করে শিক্ষক শিক্ষালয়ে ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যাবে। কারণ কাব্যে অডেনদের রুচি আশ্চর্য শুদ্ধ এবং তিনি উঁচ্ কপালে না হওয়ায় বহুধাবিচিত্র।

যে দুটি আপত্তি এ বই সম্বন্ধে হতে পারে, তার একটি প্রায় অর্থহীন—যে কবিতাগুলি অডেন দিয়েছেন সে সবই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভালো কিন্তু ঐ রকম ভালো কবিতা তো আরো বিস্তর আছে সে সব বাদ কেন? কিন্তু পাঁচ খণ্ডের English Poets গোছের বিরাট ব্যাপার ছাড়া এ কথার জবাব হয় না। অবশ্য আরেক কথাও আছে। স্থানাভাবেই বহু কবি বাদ পড়েছেন একথা সত্যি হলে কলিন ফ্রান্সিস বিশেষত ডে লুইস ও স্পেণ্ডর কেন? বন্ধুকৃত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু অডেন যে জীবন সম্বন্ধে মতামতের দ্বারা চালিত সে সম্বন্ধেও কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাঁর পক্ষে বক্তব্য এইটুকু যে সংগ্রহণে তাঁর মতামত তাঁর রুচিকে বিকৃত করে নি, করেছে শুধু বর্জনে। এবং বন্ধু-প্রীতি কার না আছে?

তাই সুকুমার রায়ের ছড়াটা মনে পড়লেও অডেনের প্রশংসনীয়তা কমে না। শেষ পর্য্যন্ত আমরা সবাই কি বলিনা—তুমিও ভালো আমিও ভাল কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়? —আর, ডি লা মেয়ারের স্বপ্নালু পলায়ন লিপ্সার চেয়ে হয়ত অডেনের সংস্কারক কর্মঠ ভাবটা অপেক্ষাকৃত পছন্দই করব—প্রথমত এ চালটা নতুন বলে, দ্বিতীয়ত এ চালে ছেলেমানুষিটা আপাত-বোধ্য, সুতরাং প্রভাবটা কম বিপজ্জনক।

আর সংস্কারক হলেই যা হয়, কবিতার স্বধর্মগত আবেদন বিড়ম্বিত হয় স্বরের উচ্চতায় ও মতের বাদবিতণ্ডায়। ফলে পাঠকের মনে হয় সন্দেহ, নবদেশের নবস্বাক্ষরিত নবকাব্যের উপদেশ বাণীতে ভক্তি পায় লোপ। এঁদের একজন বলেন যে মার্কস ও ফ্রয়েড আসলে এক, আরেকজন বলেন যে মনস্তত্ত্বের গভীরে ডুবলে সমাজ গঠনের চূড়ারোহণ অসম্ভব। স্পেণ্ডর বলেন যে এমন নরাধমও আছে যে নিজের ছেলে হলে ব্যক্তিগত ভাবে খুসি হয়। ডে লুইস কিন্তু বলেছেন যে এমন নির্বোধও আছে যে তাঁর সন্তান জন্মোপলক্ষ্যে লেখা মহাকাব্যটা সমষ্টিবাদের অবতারের স্বাগতভাষণ বলে ভেবেছে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফলে রবার্টসের দীর্ঘ ভূমিকায় বিস্তর গালভরা শব্দ ও গভীর সুরের ভাণ থাকা

সত্ত্বেও তাঁর রুচি নয়, তাঁর মতামতে কোনো আস্থা থাকে না। হপকিনসকে পছন্দ করা এক কথা আর রবার্টসের উচ্ছ্বাস মানা স্বতন্ত্র। আসলে পার্সসের কথা সত্য মনে হয় যে হপকিনস নিতান্তই ভিক্টোরীয় কবি ও তাঁর সমস্যা নেহাৎ সেই কালের বিশেষ একজন ধর্মিষ্ঠ সংসার-ভীরু নীড়-প্রত্যাশী মঠ-বাসীর; কাজেই সেদিক দিয়ে তিনি মডার্নই নন। আর তাঁর প্রভাবও আসলে এলিয়টের তুলনায় নগণ্য। শেষোক্তের প্রভাব মজ্জায় মজ্জায় ছড়ায় আর হপকিন্‌সের শুধু অলঙ্কারে—অনুপ্রাসাদিতে। রবার্টসের ভালো লাগবার ক্ষমতা অবশ্য অসাধারণ —সুকুমার রায়ের ছড়াটা বোধ হয় রবার্টসের জন্যেই লেখা। রবার্টসের ভালো লাগে সব কবিই, অবশ্য যারা নেহাৎ জনপ্রিয়, তাদের ছাড়া। কিন্তু হপকিন্‌স্‌কে এই আধুনিকম্মন্যদের ভালো লাগার কারণ আমার বিশ্বাস হপকিন্‌সের কাব্যের কাংস্যকণ্ঠ ও উচ্চস্বর। এবং এই কণ্ঠ ও স্বরের সাধনই আধুনিকদের বৈশিষ্ট্য। বারে বারে লক্ষ্য করেছি এঁদের কবিতায় বাক্যে বাক্যে imperative।

জীবনের প্রয়োজনে কাব্যের মূল্য অবিসম্বাদিত সত্য। রিচার্ডসের সঙ্গে আমিও এক মত। কিন্তু মনোবৃত্তিকে যে শুদ্ধি কাব্য দিতে পারে, সে শুদ্ধি আপাতবোধ্য কর্মিষ্ঠতা নয় বলেই বিশ্বাস। কাব্যকে খানিকটা মোরঁ-র মতো, ফ্রাইএর মতো ধ্যান ধারণার গোত্রেই ফেলি আমরা অনেকে। এইটুকু বলা যায় যে আজকের দিনে আমরা ক্যাম্বেলের চড়া গলায় তৃপ্তি পাই না—বরং প্রেলুডে খুঁজতে যাই সেই গভীর আনন্দ, যাতে করে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো অসতর্ক কবি, অপ্রিয় ব্যক্তিও আত্মীয় হয়ে ওঠেন। সেই জন্যেই এই কবিদের সম্বন্ধে মন শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় স্নিগ্ধ হয় না। এমন কি মনে হয় যার ভাষা হয় উগ্র, গলা হয় কর্কশ, তার গায়ের জোর বা মতের জোর হয়ত কমই। তাই এই সব ভালো ভালো কথাও জোলো বা খেলো লাগে—

Readers of this strange language,
We have come at last to a country
Where light equal, like the shine from snow,
strikes all faces,

Here you may wonder
How it was that works, money, interest,
building, could ever hide

The palpable and obvious love of man for man.
Oh comrades, let not those follow after
—The beautiful generation that shall spring
from our sides—

ইত্যাদি

অথবা

You who go out alone, on tandem or on pillion
Down arterial roads riding in April,
Or sad beside lakes where hill-slopes are reflected
Making fire of leaves, your high hopes fallen,
Cyclists and hikers in company, day excursionists,
Refugees from cursed towns and devastated areas ;
Know you seek a new world, a saviour to establish
Long lost kinship and restore the blood's full establishment

Comrades to whom our thoughts return,
Brothers for whom our bowels yearn
when words are over ;
Remember that in each direction
Love outside out own election
Holds us in unseen connection :
O trust that ever.

স্পেণ্ডর, লুইস্, অডেন্ শুধু নয় তাঁদের অন্যান্য বন্ধুরাও এই একঘেয়ে নাটুকেপনায় দক্ষ, যথা ওয়ার্নার-এর

Now will my mind permit me to linger in the love,
The motherkindness of country among ascending trees

Knowing that love must be liberated by bleeding,
Fearing for my fellows, for the murder of man.

রবার্টস্ অনেক কায়দা করে ওকালতি করেছেন—পাউণ্ড এবং এলিয়ট নাকি য়ুরোপীয়, এঁরা নাকি ইংরেজ। রশ্যান্ বা নাট্‌সিজর্জর জর্মান বল্লেও না হয় বোঝা যেত। এবং এম্‌প্‌সন্ বৈজ্ঞানিক, তাঁর আবেদন সুতরাং ঐ য়ুরোপীয় বৃদ্ধদের চেয়ে সহজবোধ্য, সর্বজন-বোধ্য ও মূল্যবান্। মাত্র দুটি উপাদেয় ছত্র তুলে দেখলেই এম্‌পস্‌নের সর্বজনবোধ্যতা বোঝা যাবে—

Only have we space ; commonsense in common,
A tribe whose lifeblood is our sacrament,
Physics or metaphysics for your showman,
For my physician in this banishment ?
Too non-Eulclidean predicament,

এবং

Professor Eddington with the same insolence
Called all physics one tautology ;
If you describe things with the right tensors
All law becomes the fact that they can be
described by them ;
This is the Assumption of the description.
The duality of choice thus becomes the
singularity of existence :
The effort of virtue the unconsciousness of
foreknowledge.

রবার্টসের ভূমিকার মতো গভীর-ছল ভ্রান্তিবিলাস সত্ত্বেও—কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতা দলীয় কারণে বাদ পড়া সত্ত্বেও তাঁর সংগ্রহটিকেই প্রকাশিত বইএর মধ্যে সব চেয়ে বড়ো ও ভালো বলতে হয়। সুখের কথা, এতে কৃতী আমেরিকান কবিরাও আছেন এবং জীবিত কবিদের মধ্যে ইয়েট্‌স্ থেকে

গ্যাসকয়ন অবধি কবির একসঙ্গে পরিচয় দেওয়া সত্যিই ধন্যবাদার্হ। তা ছাড়া, বাস্তবিক ঐ কয়েকজন সংস্কারক ছাড়া অন্য বিষয়ে রবার্টসের রুচি মোটামুটি নির্ভরণীয়। বিশেষ করে মারিআন্ মূর, ওয়ালেস্ স্টীভেনস্, রোজেন্‌বর্গ, ওয়েন, র‍্যানসম্, টেট্, ক্রেন, রাইডিং, গ্রেভ্‌স্ ইত্যাদির অনেক কবিতাই অনেকের কাছে বিস্ময়কর লাগবে। এবং ঐ সংস্কারক কবিদের নানাকারণে নামডাক বেশি হলেও ইংরেজি কবিতার ভবিষ্যৎ যে তাঁদের হাতেই শুধু নেই, এ আশ্বাসও হয় এই সংগ্রহ পাঠে।

আমার পক্ষে অন্তত এ আশ্বাসের প্রয়োজন। স্থানাভাবে এই কবিকিশোরদের কাব্যের নানা বিরক্তিকর কাব্যগত ত্রুটি, অনুকরণ ও মুদ্রাদোষের বিস্তৃত তালিকা না দিয়েও বলতে পারি যে পার্সনসের মতো আমার মতে যাঁরা আত্মসংস্কারে বিশ্বাস করেন তাঁদের কবিতা জাত হিসাবেই বহিঃসংস্কারে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁদের কবিত্বের চেয়ে বড়ো। কারণ আমি মনে করি যে-জীবনে আত্মজিজ্ঞাসার ছায়া নেই, সে জীবন অসম্পূর্ণ, ছেলেমানুষী। কারণ অসত্যের প্রবল প্রতাপে আমার বিশ্বাস। তাই আমার বিশ্বাস যে মহাকবির কবিতামাত্রেই না হোক, তার কবিদৃষ্টি হবে tragic। তাই কিং লিয়ার স্নায়ুকে ছিন্নভিন্ন করে নিয়ে যায় মানব-জীবনের চরম উপলব্ধিতে, তাই জেম্‌সের নভেল প্রিয়পাঠ্য, তাই এই অডেনাদির প্রায়ই চতুর কুশলী কাব্যে এমন লাইন না পেয়ে হতাশ হই—

Eyes I dare not meet in dreams
In death's dream kingdom
These do not appear:
There, the eyes are
Sunlight on a broken column
There is a tree swinging
And the voices are
In the wind's singing
More distant and more solemn
Than a fading star.—

আসল কথা পরিবর্তনটা ইস্তাহারে নয়, চাই অভিজ্ঞতার গভীরে।

তাই অডেনের দক্ষতা এবং স্পেণ্ডারের সৌকুমার্য পছন্দ করেও আপাতত খুসি হয়েছি তরুণতর বার্কর, টমাস ইত্যাদির আপাত উদ্ভ্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক মননশীলতায়। আশাকরি বিপ্লবের শুদ্ধিসাধনে ইংরেজী কাব্যের আত্মকেন্দ্রিক মিলবে জীবন রচনার বহির্মুখের সঙ্গে।

পরিচয় : বৈশাখ ১৩৪৩

Poems – by William Empson (Chatto & Windus)

Poems – by George Barker (Faber & Faber)

Selected Poems – by Marianne Moore „

A Time to Dance – by Cecil Day Lewis (Hogarth Press)

পরিচয় : শ্রাবণ, ১৩৪৩

The Poet's Tongue – Edited by WH, Auden & J. T. Garrett (Bell)

The Faber Book of modern Verse – „ Michael Roberts (Faber)

The Progress of Poetry – „ J. M. Parsons (Chatto & Windus)

পরিশিষ্ট

বিষ্ণু দে : জীবনপঞ্জি

প্রভাতকুমার দাস

১৯০৯ জুলাই ১৮ [শ্রাবণ ২ বঙ্গাব্দ ১৩১৬] রবিবার বেলা ১টায় পূর্ণিমা তিথি টেমার লেন-এ মাতুলালয়ে জন্ম। উত্তর কলকাতার পটলডাঙা এলাকায় এক যৌথ বনেদি কায়স্থ পরিবারে ১৩ কলেজ স্কোয়ার তাঁর পৈতৃক বাসভবন। আদি নিবাস হাওড়া জেলা (তদানীন্তন হুগলী জেলা) পাঁতিহাল গ্রাম। তিনি পিতা-মাতার পঞ্চম সন্তান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পিতামহ শ্যামাচরণ দে (১৮২০-১৮৮৪), পিতামহ বিমলাচরণ দে (১৮২২-১৮৭৯), পিতা অবিনাশচন্দ্র, মাতা মনোহারিণী। মাতামহ গিরীন্দ্রনাথ বসু।

১৯১৫ অক্টোবর ১৭ পরবর্তী ভ্রাতা কেশব-এর জন্ম।

১৯১৯ শৈশবে মায়ের কাছে শিক্ষার সূচনা, পরে পিতার কাছে পড়েছেন। বাল্যকালে গ্রীষ্মের সময় জ্বর হতো বলে বিলম্বে বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। হিন্দু বা হেয়ার স্কুলে পড়ার পারিবারিক প্রথা ভেঙে, তাঁকে ন-দশ বছর বয়সে মিত্র ইনস্টিটিউশনে সেভেন্থ ক্লাসে (চতুর্থ শ্রেণী) ভর্তি করা হয়।

মিত্র ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় 'সন্দেশ' পত্রিকা আয়োজিত একটি নির্দিষ্ট চিত্র অবলম্বন করে, কবিতা রচনা প্রতিযোগিতায় ডাকযোগে অংশগ্রহণ করে, দশ টাকা মূল্যের ঘোষিত পুরস্কার লাভ করতে পারেননি। কিন্তু সেই বয়সে তারপর থেকে কাব্যচর্চায় গভীরভাবে আকর্ষণ বোধ করেন। আত্মীয় পরিজনদের বিবাহ উপলক্ষে প্রায়ই নানা সময়ে আনুষ্ঠানিক পদ্যরচনার জন্য অনুরুদ্ধ হতেন। এসময় থেকেই দেশি বিদেশি গ্রন্থপাঠে ভীষণভাবে আকৃষ্ট হন। উল্লেখিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র দে তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন।

বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বালক বয়সেই খুশি হতে পারেন নি, তা সত্ত্বেও পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিলেন। জ্যাঠামশাই, আশুতোষ মুখার্জিকে বলে ডাবল্ প্রমোশন করিয়ে দিতে চান, পিতা এই ব্যবস্থার কথা শুনে সম্মত হননি।

১৯২০ ফেব্রুয়ারি ১৮ বড় জ্যাঠামশাই যোগেশচন্দ্র-র মৃত্যু।

১৯২২ খানিকটা স্থানাভাববশত এবং খানিকটা ডাক্তারি কারণে কলেজ স্কোয়ারের বাড়ি ছেড়ে তাঁর পিতা, তাঁদের ন'পিসিমার [কুমুদকামিনী ঘোষ (১৮৫৭-১৯৪৩)] ১০৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়িতে উঠে যান।

১৯২৩ জুন ১৮ বঙ্গাব্দ ১৩৩০ আষাঢ় ৩ কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে আকৃষ্ট হয়ে, তৎকালীন শিক্ষাদানের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন। অবশেষে পিতার অনুরোধে [চৌদ্দ বছর বয়সে] 'মিত্র' ছেড়ে 'সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে' ভর্তি হন।

সংস্কৃত কলেজিয়েট-এ তাঁর সহপাঠী ছিলেন পরবর্তীকালে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় (১৯০৯-৭৭)। ঐ বিদ্যালয়ে ইংরেজির শিক্ষক ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, চিত্রকলার প্রতি উৎসাহী ছাত্রকে একটি আর্ট অ্যালবাম কিনে দেন, দার্শনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর (১৮৯৪-১৯৬১) সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা, পরে তিনি নিজের লেখা 'চার্বাক দর্শন' গ্রন্থ উপহার দেন। সংস্কৃত স্কুলের শেষ পরীক্ষায় দক্ষিণারঞ্জনের ব্যবস্থাপনায় উপেন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার হিসাবে একটি রৌপ্যপদক অর্জন করেন। নিজের কবিতার প্রতি ক্রমশ তাঁর সচেতনতা এমনই বৃদ্ধি পায়, অতৃপ্তির কারণে প্রায় দু'শ পৃষ্ঠার স্বরচিত কবিতার খাতা নষ্ট করে ফেলেন।

১৯২৪ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্যিক আড্ডায় যেতেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬) ও নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সঙ্গে এই সময় থেকেই তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়।

১৯২৫ 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'গার্হস্থ্যাশ্রম' কবিতাটির অংশ বিশেষ রচনার সূত্রপাত, এটি তাঁর পুরাতন কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম।

পদ্য রচনায় উৎসাহিত কিশোর কবি তদানীন্তন 'প্রবাসী' পত্রিকায় পাঠান, কিন্তু নীরব প্রত্যাখ্যানে হতাশ না হয়ে ক্রমান্বয়ে কাব্যচর্চায় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন।

১৯২৭ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

জুলাই (বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ আষাঢ়) ঢাকার পুরানো পল্টন থেকে বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪) ও অজিতকুমার দত্ত (১৯০৭-১৯৯১) সম্পাদিত 'প্রগতি' পত্রিকার প্রকাশ। 'প্রগতি'র জন্য তাঁর ন' জামাইবাবু রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ও কবি নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১)-

এর কাছ থেকে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করে ঢাকায় বুদ্ধদেব বসুকে পাঠাতেন।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই 'প্রগতি', 'কল্লোল', 'ধূপছায়া' প্রভৃতি অতি-আধুনিকপন্থী পত্রিকার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সে সময় কল্লোলযুগের অর্বাচীনতম কবি হিসাবেও তাঁকে চিহ্নিত করা হত। পূর্বোক্ত পত্রিকাগুলিতে তাঁর গল্প কবিতা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। প্রমথ চৌধুরীর (১৮৩৮-১৯৪৬) কাব্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ফরাসি ছন্দে 'ট্রিওলেট' কবিতা লেখেন। তাঁর আঠারো-উনিশ বছর বয়সে 'উর্বশী ও আর্টিমিস'-এর কবিতাগুলি লেখা হয়।

১৯২৮ 'প্রগতি' পত্রিকার প্রথম বর্ষ নবম সংখ্যায় (বঙ্গাব্দ ১৩৩৪ ফাল্গুন) প্রভু গুহঠাকুরতার প্রেরণায় রচিত তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'পুরাণের পুনর্জন্ম / লক্ষ্মণ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। সে সময় অনেকেই [বিশেষত মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)] মনে করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী ছদ্মনামে লিখেছেন।

'বিচিত্রা'য় (১ বর্ষ ২ খণ্ড ৩ সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৩৪) 'স্মৃতি' (ফরাসী ভিলানেল ছন্দে রচিত) কবিতাটি পড়ে কান্তিচন্দ্র ঘোষ (১৮৮৬-১৯৪৮) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

শ্যামল রায় ছদ্মনামে তাঁর রচিত প্রথম প্রবন্ধ 'শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ' প্রকাশিত হয় 'ধূপছায়া' (১৩৩৫ আষাঢ়) পত্রিকায়। সমবায় ম্যানসনে অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এ গগনেন্দ্রনাথ-এর (১৮৬৭-১৯৩৮) প্রদর্শনীতে মুদ্রিত প্রবন্ধটি প্রদর্শিত হয়।

বিষ্ণু দে স্বনামে পত্র মারফৎ গগনেন্দ্রনাথ-এর একটি ছবি পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, সম্ভবত ছদ্মনাম ও প্রকৃত নামের গোলমালে গগনেন্দ্রনাথ বিব্রত হয়ে কোনো ছবি পাঠাননি বা উত্তর দেননি।

'কল্লোল' (৬ বর্ষ ৬ সংখ্যা আশ্বিন ১৩৩৫) পত্রিকায় তাঁর প্রথম মুদ্রিত প্রবন্ধ 'আপন মনে / লেখক ও পাঠক' প্রকাশিত হয়। এর পরে 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয় 'আরব কবিতা' (খলিল জিব্রান) বৈশাখ ১৩৩৬ সংখ্যায়; 'তেপাটি' কবিতা ভাদ্র ১৩৩৬ সংখ্যায়; 'পৌরাণিক প্রশাখা / গল্প' কার্তিক ১৩৩৬ সংখ্যায়। সে সময় কল্লোল যুগের তরুণতম কবি হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করা হতো।

১৯২৯ সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রথমবার ইণ্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়িতে, একটি ঘটনায় মানসিক উত্তেজনায় পীড়িত হয়ে লজিক পরীক্ষা দিতে পারেননি। ফলে পরীক্ষার ফল অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই ঘটনায় এক বছর রাত্রে ঘুমাতে পারেন নি। [দ্র. ছড়ানো এই জীবন / কবিতা সমগ্র ২]। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে এই ঘটনা প্রায় সংকটের আকার নেয়; কিন্তু আকস্মিক ভাবে পটলডাঙা পাড়ার পুরনো বইয়ের দোকানে টি. এস. এলিয়টের 'দি সেকরেড উড' ও 'পোয়েমস ১৯২৫' গ্রন্থ দুটি তাঁর কাছে সংকট মুক্তির নতুন পথ হিসাবে আবিষ্কৃত হয়, পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০) ও অপূর্বকুমার চন্দ-র (১৮৯২-১৯৬৬) এলিয়ট প্রীতিতে নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

১৯৩০ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ইণ্টারমেডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে না গিয়ে সেণ্ট পলস্ কলেজে ভর্তি হন।

সেণ্ট পলস কলেজে রেভারেণ্ড সি. সি. মিলফোর্ড ও অধ্যাপক এইচ. এইচ. ক্রাবট্রি, ইতিহাসের অধ্যাপক ক্রিস্টোফার একরয়েড এবং অধ্যক্ষ ডি. পি. জি ব্রিজ তাঁর ছাত্রজীবনকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেন; বিশেষত অধ্যাপক একরয়েড আধুনিক ইতিহাস, মার্কসবাদ ও পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীত বিষয়ে তাঁকে আকৃষ্ট করে তোলেন। সমসাময়িককালে নীরদ সি, চৌধুরী, অপূর্বকুমার চন্দ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৯১১-৭৭)-র বন্ধুতাময় সান্নিধ্যে তাঁর সংগীতপ্রীতি ক্রমশ গভীর হয়ে ওঠে। তাঁর কবিজীবনে বেটোভেনের নাইনথ্ সিম্‌ফানি-র প্রভাব সর্বজনবিদিত। কলকাতায় যে কজন ব্যক্তির নিজস্ব রেকর্ড সংগ্রহ গর্ব করার মতো, বিষ্ণু দে তাঁদের তালিকায় শীর্ষস্থানীয়। বাখ্, বেটোভেন, মৎসার্ট, শ্রবার্ট, হ্বাগনার—তাঁর অবসর বিনোদনের নিত্য উপকরণ হয়ে উঠে এই সময় থেকে।

১৯৩১ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশ (বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ শ্রাবণ)।

'পরিচয়' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় বিষ্ণু দে রচিত 'অর্ধনারীশ্বর' ও 'বজ্রপাণি' কবিতা দুটি, ফরাসি উপন্যাসকার মারসেল প্রুস্ত-এর 'উইথ

ইন এ বাডিং গ্রোভ' গ্রন্থের বিষ্ণু দে কৃত আংশিক অনুবাদ 'বিচ্ছেদ' প্রকাশিত হয়।

নীরেন্দ্রনাথ রায়ের (১৮৯৬-১৯৬৬) মাধ্যমে 'পরিচয়ে'র শুক্রবাসরীয় আড্ডার সঙ্গে যুক্ত হন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪), যামিনী রায়ের (১৮৮৭-১৯৭২) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূচনা। এলিয়ট চর্চার সূত্রপাত, রবীন্দ্রনাথের কাছে এলিয়ট রচিত 'Journey of the Magi' অনুবাদ করে পাঠান।

১৯৩২ সেণ্ট পলস্ কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাম্মানিক স্নাতক। পরীক্ষায় ভালো ফলের জন্য সেণ্ট পলস্ কলেজ প্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ।

[সূত্র : University of Calcutta. The calender 1953. Part II, Vol. I page 708. C. U. 1958]

১৯৩৩ পিতার প্রত্যক্ষ উৎসাহে ও আর্থিক সহায়তায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টিমিস'-এর প্রকাশ [বঙ্গাব্দ ১৩৪০] প্রকাশক বুদ্ধদেব বসুর তদানীন্তন বাসস্থান ৪৬/১ রমেশ মিত্র রোড-এ প্রতিষ্ঠিত 'গ্রন্থকার মণ্ডলী-র সর্বশেষ গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত।

কাব্যগ্রন্থটি পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ২৯ আষাঢ় ১৩৪০ [১৩ জুলাই ১৯৩৩] তারিখে লিখিত পত্রে প্রশংসিত মন্তব্য করেন, কিন্তু পরবর্তী ১ শ্রাবণ ১৩৪০ তারিখে [১৭ জুলাই ১৯৩৩] পত্রে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। [দ্র. দেশ সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮২]।

১৯৩৪ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রিপন কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর [সূত্র : পূর্বোক্ত p. 47]। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর একই বর্ষে সহপাঠী ছিলেন : দেবব্রত বিশ্বাস (১৯১১-৮০), জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, ক্ষিতীশ রায়, প্রণতি দে, কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী, বরেন্দ্রপ্রসাদ রায়।

নভেম্বর দক্ষিণ কলিকাতায় রসা রোড-এ [অধুনা আশুতোষ মুখার্জি রোড] মাত্র দু-মাস বাস করার জন্য পিতা সপরিবারে উঠে আসেন।

ডিসেম্বর ২ [১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৪১] রবিবার বিবাহ।

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর পৌত্রী, পিতা ব্যারিস্টার প্রভাতকুসুম ও মাতা ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরীর কন্যা প্রণতি-র [জ. ১৯১১-] সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় প্রথম পরিচয়। প্রণতির আদি পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর-উলপুর ;

তাঁরা ব্রাহ্ম ছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁদের পরিবারের। কলকাতায় ৩২ রিচি রোড-এর বাসভবনে বিবাহ অনুষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন হিন্দু মতেও সম্পন্ন হয়।

১৯৩৫ জানুয়ারি ১ পি ২৪১বি রাসবিহারী এভেনিউর [বর্তমানে দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট] ভাড়াবাড়িতে আসেন। পরবর্তী একটানা তিন বছর এই বাড়িতে ছিলেন।

বিবাহের পর প্রায় মাসাধিক কাল রিউম্যাটিক জ্বরে হার্ট খারাপ হয়, যেজন্য গল ব্লাডার অপারেশন হয়নি। সম্ভবত ৫ অথবা ৬ জানুয়ারি সারারাত রিউম্যাটিক জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় প্রায় সংজ্ঞাহীন এক ঘোরের মধ্যে ভোরবেলা একটানা 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি প্রথম রচনা করেন। [প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়' শ্রাবণ ১৩৪৩]। তারপর ঘুম থেকে উঠে কবিতাটির দ্বিতীয় অংশ রচিত হয়।

জুলাই অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ-এর ইচ্ছায় রিপন কলেজে অধ্যাপনা কর্মে যোগদান।

শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন কিছুদিন। অধ্যাপনার অতিরিক্ত উৎসাহ এবং কলেজে অধ্যাপকের সংখ্যা কম থাকায়—সামান্যমাত্র অর্থের বিনিময়ে কলেজের নৈশ শাখার বাণিজ্যবিভাগে ক্লাশ নিতেন। এই সময় আর্থিক রোজগারের উদ্দেশ্যে গৃহ-শিক্ষকতাও করেছেন।

রিপন কলেজে তাঁর সহকর্মী ছিলেন : বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত, প্রমথনাথ বিশী (১৯০১-৮৬), বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-৮৯), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯০৭-), ভবতোষ দত্ত (১৯১১-৯৭), হমফ্রি হাউস প্রমুখ।

সেপ্টেম্বর ১৪ [২৮ ভাদ্র ১৩৪২] প্রথমা কন্যা শ্রীমতী রুচিরা-র [বর্তমান পদবী চক্রবর্তী, ডাকনাম ইরা] জন্ম।

অক্টোবর বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ [আশ্বিন ১৩৪২], প্রথম সংখ্যায় বিষ্ণু দে রচিত 'পঞ্চমুখ' কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়। 'কবিতা'র প্রাথমিক সংগঠন পর্বে বিষ্ণু দে ছিলেন অন্যতম উৎসাহদাতা ও সাহায্যকারী। [দ্র. কবিতা পত্রিকা : সূচিগত ইতিহাস / প্রভাতকুমার দাস]। সজনীকান্ত দাস (১৯০০-৬২)

'শনিবারের চিঠি'তে, অন্যান্য আধুনিক কবিদের সঙ্গে বিষ্ণু দে-কেও অশালীন আক্রমণ করতে শুরু করেন।

১৯৩৬ তরুণতম কবি সমর সেনের (১৯১৬-৮৭) সঙ্গে আলাপ। সে সময় biliary colic-এ ভুগে সদ্য সুস্থ হয়েছেন।

জুন ১৮ ম্যাক্সিম গর্কির মৃত্যু।

১৯৩৭ দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি' [১৩৪৪] প্রকাশ ; সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ভূমিকা লিখেছিলেন, প্রচ্ছদপট রচনা করেছিলেন প্রণতি দে।

এপ্রিল শান্তিনিকেতনে সদলবলে কবিগুরুর আতিথ্যগ্রহণ। সহযাত্রী ছিলেন সমর সেন, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-৭৬) চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯১৪-), জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, (১৯১৭-৭৭), রথীন মৈত্র।

মে গ্রীষ্মের ছুটিতে ঐ একই দলের সঙ্গে সস্ত্রীক পুরীতে মামার বাড়িতে গিয়ে থাকেন, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ তখন পুরীতে ছিলেন, তিনি তাঁদের কোনারক যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী (১৯০৯-৪৫) ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর যুগ্ম সম্পাদনায় 'প্রগতি' সংকলনের প্রকাশ, লেখক তালিকায় ছিলেন : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আবু সয়ীদ আইয়ুব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর সেন, প্রবোধকুমার সান্যাল, অরুণ মিত্র।

১৯৩৮ জুন ২২ দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী উত্তরা-র [বর্তমান পদবী বসু, ডাকনাম তারা] জন্ম।

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ [শ্রাবণ ১৩৪৫]। সংকলনটিতে বিষ্ণু দে ও সমর সেন গৃহীত হননি—এজন্য বুদ্ধদেব বসু সংকলনটির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা লেখেন 'কবিতা' পত্রিকায় [আশ্বিন ১৩৪৫]।

ডিসেম্বর ১ কলকাতায় পিতার মৃত্যু।

ডিসেম্বর ২৪-২৫ কলকাতায় ভবানীপুরে আশুতোষ মেমোরিয়াল হল-এ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় নিখিল ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, বিষ্ণু দে পিতার মৃত্যুর জন্য যোগ দিতে পারেননি।